ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড্
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
গোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
কানাই পাল

উপন্যাস ঃ—ভাবি এক হয় আর * দ্বিচারিণী ২·৭৫ ছোটাগ ৩·০০, ধূসরে রঙিন ৯·০০, দোলা * তরঙ্গ রোধিবে কে * ছায়ার আলো ৭·০০

রমণ্যাস (অঘটনী ঃ—অঘটন আজো ঘটে ৫·৫০, অভাবনীয় ১০·০০, অঘটনের ঘটা ৬·০০, অঘটনের শোভাযাত্রা ১০·০০, অঘটনের পূর্বরাগ ৯·০০, অশ্রু হাসি ইন্দ্রধনু (যন্ত্রস্থ) অঘটনী গল্পমালা ১০·০০, ছায়াপথের পথিক (যন্ত্রস্থ), পতিতা ও পতিতপাবন (যন্ত্রস্থ)

কাব্য ঃ—মধুমুরলী ১০·০০, অনামিকা-সূর্যমুখী ১২·০০ কৃষ্ণ কথাকাহিনী ৬·০০, তারাঞ্জলি (যন্ত্রস্থ)

নাটক ঃ—শ্রীচৈতন্য ৩·০০, মীরা বৃন্দাবনে ৪·০০, ভিখারিণী রাজকন্যা ২·৫০, আপদ * জলাতঙ্ক * সাদা-কালো *

ভ্রমণ ঃ—দেশে দেশে চাল উড়ে * ভ্রাম্যমাণ ৭·৫০, এদেশে ওদেশে * আবার ভ্রাম্যমাণ * ভূস্বর্গ চঞ্চল

জীবনচরিত ও প্রবন্ধাদি ঃ—তীর্থঙ্কর ৮৲, স্মৃতিচারণ (১ম ভাগ) ১২·০০, স্মৃতিচারণ (২য় ভাগ) ৬॥০, যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ (যন্ত্রস্থ), মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ৫৲, সাঙ্গীতিকী ২॥০, ছান্দাষিবী ৫·০০, ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী (অনুবাদ) ৫·০০, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল *

স্বরলিপি ঃ—সুরবিহার (১ম খণ্ড) ৪·০০ (২য় খণ্ড) ৪·০০, দ্বিজেন্দ্রগীতি (যন্ত্রস্থ), হাসির গানের স্বরলিপি ৩·০০ গীতশ্রী * নবগীতি মঞ্জরী * সুরাঞ্জলি ২০·০০

---

* চিহ্নিত বইগুলি ছাপা নেই তবে এদের ভবিষ্যতে পুনর্মুদ্রিত হবে।

উৎসর্গ

(তথা ভূমিকা)

বিমলানন্দ ও রণু মৈত্র গুরুভাই যুগলেষু

তোমাদের এ-প্রবন্ধাবলী উৎসর্গ করলাম জানি ব'লে যে, তোমরা দরদী—যাদের কাছে শুধু যে মনের কথা বলা যায় তাই নয়, তোমরা গুরুভাই ব'লে গুরু গুণগান করলেও সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

প্রবন্ধগুলির এ-নামকরণ করেছি কেন এ-প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে উদয় হ'তে পারে, অর্থাৎ কেন "ধর্ম বিজ্ঞান" নামকরণের শেষে "শ্রীঅরবিন্দ" জুড়ে দিলাম? উত্তর এই যে, প্রবন্ধাবলীর মধ্যে দু একটি প্রবন্ধে তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও এ-বইটির Leitmotiv শ্রীঅরবিন্দই বটে। এ-চমৎকার জর্মন বিশেষ্যটির প্রতিরূপ খানিকটা আমাদের বাংলায় বলা যেতে পারে--ধুয়া। ফিরে ফিরে নানা আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের পরে শ্রীঅরবিন্দের স্থর বেজে উঠেছে বারবারই। তাই এ-নামকরণ।

আমি ভুক্তভোগী, তাই জানি—আমার নানা লেখায় আমি শ্রীঅরবিন্দের মহিমা সম্বন্ধে যা যা বলেছি তাতে এ-যুগের অনেক বুদ্ধিবাদী নাস্তিক ভাবাপন্ন সুধীই সাড়া দিতে পারবেন না। বুদ্ধি যখন চড়াও হ'য়ে ভাগবত তত্ত্বের বিচার করতে বসে তখন তার কাছে পরম ভাগবত মহাপুরুষদের গুণগান বেস্থরো না ঠেকেই পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখনো আস্তিক ধার্মিক শ্রদ্ধালু মানুষ অনেক বেঁচেবর্তে আছেন—তাঁদের কাছে শ্রীঅরবিন্দের বহুমুখী প্রতিভা বরণীয় ব'লে মনে হবার কথা। আমাব বক্ষ্যমান প্রবন্ধাবলী বিশেষ ক'রে তাঁদের জন্যেই লেখা।

আমি আশৈশব নিজেকে "জিজ্ঞাসু" ব'লে চিনেছি। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সত্য নির্ণয়ের একটি গভীর প্রবণতা। এ-জিজ্ঞাসায় আমি চিন্তার অপর্যাপ্ত খোরাক পেয়েছি নানা মনীষীরই চিন্তা ও গবেষণা থেকে। আমার নিজের একটি উপলব্ধি এই যে, ভাবুক মনীষী কবিদের প্রদীপ্ত চিন্তা—বিশেষ ক'রেই অধ্যাত্ম জগতে—আমাদের অন্তরে যেন বীজ বোনে—ইংরাজীতে leaven ব'লে একটি কথা আছে—অর্থাৎ, এমন শক্তি যা অলক্ষ্য থেকেও তার রঙে আমাদের মনকে রঙিয়ে তোলে। আমার সত্য জিজ্ঞাসায় পদে পদেই মনে হয়েছে মহাপুরুষ ও মহানুভব মানুষের কাছ থেকেই আমরা সবচেয়ে বেশি শিখি। মহামনীষী অলডাস হাক্সলি তাঁর Young Archimides গল্পে একথাটি বড় চমৎকার জোরালো ভাষায় পেশ করেছেন। এক প্রতিভাধর গাণিতিক বালকের মনোজ্ঞ ছবি এঁকে মন্তব্য করছেন হাক্সলি সাহেব:

"Perhaps the men of genius are the only true men. In all

history of the race there have been only a few thousand real men. And the rest of us—what are we? Teachable animals. Without the help of the real men, we should have found out nothing at all. Almost all the ideas with which we are familiar could never have occurred to minds like ours. Plant the seeds there and they will grow; but our minds could never have spontaneously generated them."

ভাবার্থঃ প্রতিভাধরেরাই কেবল মানুষের মতন মানুষ। ইতিহাসে দেখতে পাই মানুষের মতন মানুষ জন্মেছে সব জড়িয়ে মাত্র কয়েক হাজার। বাকি সব—মানে আমরা—এঁদের চিন্তা ভাঙিয়েই খাচ্ছি—তাঁরা না জন্মালে আমরা তাঁদের চিন্তা গবেষণা আবিষ্কারের আঁচও পেতাম না।

উপনিষদের ঋষি এ-সত্যটির কী রূপ দিয়েছেন জানোই তো, বলেছেন: যাকে ভগবান নিজে থেকে বরণ ক'রে তাঁর স্বরূপের দিশা দেন কেবল সে-ই জানতে পারে তিনি আসলে কী বস্তু—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। অধ্যাত্ম জগতেও তাই এইসব বরেণ্য মহাপুরুষেরাই কেবল জানতে পারেন পরম অধ্যাত্মতত্ত্ব যার খবর পেতে হ'লে আমাদের তাঁদের কাছে ধর্না দিতেই হবে। এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পরে শ্রীঅরবিন্দের মত এতবড় দিকপাল তত্ত্বদর্শী আর জন্মান নি—শুধু আমাদের দেশেই নয়, দিন দুনিয়ার কোথাও-ই এযুগে এত বড় অধ্যাত্ম দিশারির জুড়ি মিলবে না। এমন দীপ্যমান মনীষা, বহুমুখী প্রতিভা, লোকোত্তর কবিশক্তি, ঐকান্তিক পরাবিদ্যাব্রত ও গভীর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সমন্বয় এ-যুগে আর কোনো মহাত্মার মধ্যেই এমন স্বর্ণপ্রভায় ঝলকে ওঠে নি। মহাকবি, সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রবিৎ, সাহিত্য-রসিক, বিজ্ঞানের মর্মজ্ঞ, প্রবন্ধকার, বেদ-উপনিষদ-গীতার ভাষ্যকার, অতীতের অভ্রান্ত যাচনদার, ভবিষ্যতের আর্ষদ্রষ্টা—আরো কত উপাধিই না তাঁকে দেওয়া চলে! আমি তাঁকে আমার অন্য তর্পণে "যুগর্ষি"* শিরোপা দিয়েছি, কারণ সব জড়িয়ে মনে হয় এইটিই তাঁর যথার্থ তখমা—epithet.

লক্ষণীয়—এ-প্রবন্ধাবলীর নানা প্রবন্ধেই আমার চিন্তার গতি ও মোড় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এ-যুগর্ষির বহু বিচিত্র ভাবোদ্দীপক চিন্তার আলোয়। যেমন কথা, গান, আবৃত্তি, স্তব সমস্তই অনুস্যূত আমাদের বুকের নিশ্বাসে, তেম্নি আমার সমস্ত চিন্তা ও অভীপ্সার মূলেই আছে তাঁর অতুলনীয় ভাবধারা। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে না এলেও হয়ত আমি সত্যনিষ্ঠ ও চিন্তাশীল লেখক হ'য়ে গ'ড়ে উঠতাম, কিন্তু যে আত্মিক সমৃদ্ধির দিশা পেয়ে ধন্য হয়েছি তার চূর্ণচ্ছটাও পেতাম না।

---

* আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" স্মৃতিচারণ দ্রষ্টব্য।

আমার নিছক বুদ্ধিবাদী বুদ্ধিসারথিদের সাথী হ'য়ে চললে আমার কী অবস্থা হ'ত য়ুরোপের কয়েকজন খ্যাতনামা বুদ্ধিবাদী নাস্তিকের দশা দেখে বেশ কল্পনা করতে পারি—যাঁদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ মৃদু হেসে মন্তব্য করেছেন মগজী বুদ্ধিকে শান্ত্রীকুকুর উপাধি দিয়ে :

"A watch-dog of the spirit's sense-railed house
Against intruders of the Invisible,
Nourished on scraps of life and Matter's bones,···
It keeps close guard in front of custom's wall···
And barks at every unfamiliar light
As at a foe who would break up its home."

অর্থাৎ মগজী বুদ্ধিকে তিনি হ্রস্বদৃষ্টি রক্ষী উপাধি দিয়ে বলছেন (কুকুর শব্দটি বাংলা কাব্যে শ্রুতিকটু ব'লে বাদ দিলাম) :

আত্মার ইন্দ্রিয়বোধবেষ্টিত দুর্গের রক্ষী, হায়,
অলক্ষ্য লোকের দেবদূতবৃন্দে পারে না চিনিতে।
প্রাণ-বস্তু-লোক হ'তে খণ্ড খণ্ড অস্থি মাংস ল'য়ে
পুষ্ট সে যে চিরদিন, দেয় তাই পাহারা সে ক্রোধী
সীমান্ত-শান্ত্রীর ম'ত—না পারি' সহিতে উর্ধ্বতর
অচিন সত্যের প্রভা করে প্রতিবাদ তারস্বরে৭

এ-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আর এক বরেণ্য অধ্যাত্ম চিন্তাবীরের কথা বলব ভেবেছিলাম : শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। কিন্তু গত ১৪. ১১. ৬৫ তারিখে তিনি দেহরক্ষা করার পরে তাঁর সম্বন্ধে দুটি বই * লিখেছি ব'লে এ-প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাঁর কথা বলি নি। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি আপত্তি করবেন ব'লেও আরো তাঁর সম্বন্ধে নতুন ক'রে কিছু লিখতে সাহস হয় নি।

এ-সূত্রে আর একটিমাত্র অধ্যাত্মপন্থী চিন্তা নায়কের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই এ-ভূমিকায়—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে এ-যুগের বৈজ্ঞানিক গাণিতিকদের মধ্যে তিনি একজন লোকোত্তর মনীষী : Blaise Pascal (তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ধর্মচিন্তাবলীর নাম PENSÉES)।

তাঁর লেখা আমি পড়েছিলাম বহুদিন পূর্বে, কিন্তু তাঁর কয়েকটি বাণী ছাড়া সবই ভুলে গিয়েছিলাম, যথা :

"Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. অর্থাৎ

* তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজী বইটির নাম—Yogi Krishnaprem—বম্বের ভারতীয় বিদ্যাভবন এর প্রকাশক।

হৃদয় চলে তার নিজের যুক্তির পথে, যদিও বুদ্ধি তার কোনো খবর রাখে না, বা "C'est le coeur qui sent Dieu et non la raison—ভগবানের নাগাল যে পায় তার নাম হৃদয়, বুদ্ধি যুক্তি নয়।

এ-বইটি আমি পড়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দের কাছে পরাবিদ্যায় দীক্ষা পাওয়ার আগে। আজ হঠাৎ চল্লিশ বৎসর পরে পড়তে গিয়ে যেন নতুন ক'রে চম্‌কে উঠলাম। মনে হ'ল যেন শ্রীঅরবিন্দের স্বরই শুনতে পাচ্ছি পাস্কালের নানা দিশায়। কী ভাবে—বলি।

আমার "বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি" প্রবন্ধ দুটি আমি লিখি ১৯৩০।১৯৩১ সালে—অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগে দীক্ষা নেওয়ার ঠিক পরেই যে সময়ে তাঁর বাণীপ্রভা আমার অন্তরকে আলো ক'রে থাকত বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। ১৯৬৫ সালের এ-প্রবন্ধটিতে দুটি প্রবন্ধ জুড়ে এক ক'রে আরো কিছু জুড়ে দিয়ে দেখি—শ্রীঅরবিন্দ পঞ্চাশ বৎসর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (যে, বস্তুবিচারী যুক্তির পথে মানুষের মুক্তি নেই) আজ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলতে চলেছে—বিশেষ ক'রে আণবিক বোমার অভ্যাগমের পর। পাস্কাল যুক্তির সীমা নির্দেশ করেছেন তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে এই সত্যটির 'পরেই জোর দিতে :

"Il n'y a rien de si conforme á la raison que ce désaveu de la raison ··Voilá ce que c'est que la foi : Dieu sensible au coeur, non á la raison."

অর্থাৎ "যুক্তির জোরে যুক্তিকে নামঞ্জুর করার মধ্যে অযৌক্তিক কিছুই নেই"—অর্থাৎ কিনা যুক্তি দিয়ে যুক্তির সীমা নির্দেশ ক'রে বিশ্বাসের স্বরূপ দেখতে পাওয়া : "দেখ বিশ্বাসের মহিমা—শুধু সেই ভগবানের হদিশ পায় বুদ্ধি যুক্তি পায় না।"

কিন্তু তা ব'লে তিনি বলিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার বিরোধী নন। বলেছেন সঘনেই : "মানুষ চিন্তা করবে বটেই তো। সেই ভাবেই যে তাকে গড়া হয়েছে এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। চিন্তা মানুষের ধর্ম, চিন্তাই তাকে মানের মুকুট পরিয়েছে। তার বরণীয় কর্তব্য—ভাবতে শেখা যে ভাবে ভাবা উচিত। কেবল ভাবনার পর্যায় হওয়া উচিত—প্রথমে নিজেকে ও নিজের স্রষ্টাকে নিয়ে পড়া, আর শেষে মিলিয়ে দেখা—বিকাশের পরিণতি কোথায়। কিন্তু হ'লে হবে কী—হায় হায়! মানুষ আজ কী চিন্তা নিয়ে মেতে আছে বলো তো?—না, নৃত্য, গীত, হানাহানি, রাজা হ'য়ে বসা—এই সব। ভেবে দেখবে সে কবে—রাজা হওয়ার মানে কী—মানুষ হওয়াই বা কাকে বলে?"

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আরো উজ্জ্বল গভীর ভাষায় আমাদের দীক্ষা দিয়েছেন আশ্চর্য আত্মশক্তির, আলোকিত আত্মবোধের; আভাষ দিয়েছেন—বুদ্ধির ক্রমবিকাশের পথে

বোধির উদয় হ'লে আমাদের অন্তরাত্মাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে মনের রংমহলকে—যুক্তি, বুদ্ধি, স্বেচ্ছা, কামনাবাসনা—সব সহায়কেই :

"When we have passed beyond knowings, then we shall have knowledge. Reason was the helper ; Reason is the bar.

"When we have passed beyond willings, then we shall have power. Effort was the helper ; Effort is the bar.

"When we have past beyond enjoyings, then we shall have Bliss. Desire was the helper ; Desire is the bar."

(*Thoughts & Glimpses*)

এরই নাম প্রজ্ঞার বাণী—যার দিব্য দীপ্তি ঝল্‌কে উঠেছে শ্রীঅরবিন্দের লেখার ছত্রে ছত্রে, এবং শিখর ঝংকার ঝংকৃত হয়েছে তাঁর সাবিত্রীতে (৮. ৬) :

God must be born on earth and be as man,
That men, being human, may grow even as God.

শিবের লভিতে হবে জন্ম এ-ধরায় জীবরূপে,
ফলে যার মর্ত্য জীব লভিবে বিকাশ শিবরূপে।

এ-প্রবন্ধাবলীতে শ্রীঅরবিন্দ পাস্কাল প্রমুখ এ-দেশের ওদেশের নানা প্রবুদ্ধ মনীষীর প্রজ্ঞাবাণীর কথাই আমি বলতে চেয়েছি আমার ক্ষুদ্র সাধ্য ম'ত—বিশেষ ক'রে নানা মহাজনের চরিত্র-চিত্রণে ও দৈববাণীর গুণকীর্তনে। তাঁদের আদিত্যপ্রভার কয়েকটি চূর্ণ রশ্মিও যদি আমার রচনায় এখানে ওখানে চিকিয়ে উঠে থাকে তাহ'লেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব—যদিও এ-করুণ সত্যটি আমার অগোচর নেই যে, এ-ভগবৎ-বিমুখ যুগে এ-শ্রেণীর ভাগবতী বাণী পরিবেষণ করতে চাইলেও খুব কম জিজ্ঞাসুই হাত বা পাত পাততে রাজী হবেন। হোক। আমি যা সত্য ব'লে জেনেছি, চিনেছি, দেখেছি তারই গুণগান করতে চাই যতদিন নিশ্বাসে তাঁর নাম নেওয়া সম্ভব হবে। এর ফল নিয়ে ভাবনা বিড়ম্বনা—গীতায়ও বলে নি কি : "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ?" (আমাদের কর্মেই অধিকার আছে, ফলে নয়) এই কথাটিই হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে আমার কণ্ঠ গেয়েছিল গত বৎসরে :

(এসো) নেচে নেচে সুরধুনী ! মধুর মূর্ছনায় :
(রঙিন) ঝিনুক নয় আর মুক্তা তোমার অন্তর আমায় চায়।

ইতি

তোমাদের স্নেহানুগত
দিলীপদা

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি*

Our age has made an idol of the brain ;
The last adored a purer Presence ; yet
In Asia like a dove immaculate.
He lurks deep-brooding in the hearts of men.

(Sri Aurobindo : *In the Moonlight*)

The simple faith (in science) which upheld the pioneers is decaying at the centre……In our day, those remote from the centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel……Most men of science in the present are very willing to claim for science no more than its due and to concede much of the claims of other conservative forces such as religion.

(Bertrand Russell : *Is Science Superstitious*)

Apart from religion, human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of misery, a bagatelle of transient experience.

(A. N. Whitehead : *Science & the Modern World*)

মানসচিন্তারি করে উপাসনা যুগ আমাদের ;
পূজিত বিগত যুগ এক শুভ্রতর মহীয়ানে ;
তবু স্বর্গবিহঙ্গের ম'ত এশিয়ার গূঢ় প্রাণে
উচ্চে রাজে নিরঞ্জন নিত্যজ্যোতি সে দেবদেবের।

(শ্রীঅরবিন্দ—"চন্দ্রালোকে" কবিতা)

বিজ্ঞানে যে-সরল শ্রদ্ধা তার পথিকৃৎ-দের উপজীব্য ছিল, সে-বিশ্বাসের মূল আজ শুকিয়ে যায় বুঝি ! আমাদের যুগে মানস-সংস্কৃতির রাজধানী থেকে যারা দূরে আসীন তারা বিজ্ঞানের নামে যে-ভাবে উজিয়ে ওঠে

---

* ৩৫ বৎসর আগে এ নিবন্ধটি লেখা। অনেক কিছুই জুড়েছি, ছেঁটেছিও বিস্তর। একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ বলা চলে। প্রবন্ধটি সময়োপযোগী মনে হয়। লেখক—

বিজ্ঞানের উদ্গাতারা আর সে-উচ্ছ্বাস বোধ করেন না। আজকের দিনে বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রাপ্য যতটুকু তার বেশি অর্থ চান না আর এমন কি, ধর্মবর্গীয় রক্ষণশীল সেকেলে প্রভাবের দাবিদাওয়াকে স্বীকার করতেও তাঁরা নারাজ নন এখন।

(বার্টরাণ্ড রাসেল—"বিজ্ঞান কি কুসংস্কারী" প্রবন্ধ)

ধর্ম বিনা এ-জীবনে লভি হায় আমরা কেবল
থেকে থেকে তুচ্ছ সুখভোগ—যার চকিত চমকে
চোখে পড়ে আমাদের শুধু রাশি রাশি দুঃখশোক
অবসাদ তৃপ্তিহীন ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা।

(হোয়াইটহেড—সায়েন্স অ্যাণ্ড দি মডার্ণ ওয়র্ল্ড্)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বীরবলেষু

আপনার চিঠি পেয়ে কী যে ভালো লাগল! আমাদের সাহিত্য-রাগিণীতে আপনি এক সাবলীল ভাষার তান লাগিয়েছেন আপনার বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—যার ফলে আমাদের ভাব-প্রকাশের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বৈকি—বিশেষ করে মৌখিক বাংলা ইডিয়মের প্রসাদে। কিন্তু সে যাক। আপনার চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে রকমারি ভাবোদয় হ'ল—ভাবলাম লিখিই না কেন আপনাকে—খোলা চিঠিতে।

বিশেষ ক'রে গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভাবদীক্ষা লাভের পরে আমার আজকাল আরো বেশি ক'রে মনে হয় যে ওদেশ আজ বুঝবার কিনারায় এসেছে যে, এদেশকে (অর্থাৎ ভারতকে) যদি জয় করতে হয় তবে আমাদের অন্নজগৎকে জয় করলেই কাজ হাসিল হবে না, সব আগে চাই আমাদের (পর পর) প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ-লোকের 'পরে চড়াও হওয়া। তাই ওরা আজ চাইলো ওদের ধর্মে অশ্রদ্ধা ও আত্মিক ইষ্টার্থে (values) সংশয় আমাদের মনে চারিয়ে দিতে।

মহাভারতে একটি চমৎকার কথিকা (parable) আছে। বৃত্রসংহারের পরে তাঁর শিষ্যসামন্তেরা লুকিয়ে সমুদ্রের নিচে সভা করল (কেন না সেখানে বজ্র পৌঁছতে পারবে না)। এরা কালকের দৈত্য—প্রচ্ছন্ন ব'লে

আরো দুর্ধর্ষ, সর্বনেশে। তারা ঠিক করল যে, সমুদ্র থেকে রোজ নিশুত রাতে উঠে এসে এক এক ক'রে সাধুসন্ত মুনি ঋষি যোগী তপস্বীদের নির্মূল করলেই সবচেয়ে সহজে সৃষ্টি ডুববে। লক্ষ লক্ষ জীবকে মারতে সময় লাগবে, কিন্তু এই সব ধর্মধারকদের মারলে সৃষ্টিলোপ হতেই হবে, কেন না "লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—জগৎকে যোগী-ঋষিদের তপস্যাই রক্ষা করে। কাজেই রক্ষকের নাশ হ'লে রক্ষিতও বিনষ্ট হবে—এ হ'ল দুই আর দুইয়ে চার-এর অব্যর্থ গণিত। তাই তারা রেজলুশন পাশ করল ঃ

যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ।
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্॥

অর্থাৎ

ঋষি তপস্বী তত্ত্বদর্শীরাই
ধর্মে ধরাকে ধারণ করেন সবে।
তাঁদের বংশ নির্মূল হ'লে তাই
তপসের নাশে জগতেরো নাশ হবে।

বিজ্ঞানের পিছনে যে-সংশয়দৈত্য গাঢাকা হ'য়ে ছিল সে ছিল এই (ছদ্মবেশী) কালকেয়, তাই সে চাইল বিজ্ঞানের নামে ধর্মেও সংশয় আনতে। বলল যে, যেহেতু সংশয়ই হ'ল বিজ্ঞানসিদ্ধির বনেদ আর বিজ্ঞানের সিদ্ধিই বিশ্বসমৃদ্ধির মূল, সেহেতু ধর্মকেও নস্যাৎ ক'রে দাও সংশয়-তীরন্দাজিতে।

একথা বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন আরো এই জন্যে যে, বুদ্ধি যুক্তি ছেড়ে শ্রদ্ধা বিশ্বাসকে ভজলে যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তাকে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদেই টলানো যায় না। তাই তাঁরা অভিযান (campaign) সুরু করলেন শ্রদ্ধা বিশ্বাস পূজা ভক্তির বিরুদ্ধে। বললেন ঃ "দেখ অন্ধ বিশ্বাসে তোমাদের সমাজে কত কুসংস্কারের আগাছা ও ভয়ের কাঁটাবন গজিয়ে উঠেছে।" বুদ্ধি দিল যুক্তিবর, আর বিজ্ঞান—ভুক্তি-অভয়। জঙ্গল ওরা অনেকটা সাফ করল বৈ কি। কেবল দুঃখ এই যে, সেই সঙ্গে

বিরল আনন্দসহস্রদলও নিশ্চিহ্ন হ'ল। হোক না, মহামনীষী পল ভালেরি *বললেন বড় গলা ক'রেই* "Les choses du monde ne m'interessent que sous le rapport de l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est un idol. J'y consens, mais je n'en ai trouvē de meilleure." অর্থাৎ বুদ্ধি ছাড়া জগতে আর আছে কী ছাই? কাজেই—বুদ্ধির চেয়ে মহত্তর কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না যখন—আর কাকে গড় করতে যাব?

এর উত্তরে যদি আমরা বলি: "কেন? বিশ্বাস শ্রদ্ধা স্বজ্ঞা (intuition) এসব দেবতাও তো আজো বেঁচেবর্তে আছেন—" তাহ'লে ভালেরি-প্রমুখ বুদ্ধিপূজারীরা বলবেন: "ওঁরা দেবতা কিসে? বুদ্ধি যুক্তির পদবী—মহাপ্রভু, শ্রদ্ধা বিশ্বাস তো তাঁবেদার—ওরা চায় ছায়ার কাছে হাত পাততে, বিজ্ঞান বিশুদ্ধ আলোর উপাসক, কেন না তার ভর পরীক্ষা নিরীক্ষা ওজন মাপজোপ—এককথায় যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, গুণে বলা যায়, ডুব দিয়ে তল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মূল হ'ল ভয়ের দণ্ডবৎ, যা জানি না বুঝি না তার কাছে হাতজোড় করা—এ চলবে না আর। মানুষকে হ'তেই হবে তার নিজের নিয়তির নিয়ন্তা—architect of his destiny, হ'তে হবে বীর, বস্তুবিশ্বকে খাটিয়ে হ'তে হবে ধনী সমৃদ্ধ শৌর্যশালী…" ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের ফলে মানুষ যে অনেকখানি ধনসমৃদ্ধি ও বলবীর্য লাভ করেছে একথা সকলেই মানবেন। অন্ততঃ আজকের দিনে কেউই (মধ্যযুগের পাদ্রীদের সুরে সুর মিলিয়ে) বিজ্ঞানের দানকে নিছক জড়বাদ বলবেন না। আমাদের জগতের বাহ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাড়ে পনের আনাই যে বিজ্ঞানের দান একথা কেউই অস্বীকার করবেন না, করতে পারেন না। আমার বক্তব্য অন্য: আমি শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের লেখা থেকেই কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুটি সত্যের প্রতি:

এক, বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস-নিরপেক্ষ ব'লে ধ'রে নিই, বিজ্ঞানের মূলসূত্র না জানার জন্যেই।

দুই, বিজ্ঞানের কীর্তি সিদ্ধ হলেই বলা চলে না যে, ধর্মের কীর্তি

আনন্দ বা তার প্রতিষ্ঠার যুগ গত। বলা বাহুল্য, প্রথম উক্তিটি যদি সত্য হয় তবে দ্বিতীয়টির সত্য হ'বার সম্ভাবনাও বাড়ে, যেহেতু ধর্মের মূল ভর বিশ্বাসের 'পরেই। তাই আসুন, আজ এই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে (সতেরো ও আঠারো শতকে) * মানুষের মন উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল বৈ কি। মানুষ বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে বলা সুরু করল যে, এ জাজ্বল্যমান আলোর পাশে ধর্মের ধোঁয়াটে ভাব ভক্তি আনন্দকে অবাস্তব ব'লে বরখাস্ত করাই বিজ্ঞ তথা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তখনও রাজশক্তি ধার্মিকদের হাতে, চার্চের প্রতিপত্তি কেঁপে উঠলেও টলেনি। কাজেই এ নব অভিযানে—(বিশেষ ক'রে গ্যালিলিও কোপর্নিকসকে সমর্থন ক'রে বলার পরে যে পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমা করছে)—গির্জার পাণ্ডাপুরুতরা রুখে উঠে বললেন যে, যেহেতু এসব প্রচার বাইরের সৃষ্টিতত্ত্বকে মানতে চাইছে না সেহেতু দাও এ-কালাপাহাড়দের সাজা। ফলে গ্যালিলিওকে যেতে হ'ল জেলে ও ব্রুনো প্রমুখ বহু শহীদকে দেওয়া হ'ল প্রাণদণ্ড। বৈজ্ঞানিকদের দেগে দেওয়া হ'ল হেরেটিক ব্লাসফীমার ব'লে।

কিন্তু অসহিষ্ণু অত্যাচার উৎপীড়নের ফল হ'ল যা হবার তাই: মানুষ বলল ধর্মের পাণ্ডা-পুরুতকে যে, তাঁদের বাঁধন যতই শক্ত হবে সত্যজিজ্ঞাসুদের বাঁধনও ততই টুটবে—চোখ ফুটবে আরো তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে এল যন্ত্রতান্ত্রিক বিপ্লব (industrial revolution): রেল স্টীমার বিজলিবাতি ছাপাখানা এ-ও-তা—মানুষের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল, তার হৃদয়ের সব ভক্তি ভগবানকে ছেড়ে বরণ করতে ছুটল যুক্তিপন্থী বিজ্ঞানবাদকে। ফলে বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়াল অশিক্ষিতের সম্বল ও দুর্বলের সান্ত্বনা। বুদ্ধিমন্তেরা সবাই ভলটেয়ারের বিখ্যাত

---

* বিজ্ঞানের প্রধান কথা—প্রকৃতিকে দেখ, বোঝ, জান। এ বাণীটি প্রথম প্রচার করেন রজার বেকন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাপক হ'য়ে ওঠে সব প্রথম—সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপর্নিকসের মৃত্যুর পরেই, গালিলিওর জীবদ্দশায়—যদিও আরিস্টটল, আর্কিমিডিস, দাভিন্চি প্রভৃতি নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিলেন। (The growth of the Physical Science by Sir James Jeans)

Dictionnaire Philosophique-এর সুরে বলা সুরু করলেন: যুক্তিই হ'ল মুক্তির পথ, বিশ্বাস হ'ল যা নেই তার কাছে হাত পাতা, যথা Holy Roman Empire, যে না হোলি, না রোমান, না এম্পায়ার ইত্যাদি ব্যঙ্গবিদ্রূপ। রুসো তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Contrat Social-এ মন্ত্র দিলেন: "L' home est ne´ libre, et partout il est dans les fers" অর্থাৎ মানুষ জন্মায় মুক্ত হ'য়ে, অথচ জগতে সে সর্বত্রই শৃঙ্খলিত হ'য়ে রইল। আরো কত মনীষী মনের ওকালতি করতে গিয়ে মন যার নাগাল পায় না তাকে ছোট করতে ছুটলেন বিজ্ঞানের নামে, বলা সুরু করলেন: বিশ্বাসই হ'ল যত নষ্টের গোড়া, কারণ সে দেবতার বরের লোভ দেখিয়ে চায় আমাদের অন্ধ করতে। এর পরে হার্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে বুদ্ধিমন্তদের কোরাসে গান সুরু হ'ল: "Science is organised knowledge"—অতঃপর: যা নেই সায়েন্সে তা কোথাও নেই। এককথায়, ভগবানের বেদীতে বিজ্ঞানকে চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুতও বদল হ'ল—বিশ্বাসকে বরখাস্ত ক'রে বাহাল করা হ'ল বুদ্ধিকে, চেতনাকে বলা হ'ল বস্তুর একটা ক্ষণিক ফেনা, বুদ্বুদ। কাজেই বিশ্বাসের ধোঁয়াটে এলাকা ছেড়ে মানুষকে আসতে হুকুম করা হ'ল যুক্তি ও পরীক্ষার স্বচ্ছ আলোক-লোকে। মানুষ ধ'রে নিল—যুক্তির শৃঙ্খলেই মুক্তির নূপুর বেজে উঠবে, না উঠেই পারে না।

বৈজ্ঞানিকদের আত্মপ্রসাদ দ্রুতবেগে বেড়ে উঠছিল শুক্লপক্ষের শশিকলার মতনই—এমন সময়ে হঠাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংলণ্ডে হিউম-নামধারী এক দুষ্ট রাহু উদয় হ'য়ে একটি নিদারুণ প্রশ্ন ক'রে বসলেন। বললেন: "তোমরা বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে গঙ্গাযাত্রা করাতে চাচ্ছ—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে তোমাদের বিজ্ঞানসাধনার মূলেও লুকিয়ে আছে এক সমান অন্ধ বিশ্বাস যে, প্রকৃতি শৃঙ্খলা (order) মেনে চলেন ও চলবেন চিরদিনই। এটা কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে, না বিশ্বাস ক'রেই ধ'রে নেওয়া হয়েছে?" বৈজ্ঞানিকরা শুধু যে চম্‌কে উঠলেন তাই নয়, থম্‌কে গেলেন, কারণ এ-জেরার উত্তরে কোনো সাফাই-ই গাইতে পারলেন না। রাসেল তো তাঁর Is Science Superstitious প্রবন্ধে প্রকাশ্যেই অশ্রুপাত ক'রে বললেন: "The

great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned." ভাবার্থ: বিজ্ঞানের দর্শন বিপন্ন হয়েছে এই জন্মে যে হিউম দেখালেন যে, কার্যকারণসূত্র ও উপপাদন এ-দুই থিওরিই আসলে অন্ধ বিশ্বাসের 'পরে দাঁড়িয়ে। কারণ একথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে বিজ্ঞানের মূল শিকড়ে টান পড়ে, ধর্মকে আর সরাসরি বাতিল করা চলে না, কেন না সে বলতে পারে: "বিজ্ঞানেরও ভর যদি হয় বিশ্বাসের বনেদে তবে ধর্মকে বিশ্বাসভিত্তি ব'লে নামঞ্জুর করলে শুনব কেন?" কিন্তু রাসেল তবু হাল ছাড়েন নি, কান্নাকাটি করার পরেও চোখ মুছে আশা-কুহকিনীকে আঁকড়ে ধ'রে বলছেন: "And yet....I cannot help believing that there must be an answer but I am quite unable to believe that it has been found." অর্থাৎ এ-সমস্যার সমাধান আছেই আছে আমি আজো মনে মনে বিশ্বাস করি, যদিও সে-সমাধান কেউ করতে পেরেছেন ব'লে আমার মনে হয় না।

এ-মহাসমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে রাসেলের প্রিয়তম সতীর্থ তথা বন্ধু হোয়াইটহেড সাহেবকেও। তিনি তাঁর Science and the Modern World নামক বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সমস্যাটির আলোচনা করেছেন এই ভাবে:

প্রথমতঃ তিনি অকুণ্ঠেই মেনে নিয়েছেন হিউমের উপপত্তি (theory) যে, "There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an order of things, and in particular, of an order of Nature." অর্থাৎ কোনো প্রাণবস্ত বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠতেই পারে না যদি এ-দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাপক না হয় যে, প্রকৃতি দেবী স্বভাবে খামখেয়ালী নন, নিয়ম মেনেই চলাফেরা ক'রে থাকেন। একথার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতি দেবীর আইন কানুন মেনে চলাই স্বভাব একথা যদি সত্য না হয় তাহ'লে বলতেই হয়—হোয়াইটহেড সাহেবেরই ভাষায়—যে, "we do not know science

to be true," যেহেতু "it may at any moment cease to give us control over the environment for the sake of which we like it." অর্থাৎ ধরুন জল যদি আজ যখন তখন মর্জি মাফিক জমাট হ'য়ে যায় তাহ'লে কী দারুণ অবস্থা হবে বলুন তো? জাহাজ চলবে কার বুক চিরে? কিংবা ধরুন, বাষ্প যদি বলে, "আমি কোনো-দিকেই চাপ দেব না—তাহলে ট্রেন বেচারীরা চলবে কেমন ক'রে যাত্রী নিয়ে! কিংবা ধরুন, যদি হাওয়া বলে আমি কোনো স্পন্দনই বইব না, তাহ'লে আমরা কান থেকেও হব কালা। যদি আলো বলে আমি ছুটব না, তাহ'লে সূর্য থেকেও আমরা হব আঁধারবাসী। আর দৃষ্টান্ত দেওয়া বাহুল্য হবে। মোদ্দা কথাটা এই যে, প্রকৃতি স্বভাবে নিয়ম মেনে চলেন ব'লেই এ-বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হু হু ক'রে চলেছে অগুন্তি গ্রহ তারা নীহারিকা নিয়ে—এ-বিশ্বাস যুক্তিভিত্তি প্রমাণ করতে না পারলে বিজ্ঞানের প্রাণ বাঁচলেও মান থাকে না। তাই তো রাসেলের এত কান্না যে, বিজ্ঞানের প্রধান পুরোহিতদের মধ্যে বিজ্ঞানের আর সে-প্রতিপত্তি নেই যে-প্রতিপত্তি নিয়ে ধুমধাম করছে তার যজমান রুষ জাপানী চীন।* ভারতের নয়া বিজ্ঞানোৎসাহীদেরও রাসেল এই দলে ভর্তি করতে পারতেন।

এর ফল কী হয়েছে—বা হতে যাচ্ছে—সেটা আমরা ভারতবর্ষে অবশ্য আজও ধরতে পারি নি—ধরতে সময় লাগবে। আপনিই তো বলেছেন—ওদেশের yesterday আমাদের to-day-ই হয়ে এসেছে। এর সহ-সিদ্ধান্ত (corollary): ওদের আজকের কান্নায় আমরা দোয়ার দেব আগামী কাল বা পরশু তরশু। দেখা যাক আমাদের এ-আশঙ্কা অমূলক কি না। History repeats itself—প্রবচনটি প্রায়ই সত্য হয় ব'লেই ভয় হয়। ভয় বলছি, কেন না আমরা অনেক সময়েই ঠেকে শিখলেও কেঁদে শিখতে চাই না যে, বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের বেদীতে বসিয়ে ধর্মকে অপদস্থ করার ফল ভয়াবহ। তাই আমাদের সাবধান করতে আপ্তবাক্যে

---

* "Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the young Chinese still welcome science with seventeenth century fervour. But the high priests begin to weary of the worship to which they are officially dedicated."

(Is Science Superstitious...Bertrand Russell).

বারবারই ধর্মের গুণগান করা হয়েছে, যথা মহাভারতে: "ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ"—ধর্মই মানুষকে ধারণ করে; উপনিষদে: "ধর্মং চর, ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্"—ধর্মাচরণ করো, ধর্মভ্রষ্ট হ'লে সর্বনাশ…। ভাগবতে উত্তরা বলছেন কৃষ্ণকে: "নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্"—অর্থাৎ,

যে জগতে আমরাই পরস্পরকে হানি মৃত্যুবাণ
সেথা তুমি বিনা দিবে কে অভয়, কে করিবে ত্রাণ?

আমি কিন্তু ধর্মের গুণকীর্তন করছি এর ফলে তার প্রতিষ্ঠা বাড়বে ব'লে নয়, করছি দুটি উদ্দেশ্যে: প্রথমতঃ, দেখাতে যে, বিশ্বাসকে অপদস্থ ক'রে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে না—না ধর্মে, না বিজ্ঞানে, না রাষ্ট্রে, না সমাজে; দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাদের অন্ততঃ মনে করিয়ে দিতে হবে যে, ধর্মে অশ্রদ্ধার অবশ্যম্ভাবী ফল—মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দ্বেষাদ্বেষি। আমার শেষ প্রতিপাদ্যটির প্রমাণ দেওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই, ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে-প্রমাণ রক্তাক্ষরে লেখা হয়েছে। তবে প্রথম প্রতিপাদ্যটি সম্বন্ধে আরো কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই ওদেশের মনীষীদের লেখা থেকে।

যাঁকে স্বয়ং রাসেল একজন যুগপ্রবর্তক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ব'লে মনে করেন ও হোয়াইটহেড "adorable genius" উপাধি দিয়েছেন সেই বিখ্যাত উইলিয়ম জেম্স এ-যুগে সবাইকে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ধর্ম সমর্থনে চমকে দিয়েছিলেন তাঁর Varieties of Religious Experience-এর গবেষণায়। এ-বইটিকে এ-যুগে ওদেশের একটি যুগপ্রবর্তক গ্রন্থ ব'লে অভিনন্দিত করা হয়েছে, ধর্মে অবিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকের মনই ভাবতে সুরু করেছে—তাই তো! এ বইটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া অবান্তর হবে, তার প্রয়োজনও নেই। তবে তাঁর এ-প্রখ্যাত বইটির উনশেষ অধ্যায় থেকে একটু উদ্ধৃতি না দিলেই নয়। তিনি বলেছেন যে উপসংহারে তাঁর এই কয়টি প্রত্যয় পর পর সাজাতে চান ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে যা তাঁর মনে হয়েছে বরণীয় ব'লে:

১। এ-দৃশ্য জগৎ আর একটি অলক্ষ্য গভীরতর অধ্যাত্মজগতের অংশমাত্র, আর এই অলক্ষ্য জগৎ থেকেই তার সার্থকতার রস উপচিত হয়।

২। এই উচ্চতর জগতের সঙ্গে মিলন তথা সুষমিত (harmonious) সম্বন্ধ স্থাপন করাই আমাদের যথার্থ লক্ষ্য।

৩। প্রার্থনা বা সে-জগতের সঙ্গে আন্তর যোগের—তাকে ভগবানই বলো বা ঋতম্‌ই (law) বলো—মাধ্যমে সত্যিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়, এবং অধ্যাত্মশক্তির প্রবাহ ব'য়ে এসে মানসিক ও বাস্তব নানা ঘটনা ঘটে এ-দৃশ্য জগতের মধ্যে।

এছাড়া জেম্‌স সাহেব অকুণ্ঠেই স্বীকার করছেন সত্য ব'লে যে,

৪। ধর্ম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'লে আসে যেন বরদা হ'য়ে, কবিত্বময় আবেশের রূপ নেয় আমাদের ঐকান্তিকতা ও বীর্যশক্তিকে উস্কে দিয়ে।

৫। ধর্ম আমাদের আশ্বাস দেয় নিরাপত্তার ও শান্তিভাবের এবং সেই সঙ্গে আর সবার সঙ্গে লেনদেনে স্নেহপ্রীতির জোয়ার জাগিয়ে দেয়।

পাছে অনুবাদটির অর্থপরিগ্রহ করতে কেউ বেগ পান এই ভয়ে মূল উদ্ধৃত করছি নিচে:

Summing up in the broadest possible way the characteristics of the religious life, as we have found them, it includes the following beliefs :—

1. That the visible world is part of a more spiritual universe from which it draws its chief significance ;

2. That union or harmonious relation with that higher universe is our true end ;

3. That prayer or inner communion with the spirit thereof —be that spirit 'God' or 'law'—is a process wherein work is really done, and spiritual energy flows in and produces effects, psychological or material, within the phenomenal world.

Religion includes also the following psychological characteristics :

4. A new zest which adds itself like a gift to life, and takes the form either of lyrical enchantment or of appeal to earnestness and heroism.

5. An assurance of safety and a temper of peace, and, in relation to others, a preponderance of loving affections.

জেম্‌স সাহেব তাঁর Varieties of Religious Experience-এ আরো অনেক গভীর কথা বলেছেন, কিন্তু সে-সব উদ্ধৃতি দেবার স্থানও এ নয়, তার প্রয়োজনও নেই। আমি তাঁর নাম উল্লেখ করলাম শুধু বলতে যে, তিনি অবিশ্বাসী যুক্তির তরফ থেকে পরীক্ষা করেও ধর্মসম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধায় পৌঁছেছিলেন। অবশ্য তিনি ছিলেন স্বধর্মে মনস্তাত্ত্বিকই বটে তাই ধর্মের নানা অনুভূতিকে অনুভব না ক'রে শুধু বিচারের পথ দিয়ে ঠিক বুঝতে পারেন নি। কেমন করে পারবেন? যা শুধু উপলব্ধিগম্য—বোধির এলাকায় পড়ে—তাকে বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ ক'রে বুঝতে গেলে গোল বাধেই। একটি দৃষ্টান্ত দিই আমার এ-বক্তব্যটির ভাষ্যরূপে। বিখ্যাত যোগী কবি এ. ই ওরফে জর্জ রাসেল তাঁর Candle of Vision স্মৃতিচারণে লিখেছেন: "খুব কম মনস্তাত্ত্বিকই এদেশে কল্পনায় সমৃদ্ধ।··· কম্পমান জলে চূর্ণ প্রতিবিম্বই কাঁপতে থাকে। এঁরা হ্রস্বদৃষ্টি, তাই যা দেখেন তাতে তাঁদের মনে বিস্ময় জাগে না।" এ. ই আরো পরিষ্কার ক'রে বলেছেন এ-সব বিচারীদের ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে: "We have no words to express a thousand distinctions clear to the spiritual sense. If I tell of my exaltation to another who has not felt this himself, it is explicable to that person as the joy of perfect health; and he translates into lower terms what is the speech of the gods to men". অর্থাৎ আমাদের অন্তরাত্মার যে-সব স্পষ্ট ও গভীর অনুভূতি হয় তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদগুলির ব্যাখ্যা করবার ভাষা পাব কোথায়? ধরো, আমি যদি বলি আমার পরমানন্দের কথা এমন কাউকে যার তার সঙ্গে আদৌ পরিচয় হয় নি, তাহ'লে সে তাকে হয়ত বা পূর্ণ স্বাস্থ্যের উল্লাসের সমার্থক মনে করবে। অর্থাৎ, দেবতারা মানুষের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা কন সে-ভাষার সে তর্জমা• করবে এক নিম্নতর (মানবিক) পরিভাষায়। কিন্তু তবু জেম্‌স সাহেব মানুষের নানা ধর্মীয় অনুভূতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় নানা অনুভবের মহিমার আভাস

পেয়েছিলেন বৈকি যার ফলে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা এসেছিল ধর্মের দিব্যতত্ত্বে।

তাঁর শিষ্য হোয়াইটহেডের মধ্যে এ-শ্রদ্ধার অনেকখানি সংক্রমিত হয়েছিল। তাই ধর্মকে তিনি শুধু মানুষের "one type of fundamental experience" নাম দিয়েই ডিশমিশ ক'রে দেন নি, ধর্মের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর অন্তরে তার দীপ্তির কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল যার প্রসাদে তিনি বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও কবির পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁর নানা মিসটিক সমর্থনে। এক একটি ভাবোচ্ছ্বাস এত দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে এ-কবিত্বের আলোয় যে, তাঁর লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিই ঃ

"Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things ; something which is real and yet waiting to be realised ; something which is a remote possibility and yet the greatest of present facts ; something that gives meaning to all that passes and yet eludes apprehension ; something whose possession is the final good and yet is beyond all reach ; something which is the ultimate ideal and the hopeless quest." (Science & the Modern World—Religion and Science অধ্যায়)

অর্থাৎ

যা কিছু চলচঞ্চল তার অন্তর্লোকে, অন্তরালে
সে-সত্য বিরাজে ধর্ম ধরে তারি ধ্যান। যাহা কিছু
ধ্রুব নির্বিচল তবু হয় নাই প্রমূর্ত্ত বাস্তবে
দূরতম সম্ভাবনা, অথচ সে সত্য মহত্তম ;
যাকিছু স্ফুরৎরঙ্গ চিরঞ্জীবি হ'য়ে তার রঙে
নয় অধিগম্য তবু ; উপলব্ধি সে-চিরন্তনের
জীবনের শ্রেষ্ঠ বর অভয়, অথচ কেহ তারে
পারে নি ধরিতে কভু ; সাধনার শেষ সিদ্ধি, তবু
পূর্ণিমা-মিলন তার দুরাশা পার্থিব সাধনায়।

শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেছেন যে ধর্ম আনে পূজার প্রেরণা যা

বারবার স্তিমিত হ'লেও প্রতিবারই ফিরে আসে সমৃদ্ধতর আবেগের রূপে। ব'লে শেষে লিখছেন যে, কেবল ধর্মের এই ঋষিদৃষ্টি ও অজেয় বিকাশের দৃশ্যই আমাদের মনকে ভরসার ভিত্তি দেয় (The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion is our one ground for optimism.)

কয়েক বৎসর হ'ল হ্যাভেলক এলিস সাহেব একটি কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক বই লিখেছেন: "The Dance of Life"; ভাষায় পাণ্ডিত্যে সারবত্তায় বইটি এযুগের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এমন কি, বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই সাড়া তুলেছে।

রাসেল প্রমুখ ধর্মবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বতো-বিরোধ স্বয়ংসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন, এলিস নেন নি। তিনি বলেছেন ধর্মের প্রণোদনার (impulse) মধ্যে কোনো মূলগত বিরোধই থাকতে পারে না। তাঁর মতে, এ-বিরোধের উদ্ভব হয়েছে শুধু এইজন্য যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান ধর্মপ্রবৃত্তিকে (atrophy ক'রে) মেরে ফেলে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলিকে অতিপুষ্ট ক'রে তুলতে আর ধার্মিকেরা চান যুক্তিকে বাতিল ক'রে নিছক বিশ্বাস ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে ঘর করতে। এর ফলে শেষটায় হয় কি, যখন বিজ্ঞানসর্বস্ব অধার্মিককে ধর্মসর্বস্ব অবৈজ্ঞানিকের পাশে দাঁড় করানো যায় তখন মনে হয় তারা যেন পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন পরস্পরের অবোধ্য ভাষায়। কিন্তু— এলিস টুকছেন—এজন্যে দায়ী না ধর্ম না বিজ্ঞান, দায়ী কেবল আমাদের একদেশদর্শিতা।

শুধু এলিসই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানজগতের নিউটন আইনষ্টাইনও বলছেন: "সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি জাগায় কে? সৃষ্টির রহস্য। শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎস এই অনুভূতিই বলব। যে-মানুষ এ-অনুভবে সাড়া দিতে অক্ষম, যে সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয় না সে জীবন্মৃত, অন্ধ। জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে ভয়ের সম্ভ্রম জড়িয়ে থাকলেও এই অন্তর্দৃষ্টিই ধর্মেরও উৎস। যা আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য-রহস্য তাও যে সত্যি আছে, তারই প্রকাশ যে হয় মহত্তম প্রজ্ঞায় ও দীপ্ত সৌন্দর্যে···এই জ্ঞান ও অনুভূতিই যথার্থ ধর্মভাবের মূলে। এই

ভাবে—এবং কেবল এই ভাবেই—আমি ধর্মাত্মাদের সগোত্র ব'লে মনে করি নিজেকে।"*

এলিস ও আইনষ্টাইনের কথাই ঠিক—বৈজ্ঞানিকদের মূল প্রণোদনার বিরুদ্ধে তাই কিছুই বলবার নেই শুধু এইটুকু ছাড়া যে, বৈজ্ঞানিকেরা যখন স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে ধর্মকে যাচাই করতে আসেন তাঁদের ল্যাবরেটরিতে ধার্মিককে তলব ক'রে তখনই গোল বাধে। এক ফরাসী মনীষী এই প্রবণতা সম্বন্ধে বড় চমৎকার ব্যঙ্গ করেছেন :

"Et disons-le en passant : c'est un des spectacles les plus bouffons et les plus affligeants qui soient que de voir certaines mains grossières toucher ā les âmes des saints. Aprēs tant de mesaventures pitoyables, il devrait ētre entendu dēsormais que la saintetē n'est pas du ressort de science. Il n'y a de science positive que de ce qui se compte ou de ce qui se mesure. Or, on ne compte pas, on ne mesure pas l'âme des saints, ni d'ailleurs, aucune âme.

(ভাবার্থ : একটা ভারি হসনীয় ব্যাপার সুরু হয়েছে সম্প্রতি : কয়েকটা চাষাড়ে হাত এসে মহাত্মাদের আত্মাকে পরীক্ষা করতে উঠে প'ড়ে লেগেছে। এসব হাতুড়েদের নিত্যনিয়তই পদস্খলন হচ্ছে, অথচ তবু তারা বুঝবে না কিছুতেই যে, মহাত্মাদের মাহাত্ম্য বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে। যথার্থ বিজ্ঞান হ'তে পারে কেবল সেই সব বস্তুর যাদের গোনা যায়, মাপা চলে। কিন্তু মহাত্মাদের আত্মাকে—বা কোনো আত্মাকেই —না যায় গোনা না চলে মাপা।)

এখানে, মনে রাখবেন, আমি ভেক ভণ্ডের কথা বলছি না। সংসারে জাল জুয়াচুরি ভেক বুজরুকি সর্বত্রই ছিল আবহমানকাল—হয়ত থাকবেও চিরদিন, কে জানে? তবে মেকি ভেজাল বুজরুকির দেখা কোথায় না মেলে বলুন তো? বিজ্ঞান শিল্প সমাজসেবা বাণিজ্য রাজনীতি কোথায় ভেজাল নেই? তাই শুধু ধর্মের এলাকায়ই অধার্মিকদের ধর্মের মুখোষ প'রে দাপাদাপি করতে দেখে তাকে বরখাস্ত করলে চলবে কেন?

---

* I BELIEVE (George Allen & Unwin) P 71

কিন্তু যতই বলি না কেন যে, বৈজ্ঞানিকদের ধর্মের বিচারক বাহাল করলে ধর্ম অপদস্থ হবে না—অপ্রতিভ হবে অনভিজ্ঞ বিচারকেরাই, হয়েছে কি, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়লেও আবার থেকে থেকে নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে নব উৎসাহের বান ডাকে যার ফলে মানুষ ফের ভুল করে ভেবে বসে যে, বিজ্ঞান সবজান্তা। তখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদকে ধর্মের বিচারে চীফ জাষ্টিস পদবী দেওয়া হয় আর সব ভেস্তে যায়—পরম কাজী ভুল রায় দিয়ে গণ্ডগোল বাধান পদে পদেই। কিন্তু যেহেতু বৈজ্ঞানিকদের হাতেই আমাদের জীবনমরণ (আণবিক বোমার হুম্‌কির পরে অন্ততঃ মরণ আরো আসন্ন) সেহেতু ধার্মিকদের গোঁড়ামিকে গোঁড়ামি ব'লে সনাক্ত করতে পারলেও বৈজ্ঞানিকদের* গাজোয়ারি হাকিমিকে ডগমাটিস্‌ম্‌ বলে চিনতে আমরা এত বেগ পাই, ভাবি ভুল ক'রে যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই বুঝি আশ্চর্য রকমের খোলা মন—open to conviction.

* ভুল বলছি এই জন্যে যে, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে খানিকটা মন খোলা রাখতে পারলেও অন্য কোনো গবেষণার আঙনে আসতে না আসতে বেঁকে বসেন। বিখ্যাত মনস্বী কনান ডয়ল তাঁর The Edge of the Unknown গ্রন্থে লিখেছেন যে, ফ্যারাডে ও টিণ্ডাল ভৌতিক এলাকায় আসতে না আসতে আগে থাকতেই (a priori) "এ হ'তে পারে ও হ'তে পারে না" ধরে নিয়ে তবে পরীক্ষা করতে ঝুঁকতেন কেবল এই সর্তে যে, তাঁদের পরীক্ষার আগে মনগড়া সম্ভব-অসম্ভবের সূত্রটি সবাইকেই মেনে নিতে হবে (১২ অধ্যায়)।

কেম্‌ব্রিজের লাইব্রেরি থেকে আমি বিখ্যাত রাসায়নিক স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স-এর নানা ভৌতিক পরীক্ষার বিবরণ (papers) পড়তাম সাগ্রহে। তিনি হোম নামে এক আশ্চর্য মিডিয়ামকে বার বার দেখেছিলেন শূন্যে উঠতে। তাঁর ল্যাবরেটরিতে ectoplasm-এর ঘন হ'য়ে শ্রীমতী কেটি কিং-এর দর্শন পাওয়ার কথাও লিপিবদ্ধ করেছিলেন—তার ফটোও নিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তাও করেছিলেন। অতঃপর তিনি রয়াল সোসাইটিকে লেখেন খ্যাতনামা প্রফেসর শারপি ও স্টোককে প্রতিনিধি পাঠাতে—এসব পরীক্ষা চাক্ষুষ ক'রে রায় দিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকযুগলের

মন এতই "খোলা" ছিল যে তাঁরা পিঠ পিঠ লিখে পাঠান যে এসব ভুতুড়ে লীলা নিয়ে চর্চা করা সময় নষ্ট। কনান ডয়ল লিখছেন যে, হোমকে স্যর উইলিয়ম ক্রুক্স অন্ততঃ পঞ্চাশ বার শূন্যে উঠতে দেখেছিলেন। কিন্তু কে শোনে? অন্ততঃ রয়াল সোসাইটির খোলামন বৈজ্ঞানিকেরা যে কান দিতে পারেন না একথা জানিয়ে তাঁরা গভীর গর্ব অনুভব করলেন। একেও কি বলবেন না বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি—যে বলে আমার বুদ্ধি যার নাগাল পায় না সে নাস্তি? •

এরকম বৈজ্ঞানিক গোঁয়ার্তুমির আরো অনেক দৃষ্টান্তই দিতে পারি কনান ডয়ল, স্যর অলিভার লজ, স্যর উইলিয়ম ব্যারেট প্রভৃতি গবেষকদের বই থেকে—(তাঁরা কত উপহাসই যে সহ্য করেছেন "ভূত আছে" এ রায় দেওয়ার জন্যে!)— কিন্তু আজকের দিনে সাইকিক রিসার্চ সোসাইটি তথা প্যারাসাইকলজির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে বৈজ্ঞানিকদেরও চড়া অসহিষ্ণু সুর একটু খাদে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছে ব'লে আর দৃষ্টান্ত জড়ো করার প্রয়োজন দেখি না। কেন না এযুগে অসহিষ্ণু বৈজ্ঞানিকেরাও ধর্ম অঘটন ভগবান প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে অঙ্গীকার না করলেও আর তেমন সঘনে অস্বীকার করেন না। রাসেলের পরম বন্ধু বিখ্যাত মনীষী লোঁয়েস ডিকিন্সন এমন কথাও লিখতে ভয় পান নি: "Nothing that is important can be proved by reason." এক সময়ে বুদ্ধিসর্বস্ব বিজ্ঞানকে বুদ্ধির নাগালের বাইরে সব কিছুকেই নাস্তি ব'লে চলতে হয়েছিল—অতীন্দ্রিয়বাদকে উপহাস করাটা সে-সময়ের যুগধর্ম ছিল ব'লে। কিন্তু কোনো আন্দোলন মনোভাব বা বিশেষ সাধনার সাময়িক উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, সে-সাময়িক প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হবার পরে সে-আন্দোলনকে মহত্তর ও পূর্ণতর বিকাশের মধ্যে সার্থকতা খুঁজতেই হয়। এরই নাম বিবর্তন—evolution:

বিজ্ঞানের আজ সেই অবস্থা। একটা পূর্ণতর পরিণতির, সমৃদ্ধতর সুষমার (হার্মনির) অঙ্কে মহত্তর সার্থকতা খোঁজার তার সময় এসেছে। তাই তার বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে-সত্য আছে তাকে মানুষ এতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে এলেও এ-সত্য যে আংশিকমাত্র একথাও

বিজ্ঞানকে মানতে হবে—ছাড়তে হবে তার বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা। এ-সুষমার পথও মাঝপথে কাটা হয়েছে বৈ কি। মানুষ যুগে যুগে এক একটি পথে একটানা চ'লে যখন শেষে চোরা গলিতে পৌঁছিয়ে দেখে যে সে-পথে আর এগুনো অসম্ভব তখন তাকে ফিরে এসে এমন পথের দিশা চাইতে হয় যে তাকে আরো এগিয়ে দিতে পারে। বস্তুতান্ত্রিকতা আমাদের অনেক কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করেছে, কল্পিত ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে, অসহায় অদৃষ্টবাদ ছেড়ে স্বাবলম্বনের দীক্ষা দিয়ে মানবিক আত্মসম্ভ্রম বাড়িয়েছে—সবই সত্য। কিন্তু ঐ সঙ্গে এনেছে নাস্তিক অহঙ্কার যে বলে "আমি সব পারি, সব বুঝি।" এ-অহঙ্কার অবশ্য সত্যিকার ভাবুকদের মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি, কিন্তু বিজ্ঞানের নাস্তিক দর্শন বহু ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও হ্রস্বদৃষ্টি বিজ্ঞানোৎসাহী বস্তুতান্ত্রিককে আত্মশ্লাঘার অঢেল খোরাক জুগিয়েছে যার ফলে সে যেন দুর্যোধনের মতন দাম্ভিক সুরেই বলা সুরু করেছে যে, ধর্ম হ'ল মনের আফিং এবং যে-বৈজ্ঞানিক এ-জগতে সুদুর্লভ মান পেল তার দোসর আর কে আছে? "মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ—কো নু স্বস্ততরো ময়া।"

দর্শনের দিক দিয়ে একথার ভাষ্য করা যায় এই ভাবে যে, বিজ্ঞানের বহির্মুখী দৃষ্টি বাহ্যজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যাদি খুঁটিয়ে দেখে পরমাণুর মধ্যেও বিপুল শক্তির পরিচয় পেয়ে বুঝতে শিখেছে যে, জড়বাদ ব'লে এ-জগতে কিছুই নেই। সবই এক মহাশক্তির খেলা প্রতি পরমাণুর বুকেই চলেছে এক আশ্চর্য অভাবনীয় শৃঙ্খলায় নৃত্য যার কিছুটা বুদ্ধি ধরতে পারে বটে কিন্তু সে-আভাসের মধ্যে দিয়েই সে দেখতে পায় যে, মহাবিশ্বশক্তির সৃষ্টিলীলার এক অতি সামান্য ভগ্নাংশই তার গোচরে এসেছে। তাই সে বলে মহামতি নিউটনের বিনয়ী সুরে "আমি একটি শিশু মাত্র যে সমুদ্রের তীরে খেলতে খেলতে গড়পড়তা উপল বা ঝিনুক পেরিয়ে খবর পেল এমন উপলের যা আর একটু বেশি মসৃণ, এমন ঝিনুকের যা আর একটু বেশি সুন্দর—কিন্তু সত্যের মহাসিন্ধু আমার সামনে অনাবিষ্কৃতই র'য়ে গেল।"

আজকের দিনে ক্ষুদ্রবুদ্ধি গোঁড়া বিজ্ঞানোৎসাহীরা বিজ্ঞানবুদ্ধিকে সর্বার্থসাধিকা ব'লে শৃঙ্গধ্বনি করলেও চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা সবাই

ক্রমশঃ বিজ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন। তাই তাঁরা আজকাল আর বিজ্ঞানের পাণ্ডাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলেন না—"কো মু স্বন্ততরো ময়া" (আমার মতন কে আছে ?) তাঁরা বলেন আইনষ্টাইনের মতন বিনয়ী সুরে যে, সৃষ্টি-লীলার অচিন্তনীয় মানচিত্রের অলক্ষ্য নীহারিকার গতিবিধির অভাবনীয় বেগ ও শৃঙ্খলার দৃশ্যে "আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, ক্ষুদ্র দৃষ্টি অভিভূত হয়।" এডিংটন, জীন, ক্যারেল, মিলিকান প্রমুখ মনীষীরা তাই বলেন না আর যে, "বুদ্ধি যার তল পায়'না সে নাস্তি।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা মনে পড়ে। এক পথিক বাড়ী ফিরে এসে তার বন্ধুকে বলে : "আমি কাল আসতে আসতে দেখলাম অমুক বাড়ীটা হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল।" বন্ধু বললেন : "দাঁড়াও হে, খবরের কাগজটা দেখি।" ব'লে দেখে বললেন : "ধেৎ। সব বাজে কথা। খবরের কাগজে তো লেখে নি বাড়ী পড়ার কথা!" পথিকবন্ধু বললেন : "সে কি হে! আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলাম।" উত্তরে বন্ধু অম্লানবদনে বললেন : "ও চোখের ভুল। খবরের কাগজে যখন লেখে নি তখন বাড়ী পড়তেই পারে না।" বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক এই ভুলই করেছিলেন, বলেছিলেন : "মুনি ঋষি যোগী যতিদের দল যে-ভগবানকে দেখেছেন বলছেন তাঁর কোনো খোঁজ যখন আমার বৈজ্ঞানিক বকযন্ত্রে মিলছে না তখন বলবই বলব যে ও-দর্শন তাঁদের চোখের ভুল, স্বকপোল-কল্পিত। ভলটেয়ার বেকন হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের ভুল হয়েছিল এইখানেই : যে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধি প্রকৃতির নানা শক্তির যে-সব চমৎকার ছক কেটেছে তার বাইরে আর কিছুকেই মানা চলে না, বুদ্ধি যে-ছক কাটতে অক্ষম সে-ছক নামঞ্জুর।

কিন্তু এ-নিশ্চয়োক্তির নিশ্চয়তা ক্রমশঃ ফিকে হ'য়ে এল যখন ক্রমশঃ তাঁরা বিনয়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে সৃষ্টিলীলার দুরবগাহ মহিমার কিছু আভাস পেলেন। এডিংটন বিজ্ঞানের এই change of front ওরফে নবদৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এত চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর "Nature of the Physical World"-এ, যে বইটিকে য়ুরোপে অনেক বিশেষজ্ঞই অ্যালেক্সিস ক্যারেলের Man the Unknown নামক যুগপ্রবর্তক

গবেষণার পাংক্তেয় করেছেন। ক্যারেলের বইটি মানুষের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা। এডিংটনের বইটি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক আলোচনা। একটি অন্তর্মুখী অন্যটি বহির্মুখী। কিন্তু মজা এই যে, শেষে উভয়েই এসে পৌঁছেছেন একই সিদ্ধান্তে যে, জীবন তথা বিশ্ব এতই আশ্চর্য ও অগাধ যে, বুদ্ধি দিয়ে কেউই তল পেতে পারে না এ-যুগল রহস্যের। এই রহস্যের (mystery) কথা ভেবেই আইনষ্টাইন ও শ্বাইৎজারের মতন মহা-মনীষীও বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছিলেন। আইনষ্টাইন স্তবগান করেছিলেন religious reverence-এর, শ্বাইৎজার reverence for life-এর। জীন্‌সও তাঁর Mysterious Universe-এ সৃষ্টির আকাশতত্ত্ব ও বেগতত্ত্বের খবর দিতে গিয়ে শেষ অধ্যায়ে মানুষের ধর্মভাবকে মান দিয়েছেন। এরই নাম—বিজ্ঞানের সুমতি।

এ-সুমতির কিছু খবর দিতে প্রথম এডিংটনের বইটি থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি দিই দেখাতে—কেন ও কীভাবে বিজ্ঞান তার জবরদখলের অনেকখানি ভূমিই ছেড়ে দিয়েছে ধর্মকে। যদিও বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে সে ঐ দুর্যোধনের মতনই সদর্পে বলেছিল যে ধর্মকে সে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দেবে না কিছুতেই।

প্রথমে এডিংটন দেখাচ্ছেন যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী যুক্তি—(যাকে এক সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একমাত্র দিশারি তথা সারথি ব'লে গণ্য করা হ'ত এবং বলা হ'ত যে, এ-বিচারী যুক্তি যাকে বাহাল করতে নারাজ সে নামঞ্জুর, কেন না যুক্তি ছাড়া অন্য কোনো পথে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান মিলতেই পারে না) শুধু যে অভ্রান্ত নয় তাই নয়, তার সাধ্য সীমাবদ্ধ। এডিংটন বলছেন: জ্ঞান দ্বিবিধ: symbolic অর্থাৎ প্রতীকবর্গীয় ও intimate অর্থাৎ অন্তরঙ্গ। ব'লে সূত্র দিচ্ছেন যে, যুক্তির এলাকা হ'ল প্রথমটি, কারণ দ্বিতীয়টিকে পরীক্ষা করতে এলেই দেখা যায় যে সে বিশ্লেষণের অতীত।* তাঁর ভাষ্য এই যে, ধরো বাতাস চলেছে জলের বুকে। ইকোয়েশন (সমীকরণ) ক'ষে দেখতে পাই ঘণ্টায় দুমাইল চললে বায়ু তরঙ্গ তুলতে পারে। জেনে মনে হ'ল: বাঃ, জানা গেল

* **Nature of the Physical World, ১২ অধ্যায় (Science and Mysticism) দ্রষ্টব্য।**

কিসে কী হয়। কিন্তু তারপর একটি কবিতায় পড়লাম হাওয়া উঠতেই জলে হাসির কাকলি ধ্বনিত হ'ল, † মনেও ছোঁয়াচ লাগল এ-আনন্দের। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে (লিখছেন এডিংটন): এ-হাসি তো কল্পনা, তবে এতে যে আনন্দ এও তো মায়া। বটে, কিন্তু এ-আনন্দ কল্পনা সব জড়িয়ে আর একটি জগৎ গ'ড়ে ওঠে যা প্রাণবন্ত, যা গণিতের ধার ধারে না। কিম্বা ধরো রসিকতা; বুদ্ধি দিয়ে নানারকম রসিকতার বিশ্লেষণ ক'রে তার অনেক কিছুই জানা যায় কিন্তু সে-রসিকতায় হেসে কেন মন প্রফুল্ল হয়, কেন মনে হয়—ভাগ্যে মানুষ হাসতে পারে—এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরই খুঁজে পাওয়া যায় না। এক কথায়, রসবোধ আর তথ্যজ্ঞান, গোনাগুন্তি আর পূজাঅর্চা এ-দুই একেবারে আলাদা চেতনার ছন্দ: একটা অন্তরঙ্গ অনুভূতি, অন্যটা প্রতীকের জ্ঞান। অপিচ:

"We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art, in a yearning towards God, the soul grows upward and finds the fulfilment of something implanted in its nature. The sanction of this development is within us, a striving born with our consciousness or an inner Light proceeding from a greater power than ours……We are meant to fulfil something by our lives. There are faculties with which we are endowed, or which we ought to attain, which must find a status and an outlet in the solution."

(এ তাৎপর্য: পদার্থবিজ্ঞানের বাইরেও নানা জগৎ আছে। সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে নানা আস্বাদন, শিল্পের মধুর ব্যঞ্জনা, ভগবানের জন্যে ব্যাকুলতা—এ সব কিছুর মধ্যে দিয়েই আমাদের অন্তরাত্মা এমন কোনো গভীর

---

† এডিংটন উদ্ধৃত করেছেন একটি কবিতা :

There are waters blown by changing winds to laughter
And lit by the rich skies, all day. And after,
Frost, with a gesture, stays the waves that dance
And wandering loveliness. He leaves a white
Unbroken glory, a gathered radiance,
A width, a shining peace, under the night.

প্রাপ্তির আভাস পায় যার আকাঙ্ক্ষার বীজও আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। এই যে বিকাশ—এর অনুমোদনও আমাদের অন্তরেই নিহিত, যে আমাদের চেতনার সহজাত, কিম্বা বলা যেতে পারে—এর উৎস এমন কোনো আলো যার জনয়িতা আমাদের মানবিক শক্তির চেয়ে কোনো মহত্তর শক্তি···আমরা আমাদের জীবনের তীর্থযাত্রায় কোনো-না-কোনো পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই কৃতকৃত্য হ'তে। আমাদের মধ্যে নানান্ বৃত্তি আছে—আমাদের কর্তব্য সে সব বৃত্তিকে ফুটিয়ে তোলা—যারা চায় এক উজ্জ্বল আত্মমর্যাদায় আসীন হ'য়ে আমাদের এগিয়ে দিতে কোনো পরম সমাধানের দিকে।)

কাজেই—এডিংটন বলছেন—অমুক জ্ঞান বাস্তব (real) আর অমুক জ্ঞান কল্পনা (unreal) এ ধরনের বিচার করতে গেলে পাকে পড়তে হবেই হবে। কারণ বিজ্ঞানের কারবার প্রতীকজ্ঞান নিয়েঃ To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is symbolised."

সুতরাং—তিনি বলছেনঃ "এই বিজ্ঞানের জগৎ (যার নাম দিয়েছেন তিনি pointer readings-এর সমষ্টি) বাস্তব হ'লেও আন্তর জগৎ এর চেয়ে কিছু কম বাস্তব নয়।" কেমন? তিনি উপমা দিচ্ছেন রামধনুর। বিজ্ঞান বলে রামধনু হ'ল ঈথারের স্পন্দন যার তরঙ্গ ·০০০০৪০ সেন্টিমিটার থেকে ·০০০০৭২ সেন্টিমিটার লম্বা—স্পেক্‌ট্রস্কোপের এই অকাট্য বাণী। কিন্তু আমরা তো স্পেক্‌ট্রস্কোপ নই, কাজেই আমরা বলতে পারি বৈকি যে, রামধনুকে মানুষের চোখে সুন্দর রূপে দেখাটাও জগতের একটা বিধান, যেমন বিধান তার তরঙ্গের দীর্ঘতা মেপে রামধনুর বর্ণতথ্য জানা। অন্য ভাষায় বলছেন সাহেব—"ধর্মের বিশিষ্ট বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের তথ্য বা পদ্ধতি দিয়ে প্রমাণ করার কথা আমি ভাবতেই পারি না ("I repudiate the idea of proving the distinctive beliefs of religion either from the data of physical science or by the methods of physical science.")।

আমাদের দেশে একটা অভিযোগ ঘড়ি ঘড়ি শোনা যায় ধর্মের

বিরুদ্ধেঃ যে, ধর্মের অনুভব উপলব্ধি দেখা শোনা ধরা ছোঁওয়া সবই ছায়াভ, ধোঁয়াটে। কৃষ্ণপ্রেম প্রায়ই হেসে বলত: "মিসটিক" বিশেষণটি চলতি প্রয়োগে প্রায়ই misty-র সগোত্র ব'লে ধরা হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের ঠিক উল্টো, যেহেতু বিজ্ঞান হ'ল দেদীপ্যমান্ স্পষ্ট, অতিপ্রত্যক্ষ —যেখানে না কি ঝাপসা কিছুই নেই। কিন্তু হাল আমলে—বলছেন সাহেব—বিজ্ঞানের এই একটা সুমতি মতন হয়েছে যে, আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিদের আর আমরা ছি ছি করি না তাদের অস্পষ্টতার জন্যে, কারণ "We have travelled far from the standpoint which identifies the real with the concrete."—অর্থাৎ সেদিন আর নেই যেদিন আমরা বলতাম যে বাস্তব মানেই যা অতিপ্রত্যক্ষ, ধরা ছোঁওয়া যায়। বলি না কেন? কারণ বললে সব আগে গঙ্গাযাত্রা করাতে হয় ইলেকট্রন, নিউট্রন প্রভৃতি অদৃশ্য বৈদ্যুতিক ছোটাছুটিদের যাদের সম্বন্ধে হদিশ দেওয়া যায় কোনো মডেল এঁকে বা ছক কেটে নয়—কয়েকটি সমীকরণ (equation) পেশ ক'রে।

এডিংটনের লেখা অনেকস্থলেই দুরবগাহ হ'লেও তাঁর রসিকতার আমেজে মন খুশী হয় প্রায়ই তাঁর নানা মন্তব্যে। যথা, যেখানে তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সংকটের কথা বর্ণনা করছেন:

When Dr. Johnson felt himself getting tied up in argument over Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter and that everything in the universe is merely ideal, he answered, striking his foot against a large stone till he rebounded from it: "I refute it thus." Just what that action assured him of is not very obvious, but apparently he found it comforting. And today the matter-of-fact scientist feels the same impulse to recoil from these flights of thought back to something kickable, although he ought to be aware by this time that what Rutherford has left us of the large stone is scarcely worth kicking.

(Chapter 12 Science & Mysticism, pp. 326-7)

আরো অনেক সুচিন্তিত ভাবোদ্দীপক কথা বলেছেন সাহেব তাঁর

এই চমৎকার বইটিতে যার আলোয় বিজ্ঞানের অনেক ধর্মবিমুখ যুক্তি তথা উক্তিকে নাকচ করা হয়েছে। তাঁর মধ্যে মনে হয় ধর্মের কিছু অনুভবও হয়েছিল নইলে ধর্মের নানা প্রতীতির সম্বন্ধে তিনি এমন গভীর কথা বলতে পারতেন না যে, ধর্মের নানা অনুভূতি মাপজোপের এলাকার বাইরে হ'লেও সে-সব জড়িয়েই তবে আমাদের ইন্দ্রিয়জগৎ গ'ড়ে উঠেছে বুদ্ধি দিয়ে যার সংশোধন করেন বৈজ্ঞানিকেরা। সেই সংশোধনের একটি —এডিংটনের মতে—এই স্বীকার যে, ধর্মের নেত্র জগৎকে যে-ভাবে রূপান্তরিত ক'রে দেখে তাকে বলা চলে "মানবপ্রকৃতির দিব্যভাবের কীর্তি —the achievement of a divine element in man's nature" (১২ অধ্যায়)।

আপনার সঙ্গে আমার সবচেয়ে বড় মিল এই যে আপনিও মানেন যে, ধর্মীয় অনুভব উপলব্ধি যার কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে সে ধর্ম সম্বন্ধে অনুভবের বাইরের কোনো সাক্ষীরই প্রমাণের তোয়াক্কা রাখে না। সে বলে তার দেখার কথা, শোনার কথা, অনুভবের কথা, যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" আমি জানি সেই সূর্যকল্প মহাপুরুষকে যিনি অজ্ঞান তমসার যবনিকার আড়ালে দাঁড়িয়ে। অথবা বৃহদারণ্যকের (২.৪.৫): "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—"শুধু আত্মাকেই দেখা চাই, শোনা চাই, জানা চাই, চেনা চাই।" আপনি আরো লিখেছেন: "যারা অবৈজ্ঞানিক হিসেবে জানে যে, পায়ের নিচে মাটিও আছে, আর মাথার উপরে আকাশ আছে তাদের পক্ষে এইটেই সুখবর যে, বৈজ্ঞানিকরা এখন শুধু 'মাটি ছাড়া আর কিছু জানবার নেই'—এমন কথা আর জোর ক'রে বলছেন না, আকাশের দিকে চাওয়াকেও আর মূর্খতা ব'লে অবজ্ঞা করছেন না।"

এ-কথায় সায় দিয়েও আমার শুধু এইটুকু টুকবার আছে যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের মনে বিজ্ঞানের সর্বার্থসাধিকা শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ব'লেই তাঁদের সুর ফিরেছে। রাসেল এতে বেশি দুঃখ পেয়েছেন দুটি কারণে। প্রথমটির কথা বলেছি বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডির ভিতরকার রূপটা খুলে দেখাতে: যে, যুক্তিতে বিশ্বাসও মূলতঃ

অন্ধ বিশ্বাস, হিউমের এ-অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ তিনি খাড়া করতে পারছেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে বেজেছে এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের যে-সন্ধানের ফলে মানুষের শক্তি বাড়ছে তার মান হু হু ক'রে বাড়লেও যে-বিজ্ঞান নিছক সত্যসন্ধানী তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আজ মুমূর্ষু।*

একে আমি নাম দিয়েছি বিজ্ঞানের ট্রাজিডি এজন্যে নয় যে, আমি রাসেলের সঙ্গে একমত যে, বিজ্ঞানে শ্রদ্ধাকে আজ মুমূর্ষু বলা চলে বিজ্ঞানের শক্তিমত্তায় শ্রদ্ধা বাড়ার জন্যে। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি— বিজ্ঞান প্রথম দিকে যে ভাবত সে সবজান্তা ও সবপার্তা হ'তে পারে, তার এ-বিশ্বাস তাকে ভুল পথে চালিয়েছিল ব'লেই সে ধর্মকে মিথ্যা দিশারি নাম দিয়ে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

কিন্তু রাসেল প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানপূজক এ-অত্যুক্তি করলেও মানুষের মন থেকে ধর্মের মূলোচ্ছেদ করা শুধু যে সহজ নয়, তাই নয়, করতে গেলে সে এমন অথই জলে পড়ে যে তার শেষটা মনে হয়ই হয় যে, ধর্ম আত্মা ভগবান পরকাল প্রভৃতি যদি সবই মিথ্যা হয়, যদি এই কথাই সত্যি হয় যে, এ-বিশাল অচেতন গতিশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবী নামে জীবজগতে চেতনার জন্ম হয়েছে দৈবাৎ, অথচ মরণ নিশ্চিত (থার্মডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় বিধান অনুসারে—তার পরে আমরা কেউ থাকব না শুধু কোটি কোটি নিশ্চেতন শক্তি-পারাবার নাহক ছুটোছুটি ক'রে চলবে—কত কোটি বৎসর, কে জানে?) তাহ'লে এ-বাঁচা তো বিড়ম্বনা। কেনই বা মানুষ স্বপ্ন দেখবে শিব সত্য সুন্দর চিরন্তনের? সে বলবেই বলবে: এ-সৃষ্টি যদি নিরর্থক, লক্ষ্যহীন দাপাদাপি মাত্র হয় তবে এসো যে যতটা পারি ভোগ ক'রে নিই—eat drink and be merry for tomorrow we

* J. B. S. Haldane তাঁর Inequality of Man-এ "A Mathematician Looks at Science" প্রবন্ধে লিখছেন: "I feel that Russell's preoccupation with mathematical physics is largely responsible for the pessimism which attributes to scientists. He writes: "While science as the pursuit of power becomes increasingly triumphant, science as the pursuit of truth is being killed by a scepticism which the skill of the men of science has generated'." (p. 240)

die, ওরফে চার্বাকের ভাষণেঃ "যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

ট্রাজিডি এল বিজ্ঞানের গোড়াকার উপপত্তিটিই (premise) ভুল ছিল ব'লেঃ যে, এ-বস্তুবিশ্বের মূল উপাদান জড় (কিনা অচেতন) এবং এহেন জড় জগতে জীবের প্রাণ মন চৈতন্য এ সবই অবান্তর, অন্তিম সত্য হচ্ছে এর জাড্য, ওরফে অচেতনতা। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা মহাত্মা মহাপুরুষদের এজাহার সরাসর অস্বীকার ক'রে বললেনঃ "ওঁদের কথা আমরা মানতে যাব কী দুঃখে যখন আমার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সৃষ্ট বকযন্ত্রে ভাগবত চেতনার রসের ছিটে ফোঁটারও দেখা পাচ্ছি না?" মহাপুরুষেরা বললেনঃ "যে-বিশ্বচৈতন্যের রসের খবর পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি, সে-ভূমাকে দেখে জেনে চেখে চিনে তুমিও ধন্য হ'তে পারো যদি চাও। কিন্তু চাইলে ছাড়তে হবে এই দাবি যে, তিনি দেখা দেবেন তোমার সর্তে তোমার বকযন্ত্রে—তোমার স্ট্যাটিস্টিক্সকে মান দিতে। বলতে হবে তোমাকেওঃ আমি তোমার শরণ নিলাম তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে দেখা দিয়ে কোলে তুলে ধন্য করো—তোমার কী ইচ্ছা আমাকে জানাও আমার চেতনাকে তার প্রামাণিক জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে।" বৈজ্ঞানিক একথায় রেগে উঠে বললেনঃ "অসম্ভব। আগে থাকতে মেনে নেব কেমন ক'রে? আগে জানব তবে মানব।" মহাপুরুষ বললেন হেসেঃ "এ-সর্ত ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর বিধান—আমরা জেনেছি প্রত্যক্ষভাবে—আগে মানলে তবে জানতে পারবে।" এরই খৃষ্টান নাম—meekness ওরফে humility, সংস্কৃত নাম—দীনতা, শরণাগতি। মহাপুরুষ বললেন, অনুকম্পায় গ'লে—"আনন্দের সমুদ্র তোমার আশপাশে ব'য়ে চলেছে বন্ধু, কিন্তু তার সঙ্গে যোগসূত্র তোমাকে অর্জন করতে হবে যদি সে-আনন্দ-সাগরে স্নান ক'রে ধন্য হ'তে চাও। এ-যোগ-সূত্রের একটিমাত্র পথ আছেঃ তোমার ক্ষুদ্র অহং-এর দাবিকে নাকচ ক'রে মাথা নোয়াতে হবে অজানা সত্তার কাছে অন্তরের দিশাকে বরণ ক'রে প্রশ্নসংশয়দের দাবিদাওয়াকে দাবিয়ে রেখে।" বৈজ্ঞানিক বললেনঃ "অসম্ভব। যে-পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিসংখ্যানের পথে চ'লে আমি আজ জগন্নাথ হয়েছি সে-পদবী আমি ছাড়তে নারাজ।" মহাপুরুষ

বললেন হেসে: "বেশ, তবে চলো এই মিথ্যে পদবীর ঘোড়শোয়ার হ'য়ে তোমার সীমাবদ্ধ যুক্তিবিচারকে লাগাম ক'রে, দেখ ঘুরেফিরে—ওপথে যা পাও তাতে মন ভরে কি না। আমার মন যে-পথে ভরেছে সেপথে আমি চলব। কেবল ব'লে রাখি—লিখে রাখো—যে, এই গোয়ালে একদিন না একদিন সবাইকেই মাথা মুড়ুতে হবে—এই শরণাগতির আবাহনের মন্ত্র জপ ক'রে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—যদি মৃত্যুলোক থেকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হ'তে চাও। তাই এখন আসি। যখন দেখবে যে তোমার পথে চ'লে না পাবে মনে শান্তি, না আনতে পারবে তা জগতে—গণমনের আসুরিক প্রবৃত্তিরা আস্কারা পেয়ে সুরু করবে সৃষ্টি করতে মারণাস্ত্র (যার শেষ পরিণতি আণবিক বোমা); যখন দেখবে যে, বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকতার নানা আবিষ্কারে মানুষের বাহ্য সমৃদ্ধির চাবিকাঠি মিললেও কোনো গভীর আন্তর সার্থকতার দিশা মেলে না, প্রেম জাগে না, প্রাণের ভাষা থাকে না, বুকের মধ্যে কেবল শূন্যতার হাহাকারই ফুলে ওঠে, তখন হয়ত আসবে তোমার চিত্তে সেই দীনতার ডাক যে অন্তরদেবতাকে বলে: "আমি চাই অমৃত হ'তে, কেবল তার পথ জানি না, তুমি পথ দেখাও—কারণ আমি জেনেছি যে, এ-ডাকের সুর আমার হৃদয়ে জেগেছে তোমারি কৃপায়। সেই কৃপাকেই আমি চাই আরো পূর্ণভাবে পেতে, যে আলোর কণিকা দিয়েছ আমাকে তাকে জ্বালিয়ে রেখে পথ খুঁজে পাবই পাব, কেন না আমি জানতে পেরেছি যে এই-ই তোমার বিধান।"

বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞ হেসে এ-সুরকে মিডীভাল (সেকেলে) নাম দিয়ে বাতিল করলেন ব'লেই পেলেন না যে, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই এই শ্রদ্ধার বীজ থাকলেও তাকে লালন না করলে ফসল ফলে না। কিন্তু ক্রমশঃ পরে যখন দেখলেন যে, কোনো প্রশ্নেরই চরম উত্তর মানস বুদ্ধিবিচারের পথে পাওয়া যায় না, মনের কালি ঘোচে না, স্বভাবের বর্বর নিচুটান কাটানো সময়ে সময়ে অসম্ভব হ'য়ে অশান্তিতে মন অন্ধকার হ'য়ে আসে তখন গভীরদর্শী কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মনে দাবিয়ে-রাখা ধর্মে-শ্রদ্ধার চারাগাছ ফের মাথা তুলল, তাঁরা একটু একটু ক'রে এই কথাটি বুঝবার কিনারায় এলেন যে, বিজ্ঞান ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ

করতে না পারলেও অপ্রমাণ করতেও পারে না; সুতরাং মহাপুরুষদের কথায় কান দিয়ে তাঁদের নির্দেশপথে চলতে চেষ্টা করতে যদি নাও পারি তাহলেও যাঁরা সেপথে চ'লে অনেক কিছু আনন্দময় সত্য উপলব্ধি ক'রেছেন তাঁদের এজাহারকে বাতিল করা হবে অযৌক্তিক—যে-পথে চ'লে তাঁরা অধ্যাত্ম-সত্যের দেখা পেয়েছেন সে-পথে না চ'লেই তার লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মত দেওয়া হবে গাজোয়ারি ঔদ্ধত্য। এই কথাটিই বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্‌স জীন্‌স তাঁর অনবদ্য THE MYSTERIOUS UNIVERSE-এর শেষ অধ্যায়ে। এখানে এ-অধ্যায়টির চুম্বক দেওয়ারও স্থান নেই। তবু তাঁর শেষের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

তিনি অগ্নিময় ব্রহ্মাণ্ডের বেগময় সত্তার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকের কাছে এ-ব্রহ্মাণ্ডকে আর মনে হয় না এক বিশাল যন্ত্র যে গাণিতিক ভঙ্গিতে চলেছে তার নির্দিষ্ট পথে; মনে হয় বরং এক বিশাল চিন্তার আধার, যেখানে মন বস্তুর স্রষ্টা তথা নিয়ন্তা হ'তে চলেছে—খণ্ড মন নয় অবশ্য—সেই মহামন যার অতল গর্ভে অণুপরমাণুর নিত্য অধিষ্ঠান। আজকের বৈজ্ঞানিক বলতে সুরু করেছেন বিনয়ী ভঙ্গিতেই যে, এক সময়ে আমরা বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের ক্ষমতা সম্বন্ধে যতই কেন না বড়াই ক'রে থাকি—"No scientist who has lived through the last thirty years is likely to be too dogmatic either as to the direction in which reality lies." বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারেল তাঁর যুগ-প্রবর্তক MAN THE UNKNOWN-এ এই কথাটিই বারবার বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে বিজ্ঞান এতদিন কেবল বাহ্য বস্তুজগতেরই খবর চেয়ে এসেছে; সে-খবর পেয়ে সে যথেষ্ট লাভ করেছেও বটে, কিন্তু তবু—বলছেন তিনি জোর দিয়েই—বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধু মানুষের বাহ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান নয়, তাকে চাইতে হবে মানুষের আন্তর (অধ্যাত্ম) সাধনা মানুষের কাজে লাগতে। তাই "As much importance should be given to feelings as to thermodynamics. It is indispensable that our thought embraces all aspects of

reality."* কারণ আমাদের সন্ধানী চিন্তা মানুষকে সমগ্রভাবে নিরীক্ষা পরীক্ষা না করলে হবে যা হয়েছে (হায়রে!): "We have gained the mastery of everything which exists on the surface of the earth, excepting ourselves."† এ-যুগের আর একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জে. বি. রাইন তাঁর বিখ্যাত NEW FRONTIERS OF THE MIND-এও ক্যারলের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, অবশেষে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আজ, তাই এতদিনে আমাদের চোখে পড়েছে আমাদের সমাজের সত্যি সত্যি কী টলমলে অবস্থা, আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের সব আগে জানতে হবে আমাদের নিজেদেরকে, নৈলে আমাদের দুরবস্থার নিরসন হবার নয়।...কারণ যথার্থ আত্মজ্ঞান না হ'লে আমরা আগেকার যুগের মতন চলব সেই সনাতন হাৎড়ে হাৎড়ে চলার পথে—আর এভাবে চলার পথে যে বিপদ সমূহ তা কি আর বলতে হবে? ‡

এ-বিপদ যে কী তা কি আজ কারুর অজানা আছে দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধের নরকতাণ্ডবের পর? বিজ্ঞান ভেবেছিল যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষকে প্রকৃতির নানা শক্তির 'পরে কর্তৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামরাজ্য আসবেই আসবে—সৌভ্রাত্র্যের হাটে বসবেই বসবে সমৃদ্ধির অফুরন্ত আনন্দমেলা—দেখতে দেখতে পত্তন হবেই হবে বিশ্বসাম্রাজ্যের (one world, one empire) যেখানে নানাজাতি দেবে প্রেমের রাজকর—যে-রাজ্যের কথা Norman Angel তাঁর The Great Illusion সর্বপ্রথম বইটিতে

* Chapter VII The Remaking of man......MAN THE UNKNOWN,

† Chapter I, Need of a Better Knowledge of Man......MAN THE UNKNOWN

‡ "......the most urgent problem of our disillusioned and floundering society is to find out more about what we are, in order to discover what we can do about the situation in which we exist today. In the conduct of our...... outward and inward lives, we recognise more and more the need for a profounder self-knowledge than any former age had. Until we know more about ourselves......we are moving blindly in a world whose patterns are constantly more complex and hazardous." (Chapter 1.)

এঁকেছিলেন মোহন রঙে পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে। কিন্তু আমাদের মধ্যে যে-বর্বর অসুরের বাস তাকে স্থানচ্যুত করতে না পারলে এ-রামরাজ্য কে বসাবে শুনি? বার্নার্ড শ মিথ্যা বলেন নি যে, মানুষের নানা আসুরিক প্রবৃত্তিকে যদি বিশ্ব-প্রেমের কাছে দীক্ষা নিতে বাধ্য ক'রে সভ্যভব্য করতে না পারা যায় তাহলে যে-কোনো মহৎ কাজেই তাকে নিয়োগ করো না কেন সে সব ভেস্তে দেবে যেমন কাম ও অহঙ্কার যে-কোনো প্রেমকে ভেস্তে দেয় আবিল ক'রে।

কিন্তু এ-মহাসাধনার ভার নিতে পারে না, দিশা দিতে পারে না আমাদের বস্তুবিচারী মানস বুদ্ধি (materialistic intellect) যা বিজ্ঞানের প্রধান হাতিয়ার। হাত পাততে হবে বুদ্ধির পাঁবে বোধির কাছে যে বলে: "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"—ভগবানকে জানলে তবেই মানুষ জীবন্মুক্ত হ'তে পারে, নৈলে নয়। বিজ্ঞান আজকের দিনে চাইছে যে-ঠুনকো আত্মজ্ঞান নানা মনস্তাত্ত্বিক মনোবিকলনের বিশ্লেষণের আলোয়, সে-আলো কিছুদূর অবধি পথ দেখাতে পারে বটে কিন্তু তার সাধ অসীম হ'লেও সাধ্য সীমিত। তাই বৈজ্ঞানিককে নত হতে হবে শেষমেশ মহাপুরুষেরই পায়, দিশা চাইতে হবে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রমুখ অবতারকল্প মহামানবের তথা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের কাছে। নৈলে উদ্বোধন হবে না গভীরতম আত্মবোধের—মিলবে না পরাবিদ্যার বর—প্রেম বিশ্বাস বিশ্বাত্মবোধ—শুধু মস্তিষ্কচালনী বুদ্ধির কাছে মিলবে না এ দিশা, কেন না:

"The limitations of reason become very strikingly, very characteristically, nakedly apparent when it is confronted with that great order or psychological truths and experiences which we have hitherto kept in the back-ground—the religious being of man and his religious life. Here is a realm at which the intellectual reason gazes with the bewildered eyes of a foreigner who hears a language of which the words and spirit are unintelligible to him and sees everywhere forms of life and principles of thought and action which are absolutely strange to his experience. He may try to learn this speech and understand

this strange and alien life, but it is with pain and difficulty, and he cannot succeed unless he has, so to speak, unlearned himself and become one in spirit and nature with the natives of this celestial empire."

ভাবার্থ: "বুদ্ধির সীমা যে কোথায় সেটা অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে যখন তাকে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও উপলব্ধি-সমূহের সামনাসামনি দাঁড় করানো যায়—যে-জগৎকে আমরা এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই আনি নি। এই একটি জগতের সামনে পড়লে বুদ্ধির যুক্তি-তর্ককে বাঙ্মূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেন সে কোথাকার কোন্ পরদেশী, যে না বোঝে এখানকার ভাষা, না বোঝে তার নিগূঢ় অর্থ। এ-জগতের সংস্পর্শে সর্বত্রই জীবনের এমন সব রূপের, চিন্তার, কর্মের তত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে যা তার অভিজ্ঞতায় একেবারেই চৈনিক হেঁয়ালি। অবশ্য সে এই ভাষা শিখবার, এই অচেনা অজানা জীবন বুঝবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতি পদে তার বাধা ও বেদনা বাজে। এ-চেষ্টা তার বিড়ম্বনা—যদি না সে আপন গণ্ডীর শিক্ষাদীক্ষা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে এই অমৃতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্মে ও প্রকৃতিতে এক হ'তে শেখে।"*

এ-ধরনের কথা শুনলে প্রথমটায় বুদ্ধিসর্বস্ব মানুষের চ'টে ওঠা আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো কিছু 'জানি না' কবুল করতে মানস বুদ্ধির নধর অহমিকায় আঘাত লাগে, সাধুসন্তের কাছে মাথা নত করতে হবে ভাবতেও সে রেগে আগুন হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রতি নব সত্য নব উপলব্ধিরই দাম দিতে হয় সব আগে আত্মাভিমানকে বর্জন ক'রে বলতে শিখে: "আমি জানি না, কিন্তু সত্যিই জানতে চাই, তাই চাই পথের দিশা—কোন্ পথে গেলে জানা যায় "যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োন্যদ্ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্যতে"—যা জানলে—অর্থাৎ পরা বিদ্যা—আর কিছু না জানলেও চলে—কিন্তু তিনি যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নাগালের বাহিরে, কেন না:

"The mind and the intellect are not the key. They can only

---

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development, ১৩শ অধ্যায়; শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

trace out and revolve in a circle of halftruths and uncertainties. But in the mind and life, in all the action of the intellectual, the aesthetic, the ethical, the dynamic and practical, the emotional, sensational, vital, physical being, there is that which sees by identity and intuition and gives to all these things such truth and such certainty and stability as they are able to compass··· Man's road to supermanhood will be open when he declares boldly that all he has yet developed, including the intellect of which he is so rightly, and yet so vainly proud, are now no longer sufficient for him, and that to uncase, discover, set free this greater power within shall be henceforward his great preoccupation."

ভাবার্থ:—"মন ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিশারি নয়। এরা যা পারে, সে হচ্ছে একটা অর্ধ-সত্যের ও অনিশ্চয়তার বৃত্ত এঁকে তারই বর্ত্মে চক্রাকারে আবর্তন করতে। কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও সৌন্দর্যজ্ঞান, নীতিবোধ ও গতিধর্ম, ব্যবহারিক কর্ম ও ভাবপ্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা ও শারীর চেতনা এ সবের মধ্যেই আছে সেই পরম চেতনা যার দৃষ্টি সকল সৃষ্টির স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার ফল, এবং এই চেতনাই মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদির প্রত্যেককে দান করছে ততটা সত্য, ততটা স্থিতি, ততটা প্রতিষ্ঠা, যতটা তারা প্রত্যেকে ধারণ করতে সক্ষম। মানুষের অতিমানব হবার পথ খুলে যাবে তখনই—যখন সে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এতদিন পর্যন্ত সে যা গ'ড়ে তুলেছে, আয়ত্ত করেছে (এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত—যার জন্যে সে ন্যায়তঃই, এবং কতকটা অবোধের মতনও বটে, গর্ব অনুভব করে) তা আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং তার নিজের মধ্যেকার বৃহত্তর শক্তিকে মুক্ত করাই হবে তার পরম ধ্যান, চরম স্বপ্ন।"*

এই-যে-সত্য, এই-যে-চেতনা মানুষকে আবহমানকাল বর্তমানের শোকাবহ বাস্তবতার পর্ব থেকে অনাগত আলোর যুগান্তরের দিকে রওনা

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development ২২শ অধ্যায়; শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুবাদ।

ক'রে দিয়ে এসেছে, এ কি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা মানস যুক্তিতর্কের ধার ধারতে পারে? যুক্তিতে তো সে বিধৃত নয়, যুক্তিই যে এ-দৈব প্রেরণায় বিধৃত—তাকে প্রকাশ ক'রে তবেই না যুক্তির সার্থকতা! সে যে ধ্রুব করায়ত্তকে ছাড়ে অন্তরের দুর্নিবার প্রণোদনায়, বিচক্ষণ যুক্তির সাবধানী তাগিদে তো নয়। নীটশের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, সব অধিগত সম্পদকে সে ছাড়ে এই জন্যেই যে, সে অন্তরে অন্তরে জানে যে, "Um die Erfinder von neuen Werthen dreht sich die welt"—অর্থাৎ নূতন ইষ্টার্থের (values) পূজারীকেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে।"

বিজ্ঞান ভালো করতে গিয়ে মন্দও করেছে কম নয়—টেনে এনেছে আমাদের সর্বনাশের সামনে। তাই হয়ত আজ তার বুদ্ধি অহঙ্কার নম্রশীর্ষ হ'য়ে বিনয়ের কাছে হাত পেতেছে আলোর জন্যে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনকেও মানতে হয়েছে যে, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চর্চায়ই মানুষের মুক্তি নেই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কালি-ফোর্ণিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন বিজ্ঞান কী ভাবে চলেছে আত্মঘাতের পথে। দুঃখ করেছিলেন এই ব'লে যে, "বিজ্ঞান যুদ্ধে আমাদের হাতে জুগিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে বিষ দেবার বা বিকল করবার ক্ষমতা, আর শান্তিকে আমাদের করেছে কর্মব্যস্ত অনিশ্চিত ও যন্ত্রের দাস।" (পীটার মাইকেল মোর-এর সদ্যোজাত "EINSTEIN" জীবনী থেকে উদ্ধৃত।)

এ-ট্রাজিডির কথা আরো বিশদ ক'রে লিখেছেন অলডাস হক্সলি তাঁর বহুপঠিত ENDS AND MEANS-এ। তাঁর BELIEFS অধ্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, এখানে তার চুম্বকটুকু দিচ্ছি:

"আমরা আজ আর বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের যুগের মুগ্ধ আত্মপ্রসাদের যুগে নেই, এসে পড়েছি মোহভঙ্গের দুঃখময় প্রভাতে যখন গোলাপী নেশা কেটে গেছে দেখতে পেয়ে যে, বিজ্ঞান আমাদের উন্নততর হাতিয়ার জুগিয়েছে নিম্নতর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে। বিজ্ঞান মানুষের আর একটা অপকার করেছে এই যে, আজকের গণমত বিজ্ঞানের গোনাগুন্তির জগৎকেই এ-ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য রূপ ব'লে ধ'রে নিয়ে সিদ্ধান্ত করেছে—প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতন—যে, সৃষ্টির না আছে কোনো মাথামুণ্ডু, না

কোনো উদ্দেশ্য।* কিন্তু এহেন শূন্যবাদী জগতে কেউই বাঁচতে চায় না। নির্লক্ষ্য গতির নেশায় মানুষ কদিন ডুবে থাকতে পারে? কাজেই জীবনের 'পরে একটা উদ্দেশ্য আরোপ করতে তারা জাতীয়তা (nationalism) ফ্যাশিস্‌ম্‌ ও কমুনিস্‌ম্‌কে বরণ করেছে—দার্শনিক দিক দিয়ে যাদেরকে হসনীয়ই বলব। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-সব বুলির মধ্যে দিয়ে তারা জীবনের যাহোক একটা অর্থ খুঁজে পায় তো, তাই এ নিয়ে করে তুরন্ত সিংহনাদ।

আশা করা যাক গণমনও ক্রমশ বুঝবে ঘা খেতে খেতে যে, এসব বুলিতে নেই শান্তি কি সান্ত্বনা, মানুষকে সার্থক হ'তে হলে চাইতেই হবে মানবতাকে কাটিয়ে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠা—ভগবানের আবাহনে নব ধর্মরাজ্যের প্রবর্তনে। শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর মন্ত্রঝংকৃত ভাষায়:

A deathbound littleness is not all we are:
Immortal our forgotten vastnesses
Await discovery in our summit selves.
মৃত্যুঘেরা নগণ্যতা নহে তো স্বরূপ আমাদের:
বিস্মৃত বিপুল ব্যাপ্তি আছে পথ চেয়ে—কবে তারে
আমরা চিনিয়া লব আপনার সত্তার শিখরে।

এই চলার পথ বিজ্ঞানের বস্তুবিচার নয়, ধর্মের আত্মজিজ্ঞাসা যার পরম পরিণতি আত্মবোধ। স্বামী বিবেকানন্দ এ পরম ও চরম সত্যের দেখা পেয়েছিলেন তাঁর দীপ্ত অধ্যাত্ম জীবনে তাই বলেছিলেন তাঁর Ideal of a Universal Religion ভাষণে (নিউয়র্ক ১২.১ ১৮৯৬):

"This is what Jnana-yoga teaches. It tells man that he is essentially divine. It shows mankind the real unity of being: that each of us is the Lord God Himself manifested on earth. All of us, from the lowest worm that crawls under our feet to the highest being to whom we look up with wonder and awe, all are manifestations of the same Lord."

* এক্ষেত্র লক্ষণীয়—যেকথা আগে জোর দিয়েই বলেছি ও দেখাতে চেষ্টা করেছি—যে এ-যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক বরেণ্য বৈজ্ঞানিকেরই দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়েছে—যার ফলে তাঁরা ধর্মকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন।

ভাবার্থ :—

মানব স্বরূপে তার দেবতা—এ-ভুবন বিধৃত,
এক ঐশচেতনায়। প্রতি জীবে—অণুকীট হ'তে
বিশ্বের বিস্ময় মহাজনে—প্রমূর্ত পরমেশ্বর
যেথা যাহা কিছু আছে সেই অদ্বিতীয়েরই প্রকাশ।

"Religion is realization—not talk or doctrines or theories, however beautiful they may be. It is being and becoming—not hearing or acknowledging. It is the whole soul's becoming changed into what it believes."

ভাবার্থ : ধর্ম হ'ল উপলব্ধি—প্রীতিসূত্র বা মনগড়া উপপত্তি নয়—তারা যতই কেন না মনোহর হোক। ধর্মের ভিত্তি সত্তা ও তার রূপান্তর—শুধু শ্রবণ বা স্বীকার নয়। সমগ্র অন্তরাত্মা তার বিশ্বাসের মধ্যে রূপ নেয় তখনই তাকে ধর্ম বলা চলে, নৈলে নয়।

আজকের দিনে বিজ্ঞান যে-পথে চলেছে সে-পথকে ভুল ব'লে নামঞ্জুর করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বস্তুবিচারের পথে বাহ্য সত্যের নির্ণয় বা মাপাজোপাও বিধাতার অনভিপ্রেত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা দানের জন্যে তাঁকে সাধুবাদ দেওয়া ধার্মিকেরও কর্তব্য এ কথা মেনে নিয়েও এখন জোর ক'রে বলার সময় এসেছে যে, বরেণ্যতম বিজ্ঞানকেও ক্রমশঃ বরণ করতেই হবে মানবাত্মার শিখর-অভিযান, ঐশচেতনার অভিসার। এ সাধনারও দিশা পাবেই পাবে অনাগত যুগের বৈজ্ঞানিক যদি সে সত্যি চায় সে-দিশা, যদি সে সত্যি অঙ্গীকার করে এ-আন্তর সন্ধানের সর্ত ও সাধনা। এই পরম অঙ্গীকারের মধ্যেই আছে—তার মুক্তির চাবি যে-মুক্তির আলোকেই কেবল বিজ্ঞানের কাপালিক ট্রাজিডির অবসান হ'য়ে তার সবে জাগা সুমতির অন্তিম ফল ফলতে পারে জ্ঞান প্রেম ভক্তি সেবার মহাসমন্বয়ে।

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় ও প্রসঙ্গতঃ

হরিকৃষ্ণমন্দির, পুণা-১৬
৪ জানুয়ারি.

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ কানুনগো, করকমলেষু,

আপনার চিঠি পেলাম দু' তিনদিন আগে—চণ্ডীগড় থেকে ফিরে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিয়বন্ধু শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়ের "জীবনালেখ্য" রচনায় ব্রতী হয়েছেন এ সংবাদে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। এখানে ব'লে রাখি গোড়াতেই যে, তাঁর বৈজ্ঞানক গবেষণার মূল্যায়নে আমি অক্ষম—অনধিকারী। কিন্তু মানুষ হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সর্বোপরি—মানব-হিতৈষণা-উদ্বুদ্ধ চিন্তাশীল মনখোলা লেখক হিসেবে তিনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। এহেন সুমতির কথা যতই প্রচার হয় ততই ভালো। আমাদের উপনিষদের একটি মূল প্রার্থনা : "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—ভগবান যেন আমাদের শুভবুদ্ধি দেন। ঋগ্বেদে আরো একটি মনোজ্ঞ অভীপ্সার কথা পাইঃ "আ নো ভদ্রা ক্রতবো যন্ত বিশ্বতঃ"—আকাশ বাতাস থেকে যেন শুভ চিন্তা আমাদের কাছে আসে। এযুগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বিশেষজ্ঞদের যুগ—আর কে না জানে বিশেষজ্ঞদের সময় নেই মানুষের কথা ভাববার? তবু দুচারজন মহাপ্রাণ বৈজ্ঞানিক ভাবেন—যথা রাসেল আইনস্টাইন—এই যা ভরসা। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, আমরা মানুষের হৃদয় বদলাতে পারব না যান্ত্রিকতার মাধ্যমে—অথচ না বদলাতে পারলে বিজ্ঞান শেষমেশ আমাদের বাঁচাতে পারবে না, কারণ মানুষের হাতে এখন আণবিক বোমা দেওয়া হবে তিন বৎসরের শিশুর হাতে ক্ষুর দেওয়ার সামিল।* প্রিয়দাবাবুও এই ধরনের হিতকারী কথা বলেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে—বিশেষ ক'রে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ ক'রেঃ যে, আজকের জগতে বিজ্ঞানের দান বিশ্বব্যাপী হ'লেও শুধু বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপে তুষ্ট থাকলে চলবে না—যদি ঐ সঙ্গে আমাদের নীতিবোধের বিকাশ না হয়। তাঁর

এই ধরনের দরদী কথায়ই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, তাঁকে ভালোবেসেছি।

অনেকদিন আগে পড়েছিলাম এক বিখ্যাত মনস্বীর কথা। তিনি (জর্জ ডুহামেল না লোয়েস ডিকিসন ?) লিখেছিলেন একবার যে, যদি সক্রেটিসের যুগের কোনো গ্রীক সুভদ্রকে তুহাজার বৎসর ঘুম পাড়িয়ে রেখে আজ জাগিয়ে বলা যেত—"দেখ, নয়ন ভ'রে একবার তাকিয়ে বন্ধু!"—তাহ'লে তিনি বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক বিভূতি দেখে সসম্ভ্রমে বলতেনই বলতেন ঃ "আমাকে উড়িয়ে এনেছ এ-কোন্ দেবতার স্বর্গরাজ্যে ? এ কী ব্যাপার ? জলে জাহাজ চলছে—জাহাজ তো নয় একটা শহর বলা চলে! জলের নিচে ডুবোজাহাজ সাঁতার দিচ্ছে! মাটিতে রেলগাড়ি, মোটর, বাস! আকাশে হাওয়াই রথ চলেছে পাখা মেলে। ঘরে ঘরে রেডিও, গ্রামোফোন, বিজলি বাতির দেয়ালি, টেলিফোন, সুইমিং পুল, জলের নিচে সুড়ঙ্গ—"উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে নর"!—কাটা পা জুড়ে যাচ্ছে, রবারের যকৃৎ কাজ করছে, শুনছি কাটামুণ্ডুও কথা কইলো ব'লে! এর পরে কি আর সংশয় পোষণ করা চলে যে, এ আমাদের মাটির পৃথিবী নয়—সুধার স্বর্গ, যার বাসিন্দারা দু'পেয়ে বটেন কিন্তু মানুষ নন—দৈবী জাদুকর, মহীয়ান মহাপুরুষ ?"

কিন্তু তার পরেই তিনি খবর পাবেন এ নয়া মহাপুরুষের আরো বিস্ময়কর কীর্তিকলাপের ঃ শহরকে শহর অগ্নিগোলক-বর্ষণে পুড়িয়ে দেওয়া; আকাশের আততায়ীদের হিংসায় দীক্ষা দিয়ে বহ্নিপ্লাবনে লক্ষ লক্ষ নরনারী বালকবালিকার শ্মশানসমাধি, বিষাক্ত গ্যাসের চাপে অগুন্তি নাগরিকের নাভিশ্বাস, হাজার হাজার শিশুর পঙ্গু হ'য়ে জন্মানো—সর্বোপরি, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ কীর্তি—আণবিক শক্তির প্রসাদে এক ঘণ্টায়ই লক্ষ লক্ষ জীবের হাহাকার, আর্তনাদ, ছাল-ছাড়ানো যন্ত্রণাময় মৃত্যু—যারা বাঁচল (জয় হিরোশিমা নাগাসাকি—যার পুনরাবর্তন যে কোনো মুহূর্তে হ'তে পারে!) তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের চিররুগ্ন হ'য়ে কান্না—উঃ কী ভীষণ! এরা তো দেবতা নয়। দেবতা হ'লে কি পৃথিবীতে এ হেন নরককুণ্ড খুঁড়তে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করত ? উপনিষদের প্যারাডক্সের কথা মনে করিয়ে দেয় ঃ আসীনো দূরং ব্রজতি;

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ইত্যাদি (তিনি নিশ্চল অথচ সচল, অণুপ্রমাণ অথচ মহাবিশাল)। এককথায়, আজ বিজ্ঞানের কৃপায় মহামানবের মধ্যে মহাদানব খোরাক পাচ্ছে অঢেল।

একথায় বৈজ্ঞানিকেরা বিষম রাগ করেন: "কী অর্বাচীনের মতন কথা! জর্মনির শত শত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের উপাস্য হিট্‌লার ষাট লক্ষ ইহুদীকে মেরেছেন বিজ্ঞানের শক্তিতে নয়—তাঁর নারকীয় প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারে। আজকের হাইড্রোজেন বা কোবল্ট বোমায় একদিনে কোটি কোটি নরনারীর যদি বহ্নিসমাধি হয়ও তাহ'লেও বলা চলবে না যে, তার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা দায়ী। তবে কে দায়ী? কেন, প'ড়েই তো রয়েছে—চক্রান্তকারী রাজপুরুষ তথা দুর্বৃত্ত রণচণ্ডের দল। বিজ্ঞানের লক্ষ্য—বস্তুবিচারী জ্ঞান, তার পদ্ধতি—মাপাজোপা, পরিসংখ্যান, বিশ্লেষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা—যার ফলে মানুষ (দেখ না হে!) প্রকৃতিকে কী ভাবে তাঁবেদার ক'রে প্রায় সর্বক্ষম হ'তে চলেছে!" কিন্তু অত্র দ্রষ্টব্য: এঁদের মতে, বিজ্ঞানের নানান্ শক্তির সুপ্রয়োগের ফলে মানুষের যত হিতসাধন হয়েছে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ধন্যবাদার্হ হ'লেও এ-সব শক্তির কুপ্রয়োগের জন্যে বৈজ্ঞানিক আদৌ অভিশাপার্হ নন। এঁদের যুক্তি এই যে, বিজ্ঞানের চাষে অমৃতফল ফললে বৈজ্ঞানিককে বলব: "নমামি শুভদ বরদ দাতা, জনগণমননায়ক ত্রাতা!"—কিন্তু যদি বিষফল ফলে তবে বলব: "এ-গ্লানির নও তুমি বিধাতা—তুমি গুরু পিতা ধাত্রী মাতা।" এঁদের আরো একটি বুলি আছে: বিজ্ঞান সু ও কু-র ঊর্ধ্বে—beyond good and evil, amoral.

বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো মানব-প্রেমিকেরই সত্যিকারের বিরোধ থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক যান্ত্রিকেরা যে মানুষের অশেষ মঙ্গলসাধন করেছেন একথা অন্ধ ও মূঢ় ছাড়া সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। আমাদের উপনিষদেও বলেছে: "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"—অর্থাৎ বস্তুবিশ্ব—matter-কে—নিন্দা করবে না। শুধু নিন্দা না করা নয়, "অন্নং বহু কুর্বীত"—অন্নকে বর্ধিত করবে। বিজ্ঞান বাড়িয়েছে বৈকি অন্নের মান তথা পরিমাণ (যদিও শেষটায় এসে পৌঁছেছে যে অন্ন—matter—খতিয়ে জড়বস্তু নয় শক্তির তরঙ্গলীলা।

তবু যে আমি বিজ্ঞানের ত্রুটি বা সীমার কথা তুললাম তা এইজন্যে যে, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এযুগে অনেকেই ঘোষণা করা শুরু করেছেন: "মানুষের অন্তিম মুক্তির বিধায়ক তথা নিয়ন্তা হ'ল বিজ্ঞান, আর ধ্রুব জ্ঞান-আহরণের একমাত্র পদ্ধতি হ'ল বৈজ্ঞানিক মাপজোপ—পরিসংখ্যান।"

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানুষের অনেক কাজেই লেগেছে একথা কে না মানবে? কিন্তু তবু একটু টুকতেই হবে যখন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে জাঁকিয়েই বলা শুরু করেন যে, বিজ্ঞানই মানুষের একমাত্র উপাস্য, আর কোনো দেবতাকেই হৃদয়ের বেদীতে বসানো চলবে না এ-যুগে।

প্রিয়দাবাবুকে আমার ভালো লেগেছে বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, এধরনের গাজোয়ারী (dogmatic) কথা তিনি বলেন না। তিনি বিজ্ঞানের গুণগান করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক বুদ্ধিকেও মান দেন, স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞানের দান মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রভূত সহায়তা করেছে ব'লেই বলা চলে না যে, শুধু এই ভোগবাদী বস্তুসমৃদ্ধির পথেই মানুষের মিলবে চরম সার্থকতার দিশা, আমরা পরমা শান্তি বা তৃপ্তির বনেদ গাঁথতে কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির খনিত্র দিয়ে। তিনি মূলতঃ এ-ও স্বীকার করেন ব'লেই আমার ধারণা—যেকথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আরো জোর দিয়ে: যে, "যুক্তিপন্থী মনঃশক্তি দিয়ে শুধু বাহ্যপ্রকৃতির নয়, মানুষের সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার হদিশ পেয়ে তাকে বৈজ্ঞানিক পথে চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া যায়—বৈজ্ঞানিকদের এ-ঘোষণা নামঞ্জুর। বিজ্ঞান মহনীয় বিবিধ সিদ্ধির দিশা দিয়েছে একথা মেনেও বলা চলে যে, খতিয়ে সে মুক্তিদিশারি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় নি। মানুষের মন আজ টের পেতে শুরু করেছে যে, বিজ্ঞান কোনো গভীর সমস্যারই মূল ধরতে পারে নি, পেরেছে শুধু বাইরে আলো ফেলে দেখাতে নানা শক্তির ক্রম-প্রগতির কার্যকারণের সূত্রটি মাত্র।" (In the modern era under the impulsion of Science this effort—অর্থাৎ বুদ্ধিবিচারী মনীষার প্রযত্ন—assumed enormous proportions and claimed for a time to examine successfully and lay down finally the true principle and

the sufficient rule of process not only for all the activities of Nature, but for all the activities of man. It has done great things, but it has not been in the end a success. The human mind is beginning to perceive that it has left the heart of almost every problem untouched and illumined only outsides and a certain range of processes. There has been a great and ordered classification and mechanisation, a great discovery and practical result of increasing knowledge, but only on the physical surface of things. Vast abysses of Truth lie below in which are concealed the real springs, the mysterious powers and secretly decisive influences of existence.)*

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কয়েকজন মনীষী আজকাল একথা স্বীকার করতে শুরু করেছেন ঈষৎ নম্র সুরে, যথা এডিংটন, জীন্‌স্‌, আলেক্‌সিস ক্যারেল প্রভৃতি। কিন্তু আর একদল এখনো পঞ্চাশ বৎসর আগেকার বৈজ্ঞানিক-দের মামুলি অসহিষ্ণু সুরেই ঘোষণা ক'রে চলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই এ-জগতে সর্ববিধ জ্ঞানের একমাত্র নিয়ন্তা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে। তাই একটু মজা লাগে বৈকি যখন দেখি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরাও আজ হালে পানি পাচ্ছেন না—ঠেকেও দেখতে কি শিখতে চাইছেন না যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম এ দুই দিশারি হ'ল মানুষের মুক্তিনভোসঞ্চরণের দু'টি পাখা, আর একটি পাখায় ওড়া যায় না।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও প্রায়ই এ-ধরনের অন্ধতার পরিচয় পাই। কিন্তু সেই জন্যেই আমি আরো প্রিয়দাবাবুর গুণগ্রাহী হ'য়ে উঠেছি তাঁর নানা লেখায় শুভবুদ্ধির বিনয়ী অঙ্গীকার শুনে। তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার মনে হয়েছে যে, বিশেষ ক'রে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট গভীর সুর বেজে উঠেছে তার মূল হেতু—তাঁর স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, যার প্রসাদে তিনি বৈজ্ঞানিক বস্তুবিচারী বুদ্ধির চাকচিক্যের মোহ কাটিয়ে উঠেছেন। তাই তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর নানা ভাষণেই যে, শুধু বিজ্ঞানের আলোয় বা

* **Reason and Beyond Reason—Sri Aurobindo (Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay).**

কীর্তিকলাপে মানুষের সব চাহিদার রসদ বা সব সমস্যার সমাধান মিলতে পারে না। তাঁর এই রচনাগুলি আমার হাতের কাছে নেই, কিন্তু মনে আছে যে, পড়তে পড়তে আমার অন্তর বারবারই অঙ্গীকার করতে চেয়েছিল—গীতার ভাষায়—"হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।"

কেন একটু ব'লেই এ-পত্রের সমাপ্তি টানব।

বলেছি—খতিয়ে বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির সঙ্গে অধ্যাত্মবোধের কোন মূলগত বিরোধই নেই, থাকতে পারে না। মানুষের সত্তার নানা স্তর, ক্ষেত্র মন প্রাণ চিত্ত আবহমানকাল হাজারো পরস্পর-বিরোধী স্বার্থবুদ্ধি কামনা বাসনা দম্ভ দাবির কুরুক্ষেত্র হ'য়ে এসেছে—এসব শক্তি উচ্চতর শক্তির কাছে মাথা নুইয়ে কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র ক'রে তুলতে রাজী হয়নি ব'লেই। রাজী হ'ত—যদি মানুষের বুদ্ধি তার নিজের কীর্তির জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে এই মোহে না পড়ত যে, এ-সংসারে বুদ্ধির চেয়ে বড় দিশারি আর নেই। ঋষি ও দ্রষ্টারা বরাবরই বলেছেন—আছে, কিন্তু বুদ্ধি সে কথায় কান দেয় নি আত্মগুণগানের নেশায়। তাই সে দেখতে পায় নি যে শুধু বুদ্ধি দিয়ে মানুষের মনের প্রাণের হাজারো উল্টোপাল্টামির সমাধান ক'রে পৌঁছনো যায় না কোনো মহনীয় সুষমাতে—যার বিলিতি নাম হার্মনি। কারণ এ-সুষমা মিলতে পারে বুদ্ধির কুরুক্ষেত্রে নয়, প্রেমের ধর্মক্ষেত্রে। তাই এ-প্রেমকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে শুধু বুদ্ধিকে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিলে সে পারবে না কোনো পরম মিলনের ছক কাটতে; বসাতে পারবে না হিংসার রণাঙ্গনে প্রেমের দোললীলা; মতামতের হানাহানিই হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা; মিথ্যাশ্রয়ী রফা ও চুক্তির ছিটেফোঁটায় বিশ্বব্যাপী অশান্তির দাহনা জুড়িয়ে যাবেনা; ফরমুলার মাধ্যমে বসবে না স্থায়ী সৌভ্রাত্রের শ্রীক্ষেত্র। শুধু তাই নয়, বস্তুবিচারী বিজ্ঞানের এলাকায় বুদ্ধি সর্বেসর্বা হ'লেও ধর্মের—(অর্থাৎ বুদ্ধির অতীতে বোধিলোকের)—সম্বন্ধে সে বিধান দিতে গেলে সেটা হবে হঠকারিতা ঠিক যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সেদিনও ঘটেছিল যখন হুহুঙ্কারী স্ট্যালিন ডিকটেটরী সুরে বলেছিলেন—উদ্ধৃত করি রাসেলের লেখা থেকে: "He (Stalin) even went so far as to decree that the laws of heridity are henceforth to be different from what they

used to be, and that the germ-plasm is to obey Soviet decrees but not the reactionary priest Mendel." কিন্তু বুদ্ধির সিংহনাদ মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে ফেলে ব'লেই স্ট্যালিনের দম্ভে সেদিন সবাই হাসেনি। কিন্তু রাসেল প্রায় সাশ্রুনেত্র হয়ে উঠলেন, বললেন: "I am completely at a loss to understand how it came about that some people who are both humane and intelligent could find something to admire in the vast slave camp produced by Stalin!" (Portraits from Memery).

রাসেল-প্রমুখ বুদ্ধিমানেরা হতবুদ্ধি হ'লেও শ্রীঅরবিন্দপ্রমুখ তত্ত্বদর্শী ধার্মিকেরা কিন্তু বহুদিন আগেই দেখতে পেয়েছেন কেন মানুষের এমন মতিচ্ছন্ন হয়। তাই তো তাঁরা বার বার মানুষকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন—ধর্মকে অবজ্ঞা ক'রে সর্বনাশের পথ ধরলে হবে মহতী বিনষ্টিঃ। তাঁরা যা বলেছেন তার সারমর্ম এই যে, জীবন বহুবিচিত্র ও জটিল, এ-বৈচিত্র্য তথা জটিলতা ক্রমবর্ধমান, প্রাণলীলার বিকাশের হাজারো ছন্দ রীতি তাল সুর, নানা হাটে তার বিকিকিনির নানা চাল, দর, নিরিখ। কাব্য, শিল্প, রাষ্ট্র, আইন, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম—প্রতিক্ষেত্রেই তার আত্ম স্ফুরণের (self-expression) তথা আত্মবোধের (self-realisation) বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন রসের স্বাদ জুগিয়ে তাকে পরমানন্দের তীর্থপথে একটু একটু ক'রে এগিয়ে দেয়। ফরাসীরা বলে: "Tout se tient"—অর্থাৎ সব জড়িয়ে তবে বিশ্বলীলা—সুষমার সমন্বয়। তাই আমাদের এই পরম সত্যটি অঙ্গীকার করার আজ সময় এসেছে যে, বিজ্ঞানের কীর্তি বিশ্বতোমুখী হ'লেও তার দান ও লীলাখেলা সীমিত থাকবেই থাকবে—অন্নব্রহ্মের রাজ্যে—অপরা বিদ্যার খাসতালুকে—অর্থাৎ কিনা যেখানে মাপজোক গোনাগুন্তি ইকোয়েশন চলে। কিন্তু যে-পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্ম সত্যের লীলাক্ষেত্র আত্মার অন্তর্লোক সেখানে পরিমাপক গণক ও ব্যবস্থাপক হ'তে পারে কেবল আত্মার আলো, প্রেমের প্রজ্ঞা ও অন্তরের অভীপ্সা—বুদ্ধির বিচার, মানস মনীষা বা যুক্তির জৌলুষ নয়। একথা মেনে নিলে তবেই হবে সব বিরোধের অবসান, কারণ তাহ'লে দেখতে

পাওয়া সহজ হবে যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের কোনো মূলগত বিরোধ থাকতে পারে না যেহেতু উভয়ের ক্ষেত্র ওরফে আখড়া আলাদা। বিজ্ঞান আমাদের পায়ের নিচের মাটিকে সুদৃঢ় করবে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবে, বাহ্য জীবনকে বিচিত্র করবে। ধ্যান ভক্তি প্রেম বসাবে ধর্মের রাজধানী, আমাদের জীবনেত্রকে জোগাবে শিবনেত্রের দূরবীণ—যার প্রসাদে দেখা যায় শুধু দূরের ছায়াপথ নয়, অন্তরের অন্তরঙ্গ স্বর্গরাজ্য যেখানে জীব শিবত্ব লাভ ক'রে আনন্দের প্রেমের হাট বসায় তার প্রতি পদক্ষেপে। এ-আনন্দের অন্তিম উৎস ভগবান্—যাঁকে দেখতে পেলে তবেই মানুষ্ অমৃত হয়। আর না পেলে তার দুঃখ-দুর্দশা ঘোচে না, ঘুচতে পারে না। দেশে দেশে সব ঋষি দ্রষ্টা কবিদের কীর্তিত এ-সনাতন বাণী যে সত্য তা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না আজ বিজ্ঞানের জোগানো সর্বধ্বংসী মারণাস্ত্রের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে? আর এ তো শুধু আমাদের ম'ত বুদ্ধিবাদী ভুক্তভোগীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়—যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মহামানবদের এজাহার। খৃষ্ট বললেন: "জগতের একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে মানুষের কী লাভ হবে যদি সে নিজের আত্মাকে খুইয়ে বসে?" বেদব্যাস বললেন: (রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শ্লোক)

"অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অর্থাৎ: "অধর্মে ধনসমৃদ্ধি বাড়ে ও মানুষের দম্ভও হয় অভ্রভেদী, কিন্তু এ-মিথ্যা সম্পদের পরিণাম সমূলে বিনাশ।" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মহর্ষি বললেন (৩. ১০):

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি
অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।

অর্থাৎ

এ-ধূলির ধরা হ'তে বহুদূরে সে-দেবতা—যার
অরূপ অম্লান দিব্য প্রসাদে কেবল জীব পায়
অমৃতলোকের দিশা। বিনা সেই উত্তরাধিকার
বদ্ধ জীব কেঁদে মরে অন্তহীন দুঃখযন্ত্রণায়।

এখানে অবশ্য আমার ভুল হ'য়ে থাকতে পারে। হয়ত আমি প্রিয়দাবাবুকে "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে পুলকে করেছি রচনা।" হয়ত তিনি আজও বিশ্বাস করেন যে বস্তুবিচারী পরিসংখ্যানী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান জড়ো ক'রেই মানুষ পাবে অমৃতলোকের দিশা। মানুষ মানুষকে যে প্রায়ই ভুল বোঝে গভীর বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও—এ-শোকাবহ অভিজ্ঞতা কার না হয়েছে বলুন? কিন্তু তবু আমার মনে হয় না যে, প্রিয়দাবাবুকে আমি নিজের কল্পনার রঙে রঙিয়েই বরণ করেছি সানন্দ প্রীতিমাল্যে। এ-ভরসার একটা কারণ—তিনি নিজে আমাকে পত্রযোগে গীতার দুটি মহাবাক্য উদ্ধৃত করেছিলেন: যে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" ও "বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।" (অর্থাৎ বিশ্বাসী শ্রদ্ধালু সন্ধানীই পরমজ্ঞানের অধিকারী ও বুদ্ধিরও ওপারে আসীন সেই মহান্ পুরুষ যাঁকে বরণ করলে তবেই জীবের দুঃখনিবৃত্তি।)

কিন্তু শুধু তাঁর নানা পত্রে বা শ্রদ্ধালু জিজ্ঞাসায়ই নয়, তাঁর মধ্যে আমি দেখা পেয়েছিলাম একটি সত্যনিষ্ঠ তথা বিনয়শালীন চিন্তাশীলের— যিনি বৈজ্ঞানিক হ'য়েও বিজ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন, যিনি সংশয়ী হ'য়েও তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সর্বোপরি, যিনি মতানৈক্য সত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রীতিদানে মাদৃশ সেকেলে বিশ্বাসবাদী ও ধর্মপন্থীকেও সাদরে বরণ করতে পারেন বন্ধু ব'লে। এমন উদার স্নিগ্ধ কমনীয় ভাবুকের সঙ্গে প্রীতিস্নেহের আদান-প্রদান ক'রে আমি লাভবান হয়েছি! তাই তাঁকে আজ সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করতে চাই এই ব'লে:

জ্ঞানান্বেষী যে-মনীষী নয় আত্মম্ভরী, অনুদার;
স্বধর্ম পালন করি' পারে তবু করিতে স্বীকার
স্বধর্মের সীমা; হ'য়ে একান্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বরে
আর্য মহাবাণী:
"শুধু নির্মল হৃদয়ই নিত্য করে
ধারণ পরম সত্যে, অশ্রদ্ধাই সর্ব পাপমূল,
শ্রদ্ধা শুদ্ধিদাত্রী, তারি প্রসাদে কেবল মেলে কূল
সংশয়ের অকূলপাথারে, জীবনের দ্বন্দ্বতাপ
করে স্নিগ্ধ বিনয়ের সহিষ্ণুতা। কৃষ্ণ অভিশাপ

বহন করিয়া আনে আসুরিক দম্ভের বিষাণ"। *
এমন সুধী—যে পারে সহজে করিতে মাল্যদান
বহুমুখী সত্যধর্মে—নাম হয় উপাধি যে তার ঃ
প্রিয়দা বরদা হন তুষ্ট চিত্তরঞ্জনে তাহার।

* অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী—মহাভারত, শান্তিপর্ব।

দম্ভমানমদান্বিতাঃ...আসুরীং যোনিমাপন্না...মামপ্রাপ্যৈব যান্ত্যধমাং গতিম্।—গীতা ১৬ অধ্যায়।

বিজ্ঞানের পুতুলপূজা

কলিকাতা-২৯।
৮ই জানুয়ারি

পরমপ্রীতিশ্রদ্ধাভাজনেষু,

কিছুদিন হ'ল আপনার স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ বাংলায় অনূদিত "ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী" বইখানি পেয়েছি। আজ নূতন বছরের লেখা স্নেহলিপিখানিও হস্তগত হল। কানুনগোর অধ্যবসায়ের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। সে আপনার স্মৃতিচারণে আমার সম্বন্ধে আপনার লেখা পড়ে আপনাকেও পত্রাঘাত করে তার কাজ হাসিল করেছে।

অধ্যাপক বসুর (সত্যেনবাবু) জয়ন্তী গ্রন্থে আপনার লেখা কবিতাটি পড়লাম। ভাষার ঐশ্বর্যে ও ভাবের গৌরবে লেখাটি অনুপম হয়েছে। জানুয়ারী মাসের 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে আপনার লেখা প্রবন্ধটি পড়লাম। ঐ সংখ্যায় আমারও একটা লেখা বেরিয়েছে "সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাখ্যায় আধুনিকবিজ্ঞান ও প্রাচীন ভারতীয় দর্শন" নামে। সময়মত পড়ে দেখবেন—শেষ ভাগটি নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

'ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী'র কোন কোন পত্র এর আগে ইংরাজীতে পড়েছি মনে পড়ে। ইষ্টদেবতা ও গুরুর উপর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের চিত্র বইখানির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে। এরূপ ঐকান্তিক আত্ম-বিলোপ (destruction of egosense) যাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তিনি যে সর্বদা মুক্তির আনন্দে ও শান্তিতে থাকবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অস্মিতার বিনাশ হলেই মানুষের যে সত্যানুভূতি (intuitive know-ledge) হয়, এ-কথা অনেক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। কারণ, দ্রষ্টা যদি দৃশ্যবিষয় হতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না করতে পারেন, তাহলে দৃশ্যবিষয়ের সত্যকার জ্ঞান তাঁর হতে পারে না। তবে এরূপ আত্মসমর্পণ ও আত্মবিলোপ যাঁরা ভক্ত ও বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষেই হয়ত সহজ। মানুষের মনের বিবিধ স্তর আছে সন্দেহ নাই। স্তর হিসাবে তার সত্যানুভূতিও বিভিন্ন। বিজ্ঞান একথা মানে। তাই অবচেতন (subconscious)-ও চেতনস্তর ইত্যাদি নানা নামাকরণ

হয়েছে। সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণে মনের বিভিন্ন স্তরের ক্রিয়া দেখা যায়। সমাধি অবস্থায় মন যে স্তরে থাকে সেখানে গভীর সত্যের অনুভূতি ঘটতে পারে। ভূত-ভবিষ্যতের অনুভূতি, আত্মদর্শন বা ইষ্টদর্শন প্রভৃতি ঘটে মন যখন এ স্তরে অবস্থিতি করে। মনোবিজ্ঞানীরা এখন এ-জাতীয় গবেষণায় মন দিয়েছেন।

বিশ্বাস করি, আপনি আমাকে ভুল বুঝেন নি। বিজ্ঞানের পুতুল পূজার (worship of mere matter) আমি সমর্থক কখনো নই। তবে মানুষের অনেক দুঃখ-দৈন্যের লাঘব বিজ্ঞান করতে পারে ও করেছে এ অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানের বিকৃত প্রয়োগেই আজ বিজ্ঞান আত্মঘাতী হতে চলেছে ও সৃষ্টি করেছে দারুণ বিভীষিকার। এ-কথা ধর্মের বেলাতেও বলা চলে। ধর্মকে উপলক্ষ করে মানুষের ইতিহাসে যে কত রক্তারক্তি ও নৃশংসতার অভিনয় হয়ে গেছে এবং এখনো অনেক দেশে হচ্ছে এত' অস্বীকার করা চলে না। এই ত' সম্প্রতি কোথায় কাশ্মীরে হজরত মহম্মদের কেশ চুরি গেছে এই উপলক্ষ করে বাংলা-দেশের এক প্রান্তের নিরীহ নরনারী ও শিশুর উপর কত অমানুষিক অত্যাচার হ'য়ে গেল, কত লোক প্রাণ দিল—একি ধর্মের বিকারের জন্য নয়! বিজ্ঞানের গোঁড়ামী ও ধর্মের গোঁড়ামী উভয়েই মানুষকে অমানুষে পরিণত করতে পারে। আসলে বিজ্ঞান বলে যে কোন আলাদা জ্ঞান আছে এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই। বিজ্ঞান শুধু জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ পন্থা মাত্র। সত্যের সন্ধানের উপায় বিশেষ। ধর্মও তাই। উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, সে আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ।

যাঁরা প্রকৃত জিজ্ঞাসু ও সত্যান্বেষী, তাঁরা বিজ্ঞানচর্চাই করুন বা ধর্ম চর্চাই করুন, তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না; বরং পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভক্ত বা বিশ্বাসী ছিলেন না মোটেই; বিজ্ঞানেই মানুষের একমাত্র কল্যাণ এ ছিল তাঁর ধারণা। দেশে বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনিই প্রথম আয়োজন করেন। কিন্তু পরমহংসদেবের উপর তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল গভীর। কথামৃতে এর অনেক নজীর দেখতে পাই। ডাঃ

ওপেনহাইমার (Oppenheimer) আমেরিকার একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, এটম বোমা তৈয়েরি করবার তিনিই ছিলেন প্রধান নেতা। তিনি ত এখন রামকৃষ্ণ মিশনে বেদান্ত চর্চা করবার জন্য যাতায়াত করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী Schroedinger তাঁর 'What is Life' নামক গ্রন্থে বেদান্তের মায়াবাদের কথা আলোচনা করেছেন। Prof. Pauling, যিনি সম্প্রতি Nobel Peace Prize পেলেন—তিনি আগেও রসায়নের গবেষণার জন্য একবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—তিনি ত এটম-বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে গত ১০।১২ বছর ব্যাপী ঘোরতর আন্দোলন করে বেড়াচ্ছেন। ফলে, তিনি Un-american ব্যবহারের জন্য America-তে একপ্রকার একঘরে হয়ে আছেন—বিশেষতঃ সরকারী তরফ থেকে। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কি গভীর ধর্মপ্রাণ ও মানব-প্রেমিক ছিলেন, তাঁর হৃদয় ছিল কি করুণা ও দয়ার উৎস, তার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর নিজের লেখায়। ১৯৩৫ সালে লেখা—World as I see it বইখানি পড়ে দেখবেন। বইখানির প্রথম পাতায় The meaning of Life নিয়ে আরম্ভ করে তিনি লিখছেন—"From the point of view of daily life, without going deeper, we exist for our fellowmen —in the first place for those on whose smiles and welfare all our happiness depends, and next for all those unknown to us personally with whose destinies we are bound up by the tie of sympathy,"……"The ideals which have lighted me on my way and time after time given me new courage to face life cheerfully, have been Truth, Goodness and Beauty." এ ত' আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলেছে—"সত্যং শিবং সুন্দরম্।" মানুষের প্রতি করুণা ও সহানুভূতির প্রেরণায় পরিচালিত হয়ে তিনি Roosevelt-এর কাছে আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন এটমবোমা তৈয়েরীর জন্য—হিটলারের নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড থেকে ইউরোপবাসীকে রক্ষা করবার জন্য। ফলে যখন বিপরীত ঘটল, তখন শুধু তিনি অনুতপ্ত হন নি, বরং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতির প্রধান ভক্ত ও সমর্থক হয়ে উঠে-

ছিলেন। মহাত্মাজী সম্বন্ধে তাঁর যে-উক্তি, এরূপ উক্তি অন্য কেহ করেছেন কি না জানি না। তিনি মহাত্মাজীর জীবদ্দশাতেই বলেছিলেন— "Generations hereafter will wonder that such a man in flesh and blood ever walked on this earth with us."

লেখাটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে গেল। আশঙ্কা হচ্ছে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে পড়তে যেয়ে। সুতরাং এখানেই শেষ করি। চণ্ডীগড়ে আপনার সভাপতি হিসাবে ভাষণটি যদি ছাপা হয়ে থাকে তবে এক কপি সময়মত পাঠাবেন। ইন্দিরা দেবীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন, ভালবাসা জানাবেন। ইতি—

স্নেহানুরক্ত

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

[পত্রখানি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

জন্মাষ্টমী

বৈজ্ঞানিকবর্যেষু

আমাদের হরিকৃষ্ণমন্দিরে পর পর দুটি মহোৎসব হ'য়ে গেল: দেবদেব কৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৪ই তারিখে ও গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব ১৫ই তারিখে। প্রতিবৎসরই এ-দুটি উৎসব হয় আমাদের মন্দিরে, কিন্তু এবার পর পর দুদিন উৎসবে এত ভিড় হয়েছিল যে, মাদৃশ বয়স্কের ক্লান্তি আসার কথা। কিন্তু যুক্তিবাদী বললে হবে কী যে—বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে ভাগবতীকৃপা লজ্জায় পর্দানসীনা হয়েছে, আমার দেহে মনে শুধু আনন্দ নয় ভরসাও জেগে উঠেছে প্রায় চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী উচ্ছ্বাসে। মহোচ্ছ্বাস মহানন্দের অপরাধ কী বলুন? পর পর দুটি জন্মদিনে কী উৎসাহই না দেখলাম ধর্মার্থী ও ধর্মার্থিনীদের মধ্যে! জন্মাষ্টমীর দিন দুবেলায় সবশুদ্ধ হাজার দুই ভক্ত ও ভক্তিমতী এসেছিলেন, পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল ও বঙ্গ হ'তে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—প্রায় মহামানবের সাগরতীর্থ বললেই হয়। দীপাবলি, ভজন, নামকীর্তন, ভাষণ, আরতি, ইন্দিরার ভাবনৃত্য, পরিশেষে ধনীদরিদ্র অভিজাত অস্পৃশ্য প্রভুভৃত্য সবাইয়ের একত্রে পংক্তিভোজন—কিছু কি বাকি রইল? আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ভাবতে যে আমাদের মন্দিরে সবাইকেই শুচি বলে বরণ করা হয়—এমনকি আমাদের আদুরে কুকুর "সাথীও" মন্দিরে ঢুকে প্রসাদ পায়—যদিও এতে "শুচিবেয়েরা" শিউরে উঠবেন। তাছাড়া পার্সী শিখ সাহেব সবাই ভজন করেন—ঠাকুরের নামকীর্তনে যোগ দেন এ শ্রীক্ষেত্রে। কাজেই এসব দেখে-শুনে যদি আজ উজিয়ে উঠে আপনার দরদী পত্রের উত্তরে একটি দীর্ঘ-পত্র লিখতে কোমর বেঁধে বসি, তবে আপনি আশা করি নিজগুণে মার্জনা করবেন এ দুরন্ত অধ্যবসায়কে।

এ আশা করি কারণ মহদাশয়ের কাছেই মানুষ আশা করে। (কালিদাস এমন কথাও বলেছেন: যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা—অর্থাৎ

নিরুপমের কাছে চেয়ে না পেলেও খেদ নাই ঃ
নরাধমের প্রসাদ যেন ভুলেও নাহি চাই।)

তা ছাড়া আপনি শুধু মহদাশয় তো নন, তদুপরি (কিমাশ্চর্য-মতঃপরম্?) বৈজ্ঞানিক হ'য়েও মানেন যে অধ্যাত্ম ব'লে একটি অনস্বীকার্য আনন্দরাজ্য আছে বিজ্ঞানের যুক্তিতর্ক যার পাসপোর্ট পায় না। মানেন যে, এ রাজ্যে ঢুকতে হ'লে চাই শ্রদ্ধা ভক্তি—যার স্থান মস্তিষ্কে নয়—হৃদয়ে। উপনিষদ বলেছে ঃ "হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি।" কিন্তু শুধু শ্রদ্ধাই নয়, সত্যেরও প্রতিষ্ঠা হৃদয়েই—"হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি।" পাশ্চাত্য জ্ঞানপন্থীরা এ কথায় সম্ভবতঃ ঘোর আপত্তি করবেন—বলবেন ঃ এ কেমন কথা?—জ্ঞানের মণিপীঠ তো মস্তিষ্কে। কিন্তু ভারতের সনাতন আর্য বোধি বলে ঃ অধ্যাত্ম উপলব্ধির গভীর অতলে যে পৌঁছয় সে মস্তিষ্ক নয়—সে এই হৃদয়ই বটে। তাই ভগবানকে আমরা "মনোযামী" উপাধি দিই নি, ডাকি "অন্তর্যামী" ব'লে। কারণ মস্তিষ্কের যে পেশা—বিচার বিশ্লেষণ—সে পেশায় নেশা হ'তে পারে বড় জোর, কিন্তু মেশা যায় না পরাৎপরের চেতনায়। এই জন্যেই অত বড় জ্ঞানমার্গী স্থিতপ্রজ্ঞ মহাযোগী রমণ মহর্ষিও আমাকে বলেছিলেন ১৯৪৪ সালে ঃ "ভক্তি জ্ঞান-মাতা।" এবং এ ভক্তির অধিষ্ঠান হৃদয় ব'লেই ভক্তিকে বাদ দিয়ে যে মানস (cerebral) জ্ঞান তাতে না ছিন্ন হয় হৃদয় গ্রন্থি, না দীর্ণ হয় সংশয়। ফল হয়—আপনারই ভাষায় ঃ "জ্ঞানের পথের পথিকের দুর্দশা যে—তার ভাগ্যে জোটে শুধু সংশয়, নৈরাশ্য এবং নিরানন্দ।"

আপনি সহৃদয় মানুষ—তাই তো আপনার প্রতি হৃদয়ের একটি সহজ টান আমি সত্যই অনুভব করি (নৈলে আপনাকে এত শত লিখতে যাবই বা কেন বলুন?)—আর সেই টানের আলোতেই দেখতে পাই যে, আপনি সংশয়ী হ'লেও (গীতার ভাষায়) "অশ্রদ্দধান" নন। আপনি নিজে মুখেই তো মেনে নিয়েছেন গীতার কথা ঃ "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" এটুকু আপনি মানেন ব'লেই আপনার সঙ্গে অধ্যাত্ম আলোচনা চলে। মানে, ধরুন যদি আপনি বলতেন যে আপনার মানসবুদ্ধি যে সত্যের নাগাল পায় না সে সত্য নামঞ্জুর—তা হ'লে

রাজনৈতিক ভাষায় আমাকে বলতেই হ'ত যে, আপনার সঙ্গে ধর্মালোচনার মূল ভিত্তিই গ'ড়ে ওঠে নি—there is no basis for discussion.

অথ, মিল থেকেই সুরু করি। আপনি একটি বিখ্যাত শ্লোকের "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" পাদটি উদ্ধৃত করেছেন আপনার পত্রে। এই শ্লোকটিরই তৃতীয় পাদে ঠাকুর বলেছেন আর একটি কথাঃ "মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ।" অর্থাৎ মনেরও উপরে বুদ্ধি। উপনিষদে বলেঃ শরীর হ'ল রথ, ইন্দ্রিয়—ঘোড়া, মন—লাগাম, বুদ্ধি—সারথি, আত্মা—রথী। এখানে বুদ্ধিকে সারথি বলা হয়েছে—সে-ই মনের লাগাম দিয়ে মানুষকে চালায় ব'লে। পাশ্চাত্য দর্শন বুদ্ধি ও মনকে সমার্থক জ্ঞান করে, কিন্তু আমরা মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব'লে বুদ্ধির বাহন পদেই বাহাল ক'রে এসেছি। কেবল সঙ্গে সঙ্গে ব'লে এসেছি যে এই মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ হ'লে তবেই আমাদের অন্তর্যামী যে-পরম যন্ত্রী আমাদের যন্ত্রবৎ চালাচ্ছেন তাঁর বিধান মেনে সে কৃতকৃতার্থ হয়—যাত্রার পথে কাঁটা না হ'য়ে হয় পাথেয়।

আপনার নম্র পত্রে একথা আপনিও স্বীকার করেছেন, লিখেছেন যে, মন বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে "তবেই হয়ত স্বজ্ঞা (intuition) আসবে।" ঠিক কথা, কেবল এখানে আপনার "হয়ত"-র জায়গায় আমি বসাতে চাই "সহজে" শব্দটি। আপনার কাছে এ-সত্যটি অজানা নেই যে, অধ্যাত্ম-পথের পরিব্রাজকরা সবারই শেষ আদর্শ "সহজিয়া" হওয়া—অর্থাৎ চেতনার এমন এক শিখরচারী হওয়া যেখানে প্রজ্ঞা হ'য়ে উঠেছে আমাদের স্বভাব-উপাধি। কিন্তু এই উপাধি পেতে হ'লে চাই আগে সাধনাবলে সাংসারিক দিক দিয়ে নিরুপাধি হওয়া—অর্থাৎ জীবন ও চেতনা সম্বন্ধে চলতি ধ'রে-নেওয়া ধারণাগুলিকে (preconception) বরখাস্ত ক'রে মনকে চিন্তাশূন্য করা; গীতার ভাষায়ঃ "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। পাতঞ্জলেও এহেন ধ্যানধারণার ফলে কী হয় তার আভাষ দেওয়া হয়েছে; বলা হয়েছে—"বিবেক খ্যাতির" ফলে হয় "ধর্মমেঘ সমাধি।" ধর্মমেঘ শব্দটি বড়ই সুপ্রযুক্ত। এ কেমন? না, ধরুন সর্ববিধ ব্যক্তিগত বাসনা নিরস্ত হ'লে চিত্তের চারপাশে যেমন একটি সহজ প্রসন্নতার আবহ গ'ড়ে ওঠে তেমনি সর্বদা যেন একটি ধর্মঘন জ্ঞানঘন মেঘমেদুর উপত্যকায় যোগী

অবস্থান করেন সহজ অবস্থাতেই ভাবস্থ থেকে। অর্থাৎ এ-সমাধি জগৎকে দূরে ঠেকিয়ে নিজের ভাবরাজ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকা নয়—এর ফলে হয় এই যে, জগতে আছি, সবই করছি অথচ আমাকে ঘিরে আছে প্রশান্তি প্রসন্নতার এক আশ্চর্য আবহ—শুচি পবিত্রতার একটি স্নিগ্ধ তৃপ্তিমণ্ডল। আমি এ-টীকা করছি এ-বিষয় পূরো একমাস ধ'রে কিছু অপরোক্ষ অনুভব এক সময়ে আমার হয়েছিল ব'লে। বলব সেকথা? বলিই না, আপনি যখন আমাকে কপট বা মিথ্যুক মনে করেন না—আশা করি একটু প্রীতির চোখেই দেখেন (আমি আপনাকে যতটা ভালোবেসেছি ততটা ভালো না বাসলেও) এখন খোলাখুলি সৎকথা বলতে বাধা কি? শুনুন তবে।

তখন আমি মাদ্রাজে। ১৯৫৪ সালে। আমেরিকা থেকে ফিরেছি। রিক্ত। কোথায় থাকি? কী করি? পণ্ডিচেরি থেকে চলে এসেছি, সেখানে ফিরতে সাধ নেই—গুরুদেব নেই—বড়ই দারুণ অবস্থা। তাছাড়া দারিদ্র্য। বাড়িভাড়া ক'রে থাকার অবস্থা নয়। আমার বইয়ের আয় তখন মাসিক ২৫০।৩০০৲র বেশী হবে না। তাতে এ-দারুণ কংগ্রেসী রামরাজ্যে বাড়িভাড়া ক'রে থাকা যায় না—বুঝতেই তো পারেন। এমন সময়ে ইন্দিরার প্রিয় ভগ্নী কান্তা ও তার স্বামী নরোত্তমলাল নন্দা আমাদের সাদরে আশ্রয় দেয়। কিন্তু তাদের ছোট্ট বাড়ি। একটি ঘরে আমরা থাকতাম—ইন্দিরার সঙ্গে ছিল তার দুই ছেলে। একটি ছোট্ট কয়লা রাখার ছফুট×তিনফুট ঘরে আমি দিনের পর দিন বই লিখতাম কিছু উপায় করতে। ভাবুন কী অবস্থা! শান্তির পরিবেশ নয়—মানতেই হবে আপনাকে। এমন সময়ে সার সি পি রামস্বামী চিঠি লিখলেন: জানি আপনার অবস্থা—অনেক স'য়েছেন, আর কেন? আসুন আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টের ডিরেক্টর হ'য়ে, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি সাদর দরদী আমন্ত্রণ—অনবদ্য যাকে বলে।

লোভ যে একেবারে হয় নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। এই তো সব সমস্যার আশু সমাধান করায়ত্ত। এরই নাম কি বিধাতার কৃপা? না। এরই নাম লোভ: মোটা মাইনের সস্তা আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সাধনার আকাশবৃত্তির উঞ্ছবৃত্তির দুঃখবরণ করতে ভয় পাওয়া। ইন্দিরাও

বলল : কক্ষণো না। ভগবান্ আছেন মুখে বললেই চলবে না, তিনি ভক্তের দুর্গতি করেন না এ বিশ্বাস যার আছে সে ভগবৎসাধনা ছেড়ে ওমরাও হবে কিসের লোভে ?

সার সি পিকে ধন্যবাদ দিয়ে লিখে দিলাম : "ভগবান্‌কেই চাওয়া যাক—বড় চাকরির সহজ সুলভ আরামকে নয়।" (খুব সংক্ষেপে বলছি এ-কাহিনী—কারণ সে-দুর্দশার কথা সব মুখে বলার সময় নেই—বাড়ীতে বহু অতিথি—তাছাড়া মন্দিরের হাজারো কাজ।)

আপনি মনস্বী তথা দরদী, সহৃদয়। বলুন তো, এঅবস্থা কি ধর্মমেঘ সমাধির অনুকূল—যার ফলে হয় "ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ ?" এ-অবস্থায় নাম গান ভজন ধ্যান ধারণা সবই প্রথম দিকে ফাঁকা ফাঁকা লাগত বৈকি। মনে এল গ্লানি। তবে এতদিন করলাম কি ? ষোলো কড়াই কানা ? হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থসমস্যার সাময়িক কিছু সমাধান হ'ল একটি উপন্যাস ছেপে। কিন্তু সেটা তুচ্ছ। হঠাৎ সেই ছোট্ট বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় একা ছাদে ব'সে ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে মনে নেমে এল এক অপূর্ব চিত্তপ্রসাদ। সত্যিই সব ক্লেশ যেন গ'লে গিয়ে রূপ নিল পরমা শান্তির। দিনের পর দিন ধ্যানে বসতে না বসতে শান্তি নামে দেহে মনে, আর সারাদিন তার রেশ থাকে! একেবারে অপ্রত্যাশিত—বাংলার বাইরে বিদেশে বিভূঁয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব গুরু-শুভার্থী কেউ কোথাও নেই—শুধু আমি আর ইন্দিরা রোজ ভজন করি দিনে রাতে। কিন্তু যেই সন্ধ্যায় ধ্যানে বসি নামে কী একটা প্রবাহ মূর্ধা থেকে—সমস্ত শরীর তো জুড়িয়ে যায়ই, মনের তাপও গ'লে জল হ'য়ে যায়। কান্তা ও নরোত্তম লালকে রোজ বলি : "দেখ ভাই, আর কোনো দুঃখ নেই একথা বললে কিছুই বলা হ'ল না—বলব : এ-অবস্থা যদি আমার স্থায়ী হয় তবে আর চাই কী ? মন পূর্ণতার এক অপরূপ অনুভবে নীল নিটোল হ'য়ে উঠেছে। চরম দুর্লগ্নে এ কী বিধাতার করুণা ?" কৃষ্ণকে আমি চর্মচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তাঁর করুণা যে আমাকে "ধর্মমেঘের" মতনই ঘিরে থাকত দিনের পর দিন—এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য !* কৃষ্ণকে দর্শন করলেও সে সময়ে এ-অবস্থা আমার হ'ত কিনা কে জানে ? সবচেয়ে বড় কথা : অসহায় অবস্থায় এল সহায়, ভরসা, শক্তি। সংকট উত্তীর্ণ হলাম একমাসের

বলদা শান্তিতে। তাই মনে হয়—কিছু মনে করবেন না—আপনি ঠিক ধরতে পারেন নি মনে হয় যখন লিখেছেন ঃ "ভক্ত যখন কৃষ্ণের দর্শন পান, বা গোপালরূপী ভগবানের সঙ্গে খেলা করেন—বুদ্ধিবাদীরা, জ্ঞানপন্থীরা এসবের হয়ত ব্যাখ্যা করবেন ভক্তমনের প্রক্ষিপ্ত সৃষ্টি ব'লে।" কারণ বুদ্ধিবাদী বলতে যদি উপনিষদের শুভবুদ্ধিবাদী বোঝেন (স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দিন) তাহ'লে বলব যে সে-বুদ্ধির এমন "ছায়ায় কায়াভ্রম" হ'তেই পারে না, কেন না সে-বুদ্ধি ইতি-মধ্যেই কিছুটা অন্ততঃ আভাষ পেয়েছে বেদের সেই "অদ্বিতীয় মহান্ পুরুষ"-এর যিনি অনিত্যদের মধ্যে নিত্য, চেতনদের মধ্যে চেতয়িতা হ'য়ে বহুর ভোগবিধান করেন—"নিত্যোহ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।"

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আপনার সংশয়ের উত্তরে বলব যে, এ-ইতিহাসও নির্ভেজাল বৈষ্ণবের কাছে অবান্তর যে তার অন্তরে পেতে চায় সেই ভক্তবৎসলকে যিনি তার "যোগক্ষেম বহন করেন" (যোগক্ষেমং বহাম্যহম্)—তাকে শরণব্রতে দীক্ষা দিয়ে বলেন ঃ "আমাতে তন্ময় হ'লে সর্ব দুর্গতি থেকে মুক্তি পাবেই পাবে (মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি)—শুধু জীবনে নয়, আমাকে স্মরণ ক'রে দেহত্যাগ করলেও আমার কাছেই আশ্রয় পাবে (অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ)।" শুধু কৃষ্ণকে বলি কেন ? প্রতি ধর্মের সাধকই তার ত্রাতাকে চায় দুঃখ-তারক হিসেবেই বরণ ক'রে। খৃষ্টের বাণী স্মরণীয় ঃ "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden and I will give you rest—হে ভারক্লিষ্ট জীবনশ্রান্ত মানুষ! এসো আমার কাছে, আমি তোমাকে দেব পরম বিশ্রাম।" কিম্বা বুদ্ধের (ধম্মপদ, জরাবর্গ)

"জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা
অথো সরীরং পি জরং উপেতি।
সতং ন ধম্মো ন জরং উপেতি
সন্তো হবে সব্ভি পবেদয়ন্তি ॥

অর্থাৎ

রাজরথও হয় দীর্ণ—দেহেও জরায় জীর্ণ হয় ভূতলে ঃ

শুধু সুজনের ধর্ম অমর—সাধকের কাছে সাধুরা বলে।

আপনি লিখেছেন ঃ "শাস্ত্রে কৃষ্ণের যে রূপ বর্ণনা আছে ভক্ত শুধু সেই রূপেই কৃষ্ণকে দেখতে পান…"ইত্যাদি। অর্থাৎ (রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে) ঃ

"আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—" অন্যভাষায়, কৃষ্ণের রূপ ক্রমাগত কল্পনা করতে করতে চোখের সামনে সেই রূপই উদয় হয়—যেমন হয় হিপনটিস্‌মে—এই না? বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ঃ ঠাকুরের অবজেক্টিভ কোনো রূপ টুপ নেই, সবই ফক্কিকারি—দেখছি ঠিকই। কিন্তু পুরোদস্তুর সাবজেক্টিভ দেখা, মনগড়া মূর্তি, উইশ-ফুলফিলমেণ্ট, বা অটোসাজেস্‌চন।

কিন্তু এখানে আপনার গোড়ায়ই গলদ হল আপনার উপপত্তিটাই (Premise) ভুল ব'লে—যেহেতু সাধকদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, অনেক সময়েই ঠাকুর তার কাছে এমন রূপ ধ'রে এসেছেন যে-রূপকে সে শুধু যে চায়নি তাই নয়—শাপমণ্যি দিত। তবু তিনি "হানা দিয়েছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন—Vini, vidi, vici।" কী ভাবে—একটা উদাহরণ দেই ঃ

আপনি বিশ্ববিশ্রুত খৃষ্টান সাধু সুন্দর সিং-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন? আজ একটু শুনলেনই বা তার কাহিনী। সত্যিই বলবার মতন কাহিনী—তিনি শুধু সাধুর মতন সাধু ছিলেন ব'লেই নয়, মানুষের মতন মানুষ ছিলেন ব'লেও বটে।

আমি অন্যত্র লিখেছি যে, আমার ব্যক্তিগত জীবন সত্যিই অতি বিচিত্র—কত অঘটনই যে দেখেছি, কত রকম সাধুই যে আমাকে দর্শন দিয়েছেন অপ্রত্যাশিত ভাবে—কী বলব! স্মৃতি চারণ-এ তান্ত্রিক সাধু কুমারনাথের কথা লিখেছি যিনি আচম্‌কা এসেছিলেন আমার এক বিষাদলগ্নে। ঠিক তেমনি ১৯২০ সালে যখন আমি, কেম্ব্রিজে মনঃকষ্টে দিন কাটাচ্ছি নানা ওঠা পড়ার মধ্যে—আদর্শ সংঘাতে—সেই সময়ে হঠাৎ আমার ঘরে এলেন কে ভাবুন তো? এই মহাজন—সাধু সুন্দর সিং। কেন এসেছিলেন কে বলবে? তবে সাধুরা অনেক সময়েই অন্তর্যামী

হ'য়ে আসেন আমাদের দুর্বল দুর্লগ্নে বল দিতে। সে-সময় আমি প্রায়ই ভাবতাম—শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন সাধুসঙ্গ করতে, কিন্তু ইংলণ্ডে কোথায় সাধু? হয়ত সেই ব্যাকুলতাই তাঁকে টেনে এনেছিল, কে জানে?

কিন্তু এ কেমন সাধু গো? অবিশ্বাস্য! খৃষ্টান, অথচ পরণে গৈরিক আলখেল্লা! বেশ মনে আছে আমার ব্লিঙ্কো গ্রোভের বাসায় তাঁর সৌম্য মূর্তির আকস্মিক অভ্যুদয়—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ!" কী সুন্দর! ছফুট লম্বা। বলিষ্ঠ শিখ। গৈরিক বসন, গৈরিক পাগড়ি। ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি, চোখে নির্মল জ্যোতি, মুখে শান্তির স্নিগ্ধ আভা! কী কথা হয়েছিল মনে নেই কেবল মনে আছে, জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "আপনি খৃষ্টান হলেন কেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: একগাল হেসে: "প্রভু ডাকলে কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে কেউ?"

আমার কৌতূহল জেগে উঠল। আমি পড়লাম তাঁর জীবনী। বইটি ছোট্ট—পুস্তিকা মাত্র, কিন্তু চমৎকার লেখা—যেমন আন্তরিক তেমনি প্রাণস্পর্শী। লেখিকার নাম—মিসেস আর্থার পার্কার। বইটির নাম: Sadhu Sundar Sing (Called of God)। প্রকাশিত হয়েছিল বিলেতে ১৯১৮ সালে, প্রকাশক—খৃষ্টান লিটেরারি সোসাইটি। আর একটি জীবনী পড়েছিলাম: The Sadhu, প্রণেতাযুগলের নাম—বি এইচ স্ট্রীটার ও এ জে আপাসামি। প্রকাশক—ম্যাকমিলান। আমি প্রথম বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেব এখানে। বইটির বহু সংস্করণ হয়েছে সাধু সুন্দর সিং অগুন্তি লোকের প্রিয় ছিলেন ব'লে।

সাধু সুন্দর সিং-এর সম্বন্ধে নানা লোকের মুখেই আমি শুনেছিলাম যে, খৃষ্টদেবের শুধু দর্শন পাওয়া নয়, তাঁর বাণীও পান তিনি ভাব সমাধিতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান তাঁর সংস্পর্শে···ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর বিচিত্র আত্মভোলা পুণ্যজীবনের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। একটু শুনুনই না সাধুর কথা। তাছাড়া আপনি অঘটনে বিশ্বাস করতে বেগ পান, তাই বলেই ফেলি দু একটি অঘটনের কথা—কী ভাবে খৃষ্টদেবের করুণা অঘটন ঘটিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিল দু দুবার। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি তারপরে—আগে ব্যাকগ্রাউণ্ড গড়ে তুলি তো।

সাধুজি গ্রীষ্মে প্রায়ই তিব্বতে যেতেন খৃষ্টদেবের বাণীবাহ হয়ে। এ-

প্রচারে দিনের পর দিন কত দুঃখই যে তিনি বরণ করেছেন পড়তে পড়তে সম্ভ্রম জাগে এ-পরম ভাগবতের ভক্তি বিশ্বাসে। যতই কষ্ট পান ততই যেন আনন্দে তাঁর মন প্রাণ আপ্লুত হয়। সাধু খৃষ্টানেরা এ-স্বেচ্ছাবৃত দুঃখবরণকে নাম দেন bearing one's crosses কিন্তু বিপদ অগুন্তি হ'লেও করুণা যে রক্ষাকবচ এ তো একটা কথার কথা নয়—খাঁটি ভক্তেরা সবাই যে বারবার প্রত্যক্ষ করেছেন এ-সত্য নানা পরিবেশে—অঘটনের পর অঘটনে। মিরাক্লের যুগ গত বললে শুনব কেন?

একদা করুণা তাঁকে বাঁচিয়েছিল এক অকল্পনীয় অঘটন ঘটিয়ে। সংক্ষেপে, তিব্বতে রসার ব'লে এক গ্রামে তিনি খৃষ্টদেবের সম্বন্ধে ভাষণ দিতে যেতেই তাঁকে রক্ষীরা টেনে নিয়ে গেল এক লামার কাছে। সেখানকার গ্রামবাসীরাও ছিল দারুণ গোঁড়া বৌদ্ধ। লামা বেগে আগুন হ'য়ে বিধর্মীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। সেখানে প্রথা ছিল—দণ্ডিতকে ফেলে দেওয়া এক অন্ধকূপে। কূপটির উপরে ঢাকনি—তাতে তালা লাগানো। তালার চাবি লামার কোমর বন্ধে।

সুন্দর সিংকে নিষ্ঠুর গ্রামবাসীরা ফেলে দিল সেই অন্ধকূপে—যেখানে বহু দণ্ডিতের হয়েছে জীবন্ত সমাধি। হাতে তিনি বিষম আঘাত পেলেন। কিন্তু আরো যন্ত্রণা—চারদিকে পচা হাড় মাংসের দুর্গন্ধে। সে-বিষবাষ্পে নিশ্বাস নেওয়াও ভার। সাধুজির মনে পড়ল অন্তিমলগ্নে খৃষ্টের আবেদন: "Eli, eli, lama sabachtani?" অর্থাৎ "ভগবান! আমাকে পরিত্যাগ করলে কেন তুমি?"

তৃতীয় দিনে—তাঁর মনে হ'ল আর দেরি নেই দীপ নিভবার; তিনি প্রার্থনা করছেন পরম শরণ চেয়ে। এমন সময় হঠাৎ শুনলেন অন্ধকূপের উপরে চাবি দিয়ে তালা খোলার শব্দ। তারপর ঢাকনি উঠল—একটি দড়ি নেমে এল ধীরে ধীরে। তিনি দড়িটি ধরতেই দড়ি উঠে এল। সুন্দর সিং কূপের মুখে এসে মুক্তি পেয়ে চারদিকে তাকালেন কিন্তু আশ্চর্য, কেউ কোথাও নেই! তিনি ঠাকুরের জয়গান ক'রে সেই গ্রামেই ফিরে গিয়ে অকুতোভয়ে আবার খৃষ্টের করুণার কথা বলা সুরু করলেন, যেন কিছুই হয়নি তাঁর! এমন অভী ভক্তকে মহাত্মা উপাধি দেবেন না কি?

গ্রামবাসীদের মধ্যে তুমুল কলরব! এ কী! যে অন্ধকূপ থেকে

কস্মিন কালেও কেউ নিষ্কৃতি পায় নি, সেখান থেকে পুরো তিনদিন পরে মরা মানুষ বেঁচে উঠল। তারা ভয় পেয়ে ছুটে লামার কাছে গিয়ে দরবার করল। লামা তো অবাক্। কে চুরি ক'রে তাঁর চাবি নিয়ে গেল দণ্ডিতকে মুক্তি দিতে? এ কী!—চাবি যে তাঁর কোমর বন্ধেই ঝুলছে সমানে!! লামা বিষম ভয় পেয়ে গেলেন। তিব্বতীদের মধ্যে দারুণ ভূত প্রেত দৈত্য দানার ভয়। তিনি হুকুম দিলেন সাধুজিকে বিদায় দিতে।* কেমন অঘটন বলুন তো?

আর একটি কাহিনীও বলবই বলব। বিশ্বাস যদি নাও করেন মনে করিয়ে দেব হ্যামলেটের "There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your philosophy? (অপরাধ নেবেন না, এখানে philosophy-র জায়গায় science বসাতে চাই।

সেবার সাধুজি চলেছেন এক তিব্বতী বন্ধুর সঙ্গে পার্বত্য পথে। হঠাৎ তুষার পড়া সুরু হ'ল। কী বিপর্যয় ঠাণ্ডা! দেহ জ'মে গেল বুঝি! দুজনেরই মনে হ'ল—এই শেষ। এমন সময়ে—ও কে পথে শুয়ে? কাছে গিয়ে সাধুজি দেখেন ঠাণ্ডায় অসাড় অর্ধমৃত একটি পথিক। সাধুজি বললেন সঙ্গীকে: "একে নিয়ে যাওয়া যাক যতদূর পারি—যদি কোনমতে বাঁচানো যায়।" সঙ্গী মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল। সাধুজি কী করেন?—একলাই তাকে পিঠে তুলে অতিকষ্টে ফের পথ চলা শুরু করলেন পা টিপে টিপে। এই দারুণ পরিশ্রমে শুধু যে তাঁর দেহে উত্তাপ সঞ্চারিত হ'ল তাই নয়, সে উত্তাপে জীবন্মৃত পথিকটিরও সাড় এল! অতঃপর নিয়তির কী পরিহাস—সাধুজি আর একটু এগুতেই দেখেন সহযাত্রীটি পথে প'ড়ে—হিম, নিষ্প্রাণ! যখন সাধুজি গ্রামে পৌঁছলেন তখন জীবন্মৃতের জ্ঞান ফিরে এসেছে। উভয়েই গাইলেন ঠাকুরের করুণার জয়গান। কেমন কাহিনী বলুন তো।)

পরের ঘটনা আগে বললাম ভালোই হ'ল—সাধুজি কেমন সাধু তার

* The Sadhu-তেও এই অঘটনটির কথা লিখেছেন স্ট্রীটার সাহেব, মিসেস অ্যার্থারের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। এ-অঘটনটির কথা সাধুজী বহুস্থানেই তাঁর ভাষণে বলেছেন।

পরিচয় মিলল। এবার শুনুন কেমন করে তিনি সাধু হ'লেন। সে আর এক অঘটন এবং আরো বিচিত্র, অবিশ্বাস্য, অথচ ষোলো আনা সত্য। তবে দীর্ঘ কাহিনী, তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

সুন্দর সিং এর পিতা ধনী। গোঁড়া শিখ। পিতাপুত্রে রোজ গুরু গ্রন্থ পড়েন। পড়তে পড়তে সুন্দর সিংও দেখতে দেখতে পিতার মতনই গোঁড়া হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু হায়রে, মনে যে শান্তি নেই একটুও! গেলেন এক মিশনরি স্কুলে। সেখানে ছাত্রদের রোজ ক্লাসে বাইব্ল পড়তে হ'ত। সুন্দর সিং-এর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে উঠল: "কী! ম্লেচ্ছ বাইব্ল পড়ব আমি ধার্মিক শিখ হ'য়ে? অসম্ভব।" তবু না প'ড়ে উপায় নাই ব'লেই বিতৃষ্ণা বিষিয়ে উঠল বিদ্বেষের ক্রোধে। তিনি এক হিন্দু সাধুর কাছে যোগদীক্ষা নিয়ে আরো ধ্যানে মন দিলেন।

কিন্তু কই শান্তি? যতই পড়েন নানা হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ গুরুগ্রন্থ, যতই আসন প্রাণায়ামে মন দেন ততই মনে অশান্তি ওঠে ফেঁপে। শেষে রেগে একদিন বাইব্ল আগুনে ফেলে দিলেন—ঐ তো যত নষ্টের গোড়া! কিন্তু চিত্তগ্লানি কাটল না: আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।

পরদিন ভোরবেলা উঠে অশান্ত মনে ধ্যানে বসেছেন এমন সময় ঘর ভরে গেল পাৎলা মেঘে—(পাতঞ্জলের "ধর্মমেঘ" স্মরণীয়)—আর সেই মেঘের মাঝে, আহা, খৃষ্টের যে কী দিব্য দীপ্ত মূর্তি! খৃষ্টদেব তাঁকে বললেন পরম প্রেমে: "আমাকে তুমি কেন খেদিয়ে দিচ্ছ? আমি যে তোমাদের তারক। তোমাদের জন্যেই ক্রুসে মৃত্যুকে বরণ করেছি।" সুন্দর সিং এর দেহ শিউরে উঠল। চোখে জল ভ'রে এল ভক্তিতে আর মনে নামল শান্তির অঝোর প্লাবন। সে কী অপূর্ব শান্তি! সেই যে পরমাশান্তির অবতরণ হ'ল—"The peace that passeth all understanding"—সে শান্তি তাঁকে আর কোনদিন ছেড়ে যায় নি—উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ছিল তাঁর নিত্য সাথী। এমন অপার অবর্ণ্য শান্তির বর যিনি দিলেন তাঁকে ধন্য নবজাতক ভালোবাসলেন। ব্রত নিলেন—তাঁর করুণা প্রচারের। বললেন পিতাকে যে, তিনি খৃষ্টান হবেন।

তারপরে যে আর এক তুমুল কাণ্ড। বাপ মা আত্মীয় স্বজনের তর্জন

গর্জন কান্নাকাটি কাকুতি মিনতি। কিন্তু তাঁর সেই এক কথা : খৃষ্টের ডাক যে শুনেছে তাকে সাড়া দিতেই হবে সে-ডাকে।

পিতা রেগে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ধনিপুত্র হ'লেন পথের ভিখারী।

তিনি গেলেন এক কাপড়ে, সাশ্রু নেত্রে গেয়ে :

Jesus ! I my cross have taken
All to leave and follow thee ;
Destitute, despised forsaken,
Thou from hence my All shalt be.

এ-অঙ্গীকার তাঁর মুখের কথা ছিল না। তিনি সিমলায় ৩.৯.১৯০৫ তারিখে এক খৃষ্টান মিশনারির কাছে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা (baptism) নিয়ে পণ নিলেন যে খৃষ্টধর্মের প্রচারই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তথা ব্রত।

দারিদ্র্য বরণ করলেন খৃষ্টদেবের কথা মেনেই। কোথাও যেতে হ'লে বন্ধুরা তাঁকে পাঠাত। তিনি কোনোদিন এক পয়সাও উপায় করেন নি। চির জীবন ছিলেন খৃষ্টৈকান্ত, পবিত্র, সদাপ্রসন্ন, সর্বহারা সন্ন্যাসী। অথচ সারা জগতে টহল দিয়ে বেড়িয়েছেন অকিঞ্চন বেশে, গৈরিক বসনে। খৃষ্টান, কিন্তু কোনো গির্জার পাণ্ডা ছিলেন না। মানতেন না কোনো পোপ কার্ডিনালের আদেশ। তার একটিমাত্র গুরু—খৃষ্ট। একটিমাত্র তীর্থ—জেরুজালেম। একটিমাত্র বেদ—বাইব্‌ল। একটিমাত্র উপজীব্য—খৃষ্টভক্তি ও সৌভ্রাত্র্য। সবাইকেই ভালোবাসতে হবে—এ খৃষ্টের অনুজ্ঞা—তাই সবাইকেই তিনি ভাই ব'লে বরণ করতেন—এক বিশ্বপিতার যে সন্তান আমরা সকলেই।

কিন্তু শুধু মহাত্মা সুন্দর সিং-ই তো নয় আরো অনেক (অখ্যাতনামা) সাধককেও ঠাকুর দর্শন দিয়েছেন না চাইতেই। আমার এক মাড়োয়ারি বন্ধুর কথা মনে পড়ে। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরিতে। সে থাকত আমার ঘরের পাশেই। দারুণ ইন্দ্রিয়াসক্ত, ধনী, বিলাসী। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাকে দর্শন দিলেন। সে ছেড়ে দিল লাম্পট্য, হ'ল সাধক। এল শ্রীঅরবিন্দাশ্রমে। দানও

করল আশ্রমে। প্রতি বৎসরেই আসত। তার কথা আমি লিখেছি অন্যত্র।

তাছাড়া এমনও হয়--কেউ বা কালীর ধ্যান করতে করতে কৃষ্ণের দেখা পায়, কি শিবের ধ্যান করতে করতে কালীর। এসব কথা বলার উদ্দেশ্য—ধ্যান-দৃষ্ট মূর্তিব কেবল যে আন্তর সত্তাই (subjective entity) আছে এমন নয়—তার বহিঃসত্তাও (objective existence) আছেই আছে। কিন্তু একথার কি ধরনের প্রমাণ আপনি চান? যুগ যুগ ধ'রে হাজারো ভক্ত সাধক পূজারী প্রেমিক ইষ্টকে দর্শন স্পর্শন ক'রে ধন্য হয়েছে—তাদের চরিত্র শুদ্ধ হয়েছে, সর্বভূতে দয়া এসেছে, রিপুর অত্যাচার থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছে, বার বার বিপদে আপদে সংকটতারণের আশ্রয় পেয়েছে—এসবই কি নিছক কল্পনা হ'তে পারে—গাণিতিক probabilityর বিচারেও? শুধু তাই নয়; আজও যারাই চায় তারাই পায়—অঘটন আজো ঘটে—যদি অবশ্য তারা একান্তী হয় ও সাধনার সর্ত পালন করতে প্রস্তুত থাকে। এ-যুক্তিতে অপসিদ্ধান্ত (fallacy) কোথায়? তাছাড়া ঠাকুর গীতাতেই কি বলেন নি যে, যে-ভক্ত যে-রূপে তাঁর দর্শন চায় তিনি সেই রূপেই তাকে দর্শন দেন? এমন কি অবয়বহীন শালগ্রামেও ব্রহ্মচৈতন্যের আবির্ভাব হয় যার স্পর্শে সাধকের চেতনায় পরমানন্দ নামে তার গোটা জীবনটাই বদলে যায়। এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন তাঁর এক দীর্ঘ পত্রে। তাতে প্রথমে লিখেছিলেন (২-১২-৪৬) "I have always regarded the incarnation as a fact and accepted the historicity of Krishna as I have accepted the historicity of Christ"* (সে সব উদ্ধৃত করতে গেলে এ-চিঠি হ'য়ে দাঁড়াবে মহাভারত)। কিন্তু তারপরেই আমাকে লিখলেন (অনুবাদ ক'রে দিই সংক্ষেপে): "কৃষ্ণ সত্যি ছিলেন কি না এ-গবেষণার সঙ্গে অধ্যাত্ম জীবনের কোনো সম্বন্ধই নেই। কারণ, সাধকের জীবনের লক্ষ্য হ'ল

---

* অর্থাৎ "অবতারবাদ আমি বরাবরই মেনে এসেছি এবং কৃষ্ণ ও খৃষ্টের ঐতিহাসিকতাকে স্বীকার করে এসেছি।" (পুরো চিঠিটি দ্রষ্টব্য **Letters of Sri Aurobindo**র প্রথম খণ্ডে ৩৫৩ পৃষ্ঠায়।

ভাগবত নিত্যকৃষ্ণের সঙ্গে যোগ ও তাঁর চেতনার দিকে তার নিজের চেতনার প্রগতি—অন্তরে তাঁর সঙ্গে মিলন ও প্রাক্‌মিলন পর্বে ইষ্টের জন্যে তৃষ্ণা, ভক্তির বিকাশ ও তীর্থপথে চলতে চলতে আলোর পাথেয় আহরণ। এই সব যে পেয়েছে, তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছে, শুনেছে তাঁর স্বর, জেনেছে তাঁকে বন্ধু, প্রেমিক, দিশারি, গুরু, প্রভু ব'লে+—সর্বোপরি, যার সমগ্র চেতনারই রূপান্তর হয়েছে তাঁর স্পর্শে, কিম্বা যে তাঁর আবির্ভাবকে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে—তার কাছে এসবই (অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিতণ্ডাই) বাহ্য।"

একথা আপনিও খানিকটা মানেন মনে হয়, তাই ঠিকই ধরেছেন: "ভক্তির পথ সহজ ও সরল বটে কিন্তু তাতে বিশ্বাস চাই গভীর···ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন, সাধনা ভিন্ন ঐরূপ বিশ্বাস হয়ত আসতে পারে না।" ঠিক কথা, কিন্তু এর পরেই যখন আবার লিখলেন: "আমাদের চেষ্টা হয় জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছিন্ন করবার," তখন টুকতে ইচ্ছা হয়: বটে, কিন্তু কী ধরণের জ্ঞান? উপনিষদে আছে দুরকম জ্ঞানের বা বিদ্যার কথা: পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা হ'ল আপনাদের সায়েন্স বা বস্তুবিচার। তবে বস্তুবিশ্বের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায় যা জেনে লাভ সমূহ—(যদিও ক্ষতিও হয় প্রয়োগ না জানলে, চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—যে কথা আপনিও আপনার একাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন)। কিন্তু জানা যায় না সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মাকে—মানুষের হৃদয়ে যাঁর অধিষ্ঠান, যাঁকে জানলে তবেই সে অমৃত হয় নৈলে নয় ("এষ দেব বিশ্বকর্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ···য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি")—যাঁকে জানলে আর কিছু জানার থাকে না ("নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ")। এহেন দুর্লক্ষ্য মহান্ পুরুষকে জানতে হ'লে চাই অধ্যাত্মজ্ঞানের জ্যোতি—অর্থাৎ পরা বিদ্যার প্রসাদ। অন্য ভাষায়: যে-বুদ্ধি যে-জ্ঞান দিয়ে বস্তুবিশ্বের বিশ্লেষণ ও তদন্ত ক'রে মানুষ দুনিয়ার চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে সে-জ্ঞানে সে-বিদ্যায় তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান তথা স্বাস্থ্যরক্ষা হ'তে পারে বটে—

+ গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥
(গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এ নানা বিভাবই ধ্যেয়—এবং প্রতি বিভাবই উপলব্ধিগম্য, ফাঁকা কথা নয়।)

কিন্তু অন্তরের দৈন্য, প্রবৃত্তির বর্বরতা, দুঃখ শোক তাপ ক্লৈব্য অনুশোচনা, অশান্তি—এসবের কোনো প্রতিষেধকই মিলতে পারে না। তার জন্যে চাই ভগবৎশরণ, ভক্তি, শরণাগতি। এই ভক্তিসাধনার পথে প্রজ্ঞা তথা শক্তিও উপচিত হয়, যার বলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও বাইরের নানা বাধাকে জয় করতে শেখে। তাই শ্রীঅরবিন্দ ভক্তিকে এত বড় বলেছেন। আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে (২।২।১৯৩২): "যোগের সম্বন্ধে আমার নানা লেখায় আমি ভক্তিকেই সবচেয়ে বড় বলেছি। কারণ ভক্তি যতই গভীর হয় উপলব্ধির শক্তিও ততই সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, স্বভাবের রূপান্তরও সহজ হ'য়ে আসে।" "তাঁর সিন্থেসিস অফ যোগ"-এ তৃতীয় ভাগে প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন তিনি (এ-ভাষার অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন ব'লে মূল ইংরাজী উদ্ধৃতিটুকু দিয়েই ইতি করি)।

"Love is the power and passion of the divine self-delight and without love we may get the rapt peace of its infinity, the absorbed silence of the ananda, but not its absolute depth of richness and fulness." অপিচ: "Love fulfilled does not exclude knowledge, but itself brings knowledge; and the more complete the knowledge, the richer the possibility of love."

এই জ্ঞানই কাম্য—এই দুর্লভ অধ্যাত্ম জ্ঞান, পরাবিদ্যা—আর তার সঙ্গে ভক্তি প্রেমের আদৌ বিরোধ নেই—বরং এ ওকে পূর্ণতা দেয়, যেমন গানের কথা ও সুর।

এই খানেই আমার চিঠির সমাপ্তি টানব ভেবেছিলাম কিন্তু তারপরে মনে হ'ল যে, যখন আনন্দের ঝোঁকে এতখানিই লিখে গেলাম তখন আপনার আর একটি মন্তব্যের সম্বন্ধেও কিছু লিখলামই বা—আপ্তবাক্য যখন ভরসা দিয়েছে—"অধিকন্তু ন দোষায়।"

আপনি লিখেছেন: জ্ঞানপন্থীর ভাগ্যে জোটে মনঃকষ্ট, সংশয়, নিরাশা; কেন না জীবজগতের অগুন্তি দুঃখদৈন্য, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তির সে কোনো কারণ খুঁজে পায় না।" এ-সম্পর্কে আগেই বলেছি যে মানস জ্ঞান (অপরা বিদ্যা) ও আত্মবোধের আলো (পরা বিদ্যা) এক বস্তু নয়। তাই আপনার এ-উক্তিটি মানস জ্ঞানপথের গড়পড়তা পথিকের বেলায় খাটলেও অধ্যাত্মপথের মহাপরিব্রাজকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কারণ

তাঁরা সবাই মানুষের দুঃখের নিদান তথা চিকিৎসা উভয়েরই দিশা পেয়েছেন, বলেছেন: যত নষ্টের গোড়া হ'ল আমাদের অহংকারের ভেদবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সুখের বিপর্যয় লোভ। মহাভারতে ভীষ্ম বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা: যে, সবচেয়ে দারুণ রিপু হ'ল লোভ—কেন না সে মানুষের সব গুণকেই গ্রাস করে কুমীরের মতন। যুগে যুগে দেশে দেশে সব মহাজনই এ-কথায় সায় দিয়ে এসেছেন, বলেছেন এ-ধোকার টাটি জগতকে রাতারাতি মজার কুঠিতে রূপান্তরিত করা যেত যদি সব মানুষকে নির্লোভ করা সম্ভব হ'ত। তাই মানুষ তার দুঃখদৈন্যের কারণ খুঁজে পায় নি এমন কথা বলা চলে না! বলা চলে বড় জোর এইটুকু যে (গীতার ভাষায়) যে-সুখ "অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপম" সেই রাজস সুখের লোভ থেকে মুক্ত ক'রে তাকে সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী করবার উপায় সে আবিষ্কার করতে পারেনি। অবশ্য ধর্মের পথে তাকে চালালে সাত্ত্বিকতার মুক্তি মেলে এ-উত্তর প'ড়েই রয়েছে, কিন্তু এ-উত্তরে কোনো সত্যিকার লাভ হয় না, কেন না ধর্মপথে চলতে গেলে—অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হ'তে গেলে—কোনো সস্তা সুখ বা তৃপ্তির ঘুষ কি বখশিশ মেলে না। ধর্মের পথে প্রথম দিকে বহুদিন ধ'রে সাধকের ভাগ্যে জোটে শুধুই শুষ্কতা ও নানা বাধার চাপ। পক্ষান্তরে অধর্মের আপাতঃ-সুস্বাদু কাম ক্রোধ লোভের পথে ইন্দ্রিয়সুখ নেশা উত্তেজনা বর্গীয় রকমারি নগদ বিদায় মেলে, যদিও তার পরিণাম—সর্বস্বান্তি। কিন্তু মোহ যাকে পেয়ে বসে সে আখেরের কথা ভাবে না তো, ভাবে কেবল টাটকা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা—জুয়াড়ির মতন। আর জুয়াড়ি হ'ল স্বভাবে চোরা—ধর্মের কাহিনীতে কান দেবে কেন? অর্থাৎ সে-মূঢ়কে বলা বৃথা যে, পরমার্থসিদ্ধি বিনা স্বার্থসিদ্ধি অসম্ভব—পরার্থনিষ্ঠার হাতেই চিরন্তন আনন্দলোকের ছাড়পত্র।

এক সময়ে আমি সত্যিই আথাল পাথাল ভাবতাম মানুষের এই দুঃখ দৈন্য—বিশেষ করে মূঢ়তার সমস্যা নিয়ে: "ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ"—ধর্মই ধারণ করে জেনেও কেন তার মতিচ্ছন্ন হয়—অধর্মের পথে পা বাড়িয়ে সে কেন রসাতলমুখী হ'তে চায়? ভাবতাম—কোন্ পথে মানুষের হিতসাধন করা যায় সবচেয়ে সহজে? আমার "তীর্থংকর"-এ দেখতে পাবেন প্রায়

চল্লিশ বৎসর আগে রোলাঁ, রাসেল ও গান্ধিজিকে এই একই প্রশ্ন করি। তাঁদের মধ্যে রোলাঁর উত্তরই সে সময়ে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল : যে, শিল্পী মানুষকে যে আনন্দ পরিবেষণ করে সেইই হ'ল মানুষ তথা ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা। কিন্তু তারপর শিল্পীদের মতিগতি দেখে বুঝতে পারি যে, তাঁরা যে-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাতে মানুষ টুকরো টুকরো সুখের স্বাদ পেয়ে খানিকক্ষণ জাগতিক আধিব্যাধির চাপ ভুলে থাকলেও প্রকৃতির হাজারো দুঃখ দৈন্য হীনতার চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তখন গীতার নির্দেশে ছুটি শ্রীঅরবিন্দের কাছে : "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ" —অর্থাৎ তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম প্রশ্ন ও সেবা করলে তবেই তাঁদের উপদেশে জ্ঞানের ক্ষুধা মিটতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মুখে প্রজ্ঞা পারমিতার আলো দেখে মনে হ'ল—গীতার অঙ্গীকার সত্য, তাঁর উত্তরও আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয়েছিল—যদিও গীতায় সে-উত্তর আগেই পেয়েছিলাম—যে, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে ব'লেই জীব মোহের দ-য়ে মজে। পরে তাঁর মহাকাব্য "সাবিত্রী"তে শ্রীঅরবিন্দ এ-বাণীটিকে তাঁর বলিষ্ঠ কাব্যছন্দে আরো চমৎকার ক'রে ফুটিয়েছিলেন :

Pain is the signature of the Ignorance
Attesting the secret God denied by life :
Until life finds Him pain can never cease

অর্থাৎ

অজ্ঞানই ব্যথার রক্তস্বাক্ষর—সে-ব্যথা বলে : রাজে
সুগুপ্ত সে-বিভু—যাঁরে নাস্তিক জীবন অস্বীকারে।
তাঁহার মিলন বিনা বেদনার নাই অবসান।

নাস্তিক বুদ্ধিবাদী ওরফে মানসজ্ঞানপন্থীরা বলবেন হয়ত : "কেমন ক'রে একে আপ্তবাক্য ব'লে মেনে নিই—যখন দেখি নানা মুনির নানা মত ?" এ-সংশয়ের উত্তরে শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব (যে কথা ডীন ইঞ্জ বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন তাঁর Liva Mystica শীর্ষক কাব্য সংকলনের ভূমিকায়) যে, মানস বুদ্ধি বা জ্ঞানের অরাজক রাজ্যে

হাজারো উল্টোপাল্টা বাণীর ঝড়ঝাপটা আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করলেও একটি অত্যাশ্চর্য সত্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর চোখে না প'ড়েই পারে না : যে, যাঁরা কোনমতে একবার "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" মন্ত্রের ডাকে সাধনবলে মনের আলো-আঁধারী এলাকা পার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মতভেদ নেই—তাঁরা সবাই একবাক্যে নিজের নিজের উপলব্ধির জবানিতে সাক্ষী দিয়েছেন যে, যোগ-সাধনায় ছায়াহীন আলোর নাগাল পাওয়া যায়, আর সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় যে সবাইকে ভালোবাসতে না পারলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। তাঁরা এই সঙ্গে আরো একটি তত্ত্বের দিশা দিয়েছেন : যে, সবাইকে ভালোবাসব বললেই ভালোবাসা যায় না—এ পারেন কেবল সেই মহাপুরুষেরা যাঁরা ভগবানকে ভালোবেসে তাঁর কাছ থেকে দৃষ্টিবর পেয়ে দেখতে পেরেছেন যে, সর্বভূতে তিনিই জন্ম নিয়েছেন শুধু প্রেমের লেনদেনে আনন্দলীলা করতে। তাই খাঁটি ধার্মিক সাধু-সন্তরা চিরদিনই গেয়ে এসেছেন যে, জীবের মধ্যে শিবকে দর্শন ক'রে "সর্বভূতহিতে রতাঃ" হ'তে না পারলে সর্বেশের আরাধনা সম্পন্ন হয় না। তাই তো ভাগবত ঘোষণা করেছেন।

তপ্যন্তে লোকতাপেন প্রায়শঃ সাধবো জনাঃ। (৮।৭।৪৪) :
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥

অর্থাৎ

অপরের তাপনিবৃত্তি তরে দুঃখ সহেন সাধুগণ :
সকলের হৃদে রাজেন যে-বিভু এই তো তাঁহার আরাধন।

ডীন ইঞ্জ মিথ্যা বলেন নি : এ শুধু আমাদের বেদ গীতা ভাগবতের রায় নয়—সর্বদেশে সর্বকালে জ্ঞানী ধ্যানী সাধকেরা সবাই এই উপলব্ধিকেই অঙ্গীকার করেছেন। আপনি যোগিকবি এ-ই ওরফে জর্জ রাসেলের অপরূপ মিসটিক কবিতা পড়েছেন কি? তাঁর একটি কবিতার চরণ আমার বিষণ্ণ মনকেও অনেক সময়েই প্রসন্ন করে তোলে।

When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of the world
For its tenderness

অর্থাৎ

অন্তরাত্মা যখন জাগে—সে হয় না তো আর স্বল্পসুখী :
করুণা-কোমল-আকিঞ্চনেই হয় সে নিখিলবিশ্বমুখী।

এ থেকে আমি দেখাতে চাইছি যে, মানস জ্ঞান-বুদ্ধির ওরফে অপরা বিদ্যার আলো-আঁধারী চৌহদ্দি পেরুতে না পেরুতে মানুষ সবদেশেই পেয়ে এসেছে আত্মবোধের (পরা বিদ্যার) সেই অদ্বিতীয় দিব্য দৃষ্টি যার আলোয় সে দেখতে পায় একটি মহাসত্য : যে, লৌকিক বুদ্ধি ও ঋদ্ধির প্রভূত প্রগতি হ'লেও তার বরে বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ হওয়া যায় না। সে-জন্যে চাই অন্তরাত্মার জ্যোতির্লোকে জেগে ওঠা। এ-জাগৃতি-সাধনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন তাঁরা কেউই মানস বুদ্ধির নির্দেশে চলেন নি, চলেছেন তত্ত্বজিজ্ঞাসার, ভক্তি-সাধনার, প্রেম তৃষ্ণার তাগিদে। এই শ্রেণীর দ্রষ্টা সাধুরাই চিরদিন জীবনের আঁধার গোলোকধাঁধায় আলোর পথ কেটে জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে এসে তূর্যস্বরে ঘোষণা করেছেন : "অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্" (শঙ্করাচার্য)। বাকি সবাই সংশয়াত্মা হয়ে অনৈশ্চিত্যের খাঁচায়ই থাকতে থাকতে আকাশকে ভুলে ভেবে বসেছেন যে, শুধু খাঁচাই সত্য—আকাশ কবিকল্পনা।

কিন্তু জীবন্মুক্তেরা প্রেমের বাণী ঘোষণা করলে হবে কি, নাস্তিক্যের আসুরিক মোহে প'ড়ে ও স্বাবলম্বী হওয়ার মিথ্যা গর্বে এযুগে একদল বস্তুতান্ত্রিক জননায়ক সাহেবি ঢঙে বলা সুরু করেছেন যে সাধু-সন্তের নির্দেশ পেয়ে বিশ্বমানবের দুঃখনিবৃত্তি হ'তেই পারে না, কেননা অধ্যাত্ম ধ্যান ধারণা সমাধিবাদে দু'চারজন অতীন্দ্রিয়বাদী শান্তি পেলেও সাড়ে পনের আনা অশান্ত সংসারীর আধিভৌতিক দুঃখ তাপ কোনোদিনই উপশান্ত হয় নি—কাজেই সাধুদেরকে ভ্রান্ত দিশারি বলে অর্ধচন্দ্র দেওয়াই পন্থা।

এ-দৃষ্টিভঙ্গি আত্মঘাতী কেন—বলি সংক্ষেপে।

সৃষ্টির অরুণোদয় থেকেই দেখা যায় যে, মানুষের বুদ্ধির একটু একটু ক'রেই বিকাশ হয়েছে—ধীরে ধীরেই তার চোখের ঠুলি খ'সেছে—অল্প অল্প ক'রেই সে এগিয়েছে চেতনার ক্রমবিকাশের পথে এবং এই বিকাশ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে যে স্বার্থকে ভালোবাসলেই সিদ্ধি আনন্দ হয় না—যে-অনুপাতে মানুষ পরার্থনিষ্ঠ হয় সেই অনুপাতেই সে পরমার্থের আলোয় স্থায়ী পরমানন্দের দিশা পায়।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রজ্ঞাচক্ষু আরো একটি বাস্তব সত্যের দেখা পায়ঃ যে, সাড়ে পনেরো আনা মানুষই বার বার ঠেকেও শেখে না মোহ তাকে পেয়ে বসে ব'লেই। তাই বার বার ভোগে উটের ম'ত কাঁটাঘাস খেয়ে—তবু ঐ কাঁটাঘাসই খায়—কাঁটাঘাসের আপাতঃ সুস্বাদের লোভে। অধর্মের ঢালুপথে পা বাড়িয়ে বারবারই ঠিকরে খড্ডায় পড়ে, তবু ঢালুপথে চলার আরাম তার মন টানে—চড়াই ওঠা কষ্ট—কাজেই সে বলে উঠে—কাজ নাই নেমেই আনন্দ করি—সাম্‌লে চললেই চলবে—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ি ধরা আর কি। এ-লোভের মোহ তাকে পেয়ে বসে কেন না অধর্মের কারবারে রাতারাতি প্রচুর মুনাফা আসে ব'লে সে ভাবে না যে শেষে হ'তেই হবে দেউলে। মহাভারতে এই কথাই বলেছেন মুনিঃ "অধর্মে নৈধতে তাবৎ—"কিনা অধর্মের পথে প্রথম দিকে হয় শ্রীবৃদ্ধি, কিন্তু শেষে সর্বনাশ "সমূলস্তু বিনশ্যতি"ঃ the wages of sin is death—বলেছে বাইবেলেও।

এই-যে মোহ মদ লোভ, এই যে সস্তা প্যাঁচে রাতারাতি রইস হবার কামনা—একে সর্বনাশা ব'লে চেনেন কাঁরা? না, যাঁরা খাঁটি সাধুসজ্জন, মুনিঋষি, জ্ঞানী ধ্যানী। কিন্তু তাঁরা ধর্মের পথনির্দেশ দেওয়ার পরেও যদি গড়পড়তা মানুষ লোভকেই প্রশ্রয় দিয়ে উন্মার্গগামী হয় তবে তাঁরা কি করবেন শুনি? সাধুরা সাধু ব'লেই গায়ের জোর খাটান না—কারণ গায়ের জোরে সবাইকে সাধু করতে চাইলে তাঁরা আর সাধুই থাকতেন না, হ'য়ে দাঁড়াতেন এক এক সেকেন্দর, সীজর, চেঙ্গিস খাঁ, লেনিন, হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন, মাওৎসে তুং। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life-Divine-এ ঠিকই লিখেছেনঃ " **Spirituality cannot be called upon to deal with life by a non-spiritual method or attempt to cure its ills by the panaceas, the political, social or other mechanical means which have always failed and will continue to fail to solve anything".**

অর্থাৎ, সংক্ষেপে, অধর্মের বড়ি দিয়ে মানুষের আধিব্যাধি সারানোর চেষ্টা বৃথা, একমাত্র ধর্মের পথেই অধর্মের অন্যায়ের অত্যাচারের নিবারণ হ'তে পারে। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-যুগে নাস্তিক্যের কুটিল মোহ নানা কুযুক্তি দিয়ে এই অসত্যকে সত্য ব'লে প্রচার ক'রে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে যে সুবিধাবাদ, চালাকি, ডিপ্লমাসি, দল, পার্টি, সত্যগোপন ও ভোটের জোরেই রাতারাতি রামরাজ্য আসবে। ফল হয়েছে এই যে, প্রতি দলই অট্টরবে হাঁকছেন: "আমার দলের এই যে মহান্ 'ইস্‌ম্' এরি নাম ধন্বন্তরি—সর্বরোগশোকতাপহরা—কাজেই যে-পাষণ্ড এ মহা পাঁচন সেবন করতে না চাইবে তাকে জোর ক'রে গেলাব, তাতে সে মরে মরুক।" কিন্তু মুস্কিল এই যে এ গা-জোয়ারি ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে প্রতিপক্ষের পাল্টা বিরুদ্ধ ঘোষণা—যার ফল হয় কুরুক্ষেত্র—চিরদিন এইই হয়ে এসেছে, কেবল এবারকার কুরুক্ষেত্র হবে অসভ্য তীরধনুক নিয়ে নয়, সভ্যতম আণবিক বোমা নিয়ে। এ-দলাদলি হানাহানির পথে বড় জোড় কোনো একটি দলের বা জাতির নাস্তিক-ঐহিক (secular) ভোগের উপকরণ জড়ো করা যেতে পারে, কিন্তু সে-ভোগ দেখতে দেখতে দুর্ভোগেই পর্যবসিত হয়: কেননা অধর্মের অপল্‌কা ভিৎ-এ কোনো স্থায়ী ভোগসৌধ গড়া অসম্ভব; ধর্মকে বাদ দিয়ে রকমারি জাঁকালো ইস্‌ম্-এর পথে মানুষ গড়তে পারে বড় জোড় পার্টি পুলিশের তথাকথিত মহাগণতন্ত্র একের পর এক পঞ্চবার্ষিকীর ডামাডোল, কেবল পারে না রামরাজ্য আনতে। মানুষকে লেকচার দিয়ে পরার্থব্রতী করা যায় না: অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকদের পায়ে-চলা পথে মানুষের মুক্তির স্বর্ণসরণি গ'ড়ে ওঠে না—সে-পথ গ'ড়ে উঠতে পারে শুধু বহু ধর্মযাত্রীর পদযাত্রার যোগফলে। এ-পথ আজো যে তেমন স্পষ্ট হ'য়ে গ'ড়ে ওঠেনি তার কারণ এ নয় যে, ধর্মের পথ খতিয়ে বিপথ, তার কারণ শুধু এই যে, যথেষ্ট উৎসাহী যাত্রী আজো একান্ত নিষ্ঠায় ধর্মের তীর্থপথকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ রাজপথ ব'লে বরণ করেনি—চেয়েছে স্বার্থের চোরাগলিতে গলাগলি ক'রে চোরাবাজারের কারবারী হ'তে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলতেন যে জগতের আজ এত দুঃখ দৈন্য এজন্যে নয় যে সাধুরা মানুষকে ভুল পথে চালাতে চেয়েছেন সে-পথকে

"ধর্ম" নাম দিয়ে, মানুষের দুঃখের মূলতঃ দুটি হেতু চোখে পড়েঃ এক, মহত্তম সাধুও সর্বশক্তিমান্ নন ; দুই, অগণ্য অসাধুর সংখ্যার পাশে যথার্থ সাধুরা সংখ্যায় নগণ্য।

জন্মাষ্টমীর দিনে এই কথাই আমি বলছিলাম কালঃ যে আমরা প্রত্যেকে ধর্মপথে চ'লে ধার্মিক হ'লে তবেই মানুষের চিরন্তন দুঃখনিবৃত্তি হ'তে পারে—আর কোনো পথে হানাহানি রূপান্তরিত হ'তে পারে না সৌভ্রাত্র্যে—হাজার হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই সিংহনাদ বা পঞ্চশীলের মনুসংহিতা রচনা করলেও না। যাঁরা এ-সব বিধান দেবেন সর্বাগ্রে তাঁদের হ'তে হবে নিঃস্বার্থ, মহান্, সাধু—নৈলে কেউ তাঁদের কথা শুনবে না—কারণ সাধুতাই হ'ল এই ভগবদ্দত্ত চাপরাশ—বলতেন না কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব ? এই হ'ল জন্মাষ্টমীরও পরমাবাণী—চিরন্তনী ঘোষণা :—ভয়ার্ত মানুষকে বরাভয়ের পথনির্দেশ দিতেই ঠাকুর যুগে যুগে জন্মান—বলেছিলেন দেবকী শিশু কৃষ্ণকে তাঁর জন্মদিনে :

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
তৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ (ভাগবত ১০।৩।২৭)

পশুধর্ম বরি' লভি মৃত্যুর দর্শন যবে—ধাই
দিকে দিকে ঘোর ভয়ে—পাই না তো অভয়ের দিশা :
বহুভাগ্যে যবে কেহ পায় তব শ্রীচরণে ঠাঁই
সেই শুধু নিরাপদ রাজে—কাটে তারি মোহ নিশা
অন্তরে তোমার জন্মবরি'। মৃত্যু শোক দুঃখ ভয়
পারে না ব্যথিতে তারে যে পেয়েছে তোমার আশ্রয়।

অথ সাধু মাহাত্মারা যে-পথের পথিক হ'য়ে অভী হ'য়ে পরমের বরাভয় ঘোষণা করেছেন সে-পথ ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। কংগ্রেসের পথে নয়, ঐহিক-নাস্তিক "ইস্‌ম্" কণ্টকিত সেকুলার মন্ত্রের পথে নয়, পঞ্চবার্ষিক বা শতবার্ষিক ধুম-ধড়াক্কার পথেও নয়—শুধু ধর্মের পথে, সত্যের পথে, ভক্তির পথে, প্রেমের পথে। পথ তো আমরা জানি,

কেবল—মনের অগোচর পাপ নেই—সে-পথে চলতে চাই না ব'লেই হাহাকার করি দুঃখযন্ত্রণায়—যদি অন্তরের শুভ-বুদ্ধির দিশায় চলতে চাইতাম, যদি প্রত্যেকে ঠাকুরের নির্দেশ মেনে হৃদয়ে বরণ করতাম সেই সর্বদুঃখতারকের জন্মাষ্টমী—তা'হলে এ পৃথিবী হ'ত আজ স্বর্গ। সেই একটি মাত্র পথ অমৃতলোকের, রামরাজ্যের—সে পথ পার্টির নয়, বুদ্ধিবাদের নয়, ডিপ্লোমাসির নয়, রাজনৈতিক সুবিধাবাদীর নয়, এমন কি বৈজ্ঞানিক বিদ্যুদ্দাম চর্কিবাজির বা ভোগবাদেরও নয়—সে পথ হ'ল সাধনার, দীনতার, ভেদবুদ্ধির নিরসনে পরার্থব্রত বরণের সনাতন রাজপথ। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—মুক্তির এই একটি বৈ দুটি পথ নেই।

আমাদের দেশকে বিবেকানন্দ সাধু-অধ্যুষিত "পুণ্যভূমি" আখ্যা দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবারই বলতেন যে, মুক্তিকামীকে সব আগে চাইতে হয় সাধু সঙ্গ। এ যুগে আমরা এ-ধরণের উচ্ছ্বাসে হাসি, বলি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাধুদের বড় করেছিলেন এক সেকেলে মনোবৃত্তির মোহে। এ-ধারণা সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে কাদের মধ্যে আপনি ভালো ক'রেই জানেন—তাদের নাম রাজনৈতিক—politician ; আজকের যুগে সবদেশেই রাজনৈতিকের দারুণ প্রতিপত্তি। ভোট পেয়ে রাজ্যশাসকদের অন্যতম হবার জন্যে এঁরা এমন কর্ম নেই যা করতে পিছপাও হন। এ-জাতীয় সংস্কারকেরা সমাজ-সংস্কার করবেন এ-আশা আজও (হায়রে !) অনেকেই করেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, যেহেতু ধার্মিকেরা দুর্বল, রাজনৈতিকরাই সবল, সেহেতু রাজনৈতিকের মুখর শক্তিধর দরবারেই অশক্ত মানুষের প্রগতি ও মুক্তির পত্তন হ'তে পারে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গভীর দৃষ্টি-প্রোজ্জ্বল এঁদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন উদ্ধৃত করলে এ-শ্রেণীর মনোবৃত্তির শোচনীয় অবস্থার খানিকটা আভাষ মিলবে ব'লে কিছু উদ্ধৃত করলামই বা। তিনি লিখছেন :

"আধুনিক রাজনৈতিকেরা আমাদের জাতীয় অন্তরাত্মা বা অভীপ্সার প্রতিনিধি নয়। তারা প্রতিনিধি হ'তে পারে কেবল আমাদের সার্বজনীন ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা অহমিকা আত্মবঞ্চনা অক্ষমতা আচারপ্রিয়তা ভীরুতা

ও তানের। তারা বারবারই মহতী সমস্যার মুখোমুখি হয় বটে, কিন্তু তাদের সমাধান করে না মহাজনের মতন। তারা শুধু কপচায় বড় বড় বুলি, কিন্তু সেসবই পর্যবসিত হয় এক একটি পার্টির হাঁকডাকে। আজকের দিনে সবারই চোখে পড়েছে নিখিলবিশ্ব রাজনীতির এ-মিথ্যাচার ও অসুস্থতা। এ-ব্যাপক রোগ স্থায়ী হচ্ছে শুধু এই জন্মে যে, আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতন রাজনৈতিকদের বুলিতে সায় দিয়ে তাদের সভ্যভব্য দাঁড় করাচ্ছি। মানুষ যাতেই অভ্যস্থ হয় তা-ই তার গা-সওয়া হ'য়ে আসে—এই জন্মেই রাজনৈতিকদের প্রতিপত্তি আজো টিঁকে আছে।"

ব'লে মহামতি দ্রষ্টা সখেদে লিখছেন: "তবু এরাই আজো ঠিক করে কিসে সবার মঙ্গল হবে, আমরা এদেরই গড়া যন্ত্রকে রাষ্ট্র নাম দিয়ে তার পায়ে সর্বৈব ক্রিয়াকর্মসাধনাকে বলি দিয়ে চলেছি দিনের পর দিন।"

(He the modern politician) does not represent the soul of a people or its aspirations. What he does usually represent is all the average pettiness, selfishness, egoism, self-deception that is about him and these he represents well enough as well as a great deal of mental incompetence and moral conventionality, timidity and pretence. Great issues often come to him for decision but he does not deal with them greatly; high words and noble ideas are on his lips, but they rapidly become the claptrap of a party. The disease and falsehood of modern political life is patent in every country of the world and only the hypnotised acquiescence of all—even of the intellectual classes—in the great organised sham, cloaks and prolongs the malady, the acquiescence that men yield to everything that is habitual and makes the present atmosphere of their lives. Yet it is by such minds that the good of all has to be decided, to such hands that it has to be entrusted, to such an agency calling itself the State that the individual is being more and more called upon to give up the Government of his activities."

(THE IDEAL OF HUMAN UNITY.. CHAPTER IV...Sri Aurobindo)

এর ফল কী হয়েছে ব'লে বোঝাবার কি প্রয়োজন আছে আজকের দিন দুনিয়ার বিষবাষ্পে হাঁপিয়ে ওঠার পরেও? একেই কি গীতা নাম দেন নি "ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান?" আর এর অন্য কোন প্রতিকার

আছে কি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে দুর্জনহন্তা ও সজ্জনতারক চক্রধরের অবতরণের আবাহন করা ছাড়া—যাঁর বরে এ-লক্ষচ্যুতিভরা জগতেও যুগে যুগে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে যদিও মানুষের ব্যাপক স্বার্থপরতার ভূমিকম্পে বরাবরই ধ্বসে পড়েছে? সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, শুধু আমাদের হৃদয়েই নয়, বাইরেও তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষের নিরাশার পরম দুর্লগ্নে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আবার অবতীর্ণ হবেন। কেবল আমাদের তাঁকে ডাকতে হবে, চাইতে হবে তাঁর শরণ।

এরই নাম জন্মাষ্টমীর সাধনা-- আবাহন।

পরা বনাম অপরা বিদ্যা

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা—১৬

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

শ্রদ্ধাপ্রীতিভাজনেষু

আপনার স্মারক গ্রন্থ তরশু পেয়ে সব প্রবন্ধ না হোক অনেকগুলিই এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেলেছি, বাকিগুলিও ধীরে ধীরে পড়ব—অবশ্য যেগুলি অত্যধিক বিজ্ঞানিক সেগুলি বাদে। বেশি বৈজ্ঞানিকতায় আমি পড়ি একটু অথই জলে—কাজেই এ-ক্রটি আপনি মার্জনা করবেন এ ভরসা রাখি, যেহেতু আপনি স্বভাবে দরদী তথা ক্ষমাশীল।

পড়তে পড়তে কেবলই ব'লে উঠেছি : এ কী? ইনি এত বড় প্রবীণ, সুধী, মনস্বী, কর্মী—আরো কত কী যেসব গুণের আমি নিশ্চয়ই খবর রাখি না—অথচ এহেন মনীষী মাদৃশ অন্ধবিশ্বাসীকে তাঁর স্নেহ প্রীতি দান করেছেন! এ কী ক'রে সম্ভব হ'ল? তারপরেই উত্তর এল—এরই তো নাম মহানুভব।

না, এ ঠাট্টা নয়। স্মারক গ্রন্থটি প'ড়ে আপনাকে যেন আরো ভালোবেসে ফেলেছি, বিশ্বাস করুন। অবশ্য আপনার বুদ্ধিমত্তা, কমনীয় স্বভাব ও নানা গুণ আমার মতন অন্ধ ধর্মপন্থীরও চোখে পড়েছে (এও এক কম আশ্চর্য নয়, কারণ নানা বৈজ্ঞানিকের আত্মম্ভরিতা আমার কাছে ক্ষুদ্রমনাকের আত্মম্ভরিতার চেয়ে কিছু কম হসনীয় মনে হয় না। পুনরায় ক্ষন্তব্য!) কিন্তু আপনি যে অল্প বয়সেই একটি চোখ হারিয়েও একশত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আরো নানা কাজ ক'রে ফেলেছেন—ভাবতে সত্যিই বলতে ইচ্ছা হয়: "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে!"

আপনি আপনার শেষ পত্রে লিখেছেন : "নানা কাজ যেন নাগপাশের মতন বেঁধে রাখতে চায় তাদের আবেষ্টনে।" বললে হয়ত বিশ্বাস

করবেন না, কিন্তু এখানে ভবাদৃশ বলিষ্ঠ বুদ্ধিবাদীর সঙ্গে সাদৃশ অসহায় অন্ধবিশ্বাসীরও যেন একটা মিল মতন আছে ঃ আমিও কাজের পাকে জড়িয়ে আছি প্রায় সত্তরের কোটায় পৌছনো সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের "মৃত্যুর পরে" কবিতাটি আমার বড প্রিয়। তাতে একটি শ্লোক আছে বড় চমৎকার ঃ

আয়ু যার এতটুকু এতদুঃখ এত সুখ কেন তার মাঝে ?
অকস্মাৎ এ-সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তারে শত লক্ষ কাজে ?

এ-সূত্রে একটা মনের খেদ প্রকাশ ক'রেই ফেলি। আমার খুব সাধ হয়— রাতদিন ব'সে জপতপ করি। কিছু জপতপ করি বৈ কি, নৈলে মান থাকবে কেন ? কিন্তু "কর্মের নাগপাশ" আমিও কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। পারলে হয়ত "অলখ নিরঞ্জন"—এর আর একটু গভীর দিশা পেতাম। কিন্তু দেখছি বারবারই যে, অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে দিয়েও এক ধরণের চিত্ত প্রসাদ পাই যাকে বেশ চেখে চেখে উপভোগ করা যায়। এক আরব যোগীর কথা বারবারই আমার মনে দোলা দেয় ঃ "Work is love made visible." কী চমৎকার বাণী, নয় ? কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার একাধিক যোগী বন্ধু এজন্যে আমাকে কী যে ধমকান কী বলব ? কিন্তু হায়রে, অত্র গীতাই যে তাঁর বিপক্ষে: "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি" ব'লে ঠাকুর সাফাই গান নি কি আমার এই কর্মমুখী প্রকৃতির ? তবে আমার একটা সুবিধা ছিল যা আপনার হয়ত ছিল না— আমাকে "জীবিকার জন্যে" কখনো কোনো কর্ম করতে হয় নি। করলে হয়ত তাতেও কিছু চিত্ত প্রসাদ পেতাম—জানি না, কিন্তু পিতৃদেব (যাঁর অন্ন চিন্তা ছিল ষোলো আনাই) লিখেছেন মন্ত্র-কাব্যে তাঁর "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় (এটিও আমার একটি প্রিয় কবিতা) ঃ

"হায়, শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত ও অন্ততঃ
দিবার ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত !"

আমি ভগবানের নানা করুণার স্বাদ পেয়েছি (সে কথায় ভবাদৃশ মনীষীরা বিষম রাগ ক'রে বলে থাকেন ঃ "মানি না—কারণ করুণার ভর অন্ধ বিশ্বাসে, যিনি বুদ্ধি গ্রাহ্যও নয়, সুতরাং এ হেন অতীন্দ্রিয় অ-পদার্থ

নামঞ্জুর”) কিন্তু তার মধ্যে এই করুণাটির বদান্যতায় কত যে লাভ করেছি কী বলব—যে, আজ পর্যন্ত দিবার একটি ঘণ্টাও আমাকে কোনদিন পর দাস্য করতে হয়নি। খৃষ্টদেব সঘনেই শাসিয়েছেন: “ললাটে স্বেদ ঝরিয়ে অন্নসংস্থান করবে” আমি ললাটে স্বেদ ঝরিয়েছিও অজস্র, কিন্তু অন্নসংস্থান করতে নয়—গান বাঁধতে, গল্প গাঁথতে, সুর রচতে, চিঠি লিখতে, ভাষণ দিতে, ভবঘুরে হ'তে সবশেষে (Last but not least) জপ তপ করতে। এর মধ্যে শুধু জপ তপ ছাড়া আর সব কাজেই আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। জপ তপে কিছুই পাই নি বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু মন কেমন যেন তেমন বসে নি যেমন বসেছে বরাবরই সাহিত্য, সঙ্গীত ও শাস্ত্র চর্চায়। এর চারা কী আজও ভেবে পাই নি। তবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি এই ব'লে যে, কর্মের বাজারে বুদ্ধির অতীত ভগবৎ কৃপাকে খাটিয়ে যখন খানিকটা অন্ততঃ চিত্ত প্রসাদের মুনফা অন্তরের সিন্দুকে জমা করতে পেরেছি তখন বলা চলে না—এ কর্মের সঙ্গে জপতপের কোনো মিলই থাকতে পারে না। গীতা এখানেও আমাকে ভরসা দিয়েছে কম নয়—বারবার বলেছে—তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত “সমস্ত কর্মই” যোগ সাধনার পর্যায়েই পড়ে, কাজেই পৌঁছে দিতে পারে বৈ কি “পদং শাশ্বতম্ অব্যয়ম্”-এর দোর গোড়ায়। * সে-শাশ্বত তোরণে এখনো পৌঁছই নি—তবে তার কারণও তো স্পষ্ট: কর্ম আমার তো এখনো পুরোপুরি নিষ্কাম হয় নি, কাজেই যোগার্ঘ্য হ'য়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আশা হ'ল মরিয়া না মরে রাম—বলে: একদিন হবেই হবে যদি খাঁটি অন্ধবিশ্বাসে চোখের জলে গলা ছেড়ে গাইতে পারি কবিগুরুর দোয়ার দিয়ে:

“নিশি দিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ ক'রে থাকিস, সে-পণ তোমার রবেই রবে।
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস, সে দুঃখ তোর সবেই সবে।”

---

* সর্বকর্মাণ্যাপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাৎ অবাপ্নোতি পদং শাশ্বতম ব্যয়ম॥ (গীতা)
সর্বকর্মাণ্যপি-র অপি জোর টুকু লক্ষণীয়

এইখানেই ভবাদৃশ দরদী বন্ধুর কাছে করজোড়ে নিবেদন করতেই হচ্ছে আমাকে যে, "অন্ধ বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ দিশারি—মানস বুদ্ধি নয়।" পরমহংসদেবের নজির আছে, বিবেকানন্দকে তিনি বলেছিলেন বড় গলা করেই: "ওরে, অন্ধবিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস ব'লে তেতে উঠিস কেন? বিশ্বাস মাত্রই তো অন্ধ।" সব তত্ত্বদর্শীরই এই এক রায়: ঘরোয়া ভাষায়—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" বৈদিক ভাষায়—"অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যম্ অণুপ্রমাণাৎ"—সূক্ষ্মতম বুদ্ধির চেয়েও তিনি সূক্ষ্ম—তাই না জগৎ চিররহস্যময়। বুদ্ধির অনুবীণে সব কিছু দেখা গেলে রহস্য—mystery—এমন চিরন্তন হ'ত কি অন্তরে বাহিরে?

তবু বুদ্ধির মায়া কেটেও কাটে না। সে রুখে উঠেই বলেই বলে: "আগে বুঝব জানব তবে মানব।" কিন্তু এর উত্তরে পরম ভাগবতেরা সবাই মৃদু হেসে বলেন: "ছেলেমানুষি করিস নি রে। আগে না মানলে বুঝবার কিনারায়ই আসতে পারবিনে, জানা তো দূরের কথা।" এর মানে নয় যে, ভাগবত সত্য সবই ধ'রে নেওয়া প্রতিজ্ঞা, হাইপথেসিস। এর মানে এই যে, বিশ্বাসকে বরণ ক'রে এগুলে তবেই verifiable সত্যের নাগাল মেলে। নৈলে "আগে জানব তবে মানব" এই বিজ্ঞানিক গোঁ-র পথে এগুলে অপরা বিদ্যা আয়ত্ত করা গেলেও পরা বিদ্যাকে কস্মিন্‌কালেও জানা যায় না। অর্থাৎ বাহ্য তথ্য ও আন্তর তত্ত্বে প্রবেশের পথ ও পদ্ধতি দুইই আলাদা। সুতরাং এই খানেই অমিল বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের। বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানা হয় জানার পরে, পরমার্থিক তথ্যকে জানা যায় মানার পরে। এক কথায়, বুদ্ধির উগ্র অভিমান না ছাড়লে যাকে আপনি বুদ্ধিগ্রাহ্য ব'লে দাবি করছেন তারও হদিশ মেলে না—বুদ্ধির অতীত অতর্ক্য বোধির তো কথাই নেই। তবে আপনার একথা মানি যে, "মনের ঊর্ধ্ব স্তরের যে সব অভিজ্ঞতা তাদের আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার মধ্যে টেনে আনতে না পারলেও বুদ্ধি যোগে তাদের কিছু আভাস পেতে পারি।"

একশোবার। কিন্তু আভাস পাওয়া ও মগ্ন হওয়া, খবর পাওয়া ও প্লাবিত হওয়া, চকিত দর্শন ও পূর্ণ স্থিতি এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। উপমা সম্রাট পরমহংসদেবের উপমা স্মরণ করুণ "কেউ দুধ

শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।" শুনলে বা দেখলে মান থাকতে পারে কিন্তু কেবল খেলে তবেই প্রাণ বাঁচবে। এই ঔপানিষদিক উপলব্ধিটি (যস্যামতং তস্যমতং, অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ ইত্যাদি) রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ক'রে ফুটিয়েছেন তাঁর অনুপম ভাষায় ("পাওয়া ও না পাওয়া"—শান্তিনিকেতন)।

"আমরা জগতে পাওয়ার ম'ত পাওয়া তাকেই বলি যার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে।···আমি তাঁকে জানতে পারলুম না, এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন ক'রে জানে 'আমি আকাশ পার হতে পারলুম্ না,' তেমনি ক'রে জানা চাই।"

এই সূত্রে আমার একটি কথা প্রায়ই মনে হয়, কিছু মনে করবেন না। কথাটা এই যে, বৈজ্ঞানিকের গাণিতিক জানা আর কবি নবী ঋষি দ্রষ্টার অনুভবে জানা এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমিন। বৈজ্ঞানিক জানেন তথ্য—কোনো কিছুর আচরণ। কবি নবীরা জানেন তার আদিম সত্তা ওরফে রসস্বরূপ—যাকে পরমহংসদেব বলতেন "বোধে বোধ করা।" এই শ্রেণীর উপলব্ধিকেই চেয়েছেন যোগী ঋষি বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু। এ-বোধকে জানা গেলেও ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না—ঠিক কী গোচর হ'ল। এতেই আপনারা রাগ করেন, বলেন "এ রি তো নাম ঝাপসামি, হেঁয়ালিপনা, ধূম্রবিলাস—obscurantism। আমরা তাকেই বলি সত্য যার objectivity আছে, যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়, যার পরিসংখ্যান—Statistics—ক'রে ছক কাটা যায়।" অন্ততঃ একথা শতাধিক বৎসর আগেও বিজ্ঞানিকরা বলতেন। কিন্তু হরি হরি! আজ কী দেখতে পাই? ম্যাটার ম্যাটার ক'রে যাকে বলা হ'ত আমাদের পায়ের নিচের ভিৎ সে-ও কি না আমাদের পথে বসালো—হ'য়ে গেল ছায়াময়! রাসেল সাশ্রুনেত্রে বলছেন—"আজকের দিনে ইলেকট্রনকে বলা চলে ভূতুড়ে (ghost like)—অর্থাৎ যার নাম থাকলেও—অর্থাৎ প্রকৃতির খবর কিছু মিললেও—সত্তার খোঁজ পাওয়া ভার! হেনরি ফোর্ড বলতেন: "বিদ্যুৎ দিয়ে কী কী অসাধ্য সাধন করা যায় আমি জানি। কিন্তু বিদ্যুৎ কী বস্তু ভাবতে গেলেই পড়ি অথই জলে।" আপনারা, বিজ্ঞানিকরা, অসাধ্য-সাধন করেছেন অজস্র—কিন্তু কেবল বিদ্যুতের ক্রিয়াকলাপের খবর

পেয়ে। সত্তার নাগাল পেয়ে নয়। অথচ পরম সত্তার এই নাগাল না পেলে (যোগীদের মতে) পরা বিদ্যার খবর মেলে না, প্রজ্ঞার কোঠায় পৌঁছনো যায় না—to know It *per se*—"তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বম্ অসি শ্বেত কেতো" তাকে জানলে তবেই হবে সত্যলাভ, আত্মবোধ। এই প্রজ্ঞাকেই পরমহংসদেব বলেছেন "বোধে বোধ করা", শ্রীঅরবিন্দ নাম দিয়েছেন "knowledge by identity", ঋষিদের পারিভাষিক—"নির্বিকল্প সমাধি" গীতাকারের ঃ ব্রাহ্মী স্থিতি, বুদ্ধ—নির্বাণ। এ প্রজ্ঞার ঈষৎ আভাষ মাত্র পাওয়া যায় বুদ্ধির দূরবীনে, কারণ এর মধ্যে লীন হ'তে হ'লে যে-সাধনা আবশ্যিক সে বুদ্ধির সাধনা নয়—অজানা আত্মাকে জানার সাধনা অহংবুদ্ধির পূর্ণবিলোপে।

এখানে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনারা, বৈজ্ঞানিকেরা, আশ্চর্য অধ্যবসায়ে বস্তুবিশ্বের নানা তথ্য যেভাবে সংগ্রহ করেছেন ও সে-সব তথ্যকে যেভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের নানাবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্যবিলাস, অবসর বিনোদন, চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছেন তার যথেষ্ট মূল্য আছে একথা কে না মানবে? আমার বলবার কথা এই যে, এই তথ্য-জ্ঞান ও বস্তুবিশ্লেষণের কীর্তিকে সর্বেসর্বা ক'রে মানুষের নৈতিক, শৈল্পিক—সর্বোপরি আত্মিক জিজ্ঞাসাকে ছোট করার যে-প্রকৃতি বস্তুতান্ত্রিকদের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে তার ফল বিষময়। অপরা বিদ্যার কার্য্যকরিতা অকাট্য, কিন্তু কেবল অপরাবিদ্যায় মানুষের আত্মা শান্তি পায় না, জীবন সে-আশ্রয় পায় না যে আশ্রয় পায় সে পরাবিদ্যার মহলে—হৃদয়বৃত্তির বিকাশে। প্রেমের উপলব্ধিতে, অথবা প্রেরণার আলোয়, মনের প্রাণের নানা অবসাদ ও নিরাশার নিরাকরণে। তাই বুদ্ধি বুদ্ধি ক'রে বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার চেয়ে একটু তদন্ত করা ভালো—বুদ্ধির চর্চায় মানুষ কী কী পেয়েছে, যা যা পেয়েছে তাতে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে কি না—সর্বোপরি, বাক্, মন, চক্ষু যে পরমতত্ত্বের নাগাল পায় না * তাকে কোনো উপায়ে হাতের কাছে পাওয়া যায় কি না যাতে ক'রে তার ছোঁওয়ায় মনের গ্লানি কাটে, প্রাণের আঁধার ঘোচে। পরাবিদ্যার জিজ্ঞাসা ঃ এই জগতের হাজারো নীরসতার মধ্যে দিয়ে "রসানাং রসতমের" মিলন মর্ত্য দেহেই

* ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি, নো মনঃ (কেনোপনিষদ্)

সম্ভব কি না। কারণ এ-জিজ্ঞাসা যদি লুপ্ত হয় তবে "বুদ্ধি গ্রাহ্য" হাজারো তত্ত্বের খবর পেয়েও মানুষ অমৃত হবে না। মনে রাখবেন মানুষের আত্মার চিরন্তন জিজ্ঞাসা : "যে নাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ?" খৃষ্টের ভাষায় : "নিখিল জগতের রাজা হ'য়ে আমার কী হবে যদি আত্মার রাজসিংহাসন হারাই ?"

তাই শেষ কথা এই যে, এই প্রেমের পথে চললে তবেই অমৃত হওয়া যায়, বস্তুবিজ্ঞানের পথে মেলে ধনমান যশের ক্ষণসুখ যার উল্টো পিঠে অতৃপ্তি। বস্তুবিজ্ঞান মানুষকে ধারণ করবে যেমন অন্ন মানুষকে ধারণ করে। কিন্তু যেমন বলা যায় : man does not live by bread alone তেমনিই বলা যায় man can not live by Science alone এখানে alone বিশেষণটি লক্ষ্যণীয়, কারণ এর জন্য—অন্নও চাই বস্তুবিজ্ঞানও চাই। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কিছু চাই যা না পেলেই নয়—যার জন্যে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাজনেরা বরণ করেছেন অজানার অভিসার। অচিনের তীর্থযাত্রা ধর্মের পরম নির্দেশকে মেনে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি সাহেবের একটি গভীরদর্শী বই পড়েছিলাম সম্প্রতি : AN HISTORIAN'S APPROACH TO RELIGION ; বইটিতে নানা স্থানেই বিজ্ঞান ও টেকনলজির অজস্র স্তবস্তুতি করার পরেও সাহেব সদীর্ঘশ্বাসে অঙ্গীকার করেছেন :

"Man's goal is to Seek communion with the Presence behind the Phenomena, and to seek it with the aim of bringing his self into harmony with this absolute spiritual reality."

(Essence and Nonesentials in Religion. P. 273)

এই মিলন বা সঙ্গম হয় প্রেম সাধনার পথে, "একভক্তি জ্ঞানের" পথে, * বুদ্ধি সাধনার পথে নয়—তত্ত্বদর্শীরা এই একই রায় দিয়েছেন যুগে যুগে দেশে দেশে। কিন্তু বিজ্ঞান যে প্রায়ই এই রায়কে বুদ্ধির জেরায় অপদস্থ করতে চেষ্টা করে একথা বোধহয় আপনিও অস্বীকার করবেন না।

* তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোত্যর্থম্ অহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ গীতা, ৭।১৬,

অর্থাৎ আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী এই চার'শ্রেণীর সাধকের মধ্যে' ঐকান্তিক ভক্তিমান জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ : তিনিও আমার প্রিয় আমিও তাঁর প্রিয়।

আমাদের, মানে ধর্মপন্থীদের, আপত্তি এইখানেই। কারণ এরই নাম আত্মহত্যা, বুদ্ধির ঠিকে ভুল।

মরুক গে। বুদ্ধি বনাম বিশ্বাস এ-বিতণ্ডা আজকের নয়। আমি এ-তর্কের কোনো চরম নিষ্পত্তি করবারও দুরাশা পোষণ করি না। আমার ভালো লাগে—ভবাদৃশ আন্তরিক জিজ্ঞাসুর বৈজ্ঞানিক ঢঙে সত্য খুঁজবার প্রযত্ন। কারণ এ-সাধনায় আপনি সত্যের যেটুকু দিশা পেয়েছেন (বা পেয়েছেন ব'লে জেনেছেন) তাতে শুধু যে আপনার লাভ তাই নয়, আপনার কাছ থেকে আমাদেরও লাভ করবার আছে। আপনি পুণায় এলে আপনাকে নানা প্রশ্ন ক'রে অনেক কিছু শিখতাম—বিজ্ঞানের পথে অন্তরের দিকে মানুষ কতখানি সম্পদ পেয়েছে তার খবর নিতাম। বাইরের দিকে বিজ্ঞান যে অজস্র দিয়েছে—কে অস্বীকার করবে বলুন? কিন্তু হয়েছে কি জানেন? আমাদের মন বলে: মানুষ মনের সমৃদ্ধি বা বাহ্য ঐশ্বর্যেই পরম তৃপ্তি পায় না যদি না সব আগে পায় (দেহ সুখের সঙ্গে) প্রাণের তৃপ্তি, আর্য পরিভাষায়—অন্তর্জ্যোতি, অন্তরারাম। টয়েনবিও একথা স্বীকার করেন বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের অজস্র গুণগান করা সত্বেও। কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত দেখতে পাই নি—বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষ আন্তর সম্পদে প্রেমের ঐশ্বর্য কী পেয়েছে। দেখতে পাই শুধুই তার বাইরের চাকচিক্য ও হাঁক ডাক। এমন কি যদি চেপে ধরেন তবে এমন কথাও আমি সম্ভব ব'লে মানতে রাজী যে, কোনোদিন সত্যিই বৈজ্ঞানিক রথে চ'ড়ে আপনি আমি চাঁদের বাগানে সোমরস পান ক'রে বুঁদ হ'য়ে ফিরব আমার পৃথিবীর হাটবাজারে। কিন্তু ফিরে নেশা ভাঙলে দেখব কি? দেখব—মানুষ ঠিক তেমনিই ক্ষুদ্রমনা, অহঙ্কারী, আত্মকেন্দ্রিক, শক্তিলোভী, ক্রোধন, কামুক ও অসহিষ্ণু রয়েছে। মানুষ যতদিন তার মানবিক কোঠায় "প্রাণী"-মাত্র থাকবে ততদিন সে দশটা গ্রহে ঘুরে এলেও তেম্‌নি অসুখী অশান্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধই থাকবে যেমন সে আজ আছে। একমাত্র প্রেমের পরশমণির ছোঁয়াচেই তার জৈবিক কুমতির খাদ দিব্য সুমতির সোনায় রূপান্তরিত হ'তে পারে। কিন্তু এ-সাধনা তো বিজ্ঞানের নয়, তাই বিজ্ঞান দেবতাকে আমি সমীহ করলেও "ওঁ আয়াহি বরদে দেবি" ব'লে উপাসনা করতে নারাজ। কারণ শুধু বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু ধরাছোঁয়া

যায় কেবল তারই প্রসাদে আমরা অমৃত হব এ ভাবাই যায় না। গীতার বাণী আমার মন নিয়েছে যে, "দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, নিবন্ধায়াসুরী মতা।" যে দৈবী সম্পদ আমাদের মন প্রাণকে মাটির বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে কেবল সেই আমাদের সত্যি সত্যি মাটির রাজা করবে।—জলে স্থলে আকাশে রথ চালিয়ে যে-সুখ তৃপ্তি সে সসীম, কাজেই খতিয়ে অতৃপ্তিকর। "নাল্পে সুখমস্তি" এইই হ'ল আত্মার শেষ আবিষ্কার—finding আর পার্থিব রাজ্যের সমৃদ্ধি বিপুলকায় হ'লেও শেষ পর্যন্ত অল্পই থাকবে আন্তর সাধনা লভ্য প্রেম শান্তি পরমানন্দের তুলনায়। হোক গে, তবু আপনারা, বৈজ্ঞানিকেরা, আজ মানুষকে ধ্বংসের কিনারায় টেনে আনলেও গতকাল পর্যন্ত তো সত্যিই ভেবেছিলেন ও হাঁক দিয়েছিলেন: "তিষ্ঠ! মুক্তির স্বর্গ আনলাম ব'লে।" কিন্তু পরম মুক্তির চরম দিশারি তো ঐন্দ্রজালিক টেকনলজি বা বৈজ্ঞানিক বস্তু বিশ্লেষণ নয়, সে হ'ল আত্মজিজ্ঞাসা, উপনিষদের ভাষায়—আবৃত্ত চক্ষুর সাধনা, চলতি ভাষায়—অন্তর্মুখিতা। বিজ্ঞান স্বভাবে বহির্মুখী—এতে দোষের কিছুই নেই, কারণ এইই ওর স্বধর্ম, এবং স্বধর্মে কায়েম থাকাই শুভ। যে যা পারে না তা তার সাধনা হ'তে পারে না, কেন না তার স্বভাব চায় সার্থক হ'তে অন্য সিদ্ধির পথে। এরই নাম ডিভিশন অফ লেবার বা মতির বৈচিত্র্য যাই বলুন। তাই বৈজ্ঞানিককে অভিনন্দন করি আমরা মনে প্রাণেই। কেবল দুঃখ এই যে, তাঁরা নাস্তিক্যকেই "সত্যস্য সত্যম্" মেনেছেন ব'লে যাঁকে সব আগে না মানলে জানার ম'ত জানার উপায় নেই তাঁর দেখা পান নি। তবে বৈজ্ঞানিকেরা তো তাঁর দেখা পেতে চানও না, বলেন; "ও-অচিন আমাদের তদন্তের এলাকায় পড়েন না, কাজেই ওঁর থাকা না থাকা আমাদের কাছে সমান।" তথাস্তু বলতাম কিন্তু বলতে পারছি না এই জন্যে যে, আমাদের মন বলে—একদিন আপনাদেরও জানতে চাইতে হবে—যাঁকে না জানলে কোনো কিছুরই missing link মিলতে পারে না, আপেক্ষিক (relative) জ্ঞানের কোঠা ছাড়িয়ে অদ্বয় (absolute) জ্ঞানের অলোকলোকের খবর পাওয়া যায় না। সেদিন হয়ত আপনাদের ফুটবে শিবনেত্র—বৈজ্ঞানিক আণবিক মহাপ্রলয়ের পরে, কে বলতে পারে? তবে যতদিন এ-ভূলোকে আছি ততদিন আমরা

চাইবই চাইব—যেন বৈজ্ঞানিকী কৃত্যা তার আগুনে আমাদের অন্য সব চর্চার আপৎশান্তি ক'রে সর্বসমস্যার নিষ্পত্তি না আনে। এ প্রার্থনায় অন্ততঃ আপনিও সাড়া দেবেন এ-ভরসা রাখি।

আপনার স্মারক গ্রন্থে আপনার সম্বন্ধে নানা গুণগ্রাহীর নানা উচ্ছ্বাসেই আমার হৃদয় সাড়া দিয়েছে। আপনার বিবেকিতা, ন্যায়-পরতা, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সহিষ্ণুতা, আরও কত গুণের কথাই না লিখেছেন তাঁরা। আমিও এসব গুণের কিছু কিছু খবর পেয়েছি, তাই আরো মন খুশী হয়েছে ভাবতে যে, খাঁটি গুণীর কাছে যে আমরা অনেক কিছুই পাই এটুকু অন্ততঃ এ-অশান্তির যুগেও মানুষ মানতে বাধ্য হয়েছে। আপনার একটি গুণ বিশেষ ক'রেই আমাদের মন টেনেছে: যে, আপনি যাকে সন্দেহ করেন (যথা অঘটন বা বুদ্ধির অতীত অনুভবকে) তাকেও হেনস্থা করেন না। করলে হয়ত আপনাকে আমাদের এত আপনার লোক মনে হ'ত না, আপনাকে বলতামও না এত মনের কথা মুখ হল্‌সা ঢঙে।

কলকাতায় এবার যাওয়া হ'ল না ইন্দিরার হাঁপানি অত্যন্ত বেড়েছে ব'লে। বম্বেতে স্পেশালিষ্ট দেখে খুব ভরসা দিলেন না। তাই চিন্তিত আছি। তবে এ-ও তাঁর করুণারই খেলা, কে জানে—হয়ত এই নিদারুণ দেহ দুঃখের পথেই—পাব তাঁর কৃপালীলার অন্দর মহলের খবর যা এখনো পাইনি আমি। ইন্দিরা হয়ত পেয়েছে কিছু, বলতে পারি না—তবে ওর চিত্তপ্রসাদ দেখে মনে হয় ওর অন্তর বেশ একটু ঊর্ধ্বাকাশেই বিহার করে। নৈলে এত দুঃখের মধ্যেও এত সহজে সেদিন লিখতে পারত না যা লিখেছে। পাঠালাম আপনার দরদী মনের ভালো লাগবে ভেবেই। আমাদের আশীর্বাদ করবেন যেন ভাবের ঘরে চুরি না করি সস্তা লাভের লোভে। আমাদের ভালোবাসা নেবেন। ইন্দিরা কাল আপনার বইটির পাতা উল্টোতে উল্টোতে আপনার সম্বন্ধে বলল: "চমৎকার মানুষ, জানেন অনেক কিছুই, তাই এত নম্র, জিজ্ঞাসু"—এই জাতীয় মন্তব্য। আমি জুড়ে দেই; "এবং মানেন অনেক কিছু যা জানাতে চান না—আমার মতন মুখ হলসা ঢঙে।"

ইতি। ভবদীয় স্নেহাশ্রিত দিলীপ

বিশ্বজয় ও আত্মবোধ

ওঁ

"জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন।"
বিশ্বজয়ী কে? আত্মজয়ী যে।
—শঙ্করাচার্য

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুণা

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বরেষু

আপনার চমৎকার পত্রটি পেয়ে "হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ।" হর্ষের একটি কারণ আপনার প্রাঞ্জল ভাষা। দুই: আপনার চিন্তা ছত্রে ছত্রে ভাবোদ্দীপক (suggestive)—তা থেকে আমি সত্যিই অনেক কিছু শিখি। তিন: ভাবতে ভালো লাগে যে, মাদৃশ সেকেলেপন্থীকেও ভবাদৃশ বৈজ্ঞানিক প্রীতির মাল্যদানে ধন্য করেছেন। কিন্তু আপনি কেন লিখলেন: "আপনার মতন ভাষার উপর দখল ও প্রকাশের ক্ষমতা থাকলে আপনার পত্রের উত্তরে আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারতাম!" ভাষার উপর আপনার দখল-এ আমি বিস্মিত হয়েছি ব'লেই এ-কুটিল সংশয় আমার মনে উঁকি দিচ্ছে: "Thou, too Brutus!" অর্থাৎ আপনিও কিনা "প্রশস্তির জন্যে চার ফেলছেন!" না, এ কথার কথা নয়—আপনার পত্রের ভাষা এত সরল ও প্রকাশক্ষম যে মনে হয় আপনি সাহিত্যিক হ'লেও আমাদের লাভ কম হ'ত না।

কিন্তু আপনার চিঠি পেলে আমার একটা মহা মুস্কিল হয় কী বলব? মনের মধ্যে এত কথা ভিড় ক'রে আসে যে তাদের ঠেকাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। আরো এই জন্যে যে, মনে হয় মূল বিষয়ে আমাদের মতদ্বৈধ নেই ব'লে—অমিলগুলিও হয়ত অবান্তর, আর একটু ঠোকাঠুকি হ'লেই হয়ত কালেডোস্কোপের মতন বেশ সুদৃশ্য মিলের চিত্রবিচিত্র

ভাবসজ্জা ফুটে উঠত। হর্ষের আরো একটা কারণ আছে—এটা মুস্কিল নয়—যে, আপনার নানা ইঙ্গিত থেকে আমি সত্যিই অচিন্তিত চিন্তার খোরাক পাই। একটা উদাহরণ দেই।

আমার আবাল্য এই একটা ধারণা ছিল যে, চাকুরি করতে বাধ্য হওয়াটা দুঃখের কথা—যাকে মেনে নিতে হয় জীবনের আর সব ছোট-বড় অনিবার্য ট্রাজিডির মতনই। ধরুন, আমার বন্ধুবান্ধবদের কারুর মুখেই শুনিনি এমন চমৎকার কথা যে, খতিয়ে চাকুরি মানে সমাজের ঋণ শোধ করা। পিতৃদেব প্রায়ই দুঃখ করতেন চাকুরি করতে বাধ্য হওয়ার দরুন, তাই হয়ত এ-ধারণা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, স্বাধান পেশাই প্রকাম্য, চাকুরি দুঃখাবহ। আপনি বেশ প্রাঞ্জল ক'রেই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন: "আমরা কেউ কারো দাস নই, কিংবা সবাই সবার সেবায় নিযুক্ত।" চাকুরি ব্যাপারটাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কখনো দেখিনি। তাই আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার একটি ভুল ধারণার অন্তত: নিরাকরণ করলেন ব'লে। আপনার নানা পত্রের আরো নানা উক্তিই এইভাবে আমাকে ভাবিয়ে তুলে আমার নানা অস্পষ্ট চিন্তাকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছে। এই জন্যেই আমি আপনার লৈপিক ভাষাকে ভাবোদ্দীপক উপাধি দিয়েছি সকৃতজ্ঞেই।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবার আপনি যা লিখেছেন তার প্রায় কোনো উক্তিকেই নাকচ করতে পারা যায় না। করবই বা কী দুঃখে বলুন? বিজ্ঞানের আবহাওয়া আমাদের কাছে আজ কি প্রায় প্রাণবায়ুর মতনই ব্যাপক ও বরদ নয়? আমার মনে সানন্দ বিস্ময়ের অবধি থাকে না ভাবতে—মানুষের দেহদুঃখ বিজ্ঞান কত কমিয়েছে। দেহ-তথ্যকে জড়ো ক'রে নানা পরীক্ষায় আমাদের স্বাস্থ্যকে মজবুৎ করেছে। আয়ু বাড়িয়েছে—সর্বোপরি নানা মহামারী থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানই বা বলি কেন?—এ-দারুণ হিংসা ও জনগণ-রথচক্রমুখর প্রতিযোগিতার জগতে আমরা যে আজো খেয়ে-প'রে বেঁচে আছি সে তো বৈজ্ঞানিক টেক্‌নলজিরই প্রসাদে। এক হিসেবে এ-যুগকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের যুগ, কেন না আমাদের চেতনায় বিজ্ঞান হাল আমলে প্রায় উপাস্য হ'য়ে উঠেছে। এতেও আমার আপত্তি নেই

যদি না বিজ্ঞান হ'য়ে ওঠে অদ্বিতীয় উপাস্য, অর্থাৎ যদি না আপনারা বলেন—বিজ্ঞানের কোরানে যে-সত্যের পরখ সম্ভব নয় সে-সত্য নাস্তি—নামঞ্জুর। আপনি নিজে একথা বলেন না বটে, কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকই তো বলেন উঠতে-বসতে। আর তর্ক ফেঁপে ওঠেও সেইখানেই। নৈলে মানবাত্মার চতুর্মুখ—বিজ্ঞান শিল্প দর্শন ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক—বটেই তো।

কেবল আপনার চিঠির একটি কথায় সংশয় জাগে ফের। আপনি লিখেছেন যে বৈজ্ঞানিক পন্থায় অধ্যাত্ম তত্ত্বের তল পাওয়ার চেষ্টা সমর্থনীয় যেহেতু অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ "পরস্পর-বিচ্ছিন্ন" নয়। সংশয়ের কারণ এই যে, অন্তর্জগতের তাত্ত্বিক যাঁরা তাঁরা এ রাজ্যের যে-খবর পান সে-খবর মিলতে পারে কেবল পূর্ণ আত্মোৎসর্গে। এতে বুদ্ধি বিচারের কিছু স্থান থাকতে পারে, কিন্তু খতিয়ে এ-গগনগঙ্গায় বুদ্ধির বৈভব হালে পানি পায় না, পেতে পারে না—কেন না সমগ্র সত্তাকে নিয়োগ ক'রে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় আর বুদ্ধি-বিচারের খণ্ডিত বকযন্ত্রে যে তথ্যজ্ঞান জ'মে ওঠে এ-দুয়ের জাতই আলাদা যেহেতু লক্ষ্যই আলাদা। অধ্যাত্ম সাধকও (বৈজ্ঞানিকের মতনই) জানতে চান বটে, কিন্তু সে-জ্ঞান (আপনার ভাষায়) উপায় (means) মাত্র, উপেয় (end) নয়। উপেয় হ'ল—বুদ্ধিবিচারের উপত্যকা ছাড়িয়ে পৌঁছনো পরমমিলনের আনন্দ-শিখরে।

একটা উদাহরণ দেই বোঝাতে—কেন বৈজ্ঞানিক চোখ ও যন্ত্রপাতি দিয়ে অধ্যাত্ম সত্যকে যাচাই করার প্রবৃত্তিকে সাধকেরা নেকনজরে দেখতে পারেন না।

ধরুন দাম্পত্য প্রেম। বিজ্ঞান এর দৈহিক আত্মপ্রকাশকে তদন্ত ক'রে সূত্র দিলেন—এ-প্রেমের মূল নানা কোষের (gland) রসক্ষরণ। একথা সত্য যে দাম্পত্য সঙ্গমে এ-রস ক্ষরিত হয় অমুক অমুক কোষ থেকে। কিন্তু এ-প্রণয়ের অন্দরমহলে যে-আনন্দ ও মাধুর্যের রহস্য গাঢাকা দিয়ে থেকে তার অফুরন্ত লাবণ্যের তথা মধুর তৃপ্তির রসদ জোগায় তার খবর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মিলতে পারে কি? সে আনন্দ-মহিমা এতই গভীর যে, বৃহদারণ্যক এমন কথা বলতেও কুণ্ঠিত হন নি যে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে এ-আনন্দের উপমা দেওয়া চলে। বলছেন যাজ্ঞবল্ক্য:

"যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" (ভাবার্থঃ যেমন বল্লভার বাহুবন্ধনে বল্লভ মিলনলগ্নে বিশ্ব ভুলে যায় তেমনি ব্রহ্ম-সঙ্গমের লগ্নে সাধক সব ভুলে আনন্দতন্ময় হন।)

জগতে আবহমানকাল নরনারীর প্রেমের এই মিলনানন্দের জয়গান গেয়ে এসেছেন অগণিত মুনিঋষি যোগীপ্রেমী। এ-অফুরন্ত পুলকের রস-লোকের সন্ধান পেতে হ'লে সদর থেকে বিচার করলে চলবে না, পৌঁছতে হবে এ-উপলব্ধির পরম রহস্যের অন্দরমহলে ভালোবাসার ছাড়পত্র পেয়ে। শুধু কোষের রস নিয়ে পোস্টমর্টেম গবেষণা ক'রে বা পরিসংখ্যানের ছক কেটে খবর পাওয়া যাবে না শ্রীরাধা সব হারিয়ে সব পাওয়া বলতে কী বুঝেছিলেন, কেন সর্বহারা হ'য়েও পরমানন্দে গেয়েছিলেন:

"কলঙ্কিনী বলি' ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভালোমন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস: পাপ পুণ্য সম, তোমার চরণখানি।"

আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলব: এ-প্রেমের তত্ত্বজ্ঞ হ'তে হ'লে শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞ হ'লে সানাবে না, করতে হবে প্রেমের সাধনা। নৈলে পাপপুণ্যের উর্ধ্বলোকে আসীন সে-আনন্দের সংবাদ মিলতেই পারে না যে-আনন্দের ভাবে রাধা কুলত্যাগিনী হয়ে কলঙ্কিনী দুর্নাম বরণ ক'রেও বলেছিলেন:

তোমারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।

আমি একবার এই ভাবের ক্ষণাভাষ পেয়ে লিখেছিলাম:

লুপ্ত করো রাধা, গর্বনিশাবাধা সর্বনিবেদন মন্ত্রদিশায়।
এসো উষাবরদাত্রী চিরন্তনী! রাত্রিবিশঙ্কিনী মর্তিহিয়ায়।

বিজ্ঞান যদি বায়না ধরে যে আমি ছাড়ব না, দেখবই দেখব আমার অনুবীক্ষণে এ-প্রেমের আদিম বীজাণুকে; তাহলে মনে করেন কি সে এ-পদ্ধতিতে পরমমিলনের রঙমহলে সর্বনিবেদনের ফলে আত্মলুপ্তির আনন্দের খবর পেতে পারবে? বিজ্ঞান তার স্বক্ষেত্রে সুখাসীন ও আত্ম-

ক্রীড় হ'লেই সব গোল মিটে যায়—"বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি" উড়িয়ে স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে অপরের এলাকায় চড়াও হ'তে এলেই তার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, সে বলে : যোগীঋষিরা (mystic) আত্মকেন্দ্রিক, কেবল বৈজ্ঞানিকই বিশ্বভৌম পরার্থব্রতী। এ আমার কথার কথা নয়, আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু আমার মতন মিশুক বন্ধুকেও কিছুদিন আগে ধম্‌কেছিলেন "আত্মকেন্দ্রিক" ব'লে। কাজেই তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সব সত্যকে যাচাই করবার দুরারোগ্য প্রবণতাকেই এ-হেন অসত্য ভাষণের নিদান ব'লে আমি মনে না ক'রে পারি না। আসলে বৈজ্ঞানিক ডগ্‌মাটিসম্‌ (ঠিক অন্য সব ডগ্‌মাটিস্‌মের মতনই) মানুষকে স্বাধিকারপ্রমত্ততার আঁধিতে ফেলে অন্ধ ক'রে ফেলে ব'লেই আমার মনে হয় যে, প্রত্যেককেই বলা ভালো তার নিজের নিজের ক্ষেত্রে খুশ-খেয়ালে কাজ করতে। পরে যখন নানা কর্মী জ্ঞানী অধ্যবসায়ী গবেষকের সন্ধানে আরো অনেক কিছু জানব ও মানতে শিখব তখনই আসবে সামঞ্জস্যের (Harmony) সুলগ্ন। সেদিনে হয়ত (আশা করি অন্ততঃ) বিজ্ঞানী ধ্যানীর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলবেন :

বধু, তুমি কি আমার পর ?
একই আকাশের তলে পাশাপাশি আমাদের দুটি ঘর।
এঘরে যা পাই ওঘরে তা নাই—হোক না, কী যায় আসে ?
প্রতিবেশী নয় অরি তো, তারা পরস্পরে ভালোবাসে।
সীধু যাহা পারে সহজেই, বিধু না পেরে কাঁদে বিষণ্ন।
বিধু যা পলকে পারে, দেখে সীধু গায় : "উঃ। তুমি ধন্য।"
মধু শেষে এসে জুড়ে দেয় : "ওরে, জীবন অতি বিচিত্র,
ভেদের পথেই নিতি উঁকি দেন প্রাণের প্রেমল মিত্র।
তাঁরা পেলে তবে অনৈক্যবুকে মিলিবে ঐক্যতান রে।
না মিলিলে শুধু ঝন্‌ঝনা মাঝে দায় হবে রাখা প্রাণরে।"

আমার মনে হয় মধুই বলেছে যাকে বলে লাখ কথার এককথা—কিনা মধুর কথা : যে, তাঁকে পেলে তবেই বিষের মধ্যে অমৃতের সন্ধান মিলতে পারে। না পেলে বিষ বিষই থাকবে। আপনি হয়ত এখানে আপত্তি তুলবেন : "কেন ? বিষের অনুপানেই কি বিজ্ঞান নানা রোগ

সারায় নি ?" সারিয়েছে—কিন্তু কখন ? যখন তার মধ্যে প্রেম জেগেছে পরম প্রেমলের করুণায়। আর কেবল তখনই সে প্রাণকেও বাজি রেখে গবেষণা করেছে—কেমন ক'রে রেডিয়াম দিয়ে ক্যান্সার সারানো যায়। কিন্তু এ-অসাধ্য-সাধন করতে পেরেছেন তাঁরা শুধু তখনই যখন প্রেম এসেছে সারথি হ'য়ে তাঁদের গবেষণার রথ চালাতে; নৈলে তাঁরা রোগী দেখে হয়ত নানা অসুখ সারিয়েছেন, কিন্তু শুধু পসার বাড়াতেই,পরার্থব্রতী হ'তে নয়। অর্থাৎ সব পথেই শেষ পরিণতি প্রেমে এই-ই হ'ল অধ্যাত্মসাধনার শেষ কথা। যোগী কবি এ, ই একটুও অত্যুক্তি করেন নিঃ

When the spirit wakens
It will not have less .
Than the whole of life
For its tenderness.

অন্তরতম যখন জাগে,
রয় না সে আর স্বল্পসুখী।
গাঢ় কোমলতা, সাধনায় হয়
তখন সে সারা বিশ্বমুখী।

আপনি বৈজ্ঞানিক হ'য়েও প্রেমের মহিমা স্বীকার করেন এ আমার পক্ষে এক মস্ত বাঁচোয়া। নৈলে কীই বা বলতাম আমি যাতে আপনি কান দিতেন মেহেরবানি ক'রে ? কিন্তু আপনার সমস্যা আমি বুঝি। তাই আপনি যখন রাগ ক'রে লিখলেন: "ভগবানের করুণার অনুভূতি ভক্তের পক্ষে স্বাভাবিক হ'লেও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যখন দেখতে পাই জরা ব্যাধি দুঃখ শোক দৈন্য অত্যাচার অবিচার হিংসাবিদ্বেষনিপীড়িত অগণিত নরনারীর হাহাকারই হচ্ছে এ-সংসারের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম তখন করুণার কোনো প্রমাণ পাই না"—তখন আমি বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে আপনার দরদী অভিযোগের প্রাণের কথাটি যে বুঝতে পারি নি তা নয়। আপনার এ-বিদ্রোহ-উক্তিও আমার কাছে দুঃসহ মনে হয় না যে, "সংসারের নির্মম দুঃখের চাকার তলে যারা নিষ্পেষিত হয়—(এবং তারাই সংখ্যাবহুল)—করুণার দোহাই দিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া যায় না।"

দুঃসহ মনে হয় না, কারণ এর মূলে আছে প্রেমেরই অনুভূতি, তথ্যবিচারের নয়। কিন্তু আপনি একেবারে আদিম প্রশ্নের অবতারণা করলে আমি কেমন ক'রে পেরে উঠব বলুন তো? দেহ না আত্মা, নিয়তি না পুরুষকার, চেতনা না অচৈতন্য, সৎ না অসৎ, এক না বহু, পুরুষ না প্রকৃতি···ইত্যাদি দ্বৈতবাদ (duality) নিয়ে তর্কাতর্কি চ'লে আসছে সৃষ্টির (ওরফে মানবচেতনার) অরুণোদয় থেকে। এদের মধ্যে শিব-অশিবের দ্বন্দ্ব হ'ল দেব-দানবের দ্বন্দ্বের মতনই দুরবগাহ। আমি একজন সামান্য প্রেমার্থী সাধকমাত্র যার কাছে জ্ঞানও গৌণ—ভক্তির তুলনায়। এহেন জিজ্ঞাসু কেমন ক'রে জবাব দেবে সে-প্রশ্নের যার কোনো চরম জবাবই আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি: যে, কেন এই বস্তুবিশ্বের উদ্ভব হ'ল, এক কী দুঃখে বহু হ'তে চাইলেন—যখন এক থেকে তিনি দিব্যি আনন্দেই মশগুল ছিলেন?

তাই আমি শুধু সলজ্জে বলব: আমি জানি না অমঙ্গলের নিদান কোথায়। কেবল ভয়ে ভয়ে মাত্র এইটুকু সাফাই গাইতে পারি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুঃখশোকের কথা ভেবে চলতে গেলে সমাধান মিলবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই। বাতি আগে একটা জ্বললে তবেই তা থেকে হাজার বাতি জ্বালানো সম্ভব, নৈলে নয়। তাই আমি চাই আগে নিজের হৃদয়মন্দিরে অচঞ্চল দিব্যদৃষ্টির বাতি জ্বালতে যা প্রবৃত্তির হাজারো ঝড়-ঝাপটায়ও নেভে না। যদি পারি এ-বাতি জ্বালাতে তাহ'লে ঝাপ্সা অনেক কিছুই কম ঝাপ্সা দেখব—আঁধারের মধ্যেও পাব পূর্ণ জ্যোতি না হোক, আলোর ফুল্কি। এই বিশ্বাসকেই আমি বলছি অন্ধ বিশ্বাস। কারণ এ-বিশ্বাস এসেছে সেই মহানজনদের মহিমাকে বরণ ক'রে যাঁরা আলো পেয়েছেন ব'লে আমার প্রাণ মেনে নিয়েছে। কেবল মনে রাখবেন মেনে নিয়েছে সে-আলোর স্বরূপ না জেনে। কারণ আমি জ্ঞানের পথে একটু দিশা (clue) পেয়েছি মাত্র। কিন্তু যেটুকু পেয়েছি তাতেই আমার অন্তরে এ-দৃঢ়প্রত্যয় জেগেছে (এও অন্ধ বিশ্বাসই বলব), যে, খতিয়ে জাগতিক দুঃখদৈন্যের ব্যাপক সমাধান আসতে পারে কেবল আন্তর অনুভব থেকে—বিজ্ঞানবুদ্ধির বাহ্য বিচার থেকে নয়। এ-বাহ্য বিচার আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে বৈ কি—কিন্তু জগতের হাহাকারের মূল যে-

অহমিকার ভেদবুদ্ধি তার দাওয়াই জানেন কেবল দৈবলব্ধ প্রেমের হাকিম। কেবল হায়রে এ-বৈদ্যের দেখাও ঝাঁকে ঝাঁকে মিলবে না লক্ষ লক্ষ হাহাকারীর আর্তনাদে, কি কোনো বাহ্য বিধানের কন্‌ফারেন্সে—তার উপাধি বৈজ্ঞানিকই হোক বা রাষ্ট্রিক হোক। কারণ কোনো ইস্‌ম্‌ বা তন্ত্রেই মিলতে পারে না সে-অমৃত যার স্বাদ পেলে মানুষের আর দুঃখকে অভিশাপ মনে হয় না, মনে হয়- উর্ধ্বারোহণের সোপান। এমন মানুষ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—বৈজ্ঞানিকেরা দেখেন নি বা দেখলেও বিশ্বাস না করাটাকেই তাঁদের স্বধর্ম ব'লে তাঁদের কথায় কান দেন না, তাঁদের দর্শনকে মান দেন না, তাঁদের উপলব্ধির গুণগান করেন না। এক কথায়, আমি বলতে চাই যে, আগে ব্যক্তিগত সমাধান হ'লে তবেই বিশ্বভৌম সমাধান আসতে পারে—not the other way round—অর্থাৎ বিজ্ঞানের বা সমাজের নানা সমষ্টিগত আবিষ্কার বা সেবার যোগফলে নয়—আত্মকোষের আলো হৃদয়ে জ্বললে তবেই সে-বোধি লাভ হবে যে মুক্তিলাশান হ'লেও বিজ্ঞানবুদ্ধির নাগালের বাইরে। এইখানে ফের আপনাদের সঙ্গে আমাদের বাধবে। কিন্তু তার চারা নেই। অধ্যাত্ম যার কাছে স্বধর্ম সে বাহ্য কোনো পরম বিধানকেই অন্তিম (final) ব'লে মেনে নিতে পারে না। কারণ ভগবানের করুণায় সে সেই বরদ বিশ্বাসের প্রসাদ পেয়েছে যার আলোয় তার অন্তরে পরম শান্তির আভাষ ফুটে উঠেছে যাকে সে সারা বিশ্বের জাঁকালো সংশয়লোকেও খুঁজে পায় নি (যে সংশয়কে বিজ্ঞানের ভিত্তি ব'লে অভিনন্দন ক'রে আপনি এত গৌরব করছেন)। কারণ সে গীতার বাণী মানে যে, "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" —সন্দেহের পথে পরমতম সমাধান মিলতে পারে না। মিলতে পারে শুধু বিশ্বাসের পথে—অর্থাৎ তাঁদের কথায় বিশ্বাস ক'রে যাঁরা বলছেন :

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

—"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে

জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লংঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"
(রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)

কিন্তু এই যে মহাপুরুষের মহাবাণী—একে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাপুরুষেরা বিশ্বাস করলেও বৈজ্ঞানিকভাবাপন্ন মনীষীরা কি জনশ্রুতি (hearsay evidence) ব'লে ডিশমিশ ক'রে দেন না এ-যুগে? বলেন না কি—এরই নাম অন্ধবিশ্বাস—authoritarianism-এর নজিরকে দণ্ডবৎ করা? আপনি নিজে দরদী বিশ্বাসী, তাই লিখেছেন: "যে-মূল ধারণার উপর ধর্মের ভিত্তি তাকে কেউ অন্ধবিশ্বাস বলতে পারে না। যুগযুগান্ত ধ'রে তার কল্পনা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগফলে মানুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'রে আসছে। একেই কেন্দ্র ক'রে মানুষের দর্শন শাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের উপনিষদ ও দর্শন এর প্রধান সাক্ষী। একে কেউ অন্ধবিশ্বাস বলতে পারে না।" এ-যুক্তি আমি ঠিক ধরতে পারছি না। কারণ পরের মুখে ঝাল খাওয়ার নামই তো অন্ধবিশ্বাস। সাধু সন্ত মুনি ঋষিরা যুগে যুগে দেশে দেশে একই কথা ব'লে এসেছেন নানা সুরে, নানা তালে, নানা বিশ্লেষণে, বিধিবিধানে—যার ভিত্তি তাঁদের "কল্পনা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগফল" নয়, কারণ তা যদি হ'ত তাহ'লে মাদৃশ অন্ধবিশ্বাসীরা তাঁদের আঁকড়ে ধরতেন না দিশারি ব'লে। আমরা তাঁদের মানি তাঁদের এই আত্মকথন সত্য ব'লে অকুণ্ঠে মেনে নিয়ে যে, তাঁরা জেনেছেন সেই মহানন্দ পুরুষকে যাঁকে জানলে তবেই অমৃত হওয়া যায়—মৃত্যুকে ছুয়ো দিয়ে। কিন্তু এ-মানার পিছনে যদি যুক্তি থাকত তাহ'লে কি বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের আর্যদর্শনকে মেনে নিতে একটুও বাধত? বাধে খতিয়ে এই জন্যেই যে, তাঁদের সত্যপাঠের প্রথম সূত্রই ঘোষণা করছে—বিচারবুদ্ধিই হ'ল সত্যের শেষ বিচারক—কাজেই বুদ্ধি দিয়ে আমি যাকে বুঝতে পারছি না তাকে অপরে দেখেছেন বা সত্য ব'লে চিনেছেন ব'লেই মেনে নিতে পারব না—কারণ এই মেনে নেওয়ার নামই অন্ধবিশ্বাস ওরফে authoritarianism.

কিন্তু মরুকগে এ মানা না-মানার বিতণ্ডা। কারণ আমার বৈজ্ঞানিক

দৃষ্টিভঙ্গিকে অধ্যাত্ম উপলব্ধির জগতে আমল দিতে বাধে এসব কারণে নয়, বাধে এই জন্মেই যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অশেষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পথ দেখতে পাওয়া গেলেও তাতে ক'রে মানুষের অন্তরাত্মার অন্তিম ক্ষুধা মেটে না, তার চরিত্রের রূপান্তর ঘটে না—এককথায়, তথ্যজ্ঞানের ফলে প্রেমের প্রজ্ঞা লাভ হয় না। তাই আমি চাই বিজ্ঞানী ও আত্মবাদীকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ রাখতে—এই ভয়ে যে, একে ওর এলাকায় আসতে দিলে পরধর্মের চর্চায় ভয়াবহ গণ্ডগোলের ভয়ালতা বাড়বে বৈ কমবে না—যাকে সাহেবি ভাষায় বলা চলে to make confusion worse confouned ! তাই ছেড়ে দিন ও-চেষ্টা। আসুন, মেনে নিই যে আমরা নিজের নিজের পথেই চলি তো—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে মিলি কোন্ অলক্ষ্য আনন্দপরিণতির মিলনমোহানায়।

এই মেনে নেওয়াকেই আমি বলতে যাই ঔদার্যের পথ, সহিষ্ণুতার পথ, বিনয়ের পথ—ঠিক সহযোগিতার পথ নয়। কারণ ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়ে যাঁবা প্রেম সৌভ্রাত্র্য আনন্দ ও তাদাত্ম্য উপলব্ধি করে ধন্য হ'তে চান তাঁদের মূল অন্বেষণের সহায় বিশ্বাসী নির্ভর—বিজ্ঞানী মনোভাব নয়। নির্ভর কার উপর ? না, করুণাব উপর—এই প্রত্যয়ের উপর যে, বহু মহাপুরুষ ডাকাডাকি ক'রে করুণার স্পর্শমণি পেয়ে যখন চরিত্রের সব খাদকে স্বর্ণায়িত করতে পেরেছেন ও বলছেন এ-পথে গেলে করুণার পাথেয় মেলে, তখন আমারও মিলবেই। মিলবে যদি আমি তাঁদের এজাহারে বিশ্বাস করি যে চাইলে পাওয়া যায় খুঁজলে মেলে। কেবল-মনে রাখা চাই একটা কথা : যে, অনেক না খুঁজলে মেলে না সে-বহুদুর্লভ মণির মণি যার ছোঁওয়ায় বেদনার জগতও আনন্দচেতনায় রূপান্তরিত হয়। সাধনা বিনা সিদ্ধি অসম্ভব। অমৃতকে পেতে হ'লে সমুদ্রমন্থনের বিষোদ্গারে ভয় পেলে চল্‌বে কেন ?

তবে ফের হয়ত বলবেন—এ তো হ'ল দু'চারজন ভাগ্যবানের উপলব্ধি—সীধু বিধু যদু রাধুর গতি কী হবে ? এ নিয়ে আমিও অনেক মাথা বকিয়েছি—সত্যি বলছি। কিন্তু শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি ঠেকে শিখে যে, প্রেমের প্রজ্ঞার বোধির মণি আবদারে মেলে না, মেলে

কেবল সর্বনিবেদনের তপস্যায়, কাজেই যারা এ-তপস্যা করতে নারাজ কি অক্ষম তাদের রাতারাতি মহাপুরুষের পদবী দিয়ে আনন্দময় ক'রে তোলা অসম্ভব। গীতায়ও এই কথাই বলেছে যে বহু মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ভগবানকে চায় আর যারা চায় তাদেরও পাওয়া যতক্ষণ না শরণাগতির কোঠায় পৌঁছয় (অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা চাওয়ার মতন চাইতে পারে, ডাকার মতন ডাকতে শেখে) ততক্ষণ তারা তাঁকে জানার মতন জানতে পারে না, পরম শ্রেষ্ঠ প্রিয়তম আপনজন ব'লে চিনতে পারে না।

এ-স্বীকারোক্তি করতে আজো দুঃখ পাই কবুল করছি। কারণ করুণার ছিটেফোঁটা পেয়ে যে-আনন্দের আশ্চর্য জগতের কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি সে-জগতের দোরগোড়ায় পৌঁছনো সাড়ে পনেরো আনা বুদ্ধিবাদীর পক্ষে অসম্ভব ভাবতে আজো বাজে। কিন্তু উপায় কি বলুন— যখন সাড়ে পনেরো আনা বুদ্ধিবাদী বিশ্বাসকে সারথি ক'রে এ-জগতের বাসিন্দা হবার জন্যে সাধনা করতে নারাজ ?

চিঠি অত্যধিক বড় হ'য়ে গেল ব'লে লজ্জিত হচ্ছি, তবু শেষে একটি কথা, কারণ না ব'লে ইতি করলে হয়ত ভুল বোঝানো হবে—আপনি হয়ত সিদ্ধান্ত করবেন—আমিও খতিয়ে নিরাশাবাদীরই সগোত্র।

তা নয়। আমি স্বভাবে জিজ্ঞাসু ও ধর্মে বিশ্বাসীই বটে। কিন্তু তাব'লে সংশয় আমাকেও কম ভোগায় নি। বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে নগণ্য নই, বুদ্ধিবাদে আস্থা হারানো সত্বেও। তাই কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলে থাকি প্রায়ই—বুদ্ধি দিয়েই বুঝবার চেষ্টা করি বুদ্ধির দৌড় কতদূর— (আপনার ভাষায়) "জরীপ" করতে চাই জগতের ও জীবনের হালচাল।

নানা মনীষীর কাছেই আমি গিয়েছি তত্ত্বসন্ধানী হ'য়ে। অনেকের কাছেই পেয়েছিও আলো—(আপনার ভাষায়) "খুচরা" সত্য, "খুচরা" আলো। কিন্তু মন ভরে নি। কেবলই মনে হয়েছে—ততঃ কিম্ ? মানুষের চিরন্তন দুঃখকষ্ট—আরো বেশি নীচতা ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিষেধক কী ? বুদ্ধির বিধান, সমাজনীতি, রাষ্ট্রবিধি, শিল্পকলা; শিক্ষাবিস্তার, বিজ্ঞানী তথ্যালোক, না পরোপকার করতে ছোটা ? নানা পথেই ঢুঁ মেরেছি, ভাবতে চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য, হয়ত কিছু সৃষ্টিও ক'রে

থাকব গানে কাব্যে সুরে সাহিত্যে যার কিছু মূল্য আছে। কিন্তু আজকাল প্রায়ই মনে হয় এ-সবই অবান্তর, ছায়াবাজি—ধোপে টি ঁকবে না—আঁকড়ে ধরতে গেলেই মিলিয়ে যাবে, নিত্য বস্তুর দেখা পাওয়া যেতে পারে শুধু ভক্তির পূজায়, প্রেমের সাধনায়—কেবল তার প্রসাদেই আঘাটায় ঘাট মিলতে পারে, আঁধারে হাৎড়াবার সময়েও এ-প্রত্যয় জাগিয়ে রাখা যায় সংশয়ের বুকে যে, কোনো কিছুই নিরর্থক নয়, এ-মহামহীয়ান্ অশ্রান্তগতিরুচ্ছল বিশ্বলীলার দুরন্ত বেগবহ্নিসমারোহকে আমরা একটিমাত্র ছোট্ট দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার যে-জরীপ করছি সে অসম্পূর্ণ, কাজেই নিটোল নিখুঁৎ হ'তে পারে না। ভাবতে ভাবতে কাল সকালে আচম্‌কা একটি সুর বেজে উঠল, মৃদুল কিন্তু গভীর—কে যেন বলিয়ে নিল :

করতে তো চাই নাথ নিবেদন জীবন-মরণ শ্রীচরণে :
কেন তবু ধায় আজো মন অবান্তরের আবাহনে ?
জানি—তোমার ধ্রুবতারার
দিশায় মেলে অপারে পার,
কেন মায়ার দেয়ালি তবু জ্বালাই ছায়ার উপবনে ?
যাক ভেসে সব কালো প্রভু, তোমার আলোর নির্ঝরণে ॥

জড়িয়ে আজো থাকি নিশায় মিথ্যে কাজের নাগপাশে।
যাই ভুলে—উষার দিশা পায় সে-ই শুধু যে ভালোবাসে।
নিষ্করুণের জ্বালাও শিখা
ছাই ক'রে সব অহমিকা,
আমার শঙ্খ তোমার বাঁশি আজ করো রূপান্তরণে।
করো তোমার ব্রজবাসী—কোল দিয়ে নাথ অকিঞ্চনে ॥

এ আমার কথার কথা নয়, বিশ্বাস করুন। কারণ এই একটুখানি দৃষ্টিদীপের প্রসাদেই আমার নানা কাজেই নাগপাশের বন্ধন এখনো পুরোপুরি না কাটলেও সাধনায় সহিষ্ণুতা এসেছে, বাইরে দেখতে পেয়েছি উত্তরণের পথ, অন্তরে—অভয়ের। তাই আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় যে, এই দুর্ভেদ্য রহস্যঘন বিশ্বলীলায় নানা সময়ে মানুষের অগুন্তি

দুঃখশোক—আধিব্যাধির দৃশ্য মনকে অশান্ত ক'রে তুললেও শুধু এক নিরর্থক অশান্তির ঘূর্ণীলীলার পোষ্টাই করতেই এ-বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে অগণ্য নীহারিকা ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে না। আমরা খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে যাকে হাহাকার বলছি তারও কোনো একটা তাৎপর্য আছেই আছে। কিন্তু একথা বলে কে? বুদ্ধি বা যুক্তি নয়। বলে একটা গভীর বিশ্বাসলব্ধ বোধির মৃদুস্বর যা পেলব হ'লেও জগতের হাজারো আর্তনাদেও ডুবে যায় নি কোনদিনই। আর এই তাৎপর্য খুঁজে পাওয়ার নামই পরম প্রজ্ঞা। কিন্তু সে-প্রজ্ঞার বিকাশ হয় ধীরে ধীরে চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—যে-বিকাশে দুঃখ দৈন্য হাহাকারও সহায় হয় কোনো না কোনো অচিন্ত্য উপায়ে। কী উপায়ে—আমরা জানি না বুদ্ধি দিয়ে, জানা যায় না ব'লেই। কিন্তু প্রেমের আলোয় খানিকটা আভাস পাওয়া যায় এ অন্তিম সার্থকতার। তাই আমি প্রেমকেই বলি শ্রেষ্ঠ দিশারি বুদ্ধিকে নয়। আর এ-প্রেমের পথ কাটে অন্তরাত্মার তপঃশক্তি, তাই তাকেই মালা দিতে চাই পথিকৃৎ তথা পথনায়ক ব'লে, বৈজ্ঞানিক টেক্‌নলজিকে নয়। টয়েনবি সাহেব এই কথাটিকে বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন তাঁর Civilization on Trialএর শেষ অধ্যায়ে (The Meaning of History for the soul ২৬২ পৃষ্ঠা) তাই সেইটুকু উদ্ধৃত করি। (তাঁর কথা উদ্ধৃত করছি আরো এই জন্যে যে, তিনি স্বভাবে বুদ্ধিবাদীই বটে যদিও বিশ্বাস ও ধর্মে গভীর আস্থাবান্) সাহেবের বক্তব্য এই যে:

"Man has been a dazzling success in the field of the intellect and know-how' and a dismal failure in the things of the spirit, and it has been the great tragedy of human life on Earth that this sensational inequality of man's respective achievements in the non-human and in the spiritual sphere should, so far at any rate, have been this way round; for the spiritual side of man's life is of vastly greater importance for man's well-being (even for his material well-being, in the last resort) than is his command over non-human nature."

(ভাবার্থ: বুদ্ধির ক্ষেত্রে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে খাটানোর বহুবিচিত্র আখড়ায় মানুষের কীর্তি চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও অন্তর জগতের

সন্ধান ও ব্যবস্থায় সে একেবারে নাজেহাল হ'য়ে পড়েছে। আর আমাদের পার্থিব জীবনের একটি সাংঘাতিক ট্রাজিডি এই যে, মানুষ বাহ্য জগতে ছত্রপতি হওয়া সত্বেও অন্তর্জগতে তার গবেষণা রয়ে গেল নগণ্য—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত। এ-বৈষম্যকে ট্রাজিডি বলছি এই জন্যে যে, মানুষের অন্তিম মঙ্গলবিধানে অধ্যাত্ম সাধনার অবদান ঢের বেশী ব্যাপক ও গভীর—শুধু আমাদের অন্তরের আনন্দলোকেই নয়, আমাদের বাহ্য সুখশান্তির রাজ্যেও বটে। এই অধ্যাত্ম স্বরাজের মহিমার পাশে বাহ্য প্রকৃতির উপর তার আশ্চর্য কর্তৃত্বের চমকও ম্লান হ'য়ে যায়।)

এই দুই থাকের সাধনাকেই উপনিষদে বলেছে শ্রেয় বনাম প্রেয়ের সাধনা। এর মানে নয় যে প্রেয় বর্জনীয়। তবে একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে শ্রেয়কে বাদ দিয়ে প্রেয়ের সাধনায় মানুষের মুক্তি নেই, না রাষ্ট্রের বিধানে, না বিজ্ঞানের কীর্তিতে।

এ-অসামান্য ঐতিহাসিকের ধর্মবিশ্বাসের শুদ্ধবাণীতে আপনার সংশয়ী প্রশ্নের পুরোপুরি না হোক আংশিক উত্তর পাওয়া যায়: এই প্রশ্নের যে, ভগবৎকরুণায় আস্থা রাখা যায় কেমন ক'রে যদি মানুষ ত্রিতাপে জ্ব'লে পুড়ে হাহাকার করতে থাকে? উত্তর এই যে, ভগবৎকরুণায় বিশ্বাস আসে ধর্মবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা থাকলে তবেই, এবং এই শ্রদ্ধাই খতিয়ে মানুষের আন্তর শান্তির ভিত্তি—যে-ভিত্তির উপরে তার বাহ্য সুখের ইমারৎ গড়া যায়। গীতায় বলেছে একটি লাখ কথার এক কথা: "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্।" এ-সূত্রটির সত্যতা অপ্রতিবাদ্য, কেন না মনে অশান্তির নিশা জাঁকিয়ে বসলে তার চোখে যে বাইরের শতসূর্যের আলোও কালো হ'য়ে যায় একথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। কাজেই এ-সিদ্ধান্ত অকাট্যই বলব যে, যে-ধর্মবিশ্বাস চিত্তশান্তির বনেদ তাকে বাদ দিয়ে বাহ্য সুখের দেয়ালি জ্বালানো অসম্ভব। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবেন আজকের য়ুরোপের ও আমেরিকার হালচাল একটু স্থিরচিত্তে পর্যালোচনা করলে। সেখানে ভোগবিলাসের স্রোত উত্তরোত্তর বাড়ছে বই কমছে না। আমেরিকায় অন্ততঃ বেশিরভাগ মানুষের অন্নচিন্তাও নেই বলা চলে। কিন্তু সেখানে গেলে কী দেখতে পাই? না, নাগরিকের বাইরের অবিশ্বাস্য ভোগ আরাম সমৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে তার অন্তরের

অশান্তি উদ্বেগ চিত্তচাঞ্চল্য। বস্তুতান্ত্রিকতা, বুদ্ধিবাদ, বিজ্ঞানস্তুতি এসব স্রোত মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে অধ্যাত্মসত্যে অশ্রদ্ধার মোহানায়—অবিশ্বাসের আবর্তে। বলা হচ্ছে সঘনেই—যাকে যুক্তি দিয়ে মেলে না তাকে বিশ্বাস করার নাম মূঢ়তা। উপহাস করা হচ্ছে মুষ্টিমেয় মহাপুরুষদের গুরুবাণীকে যে ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায় এবং তাঁকে পেলে তবেই মর্ত্যে স্বর্গ নামতে পারে। এককথায়, প্রচার করা হচ্ছে যে, মানুষ ষোলো আনা সামাজিক (Secular) জীব, সুতরাং তার শেষ উপাস্য মানুষ, ভগবান্ হচ্ছেন বিগত যুগের অজ্ঞানসম্ভূত ভয় থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে নির্মিত নিয়ন্তা, কল্পিত কাণ্ডারী। ইদানীন্তন বুদ্ধিবাদীরা এই যে অবিশ্বাস ও সংশয়ের আবহ গ'ড়ে তুলছেন তার মাটিতে কোনো অধ্যাত্মবোধের অঙ্কুর গজাতে পারে না, গজাচ্ছেও না। আর অধ্যাত্ম-বোধের কোনো বাগানই যদি আমাদের না থাকে তবে অশ্রান্ত-কর্মবিড়ম্বিত চাঞ্চল্য-উদ্বেলিত, রণঘোষনিনাদিত ভয়াবহ জগতে মানুষ জুড়োতে যাবে কোথায় শুনি? দাঁড়াবে কোন্ শুভবুদ্ধির ধ্রুব ভিত্তির 'পরে? আপনারা কথায় কথায় ভগবান্‌কে জাগতিক সব দুঃখের স্রষ্টা ব'লে সনাক্ত ক'রে ব'লে থাকেন: যে-জগতে এত দুঃখদৈন্য নীচতা হীনতা নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা সে-জগতের স্রষ্টাকে সত্য শিব সুন্দর উপাধি দিই কোন্ মুখে? কিন্তু জগতের নানা অসাম্যের অবিচারের নিদান খুঁজে না পেলেও একটা নিদান আমরা পেয়েছি মানুষের হাহাকারের: সে হ'ল তার স্বার্থপ্রবুদ্ধ অহমিকা। আজ যদি সব মানুষ নিরভিমান হয় তবে এ-জগৎ যে স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই বলা যায় যে সাড়ে পনের আনা না হোক বারো আনা জাগতিক দুঃখ মানুষের নিজের সৃষ্ট—man-made—গ'ড়ে উঠেছে তার সঞ্চিত ও বর্ধমান কুকর্মফলে। তাই মানবহিতৈষীরাও সবাই এখানে একমত যে, আত্মাভি-মান থেকে মুক্তি না পেলে মানুষ সুখী হ'তেই পারে না। কিন্তু এই আত্মাভিমান থেকে মুক্তির কেবল একটিমাত্র পথ আছে—ধর্মে শ্রদ্ধাকে বরণ ক'রে আত্মশুদ্ধির পথে বহু সাধনায় আত্মজয় করা। বাইরের জগৎকে জয় করাও চাই মানি, কিন্তু সেই সঙ্গে চাই আত্মাভিমানকে নাকচ করা। "জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন"—আত্মজয়ীই খতিয়ে

জগজ্জয়ী একথার মার নেই, কেন না শুধু বাহ্য জগতের 'পরে কর্তৃত্বলাভ ক'রে মানুষ কখনই পরম শান্তি আনন্দ ও সুষমার অধিকারী হ'তে পারে না। তার জন্যে চাই আন্তর সাধনা। কাজেই এ-সাধনা যাঁরা করছেন তাঁরা বিশ্বের পরম হিতৈষী এ-সিদ্ধান্ত শুধু বিশ্বাসীর অনুভবসিদ্ধ নয়, শুভবুদ্ধির যুক্তিসিদ্ধও বটে। টয়েনবি সাহেব এই কথাটি বড় চমৎকার ক'রে বলেছেন যুক্তির ভঙ্গিতে :

"Seeking and following God in this way—that is, God's way—is the only true way for a human soul on earth to seek salvation. The antithesis between trying to save one's soul by seeking and following God and trying to do one's duty to one's neighbour is, therefore wholly false. The two are insoluble."

(CIVILIZATION ON TRIAL, p. 246

(ভাবার্থ : ভগবানকে ভাগবত পথে চাওয়া ছাড়া আর কোনো পথেই মানুষের মুক্তি মিলতে পারে না। নিজের আত্মার মোক্ষলাভের সাধনার সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য-সাধনার কোনো মূলগত বিরোধই নেই—ওরা অঙ্গাঙ্গী হ'য়েই আবহমানকাল পরস্পরকে সার্থক ক'রে এসেছে।)

কাজেই বলা চলে সমাজ যেমন ধর্মের ভিত্তি, তেম্নি ধর্মই সমাজের রক্ষক তথা রক্ষাকবচ।

ইতি। গুণমুগ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ধর্ম ও বিজ্ঞান

কলিকাতা

শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বরেষু,

প্রায় একমাস হ'তে চলল আপনার গভীর প্রীতি ও আন্তরিক সৌহার্দ্যের নিদর্শনবাহী 'পরা বনাম অপরা বিদ্যা' শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধটি পেয়ে ও পাঠ করে যে স্নিগ্ধ আনন্দলাভ করেছি তা ভাষায় ব্যক্ত করবার মত ক্ষমতা আমার নেই। একে চিঠি বলতে গেলে এর গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। একাধারে একে সাহিত্য, অধ্যাত্মদর্শন ও অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় পত্র ব'লে গণ্য করা চলে। আপনার মতন ভাষার উপর দখল ও প্রকাশের ক্ষমতা থাকলে এর প্রত্যুত্তরে আমার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারতাম।

প্রথমতঃ, ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করেছেন, তাতে আপনার হৃদয় যে ভক্তির হৃদয় তার পরিচয় প্রমাণ ফুটে উঠেছে। ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে প্রেমপ্রবণ, আমাদের মতন বুদ্ধিবাদী বিজ্ঞানসেবীর সমালোচনা ও বিচারপ্রবণ দৃষ্টি নয়। প্রেমের দৃষ্টিতে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মত ছোট জিনিষকেও বড় দেখায়। জননীর স্নেহের দৃষ্টিতে কাণা ছেলেও পদ্মলোচন ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু তাই ব'লে মাতৃস্নেহকে অস্বীকার করবার ম'ত দুঃসাহস কারো হবে কিনা সন্দেহ—এমন কি আমাদের মত বাস্তববাদী বিজ্ঞানীদেরও নয়। প্রেমের দৃষ্টিতে হয় আনন্দের সৃষ্টি; সেই আনন্দের সলিলে আমাদের ক্ষুদ্র 'আমিকে' নিমজ্জিত ক'রে আমরা ধন্য হই। আপনার পত্র পাঠ ক'রে এ-ই হোল আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া।

আপনার চিঠিখানি দুবার পাঠ করেছি আদ্যোপান্ত। কারণ, প্রথমবারের পঠনে অর্থগৌরবের দিকে বেশী নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আপনি লিখেছেন ইন্দিরা দেবী হাঁপানি রোগে ভুগছেন। এই রোগে যে কি নিদারুণ কষ্ট হয় তা দু-একজন বন্ধুর বেলায় দেখেছি এবং সহজে অনুমান করতে পারি। এত কষ্টের মধ্যেও তাঁর চিত্তের স্থৈর্য ও প্রসাদ যে অক্ষুণ্ণ

রয়েছে তার প্রধান কারণ আমার মনে হয় তাঁর অসাধারণ আত্মবিলোপের ও আত্মসমর্পণের ক্ষমতা। বহির্জগৎ ও আমাদের দেহের বিবিধ প্রক্রিয়ার খবর এবং ডাক বহন করে নিয়ে যায় আমাদের অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক কেন্দ্রে, সেখান থেকে যায় মনের মণিকোঠার দরজায়। ঐ দরজা যদি মন বন্ধ করে রাখে তবে ঐসব ডাকের কোন সাড়া বা অনুভূতি মিলতে পারে না। সাধারণতঃ মনের স্বভাব সাড়া দেওয়া—যাকে আপনি লিখেছেন স্বধর্ম। কিন্তু মনকে যদি অন্য কোনো বিষয়ে গভীরভাবে নিয়োগ ক'রে রাখা যায়, তখন সে আর সাড়া দিতে চায় না। ইন্দিরা দেবী তাঁর মনকে রেখেছেন নিমগ্ন করে তাঁর ইষ্টদেবতার ধ্যানে চিন্তনে। কাজেই তাঁর পক্ষে দেহের দুঃখ যন্ত্রণা পীড়াদায়ক হতে পারে না। এ অবশ্য আমাদের মত বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা। কেন এই জন্ম-মৃত্যু, কেন এত দুঃখকষ্ট, এ নিয়ে কালে কালে অনেক মহাপুরুষ চিন্তা ক'রে গেছেন—যাঁর ফলে গড়ে উঠেছে মানুষের ধর্মদর্শন সাহিত্য এবং আপনি হয়ত মানবেন না—আমি বলব বিজ্ঞান। অর্থাৎ পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যার চর্চা। এ-রহস্যের সমাধান-প্রচেষ্টা নিয়েই তো মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বিজ্ঞান বা অপরা বিদ্যা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এ-প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত বলা চলে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসেও এর নিদর্শন মেলে। এ-কারণে প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদকে বেদের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হোত। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।" ক্ষুৎপিপাসা-রোগাক্রান্ত মানুষের পক্ষে পরা বা অপরা কোন বিদ্যারই সাধনা সুগম নয়। মানব-জীবনের কাজকারবার চলে দুটি রাজ্য জুড়ে। একটি হচ্ছে তার বহির্জগৎ, আর একটি তার অন্তর্জগৎ। ঐ দুয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া চলছে অহরহ। এই উভয় রাজ্যের বাসিন্দা সত্তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। বহির্জগতের বাসিন্দা হচ্ছে জড় ও চেতন অবয়বী পদার্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট শক্তি, আর অন্তর্জগতের সত্তারাজি হচ্ছে নিরবয়বী সুখ, দুঃখ, হিংসা, প্রেম, ক্রোধ, অক্রোধ ইত্যাদি। এ দুই রাজ্য অসংলগ্ন নহে—এদের পরস্পরের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতিক্রিয়া নিয়েই মানুষের জীবন। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব টেঁকে না—মানুষ হিসাবে। বিজ্ঞান আছে বহির্জগতের স্বরূপ জানবার জন্য মগ্ন হয়ে। অধ্যাত্মবিদ্যার

কাজ হচ্ছে মানুষের অন্তর্জগতের খবর জানা—'আমির' স্বরূপ নির্ণয় করতে। সমগ্র মানবজীবনের রহস্য রয়েছে উভয় রাজ্যকে অধিকার ক'রে। কাজেই শুধু কোনো একটি রাজ্যকে জরীপ ক'রে সমগ্রের খবর মিলতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান একথা স্বীকার করে। তাই মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরামনোবিজ্ঞান (Para-psychology) ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার শুরু করেছে। বহির্জগতের গবেষণায় বিজ্ঞান যে-প্রণালী অবলম্বন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছে, এ-ক্ষেত্রে হয়ত তার অনেক পরিবর্তন আবশ্যক হবে। বিজ্ঞানের ও গাণিতিক সঙ্কেতের সাহায্যে এ-রাজ্যের সন্ধান ও খবর হয়ত ভালো মিলবে না। এ-বিষয়েও বিজ্ঞান সজাগ হয়েছে। তথাপি, বিজ্ঞানের পন্থা যে একেবারে অচল হবে তাও স্বীকার করতে সে রাজী নয়। কেননা উভয় জগৎ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। এখানেই হয়ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আপনার মতের অমিল হবে।

বিশ্বাসের বেলায় বলা যায়—বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংশয়, এবং বিজ্ঞানের অসাধারণ ও বিস্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে এ-সংশয় বা অবিশ্বাসকে আশ্রয় ক'রে। বিজ্ঞান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নয় যে, বিজ্ঞানের সত্যগুলি হচ্ছে খুচরা সত্য ; এবং বহু খুচরা সত্যকে জোড়া দিয়ে যে একটি পাইকারী বা ব্যাপক সত্যের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানে—তারও কোন স্থিরতা নাই ;—কারণ, নূতন তথ্যের আবিষ্কারে তারও রূপ যেতে পারে বদ্‌লে, এমন কি তার সমূলে বিলোপ ঘটাও অসম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানের কোন সত্য চূড়ান্ত-চরম বা শাশ্বত নয়। কিন্তু তাই ব'লে বিজ্ঞানকে অবিশ্বাসী বলা চলে না। কেননা ধর্মের ম'ত বিজ্ঞানের গোড়ায়ও একটা বড় রকমের বিশ্বাস আছে যার অভাব হলে বিজ্ঞান হবে অচল। সে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এক শাশ্বত ও সনাতন নিয়মে বিশ্বাস—যাতে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি এবং গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে ও এর আশ্রয়রূপে যে এক বিশ্বব্যাপী চেতনা শক্তি (বা যাকে বিশ্বাত্মা বলা যেতে পারে) এরূপ কিছু রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা অস্বীকার করে না। একে ব্রহ্ম, ভগবান বা ঈশ্বর যে কোনো নামে উল্লেখ করা যায়। বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের

সিদ্ধান্তের বিশেষ অমিল নেই বলা চলে। একের প্রথম ধারণা হচ্ছে অন্যের সিদ্ধান্ত— পরীক্ষা প্রমাণের বিচারফলে।

আপনি নিজেকে অন্ধবিশ্বাসী ধর্মপন্থী ব'লে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানীদের বা বুদ্ধিবাদীদের উপর কটাক্ষ ক'রেই এরূপ লিখেছেন। আপনি অন্ধবিশ্বাসী হলেন কেমন ক'রে ? কারণ, যে মূল ধারণার উপব ধর্মের ভিত্তি তাকে অন্ধবিশ্বাস কেউ বলতে পারে না। যুগযুগান্ত ধ'রে তার কল্পনা ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগফলে মানুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'রে আসছে। একেই কেন্দ্র ক'রে মানুষের দর্শন শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের উপনিষদ ও দর্শন এর প্রধান সাক্ষী। একে কেউ অন্ধবিশ্বাস বলতে পারে না—এমনকি যাঁরা নাস্তিক বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁরাও না। অনেকে হয়ত সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হতে পারেন। ধর্মকে যখন আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে নিমজ্জিত ক'রে গোঁড়ামির সৃষ্টি করা হয়, কিংবা আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যে তাকে বিভিন্ন ক'রে দ্বন্দ্ববিদ্বেষের বা দলাদলির সৃষ্টি হয়, অথবা তার প্রচারের জন্য উন্মত্তভাবে অমানুষিক অত্যাচারের অভিনয় ঘটে— তখনই আসে অন্ধবিশ্বাসের কথা। কারণ তখন মানুষের ঘটে বুদ্ধিভ্রংশ। আসলে বিশ্বাস বুদ্ধিবিযুক্ত হতে পারে না। বুদ্ধি বলতে আমি বিশুদ্ধ বুদ্ধিকেই মনে করি—দুষ্টবুদ্ধি বা পাপবুদ্ধি নয়। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধিকেই অনেকে বলেন ধর্মবুদ্ধি। পাটোয়ারীবুদ্ধি বা কুটবুদ্ধিও বিশ্ববুদ্ধির অন্তর্গত নয়। ইংরাজীতে যাকে reason বলা হয়, তাকেই বিশুদ্ধবুদ্ধি বলা চলে, intellectকে নয়। এ-প্রসঙ্গে অঘটনে ওরফে miracle-এ বিশ্বাসের কথা উঠতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বা অস্বাভাবিক কোন তথ্য বা ঘটনাকে বিজ্ঞানী বিনা পরীক্ষাপ্রমাণে বিশ্বাস করতে পারে না ; করলে তার বিজ্ঞান-সাধনার ভিত্তি যাবে শিথিল হ'য়ে। কিন্তু পরীক্ষা-প্রমাণে যদি কোন অঘটন বা miracle-এ সত্যতা নির্ধারিত হয়, তাহ'লে বিজ্ঞানী খুঁজবে তার নূতন নিয়মকানুন। তাতে নূতন সত্যের আভাস মিলবে, এবং ঐ অঘটন বা miracle আর অঘটন থাকবে না। আপনার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মতের অনৈক্য হচ্ছে এইখানেই।

ঐতিহাসিক টয়েনবি (Toynbee) যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে (science) তার প্রয়োগ (technology) হতে বিশ্লিষ্ট ক'রে আলোচনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ। কারণ বিজ্ঞান রয়েছে জ্ঞানের সাধনায়, technology করছে ঐ জ্ঞানের প্রয়োগ। প্রয়োগ যখন অপপ্রয়োগে পরিণত হয় তখনই ঘটে যত অনর্থ। বর্তমানে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বব্যাপী বিভীষিকা—এ্যাটম্ এবং হাইড্রোজেন বোমার। ধর্মের অপপ্রয়োগেও পৃথিবীতে অনেক অত্যাচার ও অনর্থ ঘটে গেছে এবং এখনো স্থানে স্থানে ঘটছে। এর একমাত্র প্রতীকার মানুষের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা ধর্মবুদ্ধির জাগরণ। এখানে ধর্ম এবং বিজ্ঞান উভয়ের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

আপনি এক জায়গায় অন্নচিন্তা ও ভগবানের করুণার কথা, এবং চাক্‌রী বনাম পরের দাসত্বের কথা লিখেছেন। এ-বিষয়ে আমার মনের কথাও ব্যক্ত করি আপনার কাছে। আপনার সহানুভূতি পাব বিশ্বাস ক'রে। বেঁচে থাকতে হ'লে অবশ্য অন্ন সংস্থান করতে হবে—এ-কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। তবে এ নিন্দনীয় হয় যখন মানুষ তার নিজের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্নসংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে। এ-সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ সুস্পষ্ট ঃ

উপনিষদ পরিষ্কার বলেছে ঃ—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—

গীতায় বলেছে ঃ—

"ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"।

"তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ"।

অর্থাৎ যে কেবল নিজের জন্যে রাঁধে সে পাপকেই রেঁধে খায়।

চাক্‌রী করাটা দাসত্ব করা ব'লে আমি মনে করি না। কারণ মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির লেনদেন করতেই হবে। ব্যক্তিমাত্রকেই তার নিজের প্রয়োজনের জন্য সমাজের নিকট অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয় এবং তার বিনিময়ে সমাজকেও তাকে কিছু দিতে হবে। নতুবা সমাজ টিকতে পারে না এবং সমাজ না টিকলে ব্যক্তির জীবনও নিরাপদ হয় না। সমাজের কাছ থেকে আমরা যা পাই, অনেক ক্ষেত্রে সমাজকে আমরা তার উপযোগী বিনিময় দিতে পারি না।

চাকুরী ব্যবস্থাটা এই দেনাপাওনা মিটাবারই ব্যবস্থা। এখানে প্রভুত্বের বা দাসত্বের প্রশ্ন উঠতে পারে না। ওঠে, তার কারণ আমাদের ব্যক্তিগত অহমিকা। যিনি উর্ধ্বতন কর্মচারী তিনি যদি নিজেকে তার অধস্তন কর্মচারীর প্রভু মনে করেন, তবে সেটা হয় তাঁর ঘোর অজ্ঞান ও অহমিকার পরিচায়ক, প্রত্যেকেই তাঁর নিজ নিজ ক্ষমতা ও শিক্ষাদীক্ষা অনুযায়ী সমাজরক্ষা, তথা নিজের প্রয়োজন মেটাবার কাজে নিযুক্ত। সবাই সহকর্মী—সমাজের সেবায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এখনো মধ্যযুগের সংস্কারমুক্ত নয় বলে চাকুরীকে আমরা স্বাধীন কাজ মনে করতে পারি না। আপনি নিজেই কি সমাজের সেবা করছেন না—আপনার গানে, কবিতায় ও রচনায়? সমাজের মনের খোরাক আসছে আপনার পরিশ্রম এবং চিন্তা থেকে। এ-কারণে সমাজ আপনাকে দিচ্ছে আপনার যোগ্য সমাদর এবং সম্মান। আমরা কেউ কারো দাস নই—কিংবা বলা যেতে পারে সবাই সবার সেবায় নিযুক্ত। স্বাধীন ভারতে কোনো কাজে দাসত্বের কলঙ্ক থাকতে পারে এরূপ মনে করবার কারণ নেই। ইংরেজ রাজত্বে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ হয়ত ছিল। এ-বিষয়ে ইংরেজদের নিজদেশের দৃষ্টান্তই আমাদের অনুকরণীয়।

আপনি ভক্ত, ভগবানের করুণার অনুভূতি আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সারা জীবন বিজ্ঞান চর্চা ক'রে বিচারবুদ্ধি হয়েছে আমাদের একটু প্রবল। তাই প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় যখন দেখতে পাই জরা, ব্যাধি, দুঃখ, শোক, দৈন্য, অত্যাচার, অবিচার, হিংসা, বিদ্বেষ নিপীড়িত অগণিত নরনারীর হাহাকারই হচ্ছে এ সংসারের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তখন করুণার কোনো প্রমাণ পাই না। শুধু অশান্তি, বিদ্রোহ, পরস্পর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, সামাজিক অবিচার, রাজনৈতিক অত্যাচার, ধর্মের বিরোধ, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ, ইত্যাদি মানুষের জীবনযাত্রাকে যে একটি তিক্ত ও বিষাক্ত ব্যাপারে পরিণত ক'রে রাখে—এই প্রতীতিই প্রবল হয়ে ওঠে। শুধু মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্ কয়েকজন (যাঁদের বেশিরভাগ জীবনকাল নির্বিঘ্নে আরামে কাটে) তাঁরাই করুণার মহিমা কীর্তন করতে পারেন। সংসারের নির্মম দুঃখের চক্রতলে যারা নিষ্পেষিত হয়—এবং তারাই সংখ্যাবহুল—করুণার

দোহাই দিয়ে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়া চলে না। তবে ভক্তের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, তাঁরা দুঃখকেই বরণ করেন—জীবন এবং জীবনের সুখকে তুচ্ছ জ্ঞানে—বুদ্ধির নির্দেশে নয়, ভাবের প্রেরণায়।

বিশ্বসৃষ্টি ও মানবজীবনের রহস্য সমাধানের প্রচেষ্টায় স্বধর্মের অনুবর্তী হয়ে মানুষ চলেছে তিনটি বিভিন্ন সাধনার পথ অনুসরণ ক'রে, যাকে আমরা বলি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পথ। বিজ্ঞানের পথকে জ্ঞানের পথেরই সগোত্র ব'লে ধরা যায়। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের ধারণার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। বিজ্ঞান হচ্ছে পন্থা-বিশেষ, লক্ষ্য নয়। পন্থাকে লক্ষ্যের সঙ্গে একাঙ্গী ক'রেই আমরা অনেক সময়ে সৃষ্টি করি যত গোলমালের। আজকার মত এখানেই ইতি করি।

ইন্দিরা দেবী কেমন আছেন এখন? তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দেবেন। তিনি তাঁর সাধনবলে অস্তিত্বের যে-উর্ধ্বস্তরে উঠতে পারেন, আমরা তার কোন খবর রাখি না। তাই আমরা বিস্মিত হই, তাঁর অসাধারণ ধৈর্য এবং চিত্তপ্রসাদ দেখে নিদারুণ দেহযন্ত্রণার মধ্যেও। তিনিই একমাত্র কবির কথায় বলতে পারেন—"তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"

আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানবেন।

ইতি—স্নেহধন্য

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বিজ্ঞানের অবিজ্ঞতা

শ্রীশিশিরকুমার দাশ অধ্যাপকেষু,

তোমার চিঠিটি পেয়ে খুশি হয়েছি বিশেষ করে এইজন্যে যে, তুমি স্বধর্মের পথে চলতে কৃতসংকল্প। এই-ই তো চাই। গীতার একটি মূল প্রতিপাদ্যও তো এই-ই।

তোমার এ-কথাও অনস্বীকার্য (বিশেষ করেই আমাদের এ-যুগে) যে, "সংশয় বুদ্ধি এসে সহজ বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করে, তর্কজাল এসে চারদিক অন্ধকার ক'রে দেয়।" শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটিকেই বলেছেন নানাভাবে তাঁর নানা লেখায়: যে, এ যুগের একটি যুগধর্ম হল বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকেই তন্ন তন্ন করে খুঁজে বিঁধে ভেজে কেটে চেখে বুঝতে চেষ্টা করা—যেহেতু আমরা স্বীকার করি বা না করি, আমরা হচ্ছি "Sons of an intellectual age." বিজ্ঞান এই প্রবণতাটিকেই ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে জাঁকিয়ে চেষ্টা করেছে শুধু বুদ্ধি দিয়ে সর্ববিধ আদিমতত্ত্বের (Prima truths-এর) হদিশ পেতে। কিন্তু বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে ছেঁকে পাওয়া যায় কেবল একটি বিশেষ জাতের সত্য: কি না, পরিসংখ্যানের তথ্য—statistics. এ তথ্যের ছকে অনেক ঘটনার কার্যকারণসম্বন্ধ বোঝা যায় হয়ত। (১) কিন্তু তাও খানিকটা দূর অবধি। তার বেশি যেই ওরা খোঁজে অমনি সব কিছু ঝাপসা। এর কারণ পরমহংসদেবের ঘরোয়া ভাষায়—এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না। তাই বিজ্ঞান অনেক কিছু শক্তি আমাদের হাতে এনে গছিয়ে দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করলেও জ্ঞান বলতে ঋষিরা যা বুঝতেন ও এখনো বোঝেন তার কোনো খবরই পরিসংখ্যানীরা দিতে পারেননি। পারবেন কেমন করে? উপনিষদে একটি গল্প আছে, জানো নিশ্চয়ই? একটি পাত্রে নুন গোলা হ'ল। গুরু শিষ্যকে বললেন চোখ দিয়ে দেখতে, সে পেলনা নুনের খবর। কান দিয়ে শুনতে—তাতেও উত্তর মিলল না। "ছুঁয়ে দেখতো।" ছুঁয়েও দিশা পেল না। আচ্ছা জিভ

ঠেকাও। বা বা! এই তো! নুন আছে বৈকি। গুরু বললেন শিষ্যকে যে, এই ভাবেই এই জগতে পরাৎপর অনুস্যূত হয়ে আছেন—প্রতি অণুতে গোলা হয়ে জারিয়ে রয়েছেন কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির নিকষে সে-সংবাদ মেলে না। মেলে কেবল জ্ঞানের বা প্রেমের রসনায়। কারণ খতিয়ে প্রেম ও জ্ঞান অভিন্ন। এ জ্ঞান বা প্রেম এলে দেখা যায়, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"—অর্থাৎ তুমিই তিনি।

তাই তুমি যে লিখেছ: "বিজ্ঞান যে বাণী শুনিয়েছে তা বড় হতাশার বাণী। এক এক করে মানুষের বহু যুগলালিত বিশ্বাসকে সে ভেঙে ভেঙে চলেছে"—তোমার এ কথা সত্যি বলে মানা যেত যদি মেনে নিতাম যে বিজ্ঞানই জীবনের হর্তাকর্তা বিধাতা। কিন্তু তা তো নয়, ভাই। বিজ্ঞান আর পাঁচটা বাহনের মতন সৃষ্টিলীলার খানিকটা রহস্যের ভার বহন করে মাত্র, যেমন করে শিল্প বা মানস দর্শন (intellectual philosophy)। তাই যদিও তোমার একথা সত্য যে, "সমস্ত জগৎ জুড়ে তাঁরই কাজ চলেছে," তবু একথা কিছুতেই সত্য বলে অঙ্গীকার করতে পারি না যে, তীক্ষ্ণধী বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে আমাদের অন্তরাত্মায় আশা বা হতাশা কমে বা বাড়ে। বিজ্ঞান তার স্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ, মহীয়ান, সুন্দর—যেমন শিল্প বা দর্শন। কিন্তু বিজ্ঞানের যা দেয় নয়, তার কাছে তা চাইলে চলবে কেন? মানুষের আত্মার অভীপ্সা যা দিতে পারে বিজ্ঞানের গজকাঠি দূরবান অনুবীন তা দিতে পারবে কোত্থেকে? বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বুদ্ধিদেবীর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন একটি লাখ কথার এক কথা (সাবিত্রী, ২-১০,)।

A million faces weave her knowledge here
And every face is turbaned with a doubt
কোটি মুখে দেয় বুদ্ধি জ্ঞানের আভাষ এ-জগতে
শুধু প্রতি শিরে হায় কাঁপে এক সংশয়-উষ্ণীষ।

আমাকে এক বৈজ্ঞানিক বন্ধু লিখেছেন যে সংশয়ই হল বৈজ্ঞানিকের প্রধান হাতিয়ার যার বলে সে বিশ্বজয় করেছে। কথাটা সত্য ব'লে মানতে বাধে। তবে এ টুকু দেখাই যাচ্ছে চোখের সামনে যে, 'সংশয়ের ছুরি দিয়ে ব্যবচ্ছেদ করতে করতেই বিজ্ঞান সত্যের অস্থিমজ্জার

প্রাণলোকে পৌঁছতে চাইছে। কিন্তু তা কি আর হয়। ব্যবচ্ছেদের পথে বৈজ্ঞানিক বড় জোর দু'চার স্তর মাংস-ধমনী স্নায়ু ভেদ করতে পারেন। সত্যের অস্থির সামনে যে ছুরি আর এগুতে পারে না—মজ্জায় পৌঁছনো 'কা কথা'? সেজন্যে চাই ধ্যানের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাই বিজ্ঞান যেটুকুর খবর দিতে পারে সেটুকু থেকে আমাদের যা লভ্য তাকে আদায় করে নিয়ে তাকে বলা চলে: "বেশ ভাই বেশ। তুমি অনেক কিছু খবর দিলে আমাদের স্নায়ু পেশী রক্তচলাচল সম্বন্ধে। কিন্তু প্রাণ বস্তুটি যে কী তার সম্বন্ধে ভুল দিশা দিয়ে অজ্ঞানীদের আরো ঘাবড়ে দিতে যেওনা, কারণ প্রাণ যে কি বস্তু সে-তত্ত্ব তোমার ব্যবচ্ছেদী ছুরির কাটাকুটির নাগালের বাইরে। তাই ও অপচেষ্টা ছেড়ে যা পারো তাতেই মন দাও। রথ চলতে পারে সমুদ্রতটের শেষপর্যন্ত—সমুদ্রে এগুতে হলে জাহাজকে ডাক দিতে হবে। অপিচ, যদি আকাশচারী হতে হয় তো তলব কবতে হবে পুষ্পক-কে, জাহাজেও সানাবে না।

আমার বলবার উদ্দেশ্য—জাগতিক জীবনের নানা ভিৎ ইমারৎ বিজ্ঞান গড়ুক না, তাকে আমরা সাধুবাদ দেব সর্বান্তঃকরণেই। কিন্তু সে মেঘদূতের যক্ষের মত 'স্বাধিকার প্রমত্ত' হয়ে আত্মা বা ভগবান সম্বন্ধে রায় দিতে এলে "হতাশার" কবলে না পড়ে ব্যঙ্গের আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত হবে: বলব শ্রীঅরবিন্দের সুরে সুর মিলিয়ে যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে আসলে (সাবিত্রী ২, ১০)

A watch dog of the spirit's sense-railed house
Against intruders of the Invisible
It keeps close guard in front of custom's wall
And barks at every unfamiliar light
As at a foe who would break up its home.

ইন্দ্রিয় বেড়ায় ঘেরা আত্মার প্রহরী বুদ্ধিমান্
অদৃশ্য আগন্তুকেরে করে না বিশ্বাস, সীমান্তের
প্রাচীর সম্মুখে হয়ে আসীন যে করে প্রতিবাদ
তারস্বরে কুক্কুরের সম হায় অচিন আলোর
ঝলকে—পাছে সে দেয় ভেঙে তার সাধের নিলয়।

এ শুধু শ্রীঅরবিন্দের কথা নয়, এ যুগের মহামনীষী সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আর্ণলড টয়েনবিও তাঁর নানা গ্রন্থে বিজ্ঞানের সাধ্যের সীমার তথা অসহিষ্ণুতার উল্লেখ করেছেন এই সুরেই। (মনে রেখো তিনি যোগী ঋষি নন, বুদ্ধিবাদের জগতে থেকেই টের পেয়েছেন বুদ্ধির দৌড় কতদূর অবধি।) বলেছেন তাঁর Historian's Approach to Religion মহাগ্রন্থে যে, বিজ্ঞান মানুষের জীবনের অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারে না, কেননা সে লক্ষ্য তার চৌহদ্দির বাইরে। একথা হাল আমলে অনেক বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেছেন—যে কথা আমি লিখেছি আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানের ট্রাজেডি ও সুমতি'। (যদি চাও তো পাঠাতে পারি) টয়েনবি ঠিকই নির্দেশ দিয়েছেন (১৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য):

The true purpose of a higher religion is to radiate the spiritual counsels and truths that are its essence into as many souls as it can reach, in order that each of these souls many be enabled thereby to fulfil the true end of man."(২) এ-লক্ষ্য কী? মনীষী বলছেন অকুতোভয়েই (বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের বিষম মন্তব্যে একটুও ভড়কে না গিয়ে): "Man's true end is to glorify God and to enjoy Him forever." (৩)—একথা তিনি অপ্রতিবাদী মনে করেন কেন না—"Man's goal is to seek communion with the Presence behind the phenomena, and to seek it with the aim of bringing his self into harmony with this absolute spiritual reality." (৪)

পরম আরাধ্যের এই-যে স্বীকৃতি, এর উদ্ভব আমাদের অন্তরের একটি শাশ্বত তৃষ্ণা থেকে। এ-তৃষ্ণা চায়—যে উৎস থেকে আমাদের জন্ম তার গঙ্গোত্রীর খবর পেতে। কেন এ-খবর চাই আমরা? এই জন্যে যে, কেবল এ-প্রেম-গঙ্গোত্রীর সঙ্গে মিলনের ফলেই আমরা আনন্দধন্য হতে পারি—জীবনের হাজারো আধিব্যাধিকে অতিক্রম ক'রে অমৃত হ'তে পারি: "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। অন্য কোনো পথে মানবত্মার মুক্তি নেই—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" বিজ্ঞান বস্তুবিচারের পথে চলে তার নিজের পায়ে-চলা-পথে, নানা অবান্তর কাঁটাবন জঞ্জাল সাফ করতে করতে। ফলে সে বস্তুবিশ্বের এ-ও-তা নানা শক্তির খবর পেয়ে দেখাতে পেল এ-শক্তিকে চলানো যায় বুদ্ধির নির্দেশে। কিন্তু শুধু বস্তু-

বিশ্বের এই সব বাহ্য খবর পেলেই তো সৃষ্টির আনন্দতত্ত্বের নিত্যলোকের পাসপোর্ট পাওয়া যায় না, আর এ-আনন্দলোকে না পৌঁছলে বোঝাই যায় না জীবনের অর্থহীন গতির লক্ষ্য। মনে হয়—বাইরে থেকে দেখলে —যে আমাদের অগুন্তি জৈব চেতনা কেবল বুদ্বুদের মত ফুলে উঠছে ফেটে মিলিয়ে যেতে। ব্যস। বিজ্ঞান বলল থার্মডাইনামিক্স-এর দ্বিতীয় আইন অমোঘ। কাজেই সূর্য ও গ্রহরা সব এক তাপে পৌঁছালেই জীবন থেমে যাবে আমাদের সৌরলোকে। কিন্তু একথা যদি মেনেও নিই তাহলেও জেরা করা চলে—বিজ্ঞান কেমন করে জানল আরো অগুন্তি সৌরলোকে (অগুন্তি নক্ষত্রের গ্রহে উপগ্রহে) প্রাণ থাকবে না? আমাদের ইহলোকে অমুক অমুক আইন অনুসারে জীব বাঁচে; কিন্তু আরো কত রকম পরিবেশে পটভূমিকায় যে প্রাণের অসংখ্য স্ফুরণ ও বিবর্তন হচ্ছে না, একথা কি আমরা জোর করে বলতে পারি মাত্র তিনশো বৎসরের বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞানের জোরে? না তাই, এ একটা কথার কথা মাত্র নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে যে উচ্চধারণা পোষণ করতেন তার মূলে ছিল তাঁদের নাবালকত্ব। একটু সাবালক হতে না হ'তে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা আর কিছু বুঝুন আর না বুঝুন এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছেন যে তাঁদের সব আবিষ্কার নিদান থিওরিই সামান্য, সীমিত, অপলকা। নিউটনের বিনয়োক্তি স্মরণ করো যে, তিনি সমুদ্রতীরে মাত্র কয়েকটি ঝিনুক ও উপলের খবর পেয়েছেন, অগাধ জ্ঞানসিন্ধু অনাবিষ্কৃতই রয়েছে। আইনষ্টাইন বলেছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল ব্যাপ্তি, দুরন্ত গতি ও বিরাট নাট্যলীলার অব্যর্থ নিয়ম কানুন দেখতে দেখতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'তে হয় যে, এ-লীলার কতটুকুই বা বোঝে আমাদের সীমিত বুদ্ধি! জীনস তাঁর বিখ্যাত The Universe Around Us গ্রন্থে লিখেছেন যে লক্ষ লক্ষ তারার চারিদিকে যে লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহ ঘুরছে তাদের মধ্যে কোথাও যে চৈতন্যময় জীবের বসবাস নেই একথা কেউই জোর করে বলতে পারে না। তাই সৃষ্টিলীলার আদিমতত্ত্ব বা অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মতামতকে প্রামাণিক মনে করতে যাব কী দুঃখে?

তাছাড়া বিশ্ব সত্য জানবার তো একটি মাত্র পথ নয়। আজকের

বৈজ্ঞানিক "বস্তু ও শক্তি অভেদ" এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন বস্তুবিশ্লেষণের ফলে। বৈদিক ঋষিরা এ সত্যের ঘোষণা করে গেছেন হাজার হাজার বৎসর আগে। তাঁরা অনেক কিছুই ধ্যানে পেতেন যার প্রমাণ মিলেছে বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরিতে বা আরো নানা সন্ধানীর নিরীক্ষা পরীক্ষায়। এই মহাঋষি ও ধ্যানীরা এ-ও বলেছেন এক বাক্যে সমান জোরালো মন্ত্র ঘোষণায় যে, বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধু, জীবের মধ্যেই শিব—আত্মা পরমাত্মার মধ্যে ভেদ যেটুকু সেটুকু আড়াল বা আবরণের মাত্র, তাই দৃশ্যতঃ সামান্য জীবও ধ্যানের প্রেমের মধ্য দিয়ে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এ-সত্যকে চাক্ষুষ করতে পারে যে, আমিই শিব—'সোহং'।

এও কথার কথা মাত্র নয়—শত শত মহাত্মা যোগী ঋষি তপস্বী এ সত্য উপলব্ধি করেছেন, দেখেছেন যে, বিশ্ব বিশ্বাতীত থেকে আলাদা নয়—পরমহংসদেব বলেছিলেন, "দেখলাম স্পষ্ট—তাঁর চৈতন্যে সমস্ত জারিয়ে রয়েছে"—যার সাহেবি নাম Saturation, মন্ত্রের ভাষায় এ সত্যের পাঠ হল: 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের এ-সার্বভৌম উপলব্ধি কি কয়েকজন হ্রস্বদৃষ্টি বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকের প্রতিবাদে বাতিল হতে পারে কখনো? টয়েনবি কি মিথ্যা বলেছেন যে, সাধুসন্ত আর্যতপস্বী যুগাবতারের চেতনাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চেতনা—আর সব যাঁরা তাঁদের কারুর চেতনাই এত উচ্চে ওঠেনি—কর্মী, শিল্পী, রাজনীতিক, কবি, এদের স্থান সাধুসন্ত মহাপুরুষদের নিচে। উপরে নয়। (৫)

এ যে সত্য তা তাঁরা সবাই জানেন যারা মানবিক চেতনার ক্রম-বিকাশের শিখরে পৌঁছে নাগাল পেয়েছেন ভাগবতী চেতনার—দেখেছেন সেই সত্যকে যাকে দেখলে জীব শিব হ'য়ে অশোক হয়। জেনেছেন সেই আনন্দময়কে যাঁকে জানলে সে অভয় হয়—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন"—সর্বোপরি, জীবের দৃশ্যমান নগণ্যতাকে ডিঙিয়ে পৌঁছেছেন সেই ধন্যলোকে যেখানে কিছুই তুচ্ছ নয়—কেননা সবই তিনি যিনি অজস্র গ্রহ তারা নীহারিকার রথযাত্রার নিত্য-সারথি হ'য়ে শুধু যে সে অগুন্তি উধাও বিশ্বকে চালাচ্ছেন তাই নয়—তাদের অমোঘ লাগাম ধরে আছেন কোটি কোটি যুগ ধরে।

এ যখন সত্য, তখন বিজ্ঞানীর মধ্যে দু'চারজন বিজ্ঞম্মন্যের হাল্কা

সাময়িক আবিষ্কারের ভুল পাঠে দিশাহারা হ'য়ে দমে যাওয়া কি বোকামি নয়? টয়েনবি এ কথা বারবার উল্লেখ করেছেন যে, জীবন 'চান্স'-সম্ভূত নির্লক্ষ্য অর্থহীন খামখেয়ালী (৬) গতির পাগলামি এ-ধরণের কথায় কান দেওয়া চলে না কেননা এ ধরণের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা খানিকটা মাত্র জেনেছেন। আরো জানলে সব বদলে যাবে। মেয়েরা পুতুল খেলায় যখন আনন্দ পায় তখন জানেনা নিজের কোল জুড়ে সন্তান এসে তাদের নিয়ে খেলায় আনন্দ কত বেশি। তেমনি সবাইকে যে মা নিজের সন্তানের মতন ভাবতে পারেন (এ বুদ্ধের বাণী) তাঁর আনন্দ আরো কত বেশি হবে বলোতো? আমরা চলেছি পা-পা ক'রে। কতদূরই বা গিয়েছি সত্য জিজ্ঞাসায়? কতটুকুই বা দেখেছি? সবাইকে যিনি চালাচ্ছেন জ্ঞানী ও ভক্তদের শিরোমণিরাও তাঁর মাত্র কণিকা আভাষ পান। পরমহংসদেব বলতেন পিঁপড়ের কথা—একদানা চিনি মুখে ক'রে যে বলেছিল কাল এসে চিনির পাহাড়টাই নিয়ে যাবে। ব'লে হেসে বলেছিলেন তিনি: "মহাজ্ঞানী ঋষি মুনিরা বড় জোড় এক আধটা ডেও পিঁপড়ে। তার বেশি নয়।"

এইটুকু বুঝলেই আর গোল থাকে না যে, আমরা বিরাট বিশ্বলীলার এক অতি ক্ষুদ্র ভংগ্নাশেরই খবর রাখি, খুব কমই বুঝতে পারি, হাজার চেষ্টা করলেও খণ্ড চেতনা পেতে পারে না অখণ্ড চেতনার ব্যাপ্তি লক্ষ্য বা শক্তির হদিশ। কিন্তু তবু এইখানেই প্রেমের ভক্তির জয়জয়কার যে, এহেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষও ডাক দিতে পারে বিরাট ব্রহ্মের সত্তাকে আর ডাকার মত ডাকলে তিনি আসেন অন্তরে তারই মধ্যে উদয় হ'তে বাইরে তারই খেলার সাথী হ'তে। এ হেন শিবধর্মী জীবকে বৈজ্ঞানিক দমিয়ে দেবে তার নাস্তিক নির্দিশাদর্শনের ধমকে যে, ভগবান আত্মা শাশ্বত চৈতন্য কিছুই নেই, সব কল্পনা. বাস্তব সত্য শুধু বস্তু—বা অচেতন শক্তি তরঙ্গের অর্থহীন নৃত্য? এর নাম কি জ্ঞান? হাসি পায়।

না, ঋষিরা যা দেখেছেন শুনেছেন চেখেছেন তাই-ই প্রকৃত জ্ঞান—

পরমহংসদেবের পরিভাষায় 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ যে ভগবানকে দেখেছে চেখেছে সে তাঁর আনন্দময় সত্তায় মিলে জেনেছে যে তিনি ছাড়া বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তিনিই সব হয়েছেন অনোরণীয়ান্ থেকে মহতো মহীয়ান্।

শ্রীঅরবিন্দ এই পরম মিলনের মন্ত্রবাণী ঘোষণা করেছেন তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীর শেষ খণ্ডে : The Book of Everlasting Day তে—যেখানে ভগবান সাবিত্রীকে দিচ্ছেন তাঁর প্রেমের বর, জ্ঞানের বর, মিলনের বর (মাত্র সাতটি চরণ উদ্ধৃত করি) :

A vision shall compel thy coursing breath
Thy heart shall drive thee on the wheel of works,
To meet me in the abyss and on the heights,
To feel me in the tempest and the calm
And love me in the noble and the vile,
In beautiful things and terrible desire ...

এক ধ্যানস্বপ্ন হবে নিশ্বাসে তোমার অনুস্যূত.
সাধনার রাজরথে হবে তব হৃদয় উধাও,
গহন গহ্বরে দীপ্র শিখরে আমার পাবে দেখা,
ঝটিকায় শান্তিব্রতে আমাতে করিবে অনুভব,
বাসিবে আমায় ভালো ঔদার্যের নীচাশয় মাঝে
সুন্দরের অভিযানে, প্রলয়ঙ্করী বাসনায়।

(১) এডিংটন লিখেছেন যে রিয়ালিটী কী তা নিয়ে আর বিজ্ঞান মাথা ঘামায় না, সে কয়েকটা equation (সমীকরণের) ছক কেটে ধরে যে অমুক অমুক পরিস্থিতিতে এ-ও-তা এই ছক মেনে চলে। মডেল তৈরি ক'রে বোঝানো যায় না কোথায় কী ঘটছে কিসে কী হচ্ছে। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র লিখেছি : "বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি" নিবন্ধে।

(২) উন্নত ধর্মের লক্ষ্য—অধ্যাত্মবাণী ও সত্যের প্রচার—যা তার প্রাণের নির্যাস। যত বেশি লোকের মনে এ-নির্যাস চারিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল যাতে করে তারা মানুষের চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

(৩) মানুষের পরম তৃষ্ণা হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন তথা সে-মহিমার নিত্য রসাস্বাদন।

(৪) মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে ঘটনার জগতের আড়ালে যিনি ঘটক আছেন তাঁর সঙ্গে মিলন যাতে করে অদ্বৈত সত্যের সঙ্গে সে নিজের ঐক্যবোধ করতে পারে। (Essentials and Non-essentials of Religion অধ্যায়)

(৫) The works of artists and men of letters outlive the deeds of business men, soliders and statesman. The poets and philosophers outrange the historians, while the Prophets and the Saint outlast them all.

(Civilization on Trial—Arnold Toynbee, My View of History, P. 5)

(৬) বলতে কি কোনো গতিই খামখেয়ালী নয়—একটা বিরাট ঋতম-এ (law) বাঁধা। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাই বলেছেন তাঁর সাবিত্রীতে :

This world was not built with random bricks of chance,
A blind God is not destiny's architect ;
A conscious power has drawn the plan of life,
There is a meaning in each curve and line.

রচিত হয় নি বিশ্ব নিরর্থক শিলা মৃত্তিকায়,
এক অন্ধ ধাতা নয় স্থপতি মানবনিয়তির ;
আঁকিল জীবন মানচিত্র—এক শক্তি সচেতন
সুগভীর নিহিতার্থ আছে প্রতি রেখার, রঙের।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পরমা সংস্কৃতি*

আমাকে আপনারা এ-প্রীতির উৎসবে ডেকেছেন শেষ দিনে শান্তি পাঠ করতে—এ আমার মহৎ সম্মান, এইটুকু বললেই প্রীতির ঋণ শোধ হয় না। কেন বলি।

মহাভারতে উদ্যোগ পর্বে আছে কৃষ্ণ তাঁর কুটিরে পদার্পণ করলে বিদুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন :

যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ! ত্বদ্দর্শন সমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যম্ অন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥

দর্শনে তব কমললোচন ! যে-প্রীতি হৃদয়ে ওঠে উছলি—
কী আর বলিব ? ওগো নিখিলের অন্তর্যামী, জানো সকলি।

এর নিহিতার্থ এই যে, প্রীতির প্রাণের কথাটি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু অন্তর-লোকেই তার যাওয়া-আসা। সামাজিক প্রীতি আন্তরিক প্রীতির ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

এ যুগের সংস্কৃতি-সভায় আধুনিক ভারতে প্রথমেই ভগবানের গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয়ত অসমীচীন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন ভগবান্ অশ্বপতিকে বলছেন :

"Speak not my secret name to hostile time"

—অর্থাৎ, "এ-যুগে আমার নাম গোপন রেখো, কারণ লোকে এখন নাস্তিক।" আমার ভরসা শুধু এই যে, আমি আপনাদের প্রীতির দ্বারে অতিথি, তাই জানি—আমার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন—আরো এই জন্যে যে, এ-যুগে নাস্তিকতার বাড় বাড়লেও মনস্তাত্ত্বিকরা মানেন অন্ততঃ গীতার একটি কথা যে : স্বভাবস্তু প্রবর্ততে—অর্থাৎ স্বভাব যায় না ম'লে। তবে আমার একটি সাফাই আছে মোক্ষম—যে-সাফাইটি আমার কন্যাশিষ্যা ইন্দিরা দেবী প্রায়ই পেশ করেন—কোনো অতিথি আমাদের মন্দিরে এলে বলেন : "আমাদের কাছে যখন এসেছেন কিছু শুনতে, তখন আমরা যা জানি তারি কথা ছাড়া আর কীই বা বলব বলুন ?

ফলের দোকানে এসে পাটের খবর চাইলে চলবে কেন?" তাই এইটুকু ভূমিকা ক'রেই আমি সংস্কৃতি বলতে এ-চৌষট্টি বৎসরে যা অন্তরে উপলব্ধি করেছি তারি কথা বলব—এ-সম্বন্ধে চলতি সব মামুলি বুলিকে পাশ কাটিয়ে।

সংস্কৃতি শব্দটির বৈদিক অর্থ মন্ত্রাদিশোধন: কিনা, শুদ্ধিদান—মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। সংস্কার বলতে বোঝায় যে-রিফর্ম তারি সগোত্র—কেবল আধ্যাত্মিক আমেজ আছে, এই যা। সাহেবি "কালচার" শব্দটির প্রতিরূপ হিসেবেই বাংলায় এ-শব্দটির প্রবর্তন করেন প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বাংলা ভাষাকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর অসামান্য প্রতিভায়, তাই তাঁর কথা না শুনবে কে? সংস্কৃতির পূর্বস্থূরী ছিল কৃষ্টি—যার আভিধানিক অর্থ কর্ষণ বা ফসল ফলানো। এ-শব্দটি ছিল কবির কর্ণশূল। তিনি ১৯৩২ সালে ৺শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "কালচার শব্দের একটা নতুন বাংলা কথা হঠাৎ দেখা দিয়েছে—চোখে পড়েছে কি? কৃষ্টি। ইংরেজি শব্দটার আভিধানিক অর্থের বাধ্য অনুগত হ'য়ে ঐ কুশ্রী শব্দটাকে কি সহ্য করতেই হবে? এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে, ভাষার গায়ে ওটাও তেম্‌নি কামড়ে ধরেছে। মাতৃভাষার প্রতি দয়া করবে না তোমরা? অন্য প্রদেশে ভদ্রতাবোধ আছে। এই অর্থে সেখানে ব্যবহার 'সংস্কৃতি'।"

ভাগবতের গোড়াতেই একটি শ্লোক আছে, তার-শেষার্ধে আছে: "পিবত ভাগবতং রসম্ আলয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—অর্থাৎ

ভাগবত রস অন্তিম দিন অবধি করুন তাঁরা
পান আনন্দে—রসিক এবং ভাবুক ধরায় যাঁরা।

কিন্তু রসিক তথা ভাবুক মিশিয়ে রসিকভাবুক শব্দটি সমাসসিদ্ধ হ'লেও সংস্কৃতিবান্ শব্দটির মতন একটি মূল শব্দ বলা চলে না ব'লে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিবান্ শব্দ দুটি কালচার ও কালচার্ড শব্দদ্বয়ের প্রতিরূপ ব'লে গণ্য হওয়া বেশি বাঞ্ছনীয়—একথা মানতেই হবে।

ব্যস্। এবার কালচার শব্দটির নিহিতার্থ নিয়ে একটু আলোচনা

বিশ্ববিশ্রুত জর্মন ভাবুক অসওয়াল্ড্ স্পেংলার তাঁর বিখ্যাত Untergang des Abendlandes (Decline of the West) গ্রন্থে কালচার শব্দটির সংজ্ঞানির্ণয় করতে অনেক কিছুই বলেছেন। তার সার মর্ম এই যে, মানুষের নিয়তি (Shicksal = destiny) তাকে যে-উর্ধ্বপথে টেনে তুলতে চায় সে-টানটি যখন নিঃশেষ হয়—অর্থাৎ মানুষের উর্ধ্ববিকাশ যখন থেমে যায়—তখন কালচারের অন্তঃশক্তির ঘনিয়ে আসে মরণদশা, বেঁচে ব'র্তে থাকে শুধু তার বাইরের কাঠামোটি, ওরফে "সভ্যতা" (Civilization)। তাই—বলছেন সাহেব—স্তিমিতায়মান (decadent) প্রতীচ্যে মানুষ আজ কালচারে দেউলে হ'য়ে শুধু শুষ্ক সভ্যতাকে নিয়ে ঘর করছে। একথা সত্য হোক বা না হোক, সাহেবের এই বিলাপের মূলে আছে একটি মহৎ স্বীকার যে, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় তার স্বপ্ন দুরাশা উর্ধ্বাচারণের অভীপ্সা, তাই তার নিয়তির উর্ধ্ববিকাশ থেমে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল।

এখন একটু বুঝতে চেষ্টা করি নিয়তির উর্ধ্ববিকাশ বলতে ঠিক কী বোঝায়।

একথা বোধ হয় কোনো সংস্কৃতিবান্ মানুষই অস্বীকার করবেন না যে, প্রতি মানুষের হৃদয় হ'য়ে এসেছে এক একটি কুরুক্ষেত্র—যে-চিরন্তন আখড়ায় দুটি বিরোধী শক্তিসংঘ চায় তাকে বশে আনতে। একটি চায় তাকে রসাতলে নামাতে, যার নাম আসুরিক মনোবৃত্তি—নিষ্ঠুরতা, দম্ভ, শক্তিমদ ও স্বার্থ যার উপজীব্য : অন্যটি চায় তাকে স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ করতে—দয়া, দীনতা, নিরভিমানিতা ও প্রেম যার মূল প্রেরণা। কিছু দিন আগে রাসেল তাঁর Impact of Science on Society-তে বলেছেন (৯১, ৯২ পৃঃ): "মানুষ আজ ধ্বংসের কিনারায় এসেছে, সর্বনাশকে ঠেকাতে হ'লে তাকে বর্জন করতে হবে নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, লোভ, প্রতিযোগিতা ·····অর্থাৎ যাকে ফ্রয়েড-পন্থীরা নাম দিয়েছে আত্মঘাতী বাসনা—death wish। আসলে সমস্যাটির সমাধান হ'তে পারে একটি অত্যন্ত সহজ ও মামুলি উপায়ে—উপায়টি এতই সরল যে আমি উল্লেখ করতে কুণ্ঠা বোধ করছি—পাছে বিজ্ঞ সিনিকেরা আমাকে হেসে উড়িয়ে দেন। সমাধানটি হ'ল—আমার দুঃসাহস ক্ষন্তব্য—প্রেম, খৃষ্টধর্মীয় প্রেম

(Christian Love) বা করুণা। যদি তুমি হৃদয়ে এই প্রেম অনুভব করো…তাহ'লে মানুষের দারুণ আধিব্যাধির নিরসন কিছু না কিছু তুমি করতে পারবেই পারবে।"

কেবল এখানে গোড়ায় গলদ এই যে, শুধু বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির প্রসাদে এই খৃষ্টধর্মীয় প্রেম হৃদয়ে অনুভব করা যায় না খৃষ্টকে বাদ দিয়ে—করুণাকে আবাহন করা যায় না করুণাময়কে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে। কিন্তু হ'লে হবে কি, পাশ্চাত্য দেশে আজকের দিনে বিজ্ঞান ও বস্তুতন্ত্রে দীক্ষিত সংস্কৃতিবান্ মানুষ খৃষ্ট ও তাঁর করুণাময় পরম-পিতাকে বরখাস্ত ক'রে বেদীতে চড়িয়েছে জাতীয়তা ও ঐহিকতাকে। ফলে হয়েছে শুধু যে প্রেম ও অনুকম্পার ভরাডুবি তাই নয়, হয়েছে আমাদের ঊর্ধ্বমুখী হৃদয়বৃত্তিগুলির মূলোচ্ছেদ। শিকড় কেটে গাছকে বাঁচানো যেমন অসম্ভব, বস্তুবাদী বুদ্ধিকে বেদীতে বসিয়ে প্রেম প্রীতি করুণা তিতিক্ষাকে আমল দেওয়া ঠিক তেম্‌নি অসম্ভব। এই জন্যেই মানুষ আজ "আত্মঘাতী বাসনা"কে বরণ করেছে নাস্তিক আসুরিকতার প্ররোচনায়—আণবিক দৈত্যের হাত ধ'রে এসে পৌঁছেছে ধ্বংসের কিনারায় সর্বলুপ্তির অতল গহ্বরে ঝাঁপ দিতে।

এরই নাম দিয়েছেন রাসেল মরণমুখী বাসনা বা বুদ্ধি।

এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তির একটিমাত্র প্রতিষেধক আছে—শ্রদ্ধা। গীতায় তাই ঠাকুর পই পই ক'রে মানা করেছেন সংশয় ও দেবদ্রোহিতাকে আমল না দিতে, বলেছেন শুধু শ্রদ্ধাবান্ই জ্ঞানকে পায়—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। স্বামী বিবেকানন্দের একটি চমৎকার চিঠি মনে পড়ে এ সম্পর্কে, তিনি লিখেছিলেন: "আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না, যথার্থ সাধুতা, উদারতা ও মহত্ত্ব যেখানে, সেখানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হোক।"

উদ্ধৃতিটি ঠিক সময়েই হাজিরি দিয়েছে। কারণ যথার্থ সংস্কৃতিকে আমি এই শ্রদ্ধার সমার্থক মনে করি—এই আত্মিক ইষ্টার্থে (values) শ্রদ্ধা, বুঝি—সাধুতা, উদারতা ও মহত্ত্বের বিকাশ। ইতিহাসের প্রতি পাতায়ই কি দেখতে পাই না মানুষের এই চিরন্তন অভিজ্ঞতার এজাহার যে, যেখানেই মানুষ নিজের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান, অসাধুতা ও নিম্নমুখী স্বার্থ

বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, সেখানেই তার ঊর্ধ্বপ্রগতি ব্যাহত হ'য়ে সর্বনাশা অশুভবুদ্ধি তাকে পেয়ে বসেছে? কেবল মুস্কিল এই যে, ব্যক্তির সম্বন্ধে এ-সত্যটি স্বতঃসিদ্ধের মতন মনে হ'লেও জাতীয় অধঃপতন এত স্পষ্ট ও অপ্রতিবাদ্য হ'য়ে চোখে পড়ে না। তাই মানুষ জাতীয়তার অভিমানে অন্ধ হ'য়ে দেখেও দেখতে পায় না যে জাতি ব্যক্তির সমষ্টি ব'লে উভয়ে একই পথে চলে আত্মঘাতের মহাপ্রয়াণে—সংস্কৃতি খুইয়ে শুধু বাহ্য সভ্যতার সস্তা চেকনাইকেই বরণ করে একই শোকাবহ ভ্রান্তিবিলাসে।

ভাগ্যক্রমে পুণ্যভূমি ভারতে আমরা চিরদিন মহৎ ও উদার সাধুসন্তদের কাছেই পরমা সংস্কৃতির দীক্ষা পেয়ে এসেছি, শুনে এসেছি যে, ভাগবত প্রসাদের ছিটেফোঁটা পেলেও আর ঠিকে ভুল হয় না, অজ্ঞানতিমিরান্ধ নয়ন পায় আলোর দিশা, বুভুক্ষু প্রাণ—পথের পাথেয়।

যত দুর্গতিই হই না কেন, আমরা আজো যে বেঁচে আছি তার কারণ—ধর্মে বিশ্বাস এখনো আমাদের ভারতীয় গণমনে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। কেবল শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—শুভবিশ্বাস ও শুভবুদ্ধির পরিপন্থী বহু। এদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক শত্রু হ'ল আপাত-মনোহর বস্তু-তান্ত্রিকতার ভোগবাদী বুদ্ধি—যার অন্ত্যেষ্টি দর্পমূঢ় রণসজ্জার আত্মঘাতে। তাই আমাদের আজ আরো সশ্রদ্ধ নিষ্ঠায় বরণ করা চাই মহাজনে শ্রদ্ধা, যেহেতু "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যুধিষ্ঠিরের এ-মহাবাণী শুধু তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কাব্যরূপ নয়—মানব মনের একটি শাশ্বত উপলব্ধির এজাহার : যে, "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"—যে যা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে শেষে তা-ই হ'য়ে দাঁড়ায়। গত দেড়শো বৎসরে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ঊর্ধ্ববিকাশ কী ভাবে আমাদের সহায় হ'য়ে এসেছে তার ইতিহাস একটু পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব গীতার কথা কত সত্য। সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা কাব্য নাটক গান ভাস্কর্য দেশাত্মবোধ—সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ এ তিন মহামানবের তপস্যালব্ধ অধ্যাত্ম-প্রেরণা—সব জড়িয়ে একটি মহান্ জাতীয় রেনেসাঁস—নবজন্ম—আমাদের গৌরবের বস্তু হ'য়ে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত Renaissance in India-য় পরিচয় পাওয়া যায়—অধ্যাত্মলোকের আলো সমাজে কী ভাবে সক্রিয় হয়। এ-বইটি লেখা হয়েছিল পঞ্চাশ বৎসর

আগে, কিন্তু আজও এর ছত্রে ছত্রে ভারতীয় মনের অধ্যাত্মসমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর তেম্‌নিই অম্লান, অক্ষুণ্ণ আছে।

পক্ষান্তরে, যেখানে এ-অধ্যাত্ম প্রেরণা নেই, সেখানে মানুষের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ কীভাবে জোয়ারের জলের মতনই ফেঁপে ওঠে—আজকের য়ুরোপের চিন্তানেতাদের লেখা পড়লেই প্রতীয়মান হবে—আমরা দেখতে পাব মানুষের সংস্কৃতি-সংকট নিয়ে ওদেশের ভাবুকবৃন্দ কতখানি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে। যথা, পয়লা নম্বর: বাহ্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যদি যথার্থ সংস্কৃতি হ'ত তাহ'লে হিটলারী জর্মন প্রভুজাতির (Herrenvolk) সামরিক হুহুঙ্কারই হ'ত এ-যুগের সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দোসরা: ধনবৃদ্ধি ও বিলাসসজ্জা যদি হ'ত আসল সংস্কৃতির ভিৎ তাহলে আমেরিকার মানুষ এত অশান্ত চঞ্চল হয়ে শুধু উত্তেজনার মায়ায় জাতীয় অসুখকে ভুলতে চাইত না। তেসরা: শক্তিমত্তাই যদি সংস্কৃতির অভিজ্ঞান হ'ত তাহ'লে ইংলণ্ড বা জাপানের আজ এ-দেউলে অবস্থা হ'ত না। সবশেষে, শুধু বুদ্ধির চাষেই পরমা সংস্কৃতির ফসল ফলে—একথা যদি সত্য হত তাহ'লে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাও আজ মূঢ়মতি রাজনীতিকের তাঁবেদার হ'য়ে তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি প্রতিভাকে সর্বধ্বংসের কুরুক্ষেত্রে 'সারথি বাহাল করতেন না।

এ-সব ক্ষেত্রে যথার্থ সংস্কৃতির কমবেশি অধোগতি হওয়ার কারণ স্পেংলার ঠিকই নির্দেশ করেছেন: যে সভ্যতব্য জীবনরীতি, ধনশালিতা, শক্তিমদ, বুদ্ধিবাদ—এরা সংস্কৃতির অভিজ্ঞান নয়। পরমা সংস্কৃতি বলব সেই প্রেরণাকেই—যা আমাদের নিয়তিকে সার্থক করে ঊর্ধ্বাভিসারে, ইন্দ্রিয়ভোগের সোণার হরিণের পিছনে মিথ্যে ধাওয়া করায় না। তাই ভারতের কবি মনীষী সাধুসন্ত মুনি-ঋষি সবাই একবাক্যে ব'লে এসেছেন আবহমানকাল যে, সেই সংস্কারই হ'ল পরমা সংস্কৃতি—যাকে বলা যায় আত্মার উপনয়ন, অর্থাৎ যে আমাদের কানে আত্মবোধের দ্বিজমন্ত্র দিয়ে বলে: "জিতং জগৎ কেন? মনো হি যৈন"—অর্থাৎ যে আত্মজয়ী সেই জগজ্জয়ী, যে-ধনজন সুখ-মানে মানুষ অমৃত না হয় কী হবে তাকে নিয়ে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্‌?" এই যে আশ্চর্য, অসাঙ্গরেশ প্রশ্নটি করেছিলেন ভারতের এক মহীয়সী—চারহাজার বৎসর

আগে—আজও সে-প্রশ্ন প্রতি অমৃতাশীর হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে ঠিক তেম্‌নি ব্যাকুল মূর্ছনায়—মনে করিয়ে দেয় সেই ঋগ্বেদের ঋষিদের পরমা সংস্কৃতির ঘোষণা—যার প্রসাদে "মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ" তাঁরা মানুষ হয়ে জন্মেও অমৃতের অধিকারী হয়েছিলেন।

এ-ধরণের সেকেলে কথা শুনে অনেকে হয়ত অপ্রসন্ন হ'য়ে বলবেন: "এ কী ধান ভানতে শিবের গীত?" বললে খুব ভুল বলবেন না—তাঁদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার ক'রে। কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের মতন মানুষেরও একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে। আমরা বলতে আমি বুঝেছি সেই শ্রেণীর তীর্থযাত্রীর কথা—যাঁরা শুধু যে ধর্মকে বিশ্বাস ক'রে পথের পাথেয় পেয়েছেন তাই নয়, যাঁরা ভগবৎ প্রসাদের দিব্যাঞ্জনে জগৎকে দেখতে শিখেছেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে, কাজেই আর মনে করতে পারেন না যে, আত্মার সংস্কৃতি বলতে বোঝায় তথাকথিত সভ্যতার ক্ষণিক চেকনাই—আজ আছে—কাল নেই বিলাসমোহ, অলীক সুখ ও সর্বোপরি, দুরন্ত উত্তেজনা। এ-শ্রেণীর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ একদা রমণ মহর্ষি আমাকে বড় সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম: "মানুষ সুখ ছেড়ে কৃচ্ছ্রকে, ভোগ ছেড়ে ত্যাগকে বরণ করবে কী দুঃখে? সুখে ভোগে যে আমাদের জন্মস্বত্ব।" তিনি হেসে বলেছিলেন: "একশোবার। কেবল সুখ বলো তুমি কাকে?" আমি বলেছিলাম: "যার দানে মন ভ'রে ওঠে।" তিনি সায় দিয়ে বলেছিলেন: "চমৎকার। কেবল বলো তো বাবা, ভোগবাদী সুখান্বেষীদের চেহারা দেখে মনে হয় কি তাঁরা পেয়েছেন এই মন-ভরানো সুখ? না বাবা, সে-বস্তু মেলে না বাইরে—মেলে কেবল অন্তরে। নিরন্নের দোরে ঘা দিলে তো ভিক্ষান্ন মিলবে না। পরম সুখ মিলতে পারে একটি মাত্র দাতার কাছে—আমাদের অন্তর। অন্য ভাষায়, সুখ মেলে না বহির্মুখী অন্বেষণে—যেখানে সুখের অন্ন নেই সেখানে হাত পেতে কান্নাকাটি করলে। সুখ পেতে হ'লে সব আগে ডুবতে হবে নিজের মধ্যে। জানতে হবে—'আমি' কে? এছাড়া আর পথ নেই।"

জগতের দিকে চাইলে জ্ঞানিরাজ রমণ মহর্ষির একথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এ-বিষয়ে সংশয় থাকে কি? দেখতে পাই না কি যে, যুগে

যুগে দেশে দেশে মানুষ সুখী হ'তে চেয়ে বাইরের অবাস্তর এ-ও-তা সিদ্ধির কাছে হাত পেতে ব্যর্থ হয়েছে? কেবল দুঃখ এই যে, সে তবু আজ ফের ভুলতে ব'সেছে যে আমাদের অন্তরে যে-দেবতা প্রচ্ছন্ন রয়েছেন তাঁকে পেলে তবেই নিঃস্ব দাস হয়ে ওঠে বিশ্বরাজ, মনের কালো হ'য়ে ওঠে আলোর আলো। রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন ও মানতেন ব'লেই তাঁর বহু কবিতায়ই এই অন্তর্মুখিতার জয়গান গেয়েছেন, স্থানাভাবে তাঁর "নৈবেদ্য" থেকে শুধু একটি কবিতার শেষ চারটি চরণ উদ্ধৃত করি:

"তোমারি মিলন শয্যা হে মোর রাজন্!
ক্ষুদ্র এ-আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত! ওগো বিশ্বভূপ!
দেহে মনে প্রাণে আমি এ কী অপরূপ!"

এই যে ঈশ্বরবাদ এর দুটি রূপ: যখন অন্তরে তাঁর প্রসাদ পাই তখন নিজের দেবত্ব উপলব্ধি করি এঁরই স্পর্শের প্রসাদে। তারপরই দেখতে পাই অন্তরে যিনি অদ্বৈত হ'য়ে আসেন বাইরে তিনিই বহুবিচিত্র হ'য়ে হাসেন।

এই উপলব্ধির পথে আমাদের অন্তরকে রওনা ক'রে দেয় যে-সংস্কৃতি তারই নাম পরমা সংস্কৃতি—সংস্কৃতির সংস্কৃতি। ওরফে ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবন। তাই এ-সংস্কৃতিকে পেতে হ'লে তাকে খুঁজতে হবে ধর্মেরি মণি-কোঠায়—শক্তির সাম্রাজ্যে নয়, ধনের ধুমধামে নয়, এমন কি বুদ্ধির বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়।

আমাদের বাংলার নব্য সংস্কৃতির যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের অগ্রদূত ছিলেন পূজ্যপাদ রামমোহন রায়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষকে খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদে, তাই উপনিষদের অনুবাদে ব্রতী হন হিন্দু-ধর্মের নানা অবাস্তর আবর্জনা সংস্কার করতে চেয়ে। অতঃপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ কতিপয় ধর্মনেতা এক নব সমাজের পত্তন করেন: ব্রাহ্মসমাজ। ওদিকে হিন্দুসমাজের অঙ্গন সাফ ও মেরামৎ করতে চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও আমাদের এই ধর্মভিত্তি সংস্কৃতির অন্যতম পথিকৃৎ হ'য়ে দাঁড়ান, তাঁর অসামান্য

মনীষাকে নিয়োগ করেন কৃষ্ণচরিত্রের মহিমা প্রচার করতে। তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথও আমাদের নানা সুরে নব সংস্কৃতির পালা গান শুনিয়েছিলেন মূলত এই অন্তর্মুখী চেতনারই আনন্দ-প্রেরণায়—শুধু তাঁর অজস্র কবিতায় ও গানেই নয়—প্রবন্ধে, ভাষণে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে। তিনি ছিলেন ভাবুকতার প্রতিমূর্তি—তাই প্রতি নব পথেই ফেলেছিলেন তাঁর আশ্চর্য আত্মার আন্তর সূর্যপ্রভা। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর নাম ছিল না, ছিল উপাধি। নৈলে কি শেষ জীবনেও তাঁর মনের অপরাজেয় অভয় ফুটে উঠতে পারত যখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন, বলেছিলেন মৃত্যুকে তাঁর "মৃত্যুঞ্জয়" কবিতায়ঃ

"ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল লাজ।··
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চ'লে।" (পরিশেষ)

অভয়ের কোলে এই যে গভীর আশ্রয়, এরি তো দিশারি অন্তরাত্মার পরম আশ্বাস যে পদে পদে মানুষের মধ্যেই দেখতে পায় তার দেবত্বের অক্ষয় সম্পদ। তাই কবি মানুষ আর দেবতাকে একই ঐক্যসূত্রে বেঁধে গিয়েছিলেনঃ

"এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অন্তর।"

শুধু কি তাই?

"ভিক্ষু বেশে দ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্য বারতা।"

পরমা সংস্কৃতির একটি মস্ত দান হতেই হবে আপনার অন্তরের এই গোপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া। যেখানেই মানুষ দুঃখ বেদনা বিপদ আপদের সামনে অকুতোভয়ে বলতে পেরেছেঃ

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না করি যেন ভয়
দুঃখ তাপে-ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়,

কিম্বা স্বামী বিবেকানন্দের জীমূতমন্দ্রে :

হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে করো বিসর্জন,
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান—

তখনই সে পেয়েছে এই অন্তরের অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্যেরই পরম পাথেয়, শুনেছে এই প্রেমসিন্ধুরই আনন্দ কল্লোল।

একথা আমার কাছে অজানা নেই যে, আজকের দিনে এ-শ্রেণীর আধ্যাত্মিক পাথেয়—অভয় প্রেম বা পরার্থনিষ্ঠা—সাধারণতঃ সংস্কৃতির উপজীব্য ব'লে গণ্য হয় না। সাধারণতঃ সংস্কৃতিবান্ ওরফে "কালচার্ড" মানুষ বল্‌তে আমরা বুঝি শুধু তাঁদেরই—যাঁরা প্রধানতঃ উচ্চশিক্ষিত, বাক্‌পটু ও বিশ্বতথ্যজ্ঞ—এককথায় বুদ্ধিজীবী—ইনটেলেক্‌চুয়াল'। কিন্তু আমার মনে হয় এ-শ্রেণীর বহির্ভূষণ বা বাহ্য চাকচিক্যকে সংস্কৃতি নাম না দিয়ে সদ্‌গুণ—accomplishments—নাম দেওয়াই বেশি সঙ্গত। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে আমাদের দেশে সংস্কৃতিবান্ মহাজনদের মধ্যে একজন অগ্রণী ভাবুক ছিলেন, একথা বোধহয় এ-প্রবর্ধমান অশ্রদ্ধার যুগেও সবাই স্বীকার করবেন। তিনি তাঁর "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন বিশদ ক'রেই। তাঁর মোট কথাটি ছিল এই যে, শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বিধ বৃত্তির সুষমিত (harmonious) অনুশীলনেই মানুষ যথার্থ সংস্কৃতিবান্ হ'য়ে পূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু পিঠ পিঠ লিখেছিলেন তিনি যে, চরিত্রের সম্পূর্ণতা সংসাধিত হয় কেবল ভক্তিতে—কেন না "এক, ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখনো উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না ; দুই, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামা না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না"

(ধর্মতত্ত্ব—দশম অধ্যায়)

কিন্তু শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নন, প্রবন্ধের অযথা বপু বৃদ্ধির ভয় না থাকলে বাংলার আরো কতিপয় বরেণ্য মনীষীর বাণী উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে পারতাম যে তাঁরা সবাই অন্তর্লোকের অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যকেই সংস্কৃতি নাম দিতেন। এখানে কেবল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মান্দালয়ের জেলথেকে লেখা একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হব। তিনি লিখেছিলেন :

"বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ও ধ্যান ধারণার প্রয়োজন।··· নিয়মিত সাধনা করিলে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি : এক—রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা ; দুই—ভালোবাসা, ভক্তি, ত্যাগবুদ্ধি প্রভৃতি গুণের বিকাশ করা। ··ভক্তি প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হয়। মানুষের মনে যখনই কোনো ব্যক্তি বা আদর্শের প্রাত ভালোবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতা কমিয়া যায়।···ভালোবাসিতে বাসিতে মন ক্রমশঃ সকল সংকার্ণতা ছাড়াইয়া বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে।"

(তরুণের স্বপ্ন)

আজকের দিনে আমরা আমাদের সংস্কৃতির এই ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য ছেড়ে বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার বহির্মুখী ভাবধারায় দীক্ষিত হ'য়ে সিদ্ধি খুঁজছি বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিকতার ঐহিক মায়ালোকে। তাই আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বরেণ্যতম মহাজনদের জীবনসাধনার ধারাধরণ পর্যালোচনা না ক'রে শুধু তাঁদের নামগুণগানে একটু উজিয়ে উঠেই মনে করি তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখানো হ'ল। কিন্তু একটু তলিয়ে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলেই দেখতে পাব যে, বাংলার সত্যিকার মহাপ্রাণ যাঁরা—তাঁরা যে-জীবন-সাধনায় সর্ববরেণ্য হয়েছেন সে ঠিক মনঃশীলবুদ্ধির জৌলুষ বাড়িয়ে ইনটেলেক-চুয়াল বা মনস্বী হ'য়ে ওঠবার সাধনা নয়। তাঁরা সবাই চেয়েছিলেন চলতি সংস্কৃতির মানস আদর্শকে অন্তরাত্মার দিব্যদীপ্তিতে রূপান্তরিত ক'রে পৌঁছতে সেই পরমা সংস্কৃতিতে—যার আলোর জোগান দেয় বহির্মুখী বিদ্যাবুদ্ধির অস্থির শিখা নয়—অন্তর্জ্যোতির অচঞ্চল প্রভা। এ-প্রভা নিয়তির জলঝড়ে নিভে যায় না, প্রত্যুত আমাদের নিম্নমুখী প্রবৃত্তির পৃথ্বী-টানকে কাটিয়ে উর্ধ্বাভিসারের দুঃসাহসকে সতেজ ক'রে, জীবনের হাজারো কাঁটাবনে আলো দেখায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির আর একটি প্রতিভাধর বরপুত্র—তিনিও এই কথাই বলেছেন তাঁর নানা নাটকে কাব্যে ও গানে—বিশেষ ক'রে একটি অপরূপ ওজস্বী গানে—যে গানটি নেতাজি ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

গানটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক মেবার-পতনের শেষ গান তথা বাণী:

কিসের শোক করিস ভাই?—আবার তোরা মানুষ হ।
গিয়েছে দেশ, দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ।

মানুষ হ'তে হ'লে কোন্ সাধনা অবলম্বন করতে হবে কবি তারও নির্দেশ দিয়েছেন:

বিশ্বময় দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ,
পুণ্যসেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রু হোক।

এর ডাকনাম নৈতিকতা হ'লেও আসল নাম বিশ্বাত্মবোধ যে বলে:

ভুলিয়া যা রে আত্মপর, পরকে টেনে আপন কর্,
বিশ্ব তোর নিজেরি ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।
ধর্ম যেথা সেদিকে থাক্, ঈশ্বরের মাথায় রাখ্।
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ।

আপনাদের ধৈর্যের পরে অনেক অত্যাচার করেছি, এবার শান্তিপাঠের সময় এল। শুধু আর দু একটি কথা বলার আছে। কেবল তার আগে যদি একটু ব্যক্তিগত কথা বলি তবে আশা করি আপনারা কিছু মনে করবেন না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা কেন করতে যাচ্ছি একটু শুনলেই বুঝবেন।

আমি বলতে চাই—একটু জোর দিয়েই—যে আমি আশৈশব পিতৃদেবের দীপ্ত মনীষা তথা ব্যক্তিরূপের প্রসাদে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সংস্পর্শে একটি সমৃদ্ধ বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতির আবহেই মানুষ হয়েছিলাম। তারপর যৌবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাসেল, রোলাঁ, দু হামেল প্রমুখ এদেশের তথা ওদেশের বহু সংস্কৃতিবান্ মহাজনের সঙ্গ ও স্নেহলাভ ক'রে চলার পথে অনেক কিছু পাথেয় সংগ্রহ ক'রে এসেছি। কিন্তু এঁরা সবাই আমার কাছে পরম শ্রদ্ধার্হ হ'লেও আমি যে-দুটি মহাপুরুষের ছোঁয়াচে আমার অন্তর্জীবনের লক্ষ্য-নির্ণয়ে সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত হ'য়েছি এবং যাঁদের পথনির্দেশে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিকেই পরমা সংস্কৃতি ব'লে চিনেছি তাঁদের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত আমার কাছে গীতা ভাগবতের চেয়ে কম প্রিয় নয়। তাতে

শৈশবেই পড়ি—ঈশ্বরলাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। তারপরে নানা ঘাটের জল খেয়ে সময়ে সময়ে হাঁপিয়ে উঠলেও পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ভুলেও কখনো মনে সংশয় আসে নি, এবং তাইতেই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আমি আমার স্মৃতিচারণে লিখেছি বিশদ ক'রেই—ও সাধ্যমত গুছিয়ে বলবার প্রয়াস পেয়েছি—কীভাবে তিনি সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমার ধারণার মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়ে ভগবদ্‌ভাবে ভাবিত হ'তে পারাকেই পরমা সংস্কৃতি ব'লে চিনিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর "জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া" কী ভাবে তিনি আমার "অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত" করেছিলেন। তারপরে উত্তর যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ আমার এই শৈশবলব্ধ আবছা দিশাকে প্রদীপ্ত ক'রে আমার সামনে ধ'রে দেখিয়ে দেন—কেন বুদ্ধিবাদী সংস্কৃতি আত্মবোধী সংস্কৃতির মধ্যে নবজন্ম না নিলে মানুষ কৃতকৃত্য বা আপ্তকাম হয় না, হ'তে পারে না। সনৎকুমারের কাছে নারদ এসে বলেছিলেন এই দুই জাতের সংস্কৃতির কথা। বলেছিলেন বহুপাঠী ও বহুজ্ঞ হ'তে হ'তে তিনি শেষে হ'য়ে উঠেছিলেন "মন্ত্রবিৎ" কিন্তু "আত্মবিৎ" হ'তে পারেন নি। সনৎকুমার নারদকে দেখিয়ে দেন "আত্মবিৎ" হ'তে হ'লে কোন্ পথ ধরতে হয়—অল্পকে ছেড়ে অনল্পবরণ। বললেন শেষে: "ভূমৈব সুখম্—নাল্পে সুখমস্তি।" এক ভগবদ্‌উপলব্ধি হ'লে তবেই মানুষ পরম সুখী হয়—সীমার অল্প সম্পদে মন ভরে না—যদি সীমার মধ্যে অসীমার মহান্ সুরটি না শুনতে শিখি। শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায় পঁচিশ বৎসর ধ'রে হাতে কলমে শিখি এই সুরটি শুনবার সাধনপদ্ধতি—টেক্‌নিক্। আমার জীবনের এই দুই পরমদিশারির নাম করছি আত্মজীবনী পেশ করতে নয়—শুধু জোর দিয়ে বলতে যে পরমা সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় আমি জেনেছি, চিনেছি ও মনে প্রাণে মেনে নিয়েছি বাংলার এই দুই মহীয়ান্ ধর্মদিশারির প্রসাদে। আমার কৈশোরে ও যৌবনে আমার মনে একটি গভীর খেদ ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেখা আমি পাই নি। তারপরে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে শুধু যে আমার খেদ মেটে তাই নয়, তাঁর দীপ্র প্রতিভার, দিব্য জ্ঞানের ও মহিমময় কাব্যের ছোঁওয়ায় আমার বিশ্বাস ক্রমশ প্রত্যয়ে পরিণতি নিয়েছে; তাঁকে যতই ভালোবেসেছি ততই খ'সে পড়েছে আমার চোখের ঠুলি—

আর অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রীকে বেজে উঠেছে আনন্দঝংকারে তাঁর "Who" কবিতার :

All music is only the sound of His laughter,
All beauty the smile of His passionate bliss,
Our lives are His heart-beats, our rapture the bridal
Of Radha and Krishna, our love is their kiss.

বাজে যেথায় যত গান—ধ্বনি তার উছল সুহাস্যের,
সকল মাধুরী—তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ,
মানব-জীবন—বুকের স্পন্দন তার, পুলক আমাদের—
মিলন রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের তাদেরি চুম্বন।

এই বিশ্বমাঝে বিশ্বরাজের স্পর্শ পাওয়াকেই নাম দেওয়া যায় পরমা সংস্কৃতি, সংস্কৃতির শেষ লক্ষ্য—শুধু বাংলার সংস্কৃতি নয়, এমন কি পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতিও নয়, এর নাম সর্বকালীন তথা সর্বজনীন সংস্কৃতির মুকুটমণি—পরমতম বিকাশ। আর এ-বিকাশ যে-অনুপাতে অঙ্গীকৃত হয় ঠিক সেই অনুপাতেই আমাদের অন্তরে নামে প্রেম, চোখে আলো, প্রাণে বল, চিত্তে প্রজ্ঞা। তখন আর ভাবনা থাকে না—মন গান গেয়ে ওঠে (অতুলপ্রসাদের বাউল): "তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না, আর আমার ভাবনা রবে না।" কারণ তখন আমি সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করব সেই প্রেমাস্পদকে—যার প্রেমের আগুনে সংশয়ের আঁধার কেটে যায়, প্রাণে জাগে পরম নৈশ্চিত্য—শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রীর ভাষায়—

Love must soar beyond the very heavens
And find its secret sense ineffable :

স্বর্গ করি' অতিক্রম লভিবে লভিবে প্রেম তার—
অন্তর্গূঢ় পরমার্থ—ভাষা যার দিশাও না পায়।

এ-প্রেম স্বভাবে আত্মসুখী নয়—সর্বগ্রাহী, তাই তো মহিমময়ী সাবিত্রী অন্তরে অনুভব করেছিলেন :

In me the spirit of immortal love
Stretches its arms out to embrace mankind.

অর্থাৎ

আমার অন্তরে মৃত্যুহীন প্রেম করে প্রসারিত
বাহু তার—করিতে বিশ্বের প্রতি জীবে আলিঙ্গন।

কেন না

Love is the bright link twixt earth and heaven
Love is the far Transcendent's angel here···
প্রেম বাঁধে তার দীপ্র যোগসূত্রে স্বর্গে মর্ত্য সাথে,
সুদূর অপার ভুবনাধিপের প্রেমই দিব্য দূত···

যে-দূত যুগে যুগে ঘোষণা ক'রে এসেছে :

Imperfect is the joy not shared by all
সে-আনন্দ অসম্পূর্ণ—ভোগ্য যাহা নয় সকলের।

এ-উদ্ধৃতিগুলির ভাষ্য শুধু এই যে, মানবিক তথা মানসিক সংস্কৃতির প্রয়োজন আছে—কেবল সোপান হিসেবে। অর্থাৎ, শিল্প কাব্য বিজ্ঞান দর্শন মানবাত্মার ঊর্ধ্ব-অভিসারে উপায় ব'লেই বরেণ্য, লক্ষ্য ব'লে নয়। লক্ষ্য হ'ল প্রীতি ভক্তি প্রেম—যারা গীতার ভাষায় "সর্বভূতহিতে রতাঃ।" তাই মানবিক সংস্কৃতির মধ্যে মানুষ কমবেশি তৃপ্তি পেলে তার মধ্যে দূষণীয় কিছু না থাকলেও তাকেই চিরাশ্রয় ব'লে বরণ করলে তার মহতী বিনষ্টি, কারণ (সাবিত্রী)

Now we strain to reach an unknown goal,
The life that wins its aims asks greater aims,
There is no end of seeking and of birth,
There is no end of dying and return,
The life that fails and dies must live again.
Till it has found itself it cannot cease.
আমরা দুরভিসারে চলি এক অজানা লক্ষ্যের।
এক লক্ষ্য হ'তে প্রাণ ধায় ঊর্ধ্বতর লক্ষ্যমুখে,
নাই শেষ জিজ্ঞাসার, সন্ধানের, জন্মান্তরের,
মরণের পরে পুনরাবর্তন—নিরন্ত এ-বিধি,
মানে যে-জীবন হার, নিতে হবে নবজন্ম তাকে,
যতদিন আপনাকে না চিনে সে—মুক্তি নাই তার।

যুগে যুগে এই উর্ধ্বাভিসারকে বরণ ক'রে এসেছে প্রতি দেশেরই শ্রেষ্ঠ মহাজন বটে, কিন্তু (রামপ্রসাদের ভাষায়) "মানবজমি"তে এই পরমা সংস্কৃতির "কৃষি কাজে সোনা ফলেছে" সব চেয়ে বেশি আমাদের ভারতবর্ষেই বটে—যে-জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষিকবি শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই এ-দেশকে "পুণ্যভূমি" নাম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ভারতের প্রাণশক্তির উৎস ধর্ম, যার শেষ লক্ষ্য তথা অন্তিম পরিণতি—সর্বাত্মবাদ, অর্থাৎ ভগবানকে দেখা এ-বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে। আমাদের দেশের মরমিয়ারা—বাউল, ফকির, সাধু, সন্ত, বৈরাগী, উদাসী—সবাই গেয়ে এসেছেন এই কীর্তনেরই পালাগান, এ-মহা উপলব্ধি যারই অন্তর আলো ক'রে আসে সে-ই দেখে সেই একই সনাতন সত্যের পুনর্নব আবির্ভাব—যা ইন্দিরা দেখেছিল ভাবসমাধিতে আর সঙ্গে সঙ্গে শুনেছিল স্বকর্ণে (৯ আগস্ট, ১৯৫৪):

ময় জিত দেখূঁ—তূ হী তূ হৈ, জিত দেখূঁ কনহাঈ—তূ।
তূ বৈরী ভী হয়, সখা ভি তূ, নিন্দক তূ সহাঈ তূ।
মুসকান অধরপে ভী তূ হয়, হয় হৃদয়কি পীর ভি তূ।
তূ মিলনানন্দ হয় সুধাভরা, বিরহাকা তীর ভি তূ।···
তূ মীরাকা চির-প্রীতম হয়, প্রেমী সৌদাঈ তূ।
ময় জিত দেখূঁ— তূ হী তূ হৈ, জিত দেখূঁ কনহাঈ—তূ॥

আমি যেথাই তাকাই—দেখি শুধু তুমি সবই শ্যামরায়, তুমি!
তুমি বৈরী, বন্ধু, নিন্দক, বাধা, পরম সহায় তুমি!
বঁধু, তুমি অধরের আলোহাসি, প্রাণে যাতনার দানও তুমি!
তুমি অমৃতমিলনানন্দ, বিরহবেদনার বাণও তুমি!
তুমি চিরবল্লভ মীরার, প্রেমের পাগল ধরায় তুমি!
আমি যেথাই তাকাই—দেখি শুধু তুমি, সবই শ্যামরায়, তুমি॥

গীতার ধর্মযুদ্ধ

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রিয়বরেষু,

পৌষের প্রবাসীতে আপনার "পুনর্ভ্রাম্যমাণ" প্রবন্ধটি পড়লাম। আপনি নালিশ জানিয়েছেন যে, ধর্মপ্রসঙ্গের আধিক্য থাকে ব'লে আপনার অনেক বন্ধু আপনার চিঠি পেলে বিপন্ন বোধ করেন, তাই আপনি অযথা চিঠি লিখে তাঁদের বিব্রত করতে চান না। অন্যের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু আমি কোনো দিনই ধর্মপ্রসঙ্গের আলোচনায় উত্যক্ত হ'য়ে উঠি নি, আপনাকে বরং লিখেছি বহুবার যে ধর্মালোচনায় আমি আনন্দই পাই অকৃত্রিম। আপনাকে কতবারই তো অনুরোধ করেছি আপনাদের পুনা মন্দিরের খবর দিতে, কিন্তু কোনো উত্তর পাই নি।

এ বৎসর প্রয়াগে এলেন না কেন পূজার পরে? বৎসরান্তে ঐ সময়টার জন্যেই আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকি। উমাপ্রসাদের কাছে শুনলাম শততম দ্বিজেন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে আপনি এ বৎসর জুলাই মাসে কলকাতা যাবেন। খবরটা সত্য কিনা জানাবেন।

আপনার আগামী ষষ্ঠষষ্ঠিতম জন্মোৎসবে পাঠালাম আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক শুভকামনা।

ইতি। ৬ই জানুয়ারি

এলাহাবাদ

শ্রীঅবনীনাথ রায়

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রীতিভাজনেষু,

পুনা ৫

হরিকৃষ্ণ মন্দির

১৬ ফেব্রুয়ারি

আপনার গত চিঠির উত্তর দেব দেব ক'রেও কিছুতেই দেওয়া হ'ল না। মাসখানেক চ'লে গেল। তবে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—জানেনই তো। আমি ব্যক্তিগত চিঠি লেখায় ঢিল দিয়েছি, তার একটা কারণ আমার সাবেক কালের বন্ধুদের মধ্যে খুব কম বন্ধুই আমার ধর্মকথায়

প্রসন্ন হন। আপনি তাঁদের দলে নন এজন্যে ধর্মক্ষেত্রের পার্থসারথিকে ধন্যবাদ দেই—বিশেষ ক'রে অধুনাতন বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক কুরুক্ষেত্রে হাঁপিয়ে উঠে। এ-যুগের এক মস্ত জগত্তারণ কম্যুনিস্ট সেনাদল গিরিলঙ্ঘন ক'রে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছিল—মনে হয় ফের আসবে ও পুণ্যভূমি ভারতের ধর্মক্ষেত্রে ফের কুরুক্ষেত্রের তাণ্ডবলীলা সুরু হবে। আমার নিজের কোনো সংশয় নেই যে এ-যুদ্ধের শেষে আমরা জয়ী হবই হব। গীতার ভবিষ্যদ্বাণী : যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ—সেখানে জয়, শ্রী ও ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠ হবেই হবে। এ-সম্পর্কে মহাভারতের আরো একটি শ্লোক মনে পড়ে আজ। যুধিষ্ঠির বলেছিলেন দ্রৌপদীকে (বনপর্বে) :

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাৎ চরিতো ধর্মচারিভিঃ
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতদ্ জগন্মজ্জেৎ অনিন্দিতে।

অর্থাৎ

ধার্মিকের ধর্মপ্রেম যদি হ'ত নিষ্ফল ধরায়,
মজ্জিত এ-চরাচর কবে অন্তহীন তমসায়।

আর আমায় পায় কে—যখন আপনি "চোরা"নন ব'লে ধর্মের কাহিনীতে কান দিতে উৎসুক। তাই শুনুন, আরো আছে। এ তো সবে কলির সন্ধে। হ'ল কি জানেন? সম্প্রতি হঠাৎ আরো ধর্মপ্রেমিক হ'তে মন চাইল চীনাবর্গিদের এ-দেশে এসে হানা দেওয়ার দরুণ। এ কথা আমার ঐ "পুনর্ভ্রাম্যমাণে"ই পাবেন—পরের কিস্তিতে। কিন্তু তারও পরের কথা একটু লিখি।

আমার এক বন্ধু আমায় বলেছেন যুদ্ধবিদ্যা সাধুর সাজে না, যদিও শান্তিই ভালো, অবশ্য "সম্মানের সঙ্গে"। হায় রে হায়, ঐ "সম্মানের সঙ্গে" কিন্তুবাদেই তিনি ডুবলেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন—(যখন হিটলার রণসাজে "সাজো সাজে" হুঙ্কারে আকাশ বাতাস ডঙ্কিত করছিল) —যে, শান্তিবাদ যদি সব সময়ে শান্তি আনত তাহ'লে গীতার ঠাকুরকে অত দীর্ঘ ভাষণ দিতে হ'ত না যুদ্ধের ওকালতিতে। শান্তি ভালো, প্রেম ভালো, দয়া ভালো, ক্ষমা ভালো,—কেবল র'য়ে স'য়ে (সুকুমার রায়ের কথা মনে পড়ে : "দিনদুনিয়ার সবই ভালো, ঢাকীও ভালো ঢাকও ভালো, টাকীও ভালো টাকও ভালো—কিন্তু সবার চেয়ে ভালো পাঁউরুটি আর

ঝোলা গুড়।") আমার এ-বন্ধুটিকে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। চীন কী ভাষায় দিনরাত হুঙ্কার দিচ্ছে খেয়াল করেন নি কি! আত্মরক্ষার জন্যে পরস্বাপহরণ হাজার হাজার মাইল নিয়ে নেওয়া! নিরীহ তিব্বতকে মুক্তি দিল শান্তিচর্যা থেকে—সেখানে সুরু করল কম্যুনিজমের ক, খ যাতে ক'রে তারাও সগর্বে বিশ্বরক্ষার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগে গোলাগুলি, বিমানবোমা নিয়ে। চীনদেশের ছত্রপতি মাও বিশ্বাস করেন না সহ-অবস্থানে (coexistence) তাই বলেছিলেন মার্কিনরা ক্যুবাতে রুষদেশের মারণাস্ত্র স্থাপনের পথ আগলে দাঁড়ানোর অপরাধে ক্রুশ্চেভের আণবিক বোমার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই উচিত ছিল। এ-উপাদেয় বিশ্বধ্বংসযুদ্ধ হ'ল না ব'লে রুষদের উপর চীনের সে কী বিষম রাগ!—পড়েন নি কি সংবাদপত্রে? আর এ ক্যাপিটালিস্ট্ প্রপাগাণ্ডা নয়, নানা দেশের কম্যুনিস্টরাও আপত্তি করা সুরু করেছে, বলছে চীন বিশ্বসৌভ্রাত্র্যের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কম্যুনিজমকে পথে বসিয়ে। তার উপর দেখুন—কলম্বোর সন্ধি-প্রস্তাবে সায় দিয়েও না-দেওয়ার স্বপক্ষে কী অত্যাশ্চর্য সার সার যুক্তি! বেদের প্যারাডক্স মনে করিয়ে দেয় না কি—'তদ্ এজতি তন্নৈজতি'—সে চলে অথচ চলে না—'তদ্ দূরে তদ্ অন্তিকে' —সে দূরে অথচ কাছে!···ইত্যাদি। এহেন অদ্ভুত নৈয়ায়িকের সঙ্গে "সম্মানের সঙ্গে শান্তির রফা" হবে কোন্ ন্যায়শাস্ত্র মেনে—বলবেন আমাকে?

বন্ধুবরকে আরো লিখব ভেবেছিলাম, যে, গত যুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী চার্চিলকে যখন লিখেছিলেন: "হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়িও না—পথ ছেড়ে দাও সে এসে ইংলণ্ড অধিকার করলে—তখন কোরো—শান্ত অসহযোগ"—তখন কি আপনি বাহবা দিয়েছিলেন যে, এরই নাম সম্মানের সঙ্গে সন্ধি—শান্তিপাঠের নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে?

না বন্ধুবর, শ্রীকৃষ্ণ মূর্খ ছিলেন না, রণচণ্ডও ছিলেন না। তাই পাণ্ডবদের অতশত লাঞ্ছনা ও অপমানের পরেও গিয়েছিলেন দুর্যোধনের কাছে সন্ধির আবেদন নিয়ে। মাত্র পাঁচটি গ্রাম দাও—ব্যস। দুর্যোধন তার কী জবাব দিয়েছিল মনে আছে কি?—"বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রভাগ ভূমিও দেবো না। বীরকে বীরের মতনই আচরণ করতে হবে।" যখন

হিটলার মাও প্রমুখ দুর্যোধনেরা এই জাতের তালঠোকা সুরু করেন, তখন শান্তিবারি ছড়াতে যাবে কে? গেলে যে সে ভিস্তি হবার আগেই উড়ে যাবে তোপের মুখে। চীনের দাবি—"এক্ষণি দাও যা চাইছি, তবেই শান্তি।" অর্থাৎ ভারতকে ছাড়তে হবে তার নিজের নীতি, স্বধর্মের আলোয় পথ কেটে চলবার জন্মস্বত্ব—চলতে হবে চৈনিকদের রণডঙ্কিত বিভীষিকার পথে তার তাঁবেদার হ'য়ে—তবে হবে হিন্দি চিনি ভাই ভাই। অন্য ভাষায়—এশিয়ার চীনই হবে নেতা—তাহ'লেই সম্মানের সঙ্গে শান্তি ও বিশ্বের সমৃদ্ধির পথ খোলা হবে, নৈলে নয়।

মরুক গে—এ পলিটিক্যাল তর্ক। ফিরে আসি ধর্মের প্রসঙ্গে।

কথা হচ্ছে—এটুকু সর্ববাদিসম্মত যে জীবনে শান্তি প্রেম সৌভ্রাত্র্য ভক্তি ধর্ম দয়া প্রীতি দরদ এই সবই পরম লক্ষ্য—অন্তিম আদর্শ। কিন্তু জগতের বর্তমান বিকাশের মধ্যাবস্থায় এসব প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না যদি মানুষ এসব বহুবাঞ্ছিত ইষ্টার্থের (values) জন্যে প্রাণ দিতে রাজি না হয়। জগতে কে কোথায় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে—"স্বাধীনতার জন্যে দরকার হ'লে প্রাণ দেব" এ-অঙ্গীকার না ক'রে?

অবশ্য আমি জানি যে, সমস্যাটি আদৌ সরল নয়—বিষম জটিলই বলব। সংক্ষেপে সমস্যাটি দাঁড়াচ্ছে উভয়সঙ্কটের—two horns of a dilemma, যাকে বলে সাহেবপুরাণে।

একটি শৃঙ্গ: চীনরা (বা অনুরূপ শক্র) বলছে: "বলং বলং বাহুবলং—যে বেশি বলী সেই নেতা হবার যোগ্য—সেই করবে রাজত্ব, দেবে বিধান, বাকি সকলে হবে প্রজা, মানবে আদেশ। ওহে ভারত, তুমি মেনে নাও আমার বিধান যে, তিব্বত আমার ঘরোয়া ব্যাপার, দলাইলামা পাষণ্ড, পঞ্চেনলামাই অনিন্দ্যকান্তি রাজা, যেহেতু আমার হাতের পুতুল। এসো আমার কাছে শেখো কম্যুনিজম্ মার্ক্স-লেনিন-স্ট্যালিনিজম্-এর বোধোদয়। যদি গররাজি হও—ডুববে—আমার সঙ্গে যুদ্ধে তো পারবে না জাদু, তাই প্রণাম ক'রে আমাকে বলো 'হুজুরালি'।" ভারত বলল—অন্ততঃ বলা উচিত: "না, আমি আমার নিজের আদর্শ মেনে বাঁচতে চাই, তোমার হুকুমবরদার হ'য়ে বাঁচা হ'ল মরার সামিল।" প্রত্যুত্তরে চীন ড্রাগন অট্টহেসে বলল: "তবে মরো—আমার আর অপরাধ

নেই”—ব’লেই আচম্বিতে নিরীহ ভারতীয় সৈন্যদের মুণ্ডপাত করতে ঝম্প।

বন্ধু কি চান ভারতের সাধুরা এক্ষেত্রে বলবেন: “যেহেতু শান্তির মতন বর আর নেই সেহেতু আসুন, চৈনিকদের ক্ষমা ক’রে দু’হাত তুলে আশীর্বাদ ক’রে হরিনাম-শান্তির গঙ্গাজল ছিটিয়ে সব পাপ ধৌত ক’রে দেই শত্রুমিত্রের!”

কিন্তু একে উভয়সঙ্কটের প্রথম শৃঙ্গ বলতেই হবে এই জন্যে যে, মতভেদ হবার সঙ্গে সঙ্গে রণচণ্ড নীতি মেনে আপৎ-শান্তি করতে ছুটলে না হয় দূর আপদ, না আসে শান্তি। কারণ যুদ্ধের পর আবার যুদ্ধ, তারপর ফের যুদ্ধ—কখনো এ-পক্ষের জয় কখনো ও-পক্ষের—এইই হ’য়ে এসেছে ইতিহাসে আবহমানকাল। যেটুকু অভিনব সে হ’ল যুদ্ধ করতে করতে মানুষের পুরোপুরি কাপালিক হয়ে ওঠা যার সমাপ্তি আণবিক বোমার ব্রহ্মদৈত্যাস্ত্রের সর্ব লুপ্তি-মন্ত্রপাঠে। একে সঙ্কট ছাড়া কী বলব!

কিন্তু আরো একটি (তৃতীয়) সংকট আছে: আশু শান্তির লোভে প’ড়ে ভয়ত্রস্ত ব্যাকুলতায় যুদ্ধ করতে রাজী না হ’লে শত্রু হাসিমুখেই আসবে বটে কিন্তু আমাদের করতে হবে অন্তহীন কান্নাকাটি। শুধু তারা আমাদের যা আছে সব লুটে-পুটে নেবে ব’লেই নয়, রাখবে আমাদের তাঁবেদার ক’রে, যার ফলে একদিকে যেমন আমরা নিজের আদর্শকে ভালো বলতেও পারব না “ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ” আপ্তবাক্য মেনে, অন্যদিকে তেমনি পরপদানত রুদ্ধশ্বাস শান্তির ফলে সুখও পাব না একবিন্দু, লাভ হবে কেবল জীবন্মৃত জীবনের নরক-যন্ত্রণা।

এ-উভয় সঙ্কটের কোনো বুদ্ধিনির্দিষ্ট সমাধানই নেই। তাই রাসেল-যে-রাসেল—যিনি চিরকাল ধর্ম ও ধার্মিকদের ব্যঙ্গই ক’রে এসেছেন তিনিও অনুতপ্ত মতন হ’য়ে শেষটায় অন্য সুর ধরেছেন, লিখেছেন তাঁর সদ্যোজাত HAS MAN A FUTURE-এর প্রথমাধ্যায়েই: “Intoxicated by our new power over nature, many of us have been misled into the pursuit of power over other human beings....Knowledge is not good except in the hands of those who have enough wisdom to use it well

....Sages and Prophets have preached the folly of strife, and if we listen to them we shall emerge into new happiness." এর ভাবার্থঃ চরম সমাধান পেতে হ'লে হাত পাততে হবে—বৈজ্ঞানিকের শক্তিবাদের কাছে নয় সাধু ও জ্ঞানীদের মুক্তিমন্ত্রের কাছে। বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক ও চিন্তাশীল শোয়াইৎজার সাহেব (Albert Scheweitzer) লিখলেন আমাদের প্রেসিডেন্টকে (২০ আগস্ট ১৯৬২) "Cette confiance mutuelle arrivera-t-elle á temps pour nous préserver de la guerre atomique, la terrible et inimaginable catastrophe que nous avons a redouter ?" (অর্থাৎ যথাকালে পরস্পরকে বিশ্বাস করার সুবুদ্ধি কি আমাদের রঁগ ঘেঁষে বাঁচিয়ে দেবে অকল্পনীয় আণবিক বিশ্বযুদ্ধের সর্বলুপ্তির শ্মশানযাত্রা থেকে ?)

কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষীদের বুদ্ধিবাদী আলোচনার পথেও ঐ দেখুন এসে গেল ধর্মেরই কথা। এ-ধর্মের শেষ বাণী কী ? না, পরস্পরকে সত্যি বিশ্বাস করি আমরা কেবল তখনই যখন জানি যে, আমরাও যেমন ভালোবাসতে চাই প্রতিপক্ষও তেমনিই ভালোবাসতে চায়। এই ভালবাসা প্রেম প্রীতি দরদের উৎস কি ? না, ধর্ম। ধর্ম যদি না থাকে তবে প্রেমের স্থলে রাজত্ব করবে কাম, প্রীতির স্থলে দ্বেষ, দরদের স্থলে ঔদাসীন্য—তিতিক্ষার স্থলে অসহিষ্ণুতা। কাজেই—আমার বক্তব্য—যে পথেই যান না কেন সমস্যার নিদান খুঁড়তে খুঁড়তে পৌঁছবই আমরা ধর্মের bedrock-এ—পাষাণ-বনেদে—যাকে টলানো যায় না। যে সত্যি ধার্মিক সে ধর্মকে বরখাস্ত ক'রে চাইবে না সুখ, চাইবে না সস্তা অপল্কা শান্তি, মানবে না যে, ধর্মজীবনকে নামঞ্জুর ক'রে ইন্দ্রিয়ভোগের স্বার্থ সুখবাদ বরণ করার নামই পরমপুরুষার্থ। সে বলবে যুধিষ্ঠিরের সুরেই : যে, আত্মসর্বস্ব হয়ে শ্রেয়োধর্মকে অবজ্ঞা ক'রে শুধু ইন্দ্রিয়ভোগের জগতকেই যে সবার বড় ভাবে সে মোহমুগ্ধ মূর্খ—যে শিষ্টাচার মানে না তার "নৈব তস্য পরো লোকঃ"—না আছে ইহলোক না পরলোক।

ভারতকে আমি পুণ্যভূমি ব'লে বরণ করেছি এই জন্যেই যে, শত দুঃখেও আমাদের মুনি ঋষি কবি নবীরা বলেন নি যে, অধর্মের পথে

মানব-সভ্যতার সত্যিকার প্রগতি হ'তে পারে—আত্মবোধ বিনা কোনো স্থায়ী আলো জ্ব'লে উঠতে পারে—অল্প সুখের মোহে দুঃখ ছাড়া আর কিছু হাতে আসতে পারে। চীনদেশে ও তিব্বতেও একথা বলেছেন ধার্মিক লাওৎসে, কনফুসিয়স, মিলারেপা। কিন্তু আধুনিক জগত্তারক চৈনিকেরা তাঁদের বরখাস্ত ক'রে দিশারি ব'লে গ্রহণ করেছে মার্ক্স লেনিন স্ট্যালিনকে। এ-হেন উগ্রপন্থীদের কাছে ধর্মের প্রেমমন্ত্র যে উপহসিত হবে ও ধার্মিক মিথ্যাচারী নামে লাঞ্ছিত হবে—এ তো অবধারিত। কাজেই আমাদের দাঁড়াতেই হবে ওদের বিরুদ্ধে--কেবল এইটুকু মনে রেখে যে, আমরা চলছি ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায়, ওরা—অধর্মমন্ত্রের তাগিদে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন: "তব ধর্মাশ্রিতা বুদ্ধিস্তেষাং বৈরাশ্রিতা মতিঃ"—অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধ করছ ধর্মের তরফে ওরা কৌরবেরা চলেছে রণচণ্ডতার দাপটে। আমাদের শুধু দেখতে হবে এইটুকু—যেন আমরা কোনো মিথ্যা দর্প বা জাতীয়তার অহঙ্কারকে আমল না দেই যার ফলে আমরা হ'য়ে দাঁড়াব আর পাঁচটা আত্মভিমানী জাতির মধ্যে একটি। অন্য ভাষায়, আমাদের মনে রাখতে হবে গীতার কথা যে, আমরা যেন সর্বদা মনেপ্রাণে ভগবান্‌কে মনে রাখি, যুদ্ধ করি—দেশোদ্ধার করতে নয়, ধর্মের বাহন হ'তে—গীতার বাণী শিরোধার্য ক'রে: "তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ"—তাঁকে স্মরণ ক'রে তবে যুদ্ধ, তাঁর জন্যে যুদ্ধ। এ ও তা কুবুদ্ধি সুবুদ্ধি বা পণ্ডিতি বুদ্ধির উকীল হ'য়ে যে-যুদ্ধ সে-যুদ্ধ হবে না গীতার যুদ্ধ। প্রতিপদে মনকে মুক্ত রাখতে হবে, লোভ ও মোহ থেকে:

> সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
> ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যাসি।

অর্থাৎ সুখদুঃখ লাভালাভ জয়াজয় এসব দ্বৈতবুদ্ধিকে ছেড়ে শুধু সর্বধর্মাধিপ অদ্বৈত ঠাকুরকে আত্মনিবেদন ক'রে লড়তে হবে, তাহ'লে যুদ্ধের পাপ বা প্রত্যবায় আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করার পরে গীতার ও মহাভারতের এইসব শ্লোক ফের মনে প'ড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যেন নতুন ক'রে যে, যে-পথে বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধি চলেছে (শুধু বিজ্ঞানের ইহলৌকিক

সিদ্ধিকেই মানুষের মুক্তির পথ ব'লে) সেভাবে চললে আমরা পড়ব ঠিক ওদেরই মতন ফাঁপরে—তখন বলতেই হবে ওদের বুদ্ধিমন্ত নাস্তিকদের আত্মঘাতী সুরে যে, কেবল কাপালিক মারণাস্ত্র সাজিয়েই কৃতকৃত্য হওয়া যায়—ধ্বংসকে ঠেকানো যায়। তা যায় না, কারণ মারণাস্ত্রের ধ্বংসমুখী প্রগতির পথে মানুষের অন্তরাত্মার সমৃদ্ধি হ'তেই পারে না। খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্য : Who live by the sword shall perish by the sword, যারা এই রণমত্ততার পথে চলবে তাদের বুদ্ধির একটি মাত্র লেবেল—সংজ্ঞা—আছে : আসুরিক ওরফে অধর্মাশ্রিতা বুদ্ধি। দুঃখের বিষয়, ইতিহাস আমরা পড়াই কিন্তু ইতিহাস থেকে শিখি না কিছুই যা সব আগে শেখা উচিত ছিল : যে, মানুষ দর্পের পথে অহঙ্কারের পথে বিদ্বেষের পথে আত্মস্ফীতির একটা সাময়িক আত্মঘাতী উল্লাস বোধ করতে পারে—যা মূলতঃ আসুরিকই বটে—কিন্তু কেবল ধর্মের পথে প্রেমের পথে ভক্তির পথেই মিলতে পারে সুখ শান্তি সৌভ্রাত্রের চিরন্তন দিশা।

আপনি সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন : আপনার গুরুদেব গোপাল ঠাকুরের সঙ্গে আপনার মাধ্যমেই আমার প্রথম আলাপ হয়। আজ তাঁর কথা আরো বেশি ক'রে মনে পড়ে। বহুদিন আগে পণ্ডিচেরিতে তিনি আমার ঘরে ব'সে একদিন গীতার নবম অধ্যায়ের রাজগুহ্যযোগের ব্যাখ্যা করছিলেন। ব্যাখ্যা করতে করতে শেষে "অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" বলতে বলতে তাঁর চোখে ধারা ব'য়েছিল—আজো ভুলতে পারি নি, কেন না সে-ধর্মজ্ঞ ভক্তি বিরল ব'লেই অবিস্মরণীয়। মনে হয়েছিল এঁদেরই নাম মহাত্মা—ঐ রাজগুহ্যযোগেরই একটি শ্লোকে আছে : যে, মহাত্মারা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে ভগবানকে সর্বজীবের মধ্যে দেখে তাঁর অর্চনা করেন।* একথা আমার মনে হয়েছিল প্রথমবার বিলেতে গিয়ে ওদের মুখে উঠতে বসতে ভোগবাদের ওকালতি শুনে ও জাতীয় জীবনে প্রতিপদে ভগবানকে বাদ দিয়ে সমাজ-সংস্কার করতে চাওয়ার ফোঁপরা জাঁক দেখে। কারণ

* মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
গীতা ৯।১৩

তখনই (ভার্সেল সন্ধির পরে) শুনতাম : "জর্মনি সাজছে ফের—সাবধান!" দশ বারো বৎসরের মধ্যে হ'লও তাই—জর্মনি আরো সাড়ম্বরেই সাজল মারমূর্তি ধ'রে হিটলারের পৌরোহিত্যে—যিনি সদম্ভে ঘোষণা করলেন : "জর্মনজাতিই হ'ল Herrenvolk, কিনা প্রভুজাতি—আর সব দাস-জাতি।" চীন জাপান ও ভারতের পরে তো হিটলারের অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। মনে হয়েছিল তখন গীতারই কথা ফের। হিটলারের জন্ম যেন ঠিক গীতার অসুরের সংজ্ঞাই পূরণ করতে (ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) : "হাজারো কামনাবাসনার মোহে কামক্রোধের অধিনায়কতায় কামভোগার্থে অসৎপথে অর্থসঞ্চয় করতে হবে আমাদের। বলতে হবে হেঁকে : আজ আমার হাতে এত ধন এসেছে, কাল আরো আসবে। আমিই সর্বক্ষম ঈশ্বর ভোগী বলী সুখী। আমার মতন অভিজাত আর কে আছে—আমার প্রতিযোগী হ'তে পারে কে ?" (১৬।১২-১৫)

আজ চীনের মাও-র মুখেও কি ঠিক্ এই আসুরিক দম্ভের সুরই বেজে উঠছে না? কান পেতে একটু শুনলেই শুনতে পাবেন সেই হিটলারী অসুরদের সিংহনাদ যাদের বিশেষণ (১৬।১৮): "মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ" অর্থাৎ যারা "নিজের ও অন্যের অন্তরবাসী আমাকে—ভগবান্‌কে দ্বেষ করে।"

কিন্তু ভগবানকে অস্বীকার ক'রে বা দ্বেষ ক'রে কেউ কোথাও স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, পারবে না। কারণ ভগবৎপরায়ণ না হ'য়ে যথার্থ মানবপ্রেমিক হওয়াও অসম্ভব। সম্ভব শুধু অহম্-কে বাড়িয়ে সমস্ত জাতির মধ্যে তাকে আরো ব্যাপক ভাবে খুঁজে পাওয়া—নিজের জাতি ছাড়া আর সবাইকেই অসূয়া ক'রে, অবজ্ঞা ক'রে, ঘৃণা ক'রে।

দুঃখ এই যে, এ-হেন আসুরিক ভাবের—অধর্মের—যখন অভ্যুত্থান হয় তখন তাকে ব'লে কয়ে বোঝানো অসম্ভব—যার নাম appeasement; তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া বাঁচবার আর কোনোই উপায় নেই।

তাই এই কথাই আমার, আজ মনে হয় বারবারই : যে, আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে যে সব বীর যুবক প্রাণ দিতে ছুটেছে তাদের কাছে আমরা গভীর ভাবে ঋণী। কারণ ভারতে ধার্মিকের পক্ষে ধর্মাশ্রিতাবুদ্ধির প্রেরণায় চলা অসম্ভব হবে যদি আমাদের ধর্মযোদ্ধারা হার মানে

আসুরিক চৈনিকচমূর কাছে। এইসব ভেবেই আমি ও ইন্দিরা স্থির করেছিলাম যে চৈনিক ড্রাগনদের হুঙ্কারের উত্তরে অন্তত: সাধুবুদ্ধির একটি এজাহার দেওয়া যাক্ না—নিরীহ অশ্রু-উচ্ছল অহিংসা নীতির অনবদ্য নামকীর্তন ছেড়ে গীতার বাণীতে কান দিয়ে। বলিই না কেন: "আমরা গীতার ঠাকুরের সাবধান বাণীকে সাধ্যমত অঙ্গীকার করব যে, এ-সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ, তাই সাধুরও স্বধর্ম—যে-ধর্ম লঙ্ঘন করলে পাপ হবে।"

কারণ মনে আছে তো—ঠাকুর কী জোর দিয়েই অর্জ্জুনকে বলেছিলেন (গীতা ২।৩৩):

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যাসি।

অর্থাৎ

হেন যুদ্ধে যদি যোগ না দাও তাহারে ধর্ম জানি'—
স্বধর্ম লঙ্ঘনে তব রটিবে অকীর্তি পাপে মানি'।

প্রথমে জয়পুরে কিছু দক্ষিণা পাই দু জায়গায় গান গেয়ে। দিল্লীতে সে-টাকা পাঠিয়ে মনে হ'ল পুনায় আরো বেশি টাকা তোলা যাক। যে কথা সেই কাজ—বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে দু মাস ধ'রে রিহার্সাল দিয়ে গত ৫ই ফেব্রুয়ারি এখানকার একটি মস্ত প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় করলাম আমার ইংরাজী নাটক Beggar Princess Mirabai—ইন্দিরা সাজল মীরা, আমি সাজলাম মীরার গুরু শ্বেতশ্মশ্রু সনাতন গোস্বামী। শুধু যে অভিনয় খুব জ'মে গেল তাই নয়, আশাতীত দক্ষিণা পেলাম বারো হাজার টাকারও উপরে। এ-টাকা থেকে আটশো টাকা খরচ ক'রে দুটি রেডিও সেট কিনে ইন্দিরা উপহার দিল আহত সৈনিকদের। বাকি টাকা দিলাম মেয়রের হাতে জাতীয় আত্মরক্ষা ফণ্ডের জন্যে। জানি অবশ্য যে, একদল লোক আমার শান্তিময় বন্ধুর সেন্টিমেণ্টাল সুরে সুর মিলিয়ে বলবেন—এ-কাজ সাধুকে সাজে না। (তাঁরা অবশ্য ভুলে যাবেনই যাবেন যে অন্তত: ভারতে সাধুর ধর্মযুদ্ধে সহযোগের বহু দৃষ্টান্ত আছে—স্বয়ং দধীচি তাঁর প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি ক'রে বৃত্রাসুরকে মারতে—বশিষ্ঠ তপোবনে দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের সৈন্য সংহার করেছিলেন—পরশুরাম ও দ্রোণাচার্য শিষ্যদের ধনুর্বিদ্যা শেখাতেন…

ইত্যাদি) কিন্তু আমরা মেনে নিয়েছি ঠাকুরের গীতার বাণী—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং তক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।" অর্থাৎ মিথ্যে সেন্টিমেন্টাল হওয়া অধর্ম।

এরপরে কৃষ্ণপ্রেমকে লিখলাম সব জানিয়ে লিখলাম: "তুমি হয়ত সমর্থন করবে না আমাদের যুযুৎসু উৎসাহে। না করলে নাচার, কারণ আমাকে চলতেই হবে নিজের বিবেক মেনে—ঠাকুরের বাণী শিরোধার্য ক'রে...." ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার সত্যিই ভয় ছিল পাছে কৃষ্ণপ্রেম আমাকে ভর্ৎসনা ক'রে বলে—"এ মায়াযুদ্ধ। একমাত্র সত্য—হরিনাম।" কিন্তু সে সাড়া দিল সোচ্ছ্বাসেই। আপনি জানেন সে কত বড় সাধু। আগে ছিল লক্ষ্ণৌয়ের অধ্যাপক প্রফেসর রোণাল্ড্ নিক্সন। পরে সর্বত্যাগী হয়ে আলমোরার গহন অরণ্যে কৃষ্ণমন্দির গ'ড়ে সেখানে আজ ত্রিশ বৎসর ভক্তিপ্রেমজ্ঞান-সাধনায় একান্তী হ'য়ে চলেছে—ভগবদ্ মুখী হ'য়ে। আপনি এ-ও জানেন যে, শ্রীঅরবিন্দ কৃষ্ণপ্রেমের জ্ঞান-নেত্রের উচ্ছ্বসিত তারিফ করেছিলেন আমাকে লেখা একাধিক পত্রে। লিখেছিলেন—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছে "পশ্যন্তী বুদ্ধি"। বলতেন প্রায়ই—এমন গুরু-ভক্তি ও বলিষ্ঠ চিন্তাদীপ্তি এ-যুগে বিরল। আমার "অনামী"-তে তাঁর প্রশস্তি পড়বেন—যদি না প'ড়ে থাকেন। কিন্তু সে যাক। আমার মহানন্দ জানিয়ে এ-পত্র শেষ করি—কৃষ্ণপ্রেমের অনুমোদন উদ্ধৃত ক'রে। ফেব্রুয়ারি মাসে সে আমাকে লিখেছিল একটি অভিনন্দন পত্র, তার প্রথমার্ধে লিখেছিল:

Dear Dilip.

I was very glad to get your letter yesterday··

Seriously enough I am very glad to hear of your activities in aid of the Defence of our frontiers. I only wish we could contibute on your scale. Anyhow, we sent what little we could. You strike the right note when you say that our soldiers are giving their lives that we may do our sadhana. What I mean is that it is not just a struggle between two different national egoisms—we could have little to say in support of that—but a

defence of freedom to pursue the spiritual path against a system under which it would be almost impossible, perhaps quite impossi-ble, after one generation. Not for nothing did Sri Aurobindo say that the tyranny of a Communist system would be a far worse thing than the tyranny of a mere Hitler. I have deliberately taken a stand on this issue as it is the one which concerns all of us who seek the spiritual Goal, the freedom of the spiritual path, which is the thing that we value most. Those who have other values which mean more to them will, naturally, think in terms of them. But surely these are ours and we must be ready to fight for them, if not with outer weapons, then with whatever we have and above all, with our hearts. Divine forces are there to help and will help, but for that they must have, as it were, bases in our hearts from which to operate. If we can give these bases, I am confident in the result, for, as I said, the fight is not for any morally national aims but for the sake of the spirit, for something universal that is one in all men. We have no monopoly of the Spirit (সমোহং সর্বভূতেষু—as says the Gita) but at least we still give Him a home and those who threaten us do not.

স্যর সি, পি, রামস্বামী আয়াব আমাদের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন ও বলেছিলেন তাঁর ভাষণে যে, এ-নাটকটি সর্বত্র দেখানো উচিত—জনপ্রেরণার উপযোগী ব'লে। বাংলায়ও "ভিখারিণী রাজকন্যা" লিখেছি। কলকাতায় গিয়ে ফের সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তুলতে সাধও হয়। কিন্তু সাধ্য কই? পিতৃদেবের মেবার পতন নাটক মনে পড়ে: "বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি কল্যাণী, বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি।" ইতি

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্

(বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ)

এ যুগের মানুষ বহু অসাধ্যসাধন করেছে এ কথা কে না মানবে? তবু একটা খেদ মনে না জেগেই পারে না যে, আমাদের আগের যুগের মানুষের কাছে একটি জিনিস অসাধ্য ছিল, যা এ-যুগের মানুষের কাছে হ'য়ে উঠেছে অসাধ্য না হোক দুঃসাধ্য তো বটেই ; অর্থাৎ, সরল বিশ্বাসকে দিশারি বলে বরণ করা। আমরা উঠতে বসতে ঘোষণা করতে গৌরব বোধ করি যে, আমরা টের পেয়েছি অন্ধ বিশ্বাসের ভিৎ কত দুর্বল, আত্মিক সত্যের ভূমিকা কী টলমলে, স্বজ্ঞা ওরফে 'ইনট্যুশন' কি রকম ভ্রান্ত। এ-যুগে সত্যের দিশারি কে?—না, যুক্তিবাদী সংশয়। কোন্ দিশারিকে সে বরণ করে? না, বাহাদুর বুদ্ধিকে। এ-বুদ্ধির সবচেয়ে আশ্চর্য কৃতিত্ব কী? না, শান্তিকে প্রায় আলেয়ার সমার্থক দাঁড় করিয়ে অশান্তিকে সহনীয় করে তোলা এই যুক্তিতে যে, অশান্তির বনেদই সত্য। বুদ্ধির সেরা যুক্তি এই যে, যেহেতু শান্তির ভিৎ স্থায়ী হয় না যদি ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে দীক্ষা না নিই, সেহেতু দাঁড়ালো—শান্তিই বর্জনীয়, অশান্তিই বরণীয়। এক বিদেশী কবি সংশয়ের ওকালতি করে এমন কথাও লিখলেন :

> They are but the slaves of light
> Who have never known the gloom.
> তারা শুধু আলোকের ক্রীতদাস হায়
> জানে নি জীবনে যারা কভু তমসায়।

অমনি এ-যুগের মানুষ খুশী হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল :

> 'এ-ই তো বীরের বাণী বসুন্ধরায়
> আলো ছেড়ে তমসারে বরিব হিয়ায়।'

না, এ ঠাট্টা নয়। কারণ, সত্যিই এ-যুগের মানুষ এই সুর ভেঁজেই চলেছে—সংশয়ের পথে পদযাত্রা ক'রে অন্ধকারকে হৃদয়ে বরণ করতে চেয়ে।

এ-দীক্ষার প্রধান সূত্রটি হচ্ছে এই যে, বুদ্ধি-বিচারই হল মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সারথি, বিশ্বাসভিত্তি আস্তিকতা ও ভক্তিলভ্য শান্তি—ওসব ভ্রান্তিবিলাস, সুতরাং নিন্দনীয়। আমরা চাই সত্যকে, মন-গড়া মিথ্যাকে তো নয়—তা সে মিথ্যা হাজার শান্তি দিক না কেন। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব, কিন্তু বিশ্বাসের চিচিং-ফাঁক মন্ত্র জপে চাই না আলিবাবার মতন অজস্র মণি-মুক্তার মালিক হ'তে। কেননা, এ-সব ধন-সম্পদ আরব্যোপন্যাসের মতনই অলীক অপলকা।

বীরের ম'ত কথা বৈকি। কেবল দুঃখ এই যে, খতিয়ে ধোপে টেঁকে না। কারণ, যতই জাঁকিয়ে শূন্যকে পূর্ণ বলে প্রচার করি না কেন, ফাঁকি দিয়ে ফাঁক ভরে না—হৃদয় থেকে যায় তৃষিত, আকুল, উদ্‌ভ্রান্ত। সে বলে, খৃষ্ট-দেবের ভাষায়ঃ গাছকে তার ফল দিয়ে বিচার করা যদি অযৌক্তিক না হয়, তাহলে বিশ্বাসের গাছে যখন শান্তি-ফল ফলে দেখতে পাচ্ছি, তখন কী দুঃখে অবিশ্বাসের শিলাবৃষ্টিতে সে ফলের উৎসাদন করে নিষ্ফল হ'য়ে কাল কাটাব, যার শেষ পরিণতি—বুভুক্ষা ও বিনাশ? মানুষের বুদ্ধি এ-প্রশ্নের কোনো যুক্তিসিদ্ধ উত্তর দিতে পারে না, কেবল এইটুকু বলতে পারে যে, না ও-ফল আমি চাই না, কেননা, ওর মিষ্টতায় আমার প্রাণ গললেও মন ভরে না। এক কথায়, অবিশ্বাসকেই আমাদের মন বাহাল করেছে সারথির পদে এবং এ-সারথির রথ মাটিছাড়া হ'তে পারে না ব'লেই মন বলে—এ পারাটা বাঞ্ছনীয় নয়। স্বপ্নাকাশে উড়ুক্ষু হবার হাজারো বিপদ।

এই ধরণের কথাই আমাকে একবার লিখেছিলেন আমার এক প্রিয় বন্ধু অনেকদিন আগে। আমি তখন পণ্ডিচেরি আশ্রমে থেকে বিশ্বাসকে মেনে বুদ্ধির বিচারকে পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে পেয়েছি গভীর শান্তি। কিন্তু তবু বুদ্ধির খাসতালুকে বহুকাল বাস ক'রে এসেছি তো, তাই থেকে থেকে সংশয়ের মেঘ হানা দিয়ে সে-শান্তির হেমপ্রভাকে নিভিয়ে দিতে চায়। এই দোটানার মধ্যে চিঠি পেলাম বন্ধুর। তিনি লিখলেন, তোমার কথা ভাবতে মন ব্যথিয়ে ওঠে। এ-যুগের সুসন্তান হ'য়ে কেমন ক'রে তুমি চক্ষুষ্মান বুদ্ধির আলো ছেড়ে অন্ধ বিশ্বাসের কুয়াশাকে বরণ করতে পারলে? শুধু মনে হয় সীজরের কথা: 'তুমিও ব্রুটাস?'...ইত্যাদি।

সে-চিঠি গুরুদেব শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়ে দিলাম—বেশ একটু অশান্ত

হ'য়েই, বলব। কারণ, আমার মন তখন বিশ্বাসের রং-মহলে শান্তির দেখা পেলেও কেবলই বলে আমাকে : 'এ রং ধোপে টিঁকবে না, টিঁকবে না, টিঁকবে না। কারণ, বিশ্বাস দীক্ষা দেয় চোখ বুঁজে চলবারই বটে। কাজেই, যদি আজ সে তোমাকে ক্ষীর-সরোবরেও পৌঁছে দিয়ে থাকে তাহলেও জেনো যে, সেই মিষ্টি পুকুরেই তুমি মরবে ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে দমবন্ধ হ'য়ে। যুক্তির পথ সোজা—সে শান্তি যদি নাও দিতে পারে, বীর হতে শেখায়, আর পাকে ফেলে না।'··· ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দকে এই দোটানার কথা লিখলাম। তিনি (সম্ভবত মৃদু হেসে) লিখলেন (অনুবাদ আমার) :

'কিন্তু তোমার বন্ধু কেন চান সবাই সেই পথে চলবে যে-পথ তাঁর কাছে সত্য বলে মনে হয়? তোমার অন্ধ বিশ্বাসের জন্যে তিনি তোমাকে ধম্‌কেছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি খতিয়ে যৌক্তিক বিশ্বাসই নয়? তুমি তোমার বিশ্বাসের নির্দেশে চলবে—এ তো খুবই স্বাভাবিক। তিনি চলেছেন তাঁর নিজের মত মেনে—এ-ও স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। কিন্তু তার বেশি নয়। সত্য দিশারি হিসেবে এ পন্থার পদবী তোমার বিশ্বাসের চেয়ে উঁচু নয়। তাঁর নিজের মতে তাঁর যুক্তির সায় আছে? কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাও তো চলেছে যে-পথে তাদের নিজের নিজের যুক্তির সায় আছে।—অথচ, তারা তোমার বন্ধুর ঠিক উল্টো পথকেই অভ্রান্ত সত্য মনে করছে না কি? যুক্তি কী করে দেখাবে এদের মধ্যে কে ঠিক, কে ভুল? তার্কিকেরা যুক্তি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়লেও সে পথে কোনো নিষ্পত্তি হবার নয়। শেষে জেতে সে-ই, যাকে সে সময়ের পরিস্থিতির ঝোঁক—trend of things—বরণ করে। কিন্তু এ-জগতের হাল-চাল দেখে কে বলতে পারে যে, অমুক সময়ের পরিস্থিতির ঝোঁক সব সময়ে যথার্থ যুক্তির—(right reason-এর) রায় মেনে চলে? তাছাড়া, যথার্থ যুক্তি বলতে কী বোঝায়, সেও এক কম সমস্যা নয়। বলতে কি, খতিয়ে এমন কোনো বিশ্বজনীন অভ্রান্ত যুক্তিই নেই, যে দেখিয়ে দিতে পারে—দুই তার্কিকের যুদ্ধমান যুক্তির মধ্যে কোন্‌টি সত্য। আছে শুধু তোমার যুক্তি, আমার যুক্তি, ক খ গ ঘ···হ য ব র ল—র যুক্তি-জটলার বিরাট ঘর্ঘর।'

এর পরে গুরুদেবকে জেরা করা শুরু করি—নানান অঘটন ও যোগ-বিভূতি নিয়ে। লোকে বলে অঘটন ঘটে না, ঘটতে পারে না, আর যোগ বিভূতিরা সব বাজে গুজব বা মিথ্যে ভেল্কিবাজি। আমি গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যিই কি এসব ছায়াবাজি না পরীক্ষিত সত্য? উত্তরে তিনি লিখলেন এক দীর্ঘ পত্র। ব্যাপারটা ঘটেছিল আমার এক আত্মীয়ের হঠাৎ জলে ডুবে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া নিয়ে। শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন, এ-ফাঁড়া তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সে নৌকা থেকে হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে প'ড়ে যাবার কয়েক দিন আগে। আমি লিখলাম বিজ্ঞ সুরে যে, আমি খানিকটা পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুনই হযতো এ-ধরণের যোগবিভূতিকে বিশ্বাস করতে বেগ পাই। তাতে গুরুদেব হেসে লিখলেন "আমি তোমার চেয়ে একটু বেশি পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছি শুনে থাকবে হয়তো? আমাকে এক সময়ে দুর্জ্ঞেয়বাদী নাস্তিকতার (agnostic denial) মধ্যে দিয়েও যেতে হযেছে। কিন্তু এসব ব্যাপারকে একটু শান্তভাবে দেখা শুরু করতে না করতে আমি য়ুরোপের ফ্যাশনকে বাতিল করেছিলাম, যে বলে—সংশয় ও অবিশ্বাসের জুড়ি হাঁকিয়ে চললে তবেই সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে, নৈলে নয়। অলৌকিক যোগবিভূতিকে আমার বরাবরই মনে হয়েছে একান্ত স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য। মানুষের যে-বাহ্য চেতনার আমরা খবর রাখি, সেই সীমাক্ষুণ্ণ চেতনাটুকুই আমাদের শক্তির শেষ কথা নয়। মানসিক চেতনার ঊর্ধ্বতর ব্যাপ্তি ও বিকাশ আছেই আছে। নানা যৌগিক ও তান্ত্রিক শক্তিকে বিশ্বাস করা চলে, যেমন বিশ্বাস করা চলে বড় কবির মহৎ কাব্য-রচনার বা সুরকারের সুর-রচনার ক্ষমতাকে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র এক-আধ জনের থাকে এ অঘটনী প্রতিভা, কারণ, মহনীয় সঙ্গীতের বা কাব্যের জনয়িতা আমাদের গহন অন্তর্লোক—কাজেই মহৎ কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করতে হ'লে চাই তার সঙ্গে যোগস্থাপন করা। এই জন্যেই যোগে দীক্ষা পাওয়ার পরেই তোমার মধ্যে কবিশক্তির বিকাশ হয়েছিল—অন্তর্লোকের সঙ্গে তোমার বাইরের চেতনার যোগ ঘটেছিল বলে।'*

---

* মূল পত্রটি পুরো ছাপা হয়েছে: LETTERS OF SRI AUROBINDO Volume-1 576-78PP. দ্রষ্টব্য

আমি গুরুদেবের এ-পত্রটি থেকে উদ্ধৃতি দিলাম প্রধানতঃ এই জন্যে যে এ-বহির্মুখী বুদ্ধিবাদী যুগে বুদ্ধি দিয়ে সব তত্ত্বেরই সত্য নির্ধারণের চেষ্টার ফলে আমরা বুদ্ধির অতীত লোকের নানা দৈবী সত্যকে অশ্রদ্ধা করতে শিখছি। এর কারণও দুর্বোধ্য নয়। বুদ্ধি নিজের এলাকায় অনেক কিছু অসাধ্য সাধন ক'রে সেই দম্ভে এই মিথ্যা পাঠ আমাদের দিতে চায় যে, যা সে জানে না তা নেই, কাজেই মানা চলে না। আসলে কিন্তু সে মানতে চায় না একথা স্বীকার করতে তার লজ্জায় মাথা কাটা যায় ব'লে যে, বিশ্ব রহস্যের কোনো কিছু তার নাগালের বাইরে। তাই সে ধরে নেয় যে, যা কিছুই এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ঘটুক না কেন, সে চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেই পারবে। কিন্তু একথা ধরে নেওয়াটাই যে ভুল—গোড়ায় গলদ। বুদ্ধি আমাদের ব্যক্তিরূপের একটি অঙ্গ মাত্র। অর্থাৎ, অংশ, সর্বস্ব নয়। পূর্ণচেতনা দিয়ে যা বোঝা যায়, তাকে আংশিক চেতনা দিয়ে ধরা-ছোঁওয়া যায় না। স্বপ্নচেতনা দিয়ে জাগ্রত চেতনার হদিশ পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি, বুদ্ধির যেটুকু বিকাশ হয়েছে সেটুকুর আলোয় সৃষ্টি বা জীবন-তত্ত্বের বেশিদূর অবধি দৃষ্টিগোচর হয় না।

কিন্তু স্মরণীয় যে, এছাড়া আর একটি অনস্বীকার্য কথা বলেছিলেন গুরুদেব, যে, বিশ্বজনীন ও অভ্রান্ত যুক্তি বলে কোনো জিনিস নেই। এর মানে নয় যে, যুক্তি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। ক খ গ ঘ য র ল ব হ ·· প্রত্যেকের যুক্তির মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত রুচি ও সংস্কারের স্থান খুব বড় হ'লেও সমাজে একটা জায়গায় পাঁচজনের যুক্তি সায় না দিলে না যায় আইন গড়া, না হয় পথ চলা।

কিন্তু হয়েছে কি, যুক্তির শুধু এই ব্যাপক মিলের দিকটাই এযুগে আমরা বড় করে দেখতে দেখতে প্রায় ভুলেই গিয়েছি যে, গরমিলের দিকটাও কম ব্যাপক নয়। এই গরমিলের দিকটার পরে জোর দেওয়ার দরকার আছে আরো এই জন্যে যে, সেই গরমিলই নির্দেশ দেয় কোন পথে তাকে ডিঙিয়ে সমাধানে পৌঁছানো যাবে।

এই সমাধানের পথ যুক্তি-তর্কে নয়, শুধু আন্তর ধ্যান ও বিনম্র

জিজ্ঞাসার ডাকেই নামে বুদ্ধির অতীত বোধিলোকের আলোর আভাস। কিন্তু এ-আভাস পেতে হলেও প্রথম দিকে স্বীকার করতেই হবে যে, যুক্তি-তর্কের বাহাদুরী ঝাণ্ডা উড়িয়ে চললে মেলে না পরম দিশা: "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"

প্রশ্ন উঠতে পারে: কিসের মতি? উত্তর—ধর্মে মতি, নিষ্ঠায় মতি, প্রণামে মতি। তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন—এই এল প্রথম ধারা। অর্থাৎ, পরম সত্যের দিশা পেতে হলে সব প্রথম হতে হবে তত্ত্বদর্শীদের কাছে বিনত জিজ্ঞাসু। বলতে হবে: আমি জানি না, আর তোমরা যে জানো—এদুটি কথাই আমি মেনে নিতে রাজী আছি, যদি তুমি আমার সত্য-জিজ্ঞাসার এমন উত্তর দাও যার ফলে আমার মিলবে পথের দিশা, মিটবে প্রাণের তৃষা, পোহাবে আঁধার নিশা।

কিন্তু এ-বিনতি সহজ নয়। আমাদের বুদ্ধির বিদ্যার অভিমান পদে পদে বাদ সাধে। সে বলে, 'না জেনে মেনে নেব কেমন ক'রে? আগে জানব, তবে মানব—আপ্তবাক্যের নজিরে কোন কিছুই আগে থেকে ধ'রে নিতে পারি না তো।

ব্যস্। এরপর তত্ত্বদর্শীর আর কিছু বলবার থাকে না শুধু এই কথাটি ছাড়া যে, তাহলে চলো সংশয়ের, তর্কের, অবিশ্বাসের কাঁটাবনে—যতদিন না চলতে চলতে দম বন্ধ হ'য়ে আসে সে-গোলকধাঁধায়। যতদিন তা না হয়, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।' এই কথাই মহাভারতে বলেছেন ব্যাসদেব: 'পর্যায় যোগাৎ লভতে মনুষ্যঃ'—অর্থাৎ সবই আসে যথাকালে। পরমহংসদেব এই বহু-ঠেকে-শেখা সত্যটিরই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন: 'সময় না হলে হয় না, ভোগান্ত না হলে আসে না তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা।'

কিন্তু ঐসঙ্গে আরো একটা কথা বলা চলে—তার্কিকদের জন্যে নয়—সত্যসন্ধানী তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের জন্যে: যে, "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।" অর্থাৎ কিনা, ভগবানের মতন বিরাট অতীন্দ্রিয় সত্তাকে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়বোধ বা বুদ্ধির দূরবিনে যখন দেখা যায় না, তখন যাঁরা তাঁকে (পরমহংসদেবের ভাষায়) "বোধে বোধ করেছেন" তাঁদের সাক্ষ্য মেনে নিয়ে তাঁদের নির্দেশে চ'লে সে-সত্যকে নিজের জীবনে চাক্ষুষ করা ছাড়া

উপায় কি? মেনে নিতে এত অনিচ্ছা কি যুক্তিসঙ্গত যখন দেখছি যে কেবল মানার ফলেই জানা যায়? কিন্তু একথায় আমাদের বুদ্ধি করে বিদ্রোহ, বলেঃ "ধিক্! ওসব হ'ল সেকেলে, মিডীভাল—না জেনে মেনে নেওয়া, না দেখে জনশ্রুতির নজিরকে অপৌরুষেয় ব'লে গড় করা। এ-যুগের বিজ্ঞানবাণী হল—আগে দেখব, চিনব, যাচাই করব, স্ট্যাটিস্টিক্স্ জড়ো করব, তবে বলব—মঞ্জুর, valid।"

কিন্তু বিদ্রোহের পথে পাওয়া যায় না পরম প্রজ্ঞাকে। কারণ, বিদ্রোহের বনেদ অহমিকা—যে হাঁকে সগৌরবেঃ 'আমার যুক্তিই হল হাকিম, সে যদি বলে, হ্যাঁ, তবেই তুমি মঞ্জুর, নৈলে নয়।' এর উত্তরে ভাগবত ঋষি বলেন হেসেঃ "মেনো না বাপু। ভগবান্ তোমাকে মানতে তো পীড়াপীড়ি করছেন না। তাঁকে না মেনে যদি সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারো, তবে আর চাই কি? কারণ, তাঁকে পেলে সুখের চেয়ে বেশি কিছুতো পাবে না। কাজেই ও-পথে পা দিও না। চলো তোমার আত্মাভিমানেরই পথে, দেখ বেয়ে-চেয়ে। কেবল দুঃখ এই যে, আমরা বহু ঠেকে তবে শিখেছি একটি লাখ কথার এক কথা যে, সত্যের সত্যকে না জানতে পারলে দুঃখ-নিবৃত্তির আশা দুরাশা এবং তাকে জানতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্টে দিতেই হবে; অর্থাৎ, জাঁক ক'রে বললে চলবে না যে, আগে জানব তারপর মানব। বলতে হবে নম্রস্বরেইঃ "আগে মানতে রাজী আছি যখন তুমি, সাধুজি, বলছ যে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির এজাহার বিশ্বাস ক'রে মেনে না নিলে জানা যাবে না সেই সত্যকে, যা জানলে তবেই জীবনটা পরমানন্দে কাটে, কেন না, সেই প্রেমের পরশমণিকে পেলে তবেই তাঁর ছোঁওয়ায় আমার চরিত্রের সব খাদ সোনা হ'য়ে যেতে পারে, নৈলে নয়।"

এ ছাড়া আর পথ নেই পরম সত্যকে জানবার—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। কারণ ভগবান্ বৈজ্ঞানিক আদালতে এসে মাথা নিচু ক'রে বলতে রাজী নন—"প্রভু, তুমি না মানলে আমার গতি নেই। তোমার পাঞ্জা না পেলে আমি ব্যর্থ, তুমি আমাকে নস্যাৎ ক'রে দিলে আমি নাজেহাল হয়ে কেঁদে কেটে সারা হব। বলো, কী করলে তুমি আমাকে মানবে? কী? আগে তোমার বকযন্ত্রে আমাকে ফুটোবে, পরীক্ষার

আঁচে আর কড়ায় ভাজবে বুদ্ধির তেলে? তথাস্তু। যা বলো করব—মান নাই থাকল, প্রাণে বাঁচব—এইটুকু ভরসা পেয়ে।"

ঠাট্টা কি শুধু মানুষই করে ভগবানকে?

কিন্তু খতিয়ে এ ঠাট্টাও নয়। কারণ, সংশয়ী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি গম্ভীর হয়ে ঠিক এই কথাই বলেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে, ভগবানকে মঞ্জুর করা যেতে পারে কেবল তখনই, যখন তিনি আমাদের মনের মতনটি হয়ে পোষ মানবেন আমাদের বুদ্ধির ল্যাবরেটরিতে হাজিরি দিয়ে।

ততঃ কিম্? আর কী?—যা হচ্ছে। দেখতেই তো পাচ্ছি নাস্তিক্যকে বরণ করলে তার কী ফল হয়। উপনিষদ বলেছে: "ইহ চেদ বেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" —তাঁকে এই জীবনে জানলে আর কোন অভাব থাকে না, কিন্তু ইহলোকে তাঁকে জানতে না পারলে মহতী বিনষ্টি—কিনা, সর্বনাশ।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা গ্রন্থে নানা রায়ের মধ্যে দিয়ে এই বাণীটিই আমাদের দিয়েছেন অভিনব ঝংকৃত সুরে যে, আমাদের মানবিক চেতনা চলেছে বিকাশের পথে নিচে থেকে উপর দিকে, কেননা, ভগবান তাকে এই পথেই ঠেলছেন। তাই বিকাশ লাভ তাকে করতেই হবে, ছোট থেকে বড় না হলে সে পার পাবে না। বুদ্ধি ততক্ষণই আমাদের সুপথে চালায়, যতক্ষণ সে আমাদের বিকাশের সহায় হয়। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে সদম্ভে বলে: "আমিই সত্য-নির্ণয়ের আদালতে কাজীর কাজী"—সেই মুহূর্তেই ভগবান যান সরে—আর তাঁর ছেড়ে-যাওয়া শূন্য রাজ্যের সিংহাসনে এসে বসে বুদ্ধির কু-যুক্তি। সে প্রত্যক্ষ দেখে যে, পাওয়ার মতন কিছুই পাওয়া যায় না ভাগবতী করুণা না মানলে, অথচ তবু (হায় রে!) কালোকে সাদা প্রমাণ ক'রেই সে বাহাদুর বনতে চায় অশান্তিকে সাদরে কোল দিয়ে। এরই তো নাম মায়ার খেলা, ওরফে, অহঙ্কারের বিড়ম্বনা। মানুষ বার বার ঠেকেও যে শেখে না, সে এই অহঙ্কারের ফেরে প'ড়েই—যে তাকে বলে: "বুদ্ধির গুমরই হল মানুষের গৌরব-মুকুট, তাকে ছাড়লে আমার রাজকীয় মানহানি হবে।"

উত্তরে ভগবান্ হেসে বলেন: "বেশ কথা বৎস!—যাতে তোমার

মান বজায় থাকবে ভাবছ, তাই করো—আমার প্রিয় সন্তান সাধু-সন্ত্‌দের অপমান ক'রে মিথ্যাবাদী ব'লে। দেখ, কোথায় পৌঁছও।"

বৈজ্ঞানিকেরা নানান আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখান নি একথা কেউই বলে না। তাঁরা মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছেন, দেহের নানা দুঃখ কমিয়েছেন, নানা রোগের বীজাণুকে দাবিয়ে রাখবার পথ খুঁজে বার করেছেন। কেবল একটি জিনিস পারেন নি—কোনোদিন পারবেনও না—মানুষকে সেই পরা বিদ্যার খবর দিতে, যার প্রসাদে ম্লান ক্ষুণ্ণ মানুষ হয় নির্বিষণ্ণ, সীমাবদ্ধ মানুষ পায় অসীমার সালোক্য, বুদ্ধি মেনে নিতে শেখে সেই উপরওয়ালা পরমপুরুষকে যাঁকে না পেলে শুধু যে আর সব পাওয়াই বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায় তাই নয়—অমৃতাশী জীবন হারায় তবে অমৃতের জন্মস্বত্ব।

শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটি নানা দিক থেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন তাঁর অপরূপ Who কবিতাটিতে। তার তিনটি স্তবক মাত্র উদ্ধৃত ক'রে এ-ভাগবতী ওকালতির সমাপ্তি টানি (পুরো কবিতাটির অনুবাদ আমার 'অনামী'তে দ্রষ্টব্য) :

বাজে যেথায় যত গান—ধ্বনি তার উছল সুহাস্যের,
সকল মাধুরী—তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ,
মানব জীবন—বুকের স্পন্দন তার, পুলক আমাদের
বাসর রাধাশ্যামের, প্রেম আমাদের তাদেরি চুম্বন।

প্রভু সেই আমাদের—অসীম কান্ত প্রেমিক সুমহান,
প্রাণের অন্তরঙ্গ, নেই আমাদের দৃষ্টি শুধু হায়।
আমরা মুগ্ধ দম্ভ উচ্ছ্বাসে, তাই অন্ধ দুনয়ান,
হায় সসীম চিন্তা দিয়ে বাঁধি মুক্ত আপনায়!

নিখিল ব্যাপ্তি ছেয়ে, যুগযুগের কল্লোল মাঝার
চির অনির্বচনীয়, বিরাট, শুভ্র বলীয়ান,
জ্ঞানী ভাবুক মনীষীর চিন্তার শেষ শিখরের পার
অপার আলোক-সিংহাসনে তাহার নিত্য অধিষ্ঠান।

স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিকতা

আবাল্য শুনে এসেছি মানবচরিত্র সর্বত্রই এক। রটনাটা যে মূলতঃ অসত্য এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু তবু ওদেশের বহু নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমার বারবারই মনে হয়েছে যে ওদের মনপ্রাণ আমাদের থেকে বেশ একটু আলাদা। সাধারণভাবে যে কোনো সূত্র দিতে গেলেই মুস্কিলে পড়তে হয় মানি, তবু বলব—না, দৃষ্টান্ত দিয়েই বলি না কেন: ওদের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রতিভার স্ফুরণ সহজ, আমাদের মধ্যে দার্শনিকতার প্রভাব বেশি। ওদের মধ্যে রাজসিকতা প্রবল, আমাদের মধ্যে তামসিকতাই বেশি চোখে পড়ে, অথচ সেই সঙ্গে এ-ও না ব'লে পারি না যে আমাদের মধ্যে মহাজনরা যত সহজে সাত্ত্বিক্ হ'তে পারেন—ওদের মহাজনরা কিছুতেই তত সহজে নিরীহ নিবৃত্তিমার্গী হ'তে পারেন না। অন্যভাবে বলা যায়—ওরা প্রবৃত্তিতে ঐহিক, আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বেশ একটু অনৈহিক—otherworldly। ওদের দেশে পরিবর্তন দ্রুত হ'লে মানুষ শঙ্কিত হয় না, আমরা হই। অন্য ভাষায়, আমরা ওদের চেয়ে সমাজে ও ধর্মে ঢের বেশি রক্ষণশীল—conservative—অন্ততঃ এ-পর্যন্ত হ'য়ে এসেছি। আর এই জন্যেই হয়ত ইংরাজকে চড়াও হ'তে হয়েছিল এদেশে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেও ওদের মতিগতির পরিচয় পেতে বিদেশ গেলে আমাদের জাত যেত—একঘরে হ'তে হ'ত। কিন্তু ওরা যখন এদেশে এসে জাঁকিয়ে বসল তখন প্রাণপণে চোখ বুঁজে থাকতে চাইলেও চোখে পড়ল বৈ কি ওদের কীর্তিকলাপ—রেল রে, হোটেল রে, ক্লাব রে, শৈলাবাস রে, গ্রামোফোন রে, মোটর রে, রেডিও রে—কী নয় রে? দেখতে দেখতে আর চম্‌কে উঠতে উঠতে আমাদের একটু একটু ক'রে চৈতন্য হ'ল: তাই তো, এ-ম্লেচ্ছদের চলার ছন্দ যে দেখি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জলদ—ওদের তুলনায় আমরা চলি যেন প্রায় ঢিমা তেতালায় বা আড়াঠেকায়! এ-ও স'য়ে ছিলুম—ওদের উঠতে বসতে আমাদের নেটিভ বলা, বাবু বলা—কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটল একটি অঘটন: ওদের প্রাণশক্তির ছোঁয়াচে আমাদের ঘুম ভাঙল, ওদের গতির ছোঁয়াচে

আমাদের গজেন্দ্রগমন লজ্জা পেল। ফলে আমাদের প্রাণে না হোক মানে বাঁচতে দীক্ষা নিতে হ'ল ওদের ত্বরিৎগতির; মন্থরকর্মাকে মন্ত্র দিল বিশ্বকর্মার দল—নেটিভকে গাইতে হ'ল:

"আমরা বিলেতফেরতা কভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই।
আমরা কী করি, নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই!"

জবাই না ক'রে উপায়ও ছিল না—অফিসে চাকরি করতে হ'লে ফার্সি ছেড়ে ইংরাজি শিখলে সুবিধে, ধুতি-চাদর ছেড়ে হ্যাটকোট। এ সব হয়ত বাহ্য, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি অঘটন ঘটল—আমরা ইংরাজি ভাষাটায় হঠাৎ চমৎকার পোক্ত হ'য়ে উঠলাম—বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষিতবৃন্দ সত্যিই রসিয়ে উঠলেন এ-আশ্চর্য উদ্দীপনাময়ী, প্রাণদা, বলদা, বরদা ভাষায়! আমরা শুধু শেলি, কীট্‌স্, বাইরন, শেক্ষপীয়র আওড়ানোই নয়—এমন বক্তৃতা দিতে সুরু করলাম সাহেবি ভাষায় যে ওদের সত্যিই তাক লেগে গেল। এরই ফলে আমরা এসে পড়লাম সেকাল থেকে একালে—হলাম আধুনিক।

সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মিকে অভিনন্দন করে সর্বপ্রথম উচ্চতম শিখরগুলি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের দেশের শিখরচারী পুরুষদের মধ্যেও অগ্রণী। তাই তাঁর মন যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অরুণাভায় সব আগে রঙিয়ে উঠবে এতো জানাই। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা সজাগ হ'য়ে উঠলাম যে, তিনিই করলেন এক অভিনব আধুনিক যুগের সূচনা, ওদেশের নানা ভাবধারায় শ্রেষ্ঠ রংরূপ নিয়ে অকুতোভয়ে আমাদের মনকেও সে-আভায় রাঙিয়ে তুললেন। বললেন: ওদের কাছে আমরা শিখব সংঘ গড়তে, কর্মতৎপরতা—(efficiency)—আর ওরা আমাদের কাছে শিখবে ধ্যান, তপস্যা, যোগ, বেদান্ত। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—আমরা দেব আমাদের যা দেওয়ার আছে, তোমরা প্রতিদানে দাও তোমাদের যা দেওয়ার আছে। "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ" এর প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজি একথা চমৎকার করে বলেছেন—দ্রষ্টব্য।

এ-সম্পর্কে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতি আজো মনে জেগে আছে, থাকবেও চিরদিন। স্মৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি দীপ্ত উক্তির—আমার

স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব ৪৭০—৪৭১ পৃষ্ঠায় ফলিয়েই লিখেছি। তাই শুধু শেষটুকু উদ্ধৃত করি—যেটুকুতে স্বামীজির কথা বলেছিলেন তিনি লণ্ডনে ১৯২০ সালে। বলেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে লণ্ডনে সভা-ডাকা সম্পর্কে: "দিলীপ, আমরা এ-স্বাধীন দেশে এসেও কি আমাদের জাতীয় অগৌরব লজ্জা হীনতা ভীরুতা প্রচার ক'রে এদের আদর কাড়তে ছুটব? এ হয় কখনো? এরা আর যাই পারুক না কেন, কাপুরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না—নিশ্চয় জেনো। এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি যাদের দৌলতে ভারত বড় হয়েছিল—যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। তাই তো তিনি এদের শ্রদ্ধাও পেয়েছিলেন। তিনি এদেশে এসে এদের ডাক দিয়েছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' ব'লে—কাঁদুনি গাননি আমাদের হাজারো দুর্দশার কথা জানিয়ে। আমার মনে আছে নিবেদিতাকেও তিনি কীভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন ভারতের সত্যকীর্তির তত্ত্বে, তার কাছে একবারও বলেন নি—আমরা বড় আর্ত, দীনহীন, কৃপার পাত্র। বলতেন: 'ভারতের বড় দিকটার পানেই চোখ তুলে তাকাও—তার বাইরের দারিদ্র্যকেই বড়ো ক'রে দেখো না।' আমেরিকার সামনে তিনি মাথা উঁচু ক'রেই বলেছিলেন ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা—যদি কেঁদে ভাসাতেন 'দুটি ভিক্ষে পাই গো' বলে, তাহ'লে না পেতেন ভিক্ষা, না সমাদর।"

তাঁর পরে স্বামী রামতীর্থ, রবীন্দ্রনাথ, আনন্দকুমার স্বামী ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠিক এই কাজই করেছিলেন—এই পারস্পরিক দান-প্রতিদানের সম্বন্ধের বনেদ গেঁথে নিজের নিজের ঢঙে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজিই ছিলেন পুরোধা—ভারতের প্রথম ধর্মীয় সংস্কৃতিদূত, ওদেশে আমাদের বেদান্তের প্রথম উদ্‌গাতা। তাঁকে এজন্যে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছিল, বহু দুঃখ ও নিন্দা সইতে হয়েছিল—সর্বোপরি, অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল—যার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। কিন্তু এ হ'ল তাঁর আধুনিক প্রচার-মিশনের মাত্র একটি দিক। ওদেশে এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের হরির লুট বিলিয়ে তিনি দেশে ফিরে এর পাল্টা—converse—ঘোষণায় লেগে গেলেন—এদেশে খানিকটা য়ুরোপীয় ঢঙেই সেবাধর্মকে লোকপ্রিয়

ক'রে এবং কুসংস্কারবর্জিত মঠের পত্তন ক'রে। য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে আমাদের দেশে তাঁর আগেও কয়েকজন বরেণ্য মনীষী বরণ করেছেন, যথা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের পত্তন ক'রে, ও মধুসূদন-বঙ্কিম য়ুরোপীয় সাহিত্যের রস বাংলায় আমদানী ক'রে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম তথা কর্মলোকে পাশ্চাত্য প্রাণশক্তিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন প্রথম স্বামীজি —তাঁর তীব্র বৈরাগ্যে, প্রাণোন্মাদী বক্তৃতায়—সর্বোপরি, তাঁর রোমান্টিক নবজাগৃতিমন্ত্রের তথা বহ্নিময় ব্যক্তিরূপের ফুলঝুরিতে। মানুষের ঘুমন্ত শক্তি সবচেয়ে সহজে জেগে ওঠে দিগ্বিজয়ীর টঙ্কারে। স্বামীজি এ-টঙ্কারের সঙ্গে জুড়ে দিলেন পরমহংসদেবের কাছ-থেকে-পাওয়া জ্ঞানভক্তির ওঙ্কার ও ঝংকার। ফলে দেশের ঝিমিয়ে-পড়া মনে উঠল শিহরণ জেগে।

"রোমান্টিক" বিশেষণটি অনুধাবনীয়। কারণ স্বামীজির চুম্বকশক্তির মধ্যে এই রোমান্টিক উদ্দীপনার মালমসলা ছিল অপর্যাপ্ত। এ-যুগে আমরা হয়ে পড়েছিলাম খানিকটা দিনগতপাপক্ষয় ক'রে চলারই পক্ষপাতী। তাই সুভাষ প্রায়ই বলত: "আমাদের বরণ করতেই হবে স্বামীজির aggressive Hinduism এর বাণী—নির্বিবাদী ভালোমানুষের দিন গত—স্বামীজির কথায় কান দিতে হবে—চড়াও হ'তে হবে, আর তারই জন্যে চাই সবপ্রথম স্বাধীন হওয়া।" কিন্তু আমাদের মনে এ-স্বাধীনতার অভীপ্সা সবপ্রথম ব্যাপকভাবে জেগে উঠেছিল যখন স্বামীজির আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের তূরীধ্বনিতে আমরা চম্‌কে উঠলাম—যেন এক অঘটনের রোমান্সে। স্বামীজি যখন আমেরিকায় দুরবস্থায় পড়েন তখন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করে নি। কিন্তু তার পরেই যখন শিকাগোর বিশ্বমানবিক ধর্মসভায় তাঁর বিদ্যুৎপ্রবেশে হাজার হাজার মার্কিন নরনারী বিচলিত হ'য়ে উঠল, তখন আমরা বললাম: "তাই তো হে। চিরদিন ওরাই আমাদের চম্‌কে দিয়েছে। এখানে দেখি শোধ তুলল আমাদেরই মতন ভেতো বাঙালী—যাকে আমরা 'কর্মনাশা' নাম দিয়ে শাপমন্যিই দিয়ে এসেছি—অনেকগুলি ভালোমানুষের পো-র মস্তক-ভক্ষণ করার অপরাধে। অতএব অ গোঁসাই, এসো চাদর গায়ে দিয়ে ছোটা যাক্, দেখে আসি কী ব্যাপার—শুনে আসি কী বলে নরেন্দর। মনে হচ্ছে বুঝি বা এ-ঘুমের দেশে হঠাৎ একটা কিছু ঘটবার মতন ঘটল। নৈলে কি তোমার

আমার মতন ছাপোষা মনিষ্যির বুকেও কেমন যেন এক ঘরছাড়া ডাক বেজে ওঠে ?—চলো চলো।" আমার বাল্যকালে স্বামীজির তিরোধানের পরেও এই রোমান্সের কিছু রেশ শুনেছি প্রাণভরে—এ একটুও অত্যুক্তি নয়।

এই রোমান্সের শিহরণ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের উচ্ছ্বাসে এসে লেগেছিল স্বামীজির দিগ্বিজয়ী হ'য়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে। কান পেতে শুনলে আজও চম্‌কে উঠতে হয়—কলম্বোয় (১৬ই জানুয়ারিতে ১৮৯৭) তাঁর প্রথম বক্তৃতাব শঙ্খধ্বনিতে। বললেন স্বামীজি সঘনে :

"আগে আগে আমি ভাবতাম যে, ভারত পুণ্যভূমি, আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারি যে এ-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।… এই পুণ্যভূমি থেকেই ধর্মনায়কেরা বরাবরই পৃথিবীতে অধ্যাত্ম সত্যের বান ডাকিয়েছেন! এখান থেকেই দর্শনের বিপুল জোয়াব প্রবাহমান হ'য়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে, আর এখান থেকেই ফের সে-স্রোত বইবে যার স্পর্শে জগতের বস্তুতান্ত্রিকতা শুদ্ধিলাভ করবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।"

"গেরুয়া-পরা সন্নিসি বলে কি হে ?" শুধালেন মুরুব্বি প্রবীণরা চোখ কপালে তুলে! "আমরা জগতের চেহারা বদলে দেব—আমাদের অধ্যাত্ম শক্তির পরশ-পাথরের ছোঁওয়ায় ? অ্যাঁ ? আমরা—যারা—ডি. এল. রায়ের ভাষায়—

"পাঁচশো বছর এমনি করে আসছি সয়ে সমুদায়,
এইটে কি আর সইবে নাকো—দুঘা বেশি জুতোর ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুঘা দে না বাবা,
দুঘা বেশি, দুঘা কমে—এমনিই কি আসে যায় ?"

অ গোঁসাই! ছাপোষা মনিষ্যি আমরা—সাতেও নেই পাঁচেও নেই—অথচ নরেন্দর বলে কি! 'The mild Hindu has always been the blessed child of god…Abhih Abhih! We have to become fearless, and our task will be done—নিরীহ হিন্দু ভগবানের মানসপুত্র আমরা—অভী হ'লেই হাতে হাতে সিদ্ধিলাভ!' এ কী ব্যাপার, গোঁসাই? শুনে তাক লেগে গেল যে! বলে কী

নরেন্দর ?—'To the other nations of the world religion is but one among the many occupations of life—অপর দেশে ধর্ম আর পাঁচটা বৃত্তির মধ্যে একটা—রাজনীতি রে, সামাজিকতা রে, অর্থসুখ রে, ক্ষমতাবিলাস রে, রকমারি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি রে—কত কীরে—কেবল ঐ পাঁচমিশেলের সঙ্গে থাক্ না একটু ধর্মেরও অনুপান। ওদেশের লোককে গিয়েও শুধাও, দেখবে তারা এ-ও-তা অনেক কিছুরই খবর রাখে। কিন্তু যদি ধর্মের কথা পাড়ো, তা'হলে তারা বলবে যে তারা নিয়মিত গির্জায় যায় ও অমুক খৃষ্টীয় অভিধায় অভিহিত। তারা ভাবে এইটুকু জানাই যথেষ্ট'*—শুনছ, নরেন্দর বলছে ? অ গোঁসাই!"

স্বামীজি অতঃপর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় আরো কত কীই না বললেন—দেখালেন কত দৃষ্টান্ত দিয়ে যে, ওরা এইভাবে চললেও আমাদের চলার ছন্দ ঠিক উল্টো—অর্থাৎ আমরা এই আর-পাঁচটার খবর রাখি না, বলি এসব অবান্তর, রাখার মতন খবর কেবল একটি—ধর্ম। মনে পড়ে পরমহংসদেবের বিচিত্র কথিকা :

চলে পণ্ডিত নৌকায়, মাঝি অদূরে আসীন হালটি ধ'রে।
পণ্ডিত পুছে :. "জানিস কি তুই দর্শন বেদ পুরাণ ওরে!"
"না ঠাকুর।"—"সে কি ? ন্যায়, বেদান্ত ?"—"জানি না ঠাকুর।"
—"তন্ত্রসার ?"
মাঝি হাসে : "আমি মুখ্যু ঠাকুর, কোনো বিদ্যাই নেই আমার।"
পণ্ডিতও হাসে গোঁফে চাড়া দিয়ে : "তা বটে, এসব কজন জানে ?"
সহসা উঠল ঝড়। মাঝি বলে : "সামাল ঠাকুর! স্রোতের টানে :
নাও বুঝি ডোবে—তবে নিশ্চয় সাঁতার জানেন আপনি, স্বামী ?"
পণ্ডিত বলে : "বলিস কি ? ওরে, সাঁতার দিতে তো জানি না
আমি।"
মাঝি বলে : "আমি জানি না পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, তন্ত্রসার,
হাবি জাবি আরো কত কী জানি না, কেবল ঠাকুর জানি সাঁতার।"

আমার মাতামহ ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যেতেন পরমহংস দেবের গলক্ষতের চিকিৎসা করতে। (কথামৃতে তাঁর নাম

* স্বামীজির "First Lecture In the West" দ্রষ্টব্য

আছে) তিনি আমাকে বলেছিলেন—এ কথিকাটি তিনি ঠাকুরের শ্রীমুখেই প্রথম শোনেন। (আরো বলেছিলেন যে, ঠাকুর প্রায়ই গাইতেন একটি গান : "রামকো জো ন জানা সো ক্যা জানা হ্যায় রে ?") কলম্বোয় ও অন্যত্র স্বামীজির নানা বক্তৃতার বাদী সুর ছিল এই কথাই : যে, হিন্দু এ-ও-তা হাবিজাবির খবর না রাখলেও একটি জিনিসের খবর রাখে।—ধর্ম, যার নাম সে দেয় পরমার্থ। অর্থাৎ, পরম বস্তু হ'লেন তিনি, তাই তাঁকে জানার নামই সার্থক জ্ঞান—আর সব জ্ঞান—কি না ঐহিক জ্ঞান—না হ'লেও চলে, যদি এই জ্ঞানের জ্ঞান একবার অন্তরে আলো জ্বালায়।

এই প্রত্যয় আবহমনকাল ভারতের কাছে পরম ঈপ্সিত ব'লেই গণ্য হয়েছে—"নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ"—তাঁকে জানলে সবই জানা হয়। তাই তাঁকে জানায় যে বিদ্যা, তারই নাম দেওয়া হয়েছে "পরা বিদ্যা"—বাকি সব অপরা বিদ্যা, অথাৎ গৌণ, মুখ্য নয়। স্বামীজি তাঁর নানা ভাষণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল এই বাণীরই ভাষ্য করেছেন—ধর্মবুদ্ধির নামই বুদ্ধি, ফন্দির নাম দুর্বুদ্ধি। তাঁর একটি প্রিয় বচন ছিল : "চালাকি ক'রে কোনো মহৎ কাজ হয় না।" প্রায়ই বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি করলে সব ডুববেই ডুববে—যেজন্যে ধর্ম-যে-ধর্ম সেও ডুবেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন (১৮৯৪ সালে) : "ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা ? জ্ঞানমার্গ ভক্তিমার্গ যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ !! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্বভূতেও নাই, ধর্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে।"

এ-যুগের একটি মহৎ প্রবণতা—সব কিছু প'ড়ে পাওয়া বুলির যাচাই করা। স্বামীজির মধ্যে এ প্রবণতা দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরের তেজোদীপ্তিতে। বলিষ্ঠ মানুষের একটি ধর্ম—সব কিছুকেই প্রবল ভাবে অনুভব করা। স্বামীজি ছিলেন বীরসিংহ, কাজেই তাঁর প্রাণ ধিক-ধিক ক'রে উঠত—চালাকি, ছুঁৎমার্গ ও ভাবের ঘরে চুরি দেখে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন বৈ কি যে, আমরা ধর্মকেই একান্ত

হ'য়ে বরণ করি, কিন্তু চারদিকে কপটতা ও মিথ্যাচার দেখে আহত হ'য়ে আমাদের অধঃপতনের জন্যে আমাদের তীব্রভাষায় তিরস্কার করতেন। আর তাঁর প্রাণোচ্ছল মন সবচেয়ে গভীর বেদনায় ছেয়ে যেত যখন তিনি দেখতেন তামসিকতাকে আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি। তাঁর "ভাববার কথা"য়—তিনি লিখছেন: "দেখিতেছ না সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমসাসমুদ্রে ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে···যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভাণ করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি, গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে—সেদেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?"

এখানে যদি কেউ বলেন যে, স্বামীজি তো তাহ'লে অপরের 'পরে যে-অভিযোগ আনছেন নিজেই সে অপরাধে অপরাধী, যেহেতু তিনি ভারতের অতীত মহিমা—"পিতৃপুরুষের নামকীর্তন"—যত্র তত্র প্রচার করে এসেছেন, তাহ'লে ভুল বলবেন। খৃষ্টদেবের একটি কথিকা আছে—এক গৃহস্থের তিনটি চাকর ছিল। তিনি বিদেশ যাবার সময় তাদের হাতে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে যান। ফিরে এলে দুজন চাকর বলে তারা গচ্ছিত মুদ্রা খাটিয়ে বাড়িয়েছে। প্রভু খুশী হ'য়ে তাদের পুরস্কার দেন। তৃতীয় চাকরটি তাঁর দেওয়া মুদ্রাটি ফেরৎ দিয়ে বলে সে টাকাটি সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছে—পাছে খোওয়া যায় এই ভয়ে। প্রভু তাকে তামসিক ব'লে তিরস্কার ক'রে শাস্তি দেন, বলেন যে, যে-জন্মালস অল্প নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তার কাছ থেকে সে অল্পও কেড়ে নেওয়া হবে। (For every one that hath shall be given : but from him that hath not, shall be taken away even that which he hath.) স্বামীজি চাইতেন বৈ কি যে, আমরা অতীত মহিমার জয়ধ্বনি করি—কেবল সেই সঙ্গে বার বার বলেছেন এই মহিমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হ'তে হবে, হাতে-পাওয়া পুঁজি খাটিয়ে যে বাড়াতে না চায় সে হয় দেউলে। এইখানে তিনি ছিলেন বিশেষ ক'রেই আধুনিক—প্রগতিশীলদের দলে যাদের

জীবনের মন্ত্র—স্বামীজির ভাষায়ই বলি : "বল্ অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি ক'রে দেশটা গেল। ...প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে। ওরে হতভাগাগুলো! নেই নেই বলতে বলতে কি কুকুর বেড়াল হ'য়ে যাবি না কি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোহং শিবোহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বাড়ি মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে আমার জন্ম গেল! ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনাহীনা ভাব—ও হ'ল ব্যারাম—ও কি দীনতা?...ছুঁচোগিরি করবি তো চিরকাল প'ড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। ""উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্... নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। Avalancheএর মতন দুনিয়ার উপর পড়।"*

এই ধরণের উদ্দীপক ভাষণ পত্র কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন তিনি উঠতে বসতে—একদিকে দেবভাষার বীর্যবাণী, অন্যদিকে ভর্ৎসনা—দেখ্ কী ছিলি, কী হয়েছিস! এ-দুই মনোভাব তাঁর তেজস্বী চরিত্রের দুটি দিক—অতীত থেকে প্রেরণা আহরণ করতে হবে, অতীত মহিমাকে মনে প্রাণে বরণ করতে হবে—কেবল সে-আরো এগিয়ে যেতে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় : "We do not belong to the past dawns but to the noons of the Future" : অতীতের উষাবিলাসী হ'লে চলবে না—হ'তে হবে আমাদের ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নচারণ। এর কেন্দ্রীয় বাণীটি হ'ল তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের শিরোনামা—বীরবাণী। তাতে "সবার প্রতি" কবিতায় স্বামীজি লিখছেন :

> ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হ'য়ে কি বা ফল?
> দাও আর ফিরে নাই চাও—থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"
> তাই শুধু নিজের মুক্তি সাধনায় মুক্তি নেই, মুক্তি—
> সবার সেবায় জীবপ্রেমে :
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
> জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

* পত্রাবলী ১ম ভাগ ২৪২ পৃঃ—আত্মাকে বলহীনেরা পায় না, মানুষকে জগজ্জাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, যেমন সিংহ খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসে...নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হবে...ইত্যাদি।

সত্ত্বগুণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, বাহিরে থেকে অনেক সময়েই তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা ব'লে ভুল হয়। তাই বলতেন বারবারই : তামসিকতা থেকে রাজসিকতায় আরূঢ় হবার পরে তবে সাত্ত্বিকতার নাগাল পাওয়া যায় :

"সত্ত্বগুণ এখনো বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতের আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়?" (ভাববার কথা—বর্তমান সমস্যা)

দ্রষ্টব্য—বরাবরই দুটি আদর্শ পাশাপাশি চলেছে সমতালে—ঐহিকতা ও পারমার্থিকতা, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ, গুরুবাদ ও সোহংবাদ। আর সবার মূল প্রেরণা তাঁর বীরাত্মার প্রবল গ্রহণবর্জন : "আমি কাপুরুষকে ঘৃণা করি, কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাই নি। কোন প্রকার রাজনীতিতে আমি বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।" পত্রাবলী—৪৭১ পৃষ্ঠা

আবার সেই সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন এক নিশ্বাসে : "দাদা,, মুক্তি নাই বা হ'ল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। একথা কি মিথ্যে ?—

'মনসি বচসি কায়ে পুণ্য পীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ।
পরগুণ পরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥'

(ঐ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

(এমন সাধু আছেন যাঁরা নিয়ত এ-ভুবনে
সাধি' নিখিল জনের হিত বাক্যে কায়ে মনে
পরের অণুগুণই তুলি' শৈলকায় করি'
বিকাশ লাভ করেন প্রীতি পীযূষ নির্ঝরি'।)

"নাইবা হোলো তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানষি কথা! রাম

রাম !···ও কোন্ দেশী বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ। ও-রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানি নি তো কোন্ শালা জানে? তুমি জানো না তো এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব করতে পারি, সব করব, যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের ম'ত কোনে ব'সে মেউ মেউ করবে।"

কী উদ্দীপক কথা! যেন বল্গা মানতে নারাজ তেজী ঘোড়া! মনে পড়ে সুইজর্লণ্ডে রোলাঁর কথা: "গায়ে কাঁটা দেয় আমাদেরই তাঁর বীরবাণী শুনে—সোজা গিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই।"

এই ভাবের কত কথাই না তিনি বলেছিলেন আমাকে সোল্লাসে। একটি পত্রে সহস্তে লিখেছিলেন: (২২-৮-১৯২৮)

Lisez la première conférence de Vivekananda sur Maya et l'Illusion (1896). Combien je me sens proche de sa conception tragique du monde et de son action héroique !···La première qualité de mondepoor nous (et ce n'est pas seulement Beethoven qui l'a dit—mais c'est aussi votre Vivekananda) c'est l'Energie. Sans elle rien de grand. Avec elle, rien de faible. Ni vice ni vertu.

[অর্থাৎ বিবেকানন্দের প্রথম ভাষণ পড়ো ১৮৯৬ সালে মায়ার উপরে। জগত সম্বন্ধে তাঁর দুঃখবাদ ও অকুতোভয় কর্মবাদ আমার এত মন টানে!···আমরা মনে করি এ-জগতে সব আগে চাই শক্তিবাদ (আর এ শুধু বাটাভ্‌নেরই কথা নয়—তোমাদের বিবেকানন্দের বাণীও এই-ই) শক্তি ছাড়া মহৎ কিছুর প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, আর শক্তি থাকলে ক্ষীণ কিছু টিঁকতে পারে না—না পাপ, না পুণ্য।]

য়ুরোপের একটি শ্রেষ্ঠ অনুভব এই শক্তিবাদ—এনার্জি। ওদেশে যাবার পরে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে ওদের এই গতিতন্ত্র—চলো চলো চলো—থেমো না। এর ফলে ওরা অনেক সময়েই খানায় পড়ে—চলার মোহ পেয়ে বসলে মানুষ সেই মোহবশে অনেক সময়েই অন্ধ

হ'য়ে পড়ে। কিন্তু তবু সব জড়িয়ে উদ্ভিদের মতন অনড় হ'য়ে ব'সে থাকার চেয়ে চলা ভালো···এই-ই হ'ল আধুনিক যুগের একটি প্রধান বাণী—অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ নয়, প্রবৃত্তিমন্ত্র। স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য : অশ্রান্ত কর্মযোগের সঙ্গে ধ্যানযোগ। ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারত পুণ্যভূমি—আর কর্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ-পুণ্য-ভূমিকে যুগসঞ্চিত আগাছা ছেঁটে নির্মল করতে। তাই তিনি আধুনিকযুগের সাম্যবাদ মেনে নিয়েছিলেন ছুঁৎমার্গের প্রতি আমাদের ঘৃণা জাগাতে এবং লোকাচারের অসারতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করতে। এ সম্পর্কে তাঁর একটি পরম উপভোগ্য নক্সায় তিনি লিখেছেন (ভাববার কথা) :

"সনাতন হিন্দুধর্মের গগনস্পর্শী মন্দির—সে-মন্দিরে নিয়ে যাবার রাস্তাই বা কত! আর সেখানে নেই-ই বা কি? বেদান্তীর নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি সুয্যিমামা, ইঁদুর-চড়া গণেশ—নেই কি?···আমারও কৌতূহল হ'ল ছুটলুম। গিয়ে দেখি—এ কি কাণ্ড—মন্দিরের মধ্যে কেউ যাচ্চে না, দোরের পাশে এক পঞ্চাশমুণ্ডু মূর্তি খাড়া। সেইটার পায়ের তলায় সকলেই গড়াগড়ি দিচ্ছে। একজনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলুম যে, ওই ভেতরে যে-সকল ঠাকুর দেবতা, ওদের দূর থেকে একটা গড় বা দুটি ফুল ছুড়ে ফেললেই যথেষ্ট পূজা হয়। আসল পূজা কিন্তু এঁর করা যাই—যিনি দ্বারদেশে। ঐ যে বেদ-বেদান্ত দর্শন পুরাণ শাস্ত্র সকল দেখছ, ও সব মধ্যে মধ্যে শুনলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পালতে হবে এর হুকুম। তখন আবার জিজ্ঞাসা করলুম, তবে এ-দেবদেবের নাম কি? উত্তর এলো, এঁর নাম 'লোকাচার'।"

ধর্মকে মেনে লোকাচারকে তুচ্ছ করার এই যে রোখ, এ আমাদের আগের যুগে ছিল না বললেই হয়। তাই অমন যে তেজস্বী পুরুষ বিদ্যাসাগর, তিনিও বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের সময় চলতি লোকাচারকে খণ্ডন করতে বেরিয়েছিলেন পরাশর সংহিতার আশ্রয় নিয়ে, দেখিয়ে যে আগে বিধবাদের বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ ছিল না। স্বামীজি কিন্তু এ-যুগের যুগধর্মকে এককথায় মেনে নিয়ে লোকাচারকে অবাস্তব বলেছিলেন—সোজাসুজিই। শাস্ত্র তিনি আওড়াতেন চিরন্তনীপরা বিদ্যাকে

প্রামাণ্য করতে, আর হেয় লোকাচারকে বরখাস্ত করতে চাইতেন আধুনিকতার সহজ যুক্তিবাদের ফুঁ-য়ে। তাঁর পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে পাই —তিনি অধ্যাত্ম সত্যকে মনে করতেন অমূল্য ফল ফুল, আর গতানুগতিক লোকাচার কুসংস্কার কাপুরুষতাকে মনে করতেন আগাছা, কাঁটাবন। তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে একটি পত্রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮ পৃঃ):

"আমার মটো—মূলমন্ত্র—এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল ও গোঁড়ার কথা মনে করি। কারণ সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাস স্বরূপ।"

এখানে লক্ষণীয়—তিনি চিরন্তন সত্যকে মেনেও সাময়িক লোকমতকে উপেক্ষা করছেন সমান তেজে। এই ভেদজ্ঞানকে বলা যায় চিরন্তন ও অবাস্তবের তফাৎ—the difference between the essential and non-essential: ভারত পুণ্যভূমি—এ চিরন্তন সত্য, ভারতীয় লোকাচার অন্য সব লোকাচারের মতনই কখনো শুভ কখনো অশুভ—কাজেই চিরন্তন নয়। বেদান্তের সূত্র চিরন্তন, কেন না তার ভিত্তি অপরোক্ষ-অনুভব—কিন্তু লোকাচারকে প্রতিপদেই আধুনিক যুগধর্মের নিকষে যাচিয়ে দেখতে হবে—কখনো কিছু জুড়তে, কখনো কিছু বাদ দিতে। অন্যথা গোঁড়ামির চার্জে অভিযুক্ত হ'তে হবে—উদারতার হবে ভরাডুবি। পত্রাবলীতে মাষ্টার মহাশয়কেও (শ্রীম) তিনি লিখেছিলেন এই কথাই (ঐ ১৪ পৃঃ): "পূজ্যপাদেষু, আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" এ প্রসঙ্গে গুরুভক্তি সম্বন্ধেও তাঁর আধুনিক বলিষ্ঠ মনোভাবের দৃষ্টান্ত দেওয়া অবান্তর হবে না। আমেরিকায় তিনি বলেছিলেন: "Love him (the Guru) heart and soul, but think for yourself. No blind belief can save you, work out your own salvation—গুরুকে মনে প্রাণে ভালোবাসবে, কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে শিখতে হবে তোমাকে। অন্ধ বিশ্বাসে মুক্তি নৈব নৈব চ।" (Inspired Talks 164 p.)

আমাদের আগের যুগে খুব বেশি জোর দেওয়া হ'ত সব তাতেই শাস্ত্র মেনে চলার 'পরে। মুনি ঋষি মনু গুরু—বাপ্‌রে! তাঁদের কথা বেদবাক্য। কিন্তু এযুগের একটি প্রধান প্রবণতা হ'ল যা সবাই মেনে নিয়েছে, একবাক্যে, না ভেবেচিন্তে, তাকেও ভেবেচিন্তে দেখতে হবে—কতখানি রাখতে হবে, কতখানি ফেলতে। এ-মনোবৃত্তির একটি বড় চমৎকার পরিচয় মেলে মহামনীষী বার্টরাণ্ড রাসেলের একটি উক্তিতে। তাঁর দাদা তাঁকে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াতে এসে বলেন—প্রথমে কয়েকটি সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ (axiom) ব'লে মেনে নিতে হবে। রাসেল বলেন : তা কেন ? প্রমাণ বিনা কিছুই মানতে পারব না। তাতে তাঁর দাদা বলেন—তাহ'লে তোমাকে জ্যামিতি শেখাতে পারব না। এ-সূত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কে বড় সত্যদিশারি সে দারুণ তর্ক তুলতে চাই না, কেন না তর্কের পথে এ-প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা বলা যায় খানিকটা অকুতোভয়েই যে, আধুনিক মনের একটি শুভ প্রবণতা হ'ল ব্যবচ্ছেদ করা, খুঁটিয়ে দেখা, প'ড়ে পাওয়া ঐতিহ্যকে (tradition) অপৌরুষেয় ব'লে মেনে-নেওয়াও নয়, হাতের-পাঁচ রূপে ভোগ করাও নয়—খাটিয়ে বাড়ানো। শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্রে একবার আমাকে লিখেছিলেন : "The tradition of the past is a great thing in its own place, but that is no reason why we should go on repeating the past. A great past should be followed by a greater future."* এককথায়, গতিবাদ আর শক্তিবাদ এই দুই বাদ আমাদের মনকে যেমন অভিভূত করে, আমাদের পূর্বসূরীদের মনকে তেমন অভিভূত করত না। স্বামীজির মহান্ ব্যক্তিরূপের পটভূমিকায় এই গতিবাদ ও শক্তিবাদ আশ্চর্য দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছিল অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে—যে সমাহারকে পুণ্যভূমি ভারতের অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক যুগের আর একটি অনস্বীকার্য প্রবণতা—জটিলতার বৃদ্ধি ;

* অতীতের ঐতিহ্য খুবই বড় জিনিষ, কিন্তু তাই ব'লে আমরা কেবল তার পুনরাবৃত্তি ক'রেই চলতে পারি না তো। মহৎ অতীতের পরে আবাহন করতে হবে মহত্তর ভবিষ্যৎকে।

শুধু মহত্ত্বের বিকাশ নয়—সুষমার (হার্মনি) মঞ্জরণ। এ-মঞ্জরণের শোভা আরো বিচিত্র হয়ে ওঠে মহাজনদের জীবন পর্যালোচনা করলে। স্বামীজি ছিলেন এ-যুগের মহাজনদের মধ্যেও মহাজন—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—a king among men! তাই তাঁর চরিত্রের মহনীয় বিকাশ একটু পর্যালোচনা করলে আমরা লাভবান হব দেখতে পেয়ে একটি চিত্তচমৎকার দৃশ্য—কতরকম বিরুদ্ধ ভাবধারার সমুচ্চয়ে তাঁর ব্যক্তিরূপ এমন অপরূপ হ'য়ে উঠেছে।

পয়লা নম্বর: স্বামীজির মধ্যে দেখতে পাই আশৈশব ধ্যানের প্রবণতা। কৈশোরেও ধ্যানে বসতে না বসতে তিনি মগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন তিনি ধ্যানে বসেছেন—সার সার মশা ব'সে পিঠ কালো হয়ে গেছে, তবু তাঁর ধ্যান ভাঙে নি। অথচ অন্যদিকে তিনি ছিলেন এমন প্রাণচঞ্চল যে, একদিন তাঁর মাতৃদেবী উত্যক্ত হ'য়ে বলেছিলেন: "অনেক মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটি ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।" (শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, প্রথম ভাগ, ৪ পৃঃ)

দোসরা নম্বর: বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল বললেই হয়, অথচ সহজে ভক্তি বিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। পরমহংসদেব-যে-পরমহংসদেব—তাঁকেও তিনি নানাভাবেই পরখ ক'রে তবে গ্রহণ করেছিলেন—এমন কি তাঁর সমাধি সম্বন্ধেও রীতিম'ত সন্দিহান হয়েছিলেন। অগাধ ভক্তি করতেন গুরুদেবকে অথচ তাঁর কোনো কথাই সহজে মেনে নিতেন না। তিনি জগন্মাতা কালীকে দর্শন করেন শুনে প্রথমে বলেছিলেন—"ও মনের ভুল"। কথামৃতের তৃতীয় ভাগের পরিশিষ্টে পাই (পরমহংসদেবের দেহান্তের পরে বরাহনগর মঠে):

"বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র বলিলেন: আমি তো কিছুই মানতাম না।

মাষ্টার: কি, রূপ টুপ?

নরেন্দ্র: তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতাম না। একদিন তিনি বলেছিলেন: 'তবে আসিস কেন?' আমি বললাম: 'আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।'

মাষ্টার: তিনি কি বললেন?

নরেন্দ্র : খুব খুশী হ'লেন।”

তেসরা নম্বর : কর্মোত্তম ছিল তাঁর অসামান্য, অথচ তিনি নিবেদিতাকে একদিন বলেছিলেন যে, জগতে তাঁর কাম্য শুধু একটি গাছতলা—যেখানে তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে থাকতে পারেন। পরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত—অথচ তাঁর প্রকৃতি ছিল স্বভাববৈরাগী—ঘুরতেন পদব্রজে পাহাড়পর্বতে, কুম্ভে, তীর্থে, বনে-জঙ্গলে। স্বভাব-নিঃসঙ্গ অথচ শুধু যে বহুকে সঙ্গ দিতেন তাই নয়, বহুর সাহচর্যে তাঁর প্রতিভা হ'য়ে উঠত খরদীপ্তি—তর্কে, বিচারে, হাসিতে, গল্পে।

কিভাবে তিনি বহুলোককে সঙ্গ ও আশ্রয় দিতেন, তার বিশদ বর্ণনা করেছি আমার “এদেশে ওদেশে” ভ্রমণ-কাহিনীতে—“মাদাম কালভে” নিবন্ধে। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, তাছাড়া মাদাম কালভের কথা তাঁর নানা জীবনীতেই আছে। তাই আমি শুধু আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ হিসেবে এ-প্রবন্ধটি থেকে অল্প একটু উদ্ধৃত করি দেখাতে—মানুষ এ-জন্মবৈরাগী স্বভাব-নিঃসঙ্গের পুণ্যসঙ্গে কত কী পেত।

আমি ১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন দক্ষিণ ফ্রান্সে সিন্ধুসৈকতা সুন্দরী নীস নগরীতে এক কাউণ্টেসের ওখানে ফরাসীভাষায় একটি বক্তৃতা দিই ভারতীয় রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে। সেখানে আমার বক্তৃতা ও গানের পরে মাদাম কালভে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর নাম আমি জানতাম—বিখ্যাতা গায়িকা—Prima Donna—পরমা সুন্দরী—কী ভাবে মনঃকষ্টে প'ড়ে স্বামীজির কাছে এসে আলো পান ও পরে তাঁর সঙ্গে ভারতে আসেন—পড়েছিলাম আগেই। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এইভাবে সুরু করেন :

“মাদাম কালভে : স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অলোকসামান্য মহাপুরুষ। আমি তাঁর কাছে যে কত ঋণী—বলব কোন্ ভাষায়? তাঁর সঙ্গে সেই জাহাজে তিনমাস থাকা—অবিস্মরণীয়।

“আমি : তাঁর সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ হয় কী সূত্রে?

“মাদাম কালভে : সে-সময়ে আমার বড় দুর্দিন। গভীর মনঃকষ্টে আছি। আমার স্বামী ও মেয়ে মারা যান, আরো নানা উপসর্গ ছিল। সেই সংকট সময়ে হঠাৎ আমার এক বন্ধু বললেন : ‘চলো, তোমাকে

নিয়ে যাই এক হিন্দু মহাত্মার কাছে—তিনি তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন।' আমি বিশ্বাস করলাম না, কিন্তু ভাবলাম—দেখাই যাক না।

"সে সময়ে তিনি মাটিতে ব'সে ধ্যান করছিলেন। আমি পাশে বসলাম একটি চেয়ারে। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটল। আমি ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠলাম—কে এ rustic (চাষা) রে আমার মতন জগদ্বিখ্যাতা গায়িকাকে কি না ঠায় অপেক্ষা করায় এতক্ষণ! উঠে যাব যাব ভাবছি, এমন সময়ে তিনি বললেন: 'ব্যস্ত হোয়ো না, আমি ধ্যান ক'রে দেখে নিচ্ছি তোমার ঠিক কোন্‌খানে ব্যথা ও কী প্রয়োজন। মুখে তো তুমি সব বলবে না।' চম্‌কে গেলাম বৈকি—আরো যখন—খানিক বাদে—স্বামীজি আমাকে আমার অতীত জীবনের এমন সব কথা বললেন যা আমি ছাড়া কেউ জানত না!

"আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ! এ কী ব্যাপার! তারপর তাঁর সঙ্গে কত জায়গায়ই না ঘুরেছি! আমার সব ব্যথা যেন জুড়িয়ে গেল তাঁর কথালাপে ও স্নেহস্পর্শে! তাঁর কথাই ছিল আমার কাছে একমাত্র অমৃত—আর মুগ্ধ হ'তাম তাঁর মাতৃসম্বোধনে—যদিও তখন আমার বয়স কম।

"কাউন্টেস (আর্দ্রস্বরে): হিন্দুর এই নারীমাত্রকেই মাতৃসম্বোধন করাটা কী সুন্দর!

"মাদাম কালভে: অথচ এমন মানুষেরও আমি নিন্দা শুনেছি মসিয়ে রায়—শুনে সত্যি আমার লজ্জা হ'ত—মন ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠত: কী ক'রে পারে তারা এমন পুণ্যসুন্দর মানুষের নামে কুৎসা রটাতে! য়ুরোপে আমেরিকায় কত আর্তকেই যে তিনি এইভাবে শান্তি দিয়েছেন, কত অন্ধকেই দৃষ্টি দিয়েছেন! তাঁর কাছে শুনতাম—দৃষ্টিদাতার নামই গুরু।"

চৌঠা নম্বর: তাঁর প্রতিষ্ঠিত নানা মঠে তিনি আদৌ চান নি গুরুপূজা, অথচ গুরুভক্তিতে কে পারত তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে? স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একবার একটি চিঠিতে তীব্র ভৎ'সনা ক'রে লিখেছিলেন (পত্রাবলী ৪৮০ পৃষ্ঠা):

"সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে!!...তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের

ধুলো পেয়েছিস।···সকল জায়গাতেই ভাবের ঘরে চুরি—কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি রক্ষে করতেন দেখতে পাচ্ছি যে! ওরে পাগল, পরীর মত সব মেয়ে, লাখ লাখ টাকা—এসব তুচ্ছ হ'য়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন।"

কলকাতায় তাঁর একটি বিখ্যাত ইংরাজি ভাষণে বলেছিলেন—এখানে তার অনুবাদ দিলাম:

"তোমাদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নাম শুনে আমার হৃদয়ের একটি গভীর তন্ত্রী বেজে উঠেছে। আমি যদি চিন্তায় কথায় কি কাজে কোনো সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকি, যদি আমার মুখ দিয়ে কখনো একটি সার্থক বাণীও উচ্চারিত হ'য়ে থাকে, তবে সে-বাক্য আমার নয়—তাঁর। আর যদি কখনো কাউকে কোনো কটু কথা ব'লে থাকি, কি কোনো দ্বেষের বাণী রটিয়ে থাকি—তবে সে কুকীর্তি আমার—তাঁর নয়। দুর্বল ক্ষীণ যা কিছু—সব আমার। আর যা কিছু শুচি শুভ্র তার মূলে—তাঁর প্রেরণা, তাঁর বচন, তাঁর ব্যক্তিরূপ।"*

অন্যদিকে এই মানুষটিই আমাদের পদে পদে শাসিয়েছেন, নিষ্করুণ কশাঘাত করেছেন যেখানেই দেখেছেন ভণ্ডামি, জালজালিয়াতি, ভাবের ঘরে চুরি, শুচিবাই, সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার উঁকিঝুঁকি। স্বামীশিষ্য সংবাদ-এ শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন—এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে একবার ধরেন গরুর জন্যে পিঁজরাপোলে টাকা দিতে। তাতে

---

* "Brothers, you have touched another chord in my heart, the deepest of all, and that is the mention of my teacher, my master, my hero, my ideal, my God in life—Sri Ramakrishna Paramhamsa. If there has been anything achieved by me—by thoughts or words or deeds—if from my lips has ever fallen one word that has helped any one in the world, I lay no claim to it—it was his. But if there have been curses falling from my lips, if there has been hatred coming out of me—it is all mine and not his. All that has been weak has been mine, and all that has been life-giving, strengthening, pure and holy has been his inspiration, his words and he himself." (Address at Calcutta—Swami Vivekananda's Works, Vol III, p. 312)

স্বামীজি বলেন—মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষে নয় লক্ষ মারা গেছে, এ সব দুর্গতদের জন্যে কী করা যায়? তাতে ভদ্রলোকটি বলেন—মানুষ তার কর্মফলে দুঃখ পায়, শাস্ত্রে বলেছে গোজাতি আমাদের মাতা। স্বামীজির মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, তিনি বলেন: বটেই তো, নৈলে আর এমন সুপুত্র হয়!

পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে একটি মস্ত গুণ আমরা পেয়েছি—আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় স্বামীজির মধ্যে রূপ নিয়েছিল আত্মবোধের। এ-আত্মবোধের দীপ্তি বিশেষ ক'রে ফুটে উঠত—যখন ভারতের কোনো পাশ্চাত্ত্য নিন্দুক আমাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করতে চাইত। নিবেদিতা লিখেছেন (My Master as I Saw Him ২১০ পৃষ্ঠায়): "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। কতবারই না তিনি আমাকে বলেছেন: 'তোমরা ভারতকে বুঝতে পারো নি আজো। আমরা খতিয়ে নরপূজারী। আমাদের নারায়ণ নর।' প্রতিমা পূজার সম্বন্ধেও সমানই স্পষ্টভাষায় বলতেন তাঁর প্রত্যয়ের কথা: 'প্রতিমাকে ভগবান্ বলতে পারো—একশোবার, কেবল ভগবান্ প্রতিমা এই ভুলটি কোরো না।' শ্রীঅরবিন্দ আমাদের একবার বলেছিলেন যে তাঁর মনে আশ্চর্য আলো নামত—যার ফলে তিনি এমন সব সত্য দেখতে পেতেন যা সে-আলো বিনা দেখা যায় না। ইংরাজিতে এই জাতীয় বাণীকে বলে aphorism—জ্ঞানোক্তি; Inspired Talks নামে অপূর্ব বইটির ছত্রে ছত্রে পাই এই জ্ঞানোক্তি প্রায় মন্ত্রের ম'ত ঝংকারে। কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করি—কী চমৎকার:

যার কিছুই নেই ভগবান তারই। (৪৮ পৃঃ)

সিংহ হ'তে না দিলে মানুষ শৃগাল হবে। (৬৬ পৃঃ)

ভগবানের সন্ধানে মরাও ভালো, কিন্তু কুকুর হ'য়ে মাংসের জন্যে কাড়াকাড়ি কোরো না। (১০১ পৃঃ)

এমন অবস্থা লাভ করতে হবে যেখানে তোমার প্রতিটি নিশ্বাস হবে প্রার্থনা। (১০৪ পৃঃ)

অনুমান—আমার তোমার—আনে সংঘর্ষ। বলো তুমি কী দেখেছ, দেখবে তোমার কথা সবাই বরণ করবে। (১৩২ পৃঃ)

যখন মানুষ বোঝে যে সুখের অন্বেষণ বিড়ম্বনা, তখনই ধর্মের আরম্ভ হয়। (১৯২ পৃঃ)

মানুষ এগোয় প্রেমের প্রেরণায়, সমালোচনার অঙ্কুশে নয়।

এ-উক্তিগুলি মূল ইংরাজিতে পাঠ্য—বাংলা তর্জমায় এ-জাতীয় ধ্যানলব্ধ বাণীর দীপ্তি ম্লান হ'য়ে আসে। আমি তবু বাংলা তর্জমা দিলাম শুধু আভাষ দিতে—কি ধরণের মণিমুক্তা তাঁর কথালাপে নিরন্তরই বিচ্ছুরিত হ'ত ফুলঝুরির স্বর্ণরাগের ম'ত। এ তিনি পারতেন বুদ্ধিবলে—নয়—প্রাতিভ জ্ঞানের প্রেরণায়। এ-সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত আলোচনা অবান্তর হবে না।

অনেকদিন আগে একদা আমার মনে প্রশ্ন ওঠে—অত্যধিক আত্মপ্রত্যয় সাধকের পক্ষে ভালো কি না—এর ফলে মনের মধ্যে অহমিকা প্রশ্রয় পায় কি না—যার গোড়াকার কথা এই যে, আমি আর পাঁচজনের চেয়ে অনেক বড়—ইংরাজিতে যাকে বলে—sense of superiority। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একটি চিন্তা-উদ্দীপক পত্র লেখেন। সেটি তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে ব'লে আমি অনুবাদে তার সারমর্মটুকু পেশ করি। তিনি আমাকে লিখেছিলেন :

"যখন আমাদের দৃষ্টির সামনে কোনো নবদিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয় তখন অনেক সময়ে মনে আত্মপ্রত্যয়ের তেজ জেগে ওঠে যাকে বাইরে থেকে দেখে মনে হ'তে পারে আত্মাভিমান। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এক মাদ্রাজী পণ্ডিতের তর্ক হয় জানো নিশ্চয়ই? পণ্ডিত বলেছিলেন : 'কিন্তু শঙ্করাচার্য তো কই এমন কথা বলেন নি?' স্বামীজি পিঠ পিঠ উত্তর দিয়েছিলেন : 'না। কিন্তু আমি, বিবেকানন্দ, বলছি।' তাঁর এ-উক্তির মূলে অহমিকা ছিল না—ছিল রণবীরের ব্যুত্থান—যে দাঁড়ায় নিজের আদর্শের জন্যে লড়তে, কেন না নিজেকে সে মনে করে কোনো মহৎ সত্যের প্রতিভূ—যার অমর্যাদা হবে যদি সে হার মানে।

("This is not mere egoism, but the sense of what he stood for and the attitude of the fighter who, as the representative of something very great, could not allow himself to be put down or belittled.')

বিবেকানন্দের তেজস্বিতার মূলে ছিল যে এই ভাগবত প্রতিভূর প্রাণের

প্রত্যয় ও অন্তরের আলো—এই সত্যটি শ্রীঅরবিন্দের এই কয় ছত্রে আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল বলেই তাঁর পত্রের উল্লেখ করলাম। স্বামীজির অজস্র নিবন্ধ, ভাষণ, কথালাপের মাধ্যমে নিত্যই ফুটে উঠত এই আদিষ্ট প্রতিনিধির অঙ্গীকার: "Thou lead and I follow." তিনি ছিলেন ধ্যানে শিবপূজারী, কর্মে কালীর সন্তান। তাঁর "attitude of the fighter."-এর আত্মপ্রত্যয়ী সুর ফুটে উঠেছে, তাঁর একটি আশ্চর্য কবিতার বাণীতে:

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয়কি তোমার সাজে?
দুঃখ ভার, এ-ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এরই নাম "divine warrior"—কিন্তু শুধু দিব্য প্রেম নয়, সেই সঙ্গে দিব্য শক্তি। শ্রীঅরবিন্দ বার বারই বলতেন—জগতে প্রেম ও জ্ঞানের মূল ভিত্তি হ'ল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখেতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের দেখা পেয়েছিলেন আলিপুরের কারাগৃহে। একটি চিঠিতে তিনি সহস্তে লিখেছিলেন: Sri Auro-Bindo and His Ashram (৪৩ পৃষ্ঠা): "জেলে ধ্যানের সঙ্গে আমি ক্রমাগতই শুনতাম বিবেকানন্দের স্বর দুসপ্তাহ ধ'রে।" এ-অঙ্গীকার তিনি পরেও করেছিলেন ওঁর কথালাপে Mother India June, 1962, pp 11, 12): বিবেকানন্দই প্রথম আমাকে অতিমানস তত্ত্বের সন্ধান দেন—এই এই ঐ ঐ—নির্দেশ দিয়ে নানাভাবে। আলিপুর জেলে পনের দিন ধ'রে তিনি আমাকে শেখান ও বোঝান।" এ-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন Mother India, June 1962, p, 12): "আলিপুরের জেলে তিনি আমার কাছে আসবেন এ আমি মোটেই ভাবিনি, কিন্তু তবু তিনি এসে আমাকে শিখিয়েছিলেন, আর তিনি দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ—I never expected him and yet he came to teach me. And he was exact and precise even in the minutest details."

শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। উভয়কেই তিনি গভীর ভক্তি করতেন। একবার বলেছিলেন একটি অতি চমৎকার কথা: "The capitulation of Vivekananda to Sri Ramkrishna is a capitulation of the West to the East." তিনি দেখেছিলেন তাঁর যোগদৃষ্টিতে—যেকথা স্বামী বিবেকানন্দও বারবারই বলেছিলেন—যে, ভারতই হবে জগতের অধ্যাত্ম দিশারি।

শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন আরও একটি কারণে—কর্ম, লেখা ও তেজস্বিতার দিক দিয়ে এই দুই মহাপুরুষই ছিলেন সমধর্মী—এ বলে আমায় দেখ—ও বলে আমায় দেখ অবস্থা—বড় ছোটর প্রশ্ন ওঠে না—কেন না উভয়েই ছিলেন ভারত আত্মার দীপ্ত বাণীবাহ, আত্মবোধের আলোকস্তম্ভ। ওদেশে বলে—শুধু খৃষ্টই পারে খৃষ্টকে বুঝতে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বামীজির মহিমার মর্মজ্ঞ হ'তে পেরেছিলেন—তিনি নিজেও সেই একই প্রজ্ঞা-পারমিতার আলোর প্রসাদ পেয়েছিলেন ব'লে। তাই তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ১৯১৬ সালে লিখেছিলেন তাঁর মন্ত্রঝংকারিত ভাষায় যার জুড়ি মেলে না:

"Vivekananda was a soul of puissance if ever there was one, a very lion among men···We perceive his influence still working gigantically, we know not well how, we know not well where, in something that is not yet formed, somthing leonine, grand, intuitive, upheaving that has entered the soul of India and we say, 'Behold, Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of Her children." (বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিমত্তার মূর্তবিগ্রহ নরকেশরী।৽ তাঁর প্রভাব আজো প্রচণ্ড ভাবে সক্রিয় রয়েছে অনুভব করা যায়, যদিও ঠিক ধরতে পারি না কী ভাবে ও কোথায়। মনে হয় শুধু—যেন কোন সিংহবিক্রম অন্তর্মুখী উর্ধ্বায়িত মহাশক্তি ভারতের আত্মায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আর আমরা বলি: 'দেখ

দেখ বিবেকানন্দ তাঁর নিত্যজননীর ও তাঁর সন্তানদের আত্মায় আজো চিরঞ্জীবী)'।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আত্মার একজন দীপ্ত বাণী-বাহ, একথা আমরা সবাই জানি ও মানি। কিন্তু তাঁর দিব্যকর্মপ্রতিভা যে আজও আমাদের মধ্যে সক্রিয় একথা আমরা সময়ে সময়ে ভুলে ব'সে থাকি বলেই শ্রীঅরবিন্দের বিবেকানন্দ-তর্পণ চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁদের কাছে—যাঁরা এই বীরকেশরীকে দিতে চান তাঁদের প্রাণের প্রণামী।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এ-তর্পণ শুধু কথা কথা কথা নয়। স্বামীজীর প্রেরণা আজো হাজার হাজার আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর মধ্যে কাজ করছে—যাঁদের মধ্যে একজনের মাথা আকাশে ঠেকেছিল; তিনি আমাদের দেশের নেতাজি—সুভাষচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে স্বামীজির মধ্যে তাঁর তপঃ শক্তি সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মনে হয় স্বামিজির সিংহবিক্রম মহাশক্তি ঠিক তেমনিভাবে তাঁর উত্তরসাধক সুভাষের রক্তে সঞ্চারিত হ'য়ে দিয়েছিল তাকে দিব্য-উন্মাদনা। এ আমার বন্ধুপ্রীতির কাব্যোচ্ছ্বাস নয়। কারণ যাঁরা একটু গভীরদর্শী তাঁদের চোখে পড়বেই পড়বে যে, স্বামীজির দুঃসাহসের মন্ত্রে সুভাষ কৈশোরে দীক্ষা নিয়েছিল বলেই সে "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন" মন্ত্র জপতে জপতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পেরেছিল; তাঁর দিব্যপ্রেম তার মনে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল ব'লেই ভারতের দুঃখী ও দুর্গতদের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাই কল্পনা করতে পারি—যখন সে বর্মায় সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলে অসম সাহসে "দিল্লি চলো" রণদুন্দুভি বাজিয়ে তুলেছিল তখন তার দুর্দম অন্তঃশক্তির উদ্বোধন করেছিল স্বামীজির দিব্য দেশভক্তির—divine patriotism-এর—প্রাণোন্মাদী তূর্যধ্বনি—কোনো সাবধানী রাজনৈতিক বুলি নয়। স্বামীজির MY PLAN OF CAMPAIGN ভাষণ থেকে এক উদ্ধৃতি দিলে এ কথার ভাষ্য করা হবে। স্বামীজি বলেছিলেন:

"They talk of patriotism. I believe in patriotism and I also have my own ideal of patriotism. Three things are necessary for great achievements. First, feel from the heart. What is in the intellect or reason ?·· Through the heart comes inspiration. Love

opens the most impossible gates ; love is the gate to all the secrets of the universe. Therefore, feel, my would-be reformers, my would be patriots ! Do you feel ? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and sages are starving today ?...Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud ? Does it make you restless ? Does it make you sleepless ? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heart-beats ?···

"Yet that is not all. Have you got the will to surmount mountian-high obstructions ? If the whole world stands against you, sword in hand, would you still dare to do what you think is right ?···শেষত: "Have you got steadfastness ? If you have these things, each one of you will work miracles...If you live in a cave, your thoughts will permeate even through the rock walls will go vibrating all over the world for hundreds of years, may be, until they will fasten on to some brain and work out there. Such is the power of thought, of sincerity and of purity of purpose."

("শুনি দেশভক্তি সম্বন্ধে কত বুলি ! আমি বিশ্বাস করি দেশভক্তিকে —তবে আমার দেশভক্তিব আদর্শ অন্য। এজন্যে চাই তিনটি জিনিস : প্রথম অন্তরের দরদ। বুদ্ধি-যুক্তির সাধ্য কতটুকু ? প্রেরণার উৎসমূল —হৃদয়। শুধু প্রেমই খুলে দিতে পারে চিররুদ্ধ দুয়ার, বিশ্বরহস্যের চাবি তারি হাতে। যদি সত্যি সংস্কারক কি দেশভক্ত হ'তে চাও, তবে সব আগে হৃদয়ে গভীরভাবে অনুভব করতে শেখো। বুক ফেটে যায় কি তোমার ভাবতে যে, আমাদের দেশে কোটি কোটি দেব সন্তান ঋষি-সন্তান আজ নিরন্ন—অজ্ঞানের কালো মেঘে দেশ অন্ধকার ? বলতে পারো কি—তোমার রাত্রে ঘুম হয় না—প্রাণ কেঁদে ওঠে একথা ভাবতে ? অঙ্গীকার করতে পারো কি—যে পরের ব্যথা তোমার ধমনীর রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ ক'রে হৃৎস্পন্দনে কেঁপে কেঁপে উঠছে ?

"কিন্তু শুধু এইই নয়। পর্বতপ্রমাণ বাধা এলেও তাকে অতিক্রম করবে এমন পণ নিয়েছ কি তুমি ! সমস্ত জগত যদি তোমাদের বিপক্ষে

দাঁড়ায়, তাহ'লেও তুমি কৃপাণ হাতে একলা চলতে পারো কি কর্তব্য পালন করতে—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পাতনের পণ নিয়ে? শেষতঃ তোমার নিষ্ঠা আছে কি? এই তিনটি গুণ যদি থাকে, তবেই তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে। এমন কি, যদি গুহাবাসীও হও তাহলেও তোমার চিন্তা ও অভীপ্সা পাষাণ ভেঙে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে, স্পন্দমান হ'য়ে শত বৎসর ধ'রে যতদিন না তারা এমন কোনো আধার পায় যার মধ্যে দিয়ে তারা মূর্ত হ'য়ে উঠবে পরম সিদ্ধিতে। চিন্তা, অভীপ্সা, আন্তরিকতা ও পুণ্যসংকল্পের মধ্যে এমনি দিব্যশক্তি নিহিত।")

স্বামীজির দেশভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষকেও অনুপ্রাণিত করেছিল—এ আমার কথার কথা নয়. বিনিদ্র রাত্রে কতদিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার—শুধু এদেশে নয়—বিলেতেও। তাই আমি একথা অকুতোভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃশক্তিই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেম্‌নি বিবেকানন্দের তেজঃশক্তিই নেতাজির দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই। একথার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে—আমি কেবল সুভাষের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই সমাপ্তি টানব দেখাতে—স্বামীজির প্রাণের সুর তার প্রাণের তারেও কী ভাবে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছিল। সুভাষ বলেছিল:

"আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি—বাংলার আনন্দ উৎসবের মধ্যে নয়, বিত্তবানের শান্তির মধ্যে নয়। আমি আপনাদের আহ্বান করিতেছি, দুঃখ দৈন্য নির্যাতনের মধ্যে, অভাব, অজ্ঞানতা, অবসাদের মধ্যে; অশান্তি অবিচার, অনাচারের মধ্যে—সবার উপরে মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে।...

"মনে রাখিবেন যে, আমাদের সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষে নতুন জাতি সৃষ্টি করিতে হইবে।...জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না। আদর্শের নিকট যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলিদান দিয়েছে—শুধু সেই অমৃতের সন্ধান পায়। আমরা সকলেই অমৃতের পুত্র, শুধু ক্ষুদ্র অহমিকার দ্বারা পরিবৃত বলিয়া অন্তর্নিহিত অমৃতসিন্ধুর সন্ধান পাই না। আমি আপনাদের আজ আহ্বান করিতেছি—আসুন, আপনারা আসুন—মায়ের মন্দিরে

আমরা সকলে দীক্ষিত হই! আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, দেশসেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে—দেশ-মাতৃকার চরণে আমরা আমাদের সর্বস্ব বলি দিব এবং মরণের ভিতর দিয়া অমৃত লাভ করিব। তাহা যদি করিতে পারি তবে নিশ্চয়ই জানিবেন—

'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' "

এই কথাই যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন তাঁর অনুপম ভাষণে স্বামীজির সিংহবিক্রম প্রেরণাকে বরণ করে: "Behold Vivekananda still lives in the soul of his Mother and in the souls of Her Children."

আজ এ-মহাভাগ কর্মবীর জ্ঞানশিখরচারী প্রেমব্রতীর জন্মশতস্মৃতি-বার্ষিকীতে এই কথা স্মরণ করে যেন গাইতে পারি আমরা ভক্তিকম্প্র আনন্দের উচ্ছল অঙ্গীকারে:

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ, হে চিরদীপ্ত!
অলোকলোকের অশোক দুলাল, পুণ্য শুভ্র ধর্মনিত্য!
দলি বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমলকান্তি!
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে—ভরসা শান্তি!

অন্নের পথ বিদায়ে—বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ
দিলে তাহাদের দিব্যনয়ন—ছিল যারা মোহবাসনা-অন্ধ!

তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখ দৈন্য
ঘুচাতে হে দেবসেনানী, তোমার তুলিলে গড়ি' বেদান্তী সৈন্য!
হীন লোকাচারে মিথ্যাবিহারে ছিল যারা চির পথভ্রান্ত—
তোমার অভ্যুদয়ে হল' নব-অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।

অন্নের পথ...অন্ধ!

হে অপরাজেয়! বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস
জানিলে তাঁহার বরে—তুমি চিরজীবন্মুক্ত, শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন—যারা ছিল নগণ্য
তোমার বীর্য জ্ঞানের পরশমণির ছোঁওয়ায় হ'ল হিরণ্য।
অল্পের পথ······অন্ধ!

প্রাচী প্রতীচির মাঝে সেতু বাঁধি'সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক! জাগালে—যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ, ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন, উপনিষদ, তন্ত্র
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।
অল্পের পথ···অন্ধ!

ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা,
প্রেমের মুকুট দেখি' শিরে যার লাজে মুখ ঝাঁপে লালসা কৃষ্ণা,
সে-তুমি বিলালে তুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ন—
স্বার্থ ভুলিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন।
অল্পের পথ···অন্ধ!*

---

*দ্বিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার ভারত আমার" স্তবের সুরে গেয়।

একান্তী

প্রীতিভাজনেষু প্র—

আপনার চিঠিটি পড়ে সত্যই ভালো লাগল। আপনি যে ভগবানকে খুঁজছেন শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে দিয়ে, সাধুসঙ্গের মধ্যে দিয়ে, নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে এ থেকেই দেখতে পারছি আপনার (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়) চৈত্যপুরুষ—psychic being—জেগেছে। সংসারে খুব কম মানুষেরই চৈত্যপুরুষ পুরোপুরি জাগে। কখনো ভগবান্ টোকা দিয়ে যান, সে চম্‌কে ওঠে। তারপরই ফের ঘুমিয়ে পড়ে। অজ্ঞানের ঘুমে নেতিয়ে পড়লে এক ধরণের তামসিক বিশ্রাম আছে বৈকি। সংসারে সবেরই মধ্যে আনন্দের অঙ্কুর উঁকি মারে তো। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, বেদনার মূলেও আনন্দ লুকিয়ে থাকে, যা কিছু ভগবান গড়েছেন তারই নিহিতার্থ থাকে জীবনে—তুচ্ছতম সৃষ্টিও ব্যর্থ নয়—

Even grief has joy hidden beneath its roots.

Nothing is truly vain the One has made.

তাই আপনার ওকথা ঠিক: সবাই ভগবান্‌কে খুঁজছে। না খুঁজে পারে? ভগবান্ কি ছাড়বার পাত্র? তিনিও খুঁজছেন আমাকে, আমিও খুঁজছি তাঁকে। লীলা তো এই প্রেমের লুকোচুরি খেলা। প্রথম থেকেই ধরা দিলে খেলা চলে কেমন করে?

তবে মন মানে না যখন তিনি এক মিনিট কাছে এসেই একযুগ আড়ালে লুকিয়ে আমাদের আকুল ক'রে তোলেন। তাই এল বিরহ। কিন্তু বিরহ বিনা মিলনের পোষ্টাই হবে কী ক'রে? আঁধার বিনা আলোর মহিমা রটবে কেন? এই দ্বন্দ্ববাদই আমার মনে হয় জীবনের দুঃখদৈন্যের আধিব্যাধির একমাত্র গ্রহণীয় সমাধান—এই দর্শন যে, দুঃখ না থাকলে সুখকে সুখ ব'লে চেনাই যেত না। যদিও এ-দর্শনকেও পুরোপুরি সমাধান ব'লে মনে করতে বাধে, কারণ মন প্রশ্ন না করেই পারে না—দুঃখ নৈলে সুখের জৌলুষ বাড়ে না ব'লে কী হিটলার, ষ্ট্যালিন, হিমলার, গবেলদের মতন চণ্ডাসুরদের পৈশাচিক বৃত্তিকেও সমর্থন করা যায়? দুঃখ যখন খুব

বেশি গভীর হয় মানুষ কি সইতে পারে? দেহের দুঃখই দেখুন না। যতই সহিষ্ণুতার গুণগান করি না কেন—দুঃখের চাপ বেশি হ'লে সহিষ্ণুতার মেরুদণ্ড কি ভেঙে না প'ড়ে পারে?

এই জন্যেই দুঃখের চিরনিবৃত্তি খুঁজেছে সব দেশেরই দার্শনিক, নীতিবাদী তথা সাধুসন্ত মুনিঋষি। নানা ভাবেই খুঁজেছে দাওয়াই, কিন্তু সবাইয়ের দুঃখ এক দাওয়াইয়ে সারে নি কোনোদিনই। তাই না এত মতভেদ মন কষাকষি টানা ছেঁড়া। এ বলে আমার ব্যবস্থাই ঠিক, ও বলে আমার। যুধিষ্ঠির যক্ষকে বলেছিলেন কি সাধে:

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
বেদের স্মৃতির নানা সূত্রবিধান।
নানা মুনির নানা তত্ত্ব নিদান॥

অনেক খুঁজেছি আমিও। কিন্তু খতিয়ে শ্রুতির একটি শ্লোকে পেয়েছি আংশিক উত্তর। শ্লোকটির কথা প্রথম আমাকে লেখে কৃষ্ণপ্রেম—যার কাছে ঋণ আমার অশেষ। লেখে: "দিলীপ, কেন মিথ্যে এ-ও-তার কথায় ভুলছ? সমাজসংস্কার? ওপথে মানুষের দুঃখ দূর হবার নয়। এডুকেশন? তাও নয়। জর্মন জাত কি শিক্ষিত ছিল না? তবু তারাই তো সার বেঁধে দাঁড়াল হিটলারকে নেতা ক'রে 'Herenvolk' অহঙ্কারের তিলক পরতে? সমর্থন কবল অরুন্তুদ অত্যাচারে পুলিশের, কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্পের, উৎপীড়নের, অনশনের, মানুষকে পৈশাচিক যন্ত্রণা দেওয়ার…। রুষ দেশেও ঠিক তাই হ'ল ষ্ট্যালিনের নায়কতায় যার জের টানছে চীন—চাইছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আণবিক বোমার নরমেধযজ্ঞ। এপথে মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি হবার নয়—মার্ক্স এঞ্জেলের শ্রেণী-যুদ্ধবাদী বিদ্বেষবাদের পথেও সমাধান মিলবে না। আক্রোশে আক্রোশ বেড়েই ওঠে, অবিচারে ক্ষোভই জ'মে ওঠে। তার পর আসে ধ্বংস। সমাধান নেই নাস্তিক্যের পথে। সমাধানের কেবল একটি মাত্র পথ: ভগবানকে পেয়ে হৃদয়ে তাঁর প্রেমের প্রতিষ্ঠা। এই প্রেমের সাধনায়ই কেবল মানুষ দেবতা হ'য়ে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারে—শিক্ষায় নয় সমালোচনায় নয়,

রাষ্ট্রশাসনে নয়। তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা—

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ আকাশকে চামড়া দিয়ে মোড়া যদি সম্ভব হয় তাহ'লেই ভগবানকে না জেনেও মানুষের দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হবে।

আপনি আস্তিক। কেন নাস্তিকদের ওকালতি করতে চাইছেন? তাদেরও দেখবেন ভগবানই—কাউকেই তিনি ফেলবেন না। আসুন আমরা নিজের ভাবনা ভাবি—কিসে ভগবানকে পাব। তারপর তো মানুষের দুঃখনিবৃত্তি—তার আগে তো নয়। তবে কেন মিথ্যে এ-দুর্ভাবনা অমুক নাস্তিক হ'য়ে কৃতকৃত্য হবে কিনা? যদি হয় ভালো—কিন্তু আপনি আমি হব না। কারণ আমাদের মধ্যে ঠাকুর জাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর প্রেমের তৃষ্ণাকে। সেই তৃষ্ণাই প্রমাণ যে তিনি আছেন ও ডাকছেন তৃষ্ণার জল হ'য়ে—সাবধান ক'রে: "সোনার হরিণ নয়, মরীচিকা নয়—ওপথে জল মিলবে না রে। মিলতে পারে শুধু অন্তরে যিনি জেগেছেন অকূলের বাঁশি শুনে তাঁর আকুলতাকেই বরণ ক'রে সুদূর অভিসারের পথে চললে—হোক না কাঁটাবন, আসুক না মরুভূমি। তুই চল্ বিশ্বাসকে বরণ ক'রে—জাগৃতিকেই লালন ক'রে। আর ঘুমোতে না চেয়ে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

একবার দেবতা অন্তরে জাগলে আর নিস্তার নেই। আমি একবার একটি কবিতা লিখেছিলাম তাতে একটি চরণের শ্রীঅরবিন্দ ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন—A sigh that wakes can sleep no more.

আসুন, তাই আরো একান্তী হই, ভগবানকে চাই আর পাঁচটার মধ্যে নয়, সব ছেড়ে, সব ছাপিয়ে। নাস্তিকদেরও এই পথে আসতেই হবে —আজ না হ'লে কাল, কাল না হ'লে পরশু, এ জন্মে না হ'লে পর জন্মে, দশ জন্মে—শতজন্মে। মোট কথা, তিনি ছাড়া আমাদের গতি নেই। আমাকে এক ব্রহ্মজ্ঞ সাধু বলেছিলেন: "কবে কৃষ্ণকে পারেন? যেদিন কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোনো কথা শুনলে প্রাণে যন্ত্রণা হবে।" আসুন, সেই আকুলতার জন্যে সাধনা করি প্রার্থনা করি। তারপর তিনি

সব সংশয় ভঞ্জন করবেনই করবেন যথাকালে। তবে "ন ত্বরমানেন লভ্য"—বলেছেন বেদ। ব্যস্ত হ'য়ে হাঁকুপাঁকু করলে তাঁকে মিলবে না তো। ছড়ানো মন কুড়িয়ে আনার সাধনা করতে হবে সব আগে। যা কিছু আমার আছে তার স্বত্বাধিকার ছেড়ে তাঁকে বলতে হবে: "সব নাও ঠাকুর, কেবল আমাকে তোমার ক'রে নাও। ঠাঁই দাও পায়—সব দ্বন্দ্ব সংশয়দোলা থামিয়ে তোমার বাঁশির অমল রাগে ফুটিয়ে তোলো তোমার নিটোল প্রেমের আলো। যেন তোমাকে ভালোবাসতে পারি তনু মন প্রাণ নিবেদনে। আমি একটি গান বেঁধেছিলাম এই ভাবেরই ভাবী হয়ে:

যা কিছু নাথ বলি "আমার", নাও তুমি আজ এসো প্রাণে।
পারের রশি পড়ুক খসি, তোমার অপার অভিযানে।
ছিন্ন করো যত বাঁধন,
চিত্তাকাশে জাগাও কাঁপন,
করো আলো বিষাদ কালো নীলকরুণার বরদানে।
ছোট সুখের মায়াকানন
দিক ভাসিয়ে প্রেমের প্লাবন
বাসনা সব করো দাহন তোমার বাঁশির বহ্নিতানে।

আমার স্নেহালিঙ্গন নেবেন। আপনি যে আমার সমধর্মী। নাস্তিক হ'লে কি এসব কথা বলতে পারতাম? ব'লেও যে আনন্দ—পারি বা না পারি। আমাকে আশীর্বাদ করবেন যেন নিরভিমান হ'য়ে সব হারিয়ে সব পাওয়ার ব্রত নিতে পারি। এরই নাম জন্মাষ্টমী—নিশুত রাতে ঠাকুরের আলোর নবোদয়—এ ছাড়া আর পথ নেই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

ইতি—

স্নেহবদ্ধ—দিলীপদা

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী

ওঁ

সাধু বিমলানন্দ

স্নেহাস্পদেষু,

সুভাষের "পত্রাবলী" প'ড়ে শেষ করলাম। পড়তে পড়তে কেবলই মনে হচ্ছিল—"যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" সুভাষ জন্মেছিল মহাজনের দীপ্তশিখা নিয়ে, তাই তার আলোয় এত বন্ধ্যা মনে ফুটেছিল বীর্যের ফুল, ত্যাগের ফুল, ধর্ম-বিশ্বাসের ফুল। লোকে ওর বীর্য ও ত্যাগের কথা জানে।—যে দেশের জন্যে সব ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে শেষ বাণী পাঠাল: "ভারতবাসী! যুদ্ধ চালাও, স্বাধীন আমরা হবই হব"—তার ত্যাগের বীর্যের কথা ভাবতে কার মন না আর্দ্র হ'য়ে উঠবে? কিন্তু ওর এই বীর্য ও ত্যাগের উদ্দীপনা ও পেয়েছিল ওর ধর্মবিশ্বাস থেকেই এই কথাটি ওর অনুরাগীরা প্রায়ই ভুলে ব'সে থাকেন। সম্প্রতি প্রকাশিত "পত্রাবলীতে" সুভাষের কিশোর বয়সের চিঠিগুলির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ওর অধ্যাত্ম ভক্তি বিশ্বাস—যা শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আত্মার সহজাত কবচকুণ্ডলেরই মতন। "ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ"—যা ধারণ করে তারই নাম ধর্ম এই আন্তর শ্রদ্ধা বিশেষ ক'রে ওর কিশোর বয়সের চিঠিগুলিতে আশ্চর্য দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে ওর সরল মহৎ অঙ্গীকারে। দু একটি উদাহরণ দেই আমার বক্তব্যটিকে ফোটাতে। শোনো, শুনলে আনন্দ পাবে।

১৯১২—১৩ সালের মধ্যে লেখা চিঠিগুলি সুভাষ লিখেছিল তার মাকে। প্রথম চিঠিতেই লিখছে (১ পৃঃ):

"মা, আজ নবমী, আপনি এখন দেশে দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন। এবৎসর বোধহয় পূজা বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কি?…যদি প্রাণ খুলিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল; আর অধিক কি প্রয়োজন?

যে-পূজায় আমরা ভক্তিচন্দন ও প্রেমপুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।"

সে সময়েই ওর মনে হয়েছিল নিরামিষাহারই ভালো: "মা, আমি নিরামিষাশী হইতে চাই কারণ 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' একথা আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।" (৪ পৃঃ)

কিন্তু তবু মাতৃভক্ত পুত্র মার মনে দুঃখ দিয়ে মাছ মাংস ছাড়তে চান না, সুভাষও চায় নি, তাই লিখল: "আপনাদের অনুমতি বিনা আমার কিছু করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

এর পরের একটি চিঠি অপূর্ব—নম্বর চার। ইংরাজীতে যাকে বলে—revealing! সুভাষ লিখছে:

"মা, ভগবানের দয়ার অভাব নাই। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁর দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিব বা কি করিয়া? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি—কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল—অমনি আমাদের ডাকা বন্ধ হইল, আর আমরা ভুলিয়া গেলাম। এই জন্যেই তো কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন: 'হে ভগবান্! আমাকে সর্বদা বিপদের মধ্যে রাখিও; তাহা হইলে আমি সর্বদা তোমায় প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারিব। সুখের সময় তোমাকে ভুলিয়া যাইতে পারি—অতএব আমার সুখে প্রয়োজন নাই।"

পনের যোলো বৎসরের কিশোরের মনে এ-বিরল ধর্মভাব জাগে পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতির ফলেই। সাড়ে পনের আনা মানুষ সত্যিই তো দুঃখে না পড়লে ভগবানের কথা স্বপ্নেও ভাবে না। সুভাষ ক্ষণজন্মা ধার্মিক ছিল ব'লেই এ-সত্যটি ওকে এত গভীর বেদনা দিয়েছিল। কিন্তু পত্রাবলীতে আরো আছে ওর সহজাত ধর্মপ্রাণতার এজাহার। মাকে লিখছে কিশোর বৈরাগী (৮ পৃষ্ঠা):

"জন্মমৃত্যু লইয়া এ-জীবন—তাহাতে একমাত্র সার জিনিষ—হরিনাম। তাহা না করিতে পারিলে জীবন নিরর্থক।...এ-ভবে আসিয়া যদি ভগবানের নাম না করিতে পারিলাম তবে এখানে আসা আমার বিফল হইল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: ঈশ্বরের কাজ কে বুঝবে? তাই আমি

আদপে বুঝতে চাই না। শুধু প্রার্থনা করি: "মা, আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।" কিশোর সুভাষের মুখে এই কথার অবিকল প্রতিধ্বনি শুনে চমকে উঠতে হয় নাকি?

"মা, জ্ঞান বড় জিনিষ—ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ধরিবে না—তাই ভক্তি চাই, জ্ঞান এখন চাই না। তর্ক করিতে চাই না, কারণ আমি অজ্ঞ ও অন্ধ। সুতরাং এখন চাই কেবল বিশ্বাস—অন্ধ বিশ্বাস—শুধু 'হরি আছেন এই বিশ্বাস।' আর কিছু চাই না' ভক্তি বিশ্বাস হইতে আসিবে এবং জ্ঞান ভক্তি হইতে আসিবে। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন: 'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে'—ভক্তি জ্ঞানের জন্য ধাবিত হয়।" (৮ পৃষ্ঠা)

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার আগে সুভাষের মনে কী ধরণের চিন্তা আদর্শ স্বপ্ন জাগত ভাবো একবার। যার স্বধর্ম আস্তিক্য ও শ্রদ্ধা কেবল তারই মনে এই জাতের মহৎ চিন্তা মহৎ ভাব ঠাঁই পায়। যার রক্তে অধ্যাত্মবোধের বীজাণু ছড়িয়ে আছে কেবল সেই বলতে পারে: "চাই অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি বিশ্বাস থেকে আসবে, জ্ঞান ভক্তি থেকে।" পড়তে পড়তে সত্যিই মুগ্ধ হ'তে হয়, আর গর্ব হয় যে, এমন মহাপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ বন্ধুকে আমার কাছে পেয়েছিলাম—হোক না দুদিনের জন্যে—জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত কয়টি? শেলি বলেন নি কি: "How rarely rarely comest thou, O spirit of delight!"

কিন্তু আরো চমকপ্রদ কথা আছে এই চিঠিতেই: "মা, লেখাপড়া শিখিয়াও যদি কেহ হীনচরিত্র হয় তবে তাহাকে কি পণ্ডিত বলিব? না। যদি কেহ মূর্খ হইয়াও বিবেকাধীন লইয়া চলিতে পারে এবং ভগবৎসর্বস্ব ও ভগবৎপ্রেমিক হইতে পারে তবে তাহাকেই বলিব মহাপণ্ডিত। দুই চার কথা শিখিলেই কি জ্ঞানী হয়? প্রকৃত জ্ঞান—ঈশ্বরজ্ঞান। আর সমস্ত জ্ঞান—অজ্ঞান।"

এও উপনিষদের কথা: অপরা বিদ্যায় বড় জোর মন্ত্রবিৎ হওয়া সম্ভব, প্রকৃত জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মবিৎ হ'তে হ'লে পরা বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু তারপর আরো কী চমৎকার কথা, শোনো (৯ পৃঃ):

"মা, আমি বিদ্বান্ বা পণ্ডিতকে শ্রদ্ধা করতে চাই না। ভগবানের নামে যার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয় আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া

পূজা করি। মেথর হইলেও আমি তাহার পদরেণু বক্ষে ধারণ করিতে চাই। আর একবার 'দুর্গা' বা 'হরি' বলিলে যাহার অশ্রুত্যাগ রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ আবির্ভূত হয়, তাহার তো কথাই নাই—সে তো স্বয়ং ভগবান্। তাঁহাদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে—আমরা তো সামান্য তুচ্ছ জিনিষ।"

ভাগবতের বাণীও তো এই : (৭. ৯. ১০)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

বহুগুণে গুণী বিপ্রও যদি না চায় হরির চরণ, তারে
ধিক্—ধিক সেই দ্বিজপ্রবরে।
চণ্ডালও যদি হরিতন্ময় হ'য়ে ডাকে তাঁরে অশ্রুধারে
ধন্য সে, কুল অমল করে

সামনেই পরীক্ষা। সুভাষের মনে পরীক্ষা পাশ সম্বন্ধে কী ধরণের ভাবোদয় হ'ত? শোনো (৯ পৃঃ) :

"মা, আমরা 'পরীক্ষা আসিতেছে বলিয়া ব্যস্ত হই, কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না যে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা চলিতেছে। সে-পরীক্ষা ঈশ্বরের নিকট, ধর্মের নিকট।...ভগবানের শ্রীচরণে জীবন সমর্পণ করিয়া যিনি আপনার জীবনতরী ভাসাইতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁহার মানবজন্ম সফল।..."

তারপরেই শোনো মা-র সঙ্গে ক্ষণজন্মা পুত্রের অন্তরঙ্গ আলোচনা (১২ পৃঃ) :

"মা, আমাদের কর্মক্ষেত্রের কোন্ বিভাগে দেখিলে আপনি সর্বাপেক্ষা সুখী হইবেন?...দয়াময় ভগবান্ আমাদের মানবজন্ম দিয়াছেন কেন? তাঁহার পূজা ও সেবার জন্যই দিয়াছেন। কিন্তু মা, আমরা কার্যতঃ করি কি? সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে পারি না।...যিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়মন্দিরে বসিয়া আছেন আমরা

তাঁকে একবারও প্রাণ খুলিয়া ডাকি না। নিষ্ফল তাহার মানবজন্ম যাহার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না।

"মা, আমি প্রায় ভাবি—বাঙালী কবে মানুষ হইবে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে? আজকাল বাঙালীদের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়া নাস্তিক ও বিধর্মী হইয়া যায়—দেখিলে বড় কষ্ট হয়।···বাঙালীদের মধ্যে প্রত্যহ ভগবানের নাম করে এরূপ ভদ্রলোক খুব কমই আছে—দেখিলে প্রাণে বড় কষ্ট হয়।···"

শুনলে সত্যিই কি চমকে উঠতে হয় না? মনে হয় না কি যে, সে-মহাজনের জন্মস্বত্ব ধর্মবোধ—যার দৃষ্টি আশৈশব উর্ধ্বলগ্ন, স্বপ্নচারী। ভারত পুণ্য ভূমি একথা বলতেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। সুভাষের কিশোর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল এ-বিশ্বাস ১৯১৩ সালে। শোনো:

"মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্টা ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এতবার তিনি আর কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।" (১৫ পৃঃ)

কী সুন্দর ভাবাবেগ! অবশ্য পাঠ্য—১৫ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা। কত আর উদ্ধৃতি দেব? এর পরেও তার নানা চিঠিরই নানা দুঃখ বেদনা প্রধানতঃ ধর্মেরই সঙ্গে জড়িত। বার বারই সে লিখত আমরা ধর্মকে হারালে ডুববই ডুবব: উপনিষদের ভাষায়—ইহা চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—এ-জগতে ভগবানকে জানলেই সর্বরক্ষা, না জানলে সর্বনাশ। সুভাষ বারবারই বলেছে (যেন বেদের ভাষায়) যে, শুধু দুটো খেয়ে প'রে উদ্ভিদের মতন দুদিন বিকশিত হ'য়ে ঝ'রে যাওয়া—এ অতি হীন নিয়তি—যে-কথা নচিকেতা বলেছিলেন যমকে: "সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ।" বারবারই লিখেছে

বন্ধুবান্ধবকে যে, সে টাকাকড়ি চায় না—"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" বারবারই ঘোষণা করেছে—আমাদের লক্ষ্য "প্রেয়" নয় "শ্রেয়ঃ"ই বরেণ্য।

এ সুর পরে, তার যৌবনে, কিছুটা স্তিমিত হ'য়ে আসে রাজনীতির চাপে। কিন্তু তবু সে রোজই গীতা পড়ত সুদূর মান্দালয় জেলে। সেখানেও দুর্গাপূজায় তার কী উচ্ছ্বাস! লিখছে তার মেজ বৌদিকে (১৯১ পৃষ্ঠা):

"৺পূজার কথা বোধ হয় এখন পুরোনো হয়ে গেছে। এত আনন্দ কোনো পূজাতে পেয়েছি কি না জানি না। ··কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি ৺মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একধাবে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।"

বার বার সে লিখেছে "ধ্যানধারণার প্রয়োজন-এর কথা" ত্যাগের কথা, স্ত্রীরূপে "মাতৃরূপ আরোপ করা"-র কথা, "শক্তিসাধনা" ক'রে ভয় জয় করার কথা। ৮১ নম্বর পত্রে লিখছে: "সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা, অপরদিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্বলতা পলায়ন করিবে।"

কিন্তু আর না। উচ্ছ্বাসের টাল সামলাতেই হবে। পত্রকে মহাভারত হ'তে দেওয়া কিছু নয়। তাই ইতি করি শুধু এই শেষ কথাটি ব'লে যে পত্রাবলীর মতন বই আমাদের—বিশেষ ক'রে বাঙালীর—দুর্দিনে আজ ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত। এহেন ভাবধারায় স্নাত হ'লে মন পবিত্র হয়, চিত্তে বল আসে, সর্বোপরি প্রাণে জাগে ভগবানে ভক্তি—যার প্রসাদে (সুভাষেরই ভাষায়) "মানব জীবন সার্থক" হয়। আমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় নেই একথা সুভাষ বারবারই বলেছে তার নানা পত্রে—নানা সুরে নানা ভাবে নানা পরিবেশে। এতবড় মনীষীর মধ্যে ধর্মে এমন গভীর শ্রদ্ধার ভাব বড় বেশি দেখা যায় না এযুগে। সুভাষের শ্রেষ্ঠ চিঠিগুলি তার মার উদ্দেশ্যে লেখা। বলতে ইচ্ছা হয় এ চিঠিগুলি পড়তে পড়তে: "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" ইতি। দিলীপ দা

পুঃ। পত্রাবলী-র সম্পর্কে একটি কথা বলা হয় নি। নানা পত্রে সরস কথাও অনেক আছে, হাসিও আছে। একটি ছবি উদ্ধৃত করি— কিশোর সুভাষ "বাবু" বলতে কী মনে করত। ইংরাজীতে বলে child is the father of man : পরিণত বয়সে ও "বাবু" হয় নি। সে বাবু কী বস্তু? শোনো :

"ভগবান্ কলিযুগে একটি নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা অন্য কোনো যুগে ছিল না : 'বাবু' সৃষ্টি। আর আমরাই সেই বাবু সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের ঈশ্বরদত্ত পদযুগল আছে, কিন্তু আমরা ২০।২২ ক্রোশ হাঁটিয়া যাইতে পারি না—কারণ আমরা বাবু। আমাদের দুইটি অমূল্য হস্ত আছে—কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমে কুণ্ঠিত—কারণ আমরা বাবু। আমাদের এই ঈশ্বরদত্ত সবল দেহ আছে, কিন্তু আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে 'ছোটলোকের কাজ' বলিয়া ঘৃণা করি, কারণ আমরা 'বাবুলোক'। আমরা সব কাজে চাকরকে হাঁক মারি—কারণ আমরা যে বাবু। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মিলেও আমরা গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি না, কারণ আমরা বাবু। আমরা সামান্য শীতকে এত ভয় করি যে সর্বাঙ্গ বোঝায় চাপাইয়া রাখি কারণ আমরা বাবু।...জন্মাবধি সুখের এবং বিলাসিতার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়াতে আমরা তিলমাত্র কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারি না—এই কারণে ইন্দ্রিয়গণকে আমরা জয় করিতে পারি না—সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া এক দুর্বহ জীবনভার বহন করি।" (১৪ পৃঃ) *

* পত্রাবলী—সুভাষচন্দ্র বসু—এম, সি, সরকার ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৮'০০

বিজ্ঞান জনহিত ধর্ম

বৈজ্ঞানিকবর্গেষু,

আপনার চমৎকার পত্রটি প'ড়ে আমার কয়েকটি কথা মনে হয়েছে, আপনাকে নিশানা ক'রে লিখতে চাই এ-খোলা চিঠিতে। মনে হয়েছে আরো এই জন্যে যে, সম্প্রতি মহা মনীষী ধর্মবীর আলবার্ট স্বাইৎজারের (Albert Scweitzer) কয়েকটি বই পড়লাম : My Life And Thought, On The Edge Of The Primeval Forest, More From Thc Primeval forest....আরো তাঁর দু একটি জীবনী অন্যের লেখা।

প্রথম বইটিতে তিনি লিখেছেন : "জগৎ সম্বন্ধে যে কোনো গভীর দৃষ্টিভঙ্গির মূল হ'ল ধর্মের প্রেরণা, কেন না এ-দৃষ্টি মানুষকে অসীমের সঙ্গে .আত্মিক যোগসূত্রে বাঁধে।" * শ্বাইৎজাব আধুনিক জর্মন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক আবহে মানুষ হ'য়ে গভীর ধর্মভীরু, অন্তর্মুখী হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছেন—খানিকটা আইনষ্টাইনের মতনই বলব, যিনি বল্‌তেন : "আমি মনে করি—বিশ্বলীলাবাদী ধর্মানুভূতি বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার একটি বলিষ্ঠ ও মহত্তর প্রেবণা।" † তিনি আর এক জায়গায় লিখেছেন : "যত অনুভূতি আমাদের হয় এ-জীবনে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি জাগে যখন ভাবি জীবনের রহস্যের দিকটার কথা। এই গভীর অনুভবই শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্মের মূলে আসীন।" ‡

---

* "Any profound weltanschauung (world-view) is mysticism. in that it brings men into a spiritual relation with the Infinite." (My Life & Thought, Albert Schweitzer, epilogue)

† "I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research." (The world as I see it···Hans Albert Einstein, প্রবন্ধ)

‡ "La plus belle chose que nous puissions éprouver c'est le cote mysterieux de la vie. C'est le sentiment profond qui se trouve au berceau de l'art et de la science véritable." (Dilemma of Being Modern by J. P. Hodin p. 170, Footnote)

শ্রেষ্ঠ ধর্মবিৎ ও মনীষীরা যুগে যুগে মানুষের অন্তর্নিহিত যে-ঊর্ধ্ব-মুখী অভীপ্সার গুণগান করেছেন আইনষ্টাইনও সেই ব্যক্তিরূপের মহিমাকে অভিনন্দন করেছেন সর্বান্তঃকরণে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "What I Believe"-এর ও অন্য নানান্ অঙ্গীকারে; বলেছেন খুব জোর দিয়েই যে, জাবনের তথা "God of harmony"-র শ্রেষ্ঠ সূত্র গ'ড়ে তুলতে পারে কেবল স্রষ্টা মানুষ—creative personality। নানা সঙ্ঘ বা "ইস্‌ম্"-এর চাপে এই মহৎ প্রেরণা নিষ্পিষ্ট হয়ে যায় ব'লেই তিনি ফ্যাশিস্ত, নাজি বা বলশেভিক নীতিকে অকুণ্ঠে নিন্দা করেছেন। তাঁর "Credo, What I Believe-এ লিখিছেন তিনি (১৯৪১ সালে):

"For this reason I have always been passionately opposed to such regims as exist in Russia, Germany and Italy today··· I am convinced that degeneracy follows every autocratic system of violence, for violence inevitably attracts moral inferiors. Time has proved that illustrious tyrants are succeeded by scoundrels." *

তাঁর ও শ্বাইৎজারের একাধিক জীবনী পড়তে পড়তে আমার বহু বৎসর-লালিত একটি ধারণা সমর্থন পেল যেন নতুন ক'রে। ধারণাটি এই যে, সংসারে মোটামুটি দু'থাকের মানুষ আছে। এক—যাঁরা জগৎকে দেখেন শ্রদ্ধার অঞ্জন মেখে; দুই—যাঁরা বুদ্ধির সর্বক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'য়ে শ্রদ্ধেয়কে—অর্থাৎ গভীর বিশ্বাসলভ্য সত্যকে—অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতে উঠে প'ড়ে লাগেন। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পরে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিরোধ আরো প্রবল ও মুখর হ'য়ে উঠেছে। খ্যাত-নামা ভাবুক উইল ডুরাণ্ড তাঁর Story of Civilisation নামক বিরাট বিশ্বকোষে অকারণ লেখেন নি (৭ম খণ্ড, ভূমিকা): "বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে মহাবিতণ্ডা এ যুগের চিন্তাধারার একটি প্রধান স্রোত—

* এই জন্যে আমি চিরদিন তীব্র প্রতিবাদ ক'রে এসেছি রুশ জার্মান ও ইতালীতে যে-ধরণের ডিক্টেটার-নীতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে—তার বিরুদ্ধে। বাহুবল প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের পরিণাম মনুষ্যত্বের অধোগতি, কারণ বাহুবল দল পাকায় হীন মানুষকে নিয়ে। ইতিহাসে দেখতে পাই—প্রখ্যাত অত্যাচারীদের পরে অভ্যুদিত হয়েছেন দুরাত্মারাই।

"The great debate between science and religion is the main current of modern thought." (The age of Reason Begins)

এ-বিতণ্ডার নিষ্পত্তি সুদূর না আসন্ন—বলতে পারি না, তবে একটা কথা বলা যায় জোর ক'রেই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল বিশ্বব্যাপী হলেও তাতে ক'রে মানুষের নৈতিক উন্নতির পথ একটুও সুগম হয় নি। মানুষ প্রাক্‌বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে বা প্রাক্‌হেলেনিক যুগে পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন অসুখী, অশান্ত ও হিংসুক ছিল আজও ঠিক তেমনিই আছে—কেবল সভ্যভব্য পোশাক প'রে অগুন্তি চিত্তবিক্ষেপকেও জাতে তুলেছে মাত্র—"সংস্কৃতি" বা রকমারি "ইস্‌ম্‌" উপাধি দিয়ে। এর ফলও ফলেছে হাতে হাতে : আণবিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিপত্তি, জেট্‌-প্লেনের জ্যোতিষ্কগতির জয়ধ্বনি, লক্ষ লক্ষ লোককে ভুলিয়ে রাখা এই স্তোক-বাক্যে যে, বিজ্ঞানের একক প্রচেষ্টায়ই "স্বর্গ নামিয়া আসিবে মর্ত্যে, স্বর্গে উঠিবে ধরণী।"

কবির ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হবে না যদি আমরা সাশ্রুনেত্রে বিজ্ঞানকেই ভগবান্ দাঁড় করাতে না যাই, যদি আমরা মহামনীষী গেটের অঙ্গীকারে সায় দিয়ে বলি যে, আমরা সর্বনাশা সংশয়কে প্রশ্রয় দেব না :

Ich habe geglaubt, nun glaub' ich erst recht··
Ich bleibe beim glauebigen Orden :
So duester es oft und so dunkel es war···
Auf einmal ist's lichter geworden.

শ্রদ্ধারে আমি করিয়া এসেছি অঙ্গীকার,
আজ আরো চাই হৃদয়ে জপিতে সে বিশ্বাস।
এসেছে ধরণী হ'য়ে বারবার অন্ধকার,
তবু প্রতিবারই করেছে আলো সে-কালোরে গ্রাস।

কিন্তু মহাকবি গেটের বা মহাত্মা শ্বাইৎজারের মতন লোকোত্তর মনীষীরা শ্রদ্ধাবিশ্বাসের আঁধার-জয়ী শক্তি সম্বন্ধে অঙ্গীকার করলে হবে কি, এ-যুগের সংশয়ীদের সংসদে শ্রেষ্ঠ নবীর পদবী পেয়েছেন কবিরা নয় ত, পেয়েছেন বিজ্ঞানোচ্ছ্বাসী তথা রাষ্ট্রনায়কেরা। তাঁরা প্রায় একবাক্যে রায় দিলেন যে, সত্যের পথনির্দেশ দিতে পারে কেবল বিজ্ঞানী বুদ্ধি ও

বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শন। বুদ্ধি অতীত যুগেও মান পেয়েছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ধ্যানী জ্ঞানী ঋষি মুনির কাছে নয়—তাঁরা পরম দিশারী ব'লে বরণ করেছিলেন বোধির প্রজ্ঞাকে (intuition ও revelation)। কাজেই এ মুকুট-মণি পেয়ে বস্তুবিচারী বুদ্ধির মাথা গরম হ'য়ে উঠল, সে হাঁকল স-দাপটে : "আমি যা বুঝি তাই সত্য, যা বুঝতে পারি না তা হয় কাব-কল্পনা ধূম-জল্পনা, না হয় মিথ্যার শোভাযাত্রা কুসংস্কারের উর্দী প'রে।"

সাধারণ মানুষ কোন কিছুই তলিয়ে ভাবে না, যা চকচক করে তাকেই সোনার মান দেয়। বৈজ্ঞানিকের ও তাঁদের তাঁবেদার যন্ত্রনির্মাতাদের (technologist) অঘটনঘটনা কীর্তিকলাপ দেখে ও হাতেহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নগদ বিদায় পেয়ে তাই ত হকচকিয়ে গিয়ে বলল : "এরই ত নাম ভাগবতী বিভূতি—যে তার যাদুবলে আমাদের কাঁটাবনকে নন্দকানন ক'রে তুলল ব'লে। অতএব বলো ভাই সবাই মিলে সঘনে—নমো নব বিজ্ঞানদেব, আমাদের কর্তা ও বিধাতা!" কিন্তু মুশ্‌কিলের দেখা মিলল, যখন দেখা গেল, বিজ্ঞানদৃপ্ত নাস্তিক বুদ্ধিকে সরাসর কর্তা ও বিধাতা দাঁড় করালে ঐ সঙ্গে হর্তা না হয়ে তার আশ মেটে না। তবে এ সঙিন সমস্যার অভ্যুদয় হয়েছে হাল আমলে —হিরোসিমা নাগাসাকির অতিকায় হত্যাকাণ্ড দেখে যা তৈমুর চেঙ্গিস নাদিরশা মাহমুদ প্রমুখ মহাহন্তাদেরও ছুয়ো দেয় কৃপার হাসি হেসে : "আর কে আমার মত চক্ষের নিমেষে বিশ্বহন্তা হ'তে পারে?"

কিন্তু বিজ্ঞানের সর্বেসর্বা হওয়ার ফলে শুধু যে বাহ্যজগতে বিশ্বধ্বংসী কাপালিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাই নয়,—ঐ সঙ্গে নাস্তিকতা মান পেয়েছে মানুষের চরম-বোধির পদবী পেয়ে। কারণ, বিজ্ঞানের সন্ধানী বুদ্ধি ভগবানের ধারও ধারে না। সে বলে সগর্জেই : "সত্য আবিষ্কারের তীর্থযাত্রায় ভগবান্ অবান্তর, শুধু বস্তুবিচারী বুদ্ধিই চরম নিয়ন্তা। অপিচ, বিজ্ঞান এরই মধ্যে যে-সব অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়েছে তার জোরে এ কথা বলা চলে বড় গলা ক'রেই, যে, ভগবানকে বাতিল ক'রে বিজ্ঞানকে তাঁর বেদীতে বসালে আর ভয় থাকবে না। 'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার'—কবির এ ভবিষ্যদ্বাণী অপ্রতিবাদ্য, কেবল সে মাঝির নাম বিজ্ঞান, আর কর্ণধারের নাম বিজ্ঞানবাহিনী বস্তুতান্ত্রিকতা।"

এ-কথা ঢাক পিটিয়ে আরও প্রচার করলেন মহাশক্তিধর ছত্রপতিরা—লেনিন, স্টালিন, হিটলার। "Religion is the opium of the soul"—বর্গীয় বেদবাক্য রটিয়ে। এর ভাষ্যও প'ড়েই রয়েছে: "আকাশের ভগবান অকর্মা বা নাস্তি। জগৎ চালাচ্ছে—সাফ দেখতে পাচ্ছি—বুদ্ধিমন্ত কমিসারিয়েট ও যান্ত্রিক হাকিমের দল।" এ ধরণের কথা ক্রমাগত শুনতে শুনতে মানুষের আবেশ জেগে উঠল, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের শক্তি চাক্ষুষ ক'রে। সে বলল সসম্ভ্রমে, ঠিকই ত। আকাশের ভগবান কা-ই বা করছেন? বড় জোর দু'চার কোটি অকেজো নীহারিকা নিয়ে ডাণ্ডাগুলি খেলছেন। করবার মতন কাজ করছে শুধু মানুষের বিজ্ঞানী বুদ্ধি। কাজেই সেই ত ভগবান্।

এ নয়া মন্ত্রবাণীর ফেরে প'ড়ে মানুষ চলছিল খাসা fool's paradise গ'ড়ে—কেবল, হায় রে, বাগড়া দিল বিজ্ঞানী যজ্ঞের রাক্ষসী—বিশ্বহন্ত্রী আণবিক কৃত্যা। বিজ্ঞানী বুদ্ধি নাস্তিক্যের ঝাণ্ডা উড়িয়ে টেনে নিয়ে এল মানুষকে ধ্বংসের অতলান্তিকের সামনে। যে-শক্তি সে আবিষ্কার করল সে "কম্‌লীর" মতন হয়ে দাঁড়ালো—অর্থাৎ ছাড়লেও ছাড়ান দেয় না। মহাকবি গেটে তাঁর দূরদর্শী কল্পনায় পেয়েছিলেন এর পূর্বাভাস, তাই নবীর মতনই লিখেছিলেন বৈজ্ঞানিক শিক্ষানবিশের আশু সংকটের কথা:

Herr, die Not ist gross;
Die ich rief, die Geister,
Werde ich nun nicht los.
দেখ দেখ প্রভু, একি দুর্নিবাব বিপদ ভীষণ!
যে বিশ্ববিনাশী ঘোর রাক্ষসীরে করেছি আহ্বান,
ছাড়িলেও ছাড়ে না সে—রক্ষা পাব কেমনে এখন?

গেটের এ সবিলাপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বিজ্ঞানী-বুদ্ধি অক্ষম। দিতে পারে কেবল ধর্মবুদ্ধি, যে বলে নাস্তিক্যের অন্ত্যেষ্টি নিধনে—শুধু ভগবদ্ আশ্রয়েই হানাহানির মর্ত্যলোক গলাগলির অমরাবতী হ'তে পারে। বৈদিক ঋষি তাই আমাদের সাবধান করেছিলেন:

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।" (কেন উপনিষদ্)

বিভুর মিলনে শুধু জীব হয় ধন্য ইহলোকে,
না লভিলে তাঁরে আসে সর্বনাশ দুঃখে ভয়ে শোকে।

কিন্তু এ লাভের প্রথম সোপান তথা অটল ভিত্তি হ'ল আত্মিক সত্যে শ্রদ্ধাবিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞান সুখ-সুবিধার, তথা রকমারি স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, কেবল পারে না শান্তির বিধান দিতে, কি অমৃতানন্দের চিরঞ্জীয় বাণীর সন্ধান পেতে। কিন্তু তবু মোহ যখন পেয়ে বসে তখন মরীচিকাকেই জল ব'লে ভ্রম হয়, কে না জানে? তাই এত ঠেকেও মানুষ শুধু যে শিখতে চাইছে না তাই নয়, যেন আরও সদর্পে চাইছে চিরন্তন আর্যবাণীকে পাল্‌টে ঘোষণা করতে:

বিজ্ঞান-বিধানে যার নাই ভক্তি এই মর্ত্যলোকে
সে নাস্তি ঈশ্বরে কল্পি' কেঁদে মরে দুঃখে ভয়ে শোকে।

আপনার এ কথা কে না মানবে যে, ঈশ্বরকে নানা অজ্ঞানীই যুগে যুগে নিজের মনগড়া রূপে কল্পনা ক'রে অমানুষ হয়ে ধর্মের নামে অধর্মের দুর্ভোগ এনেছে। কিন্তু কোনো পথে মেকির দেখা মেলে ব'লেই এ সিদ্ধান্ত মঞ্জুর নয় যে, খাঁটি নাস্তি। তাই অজ্ঞানী অমানুষেরা ধর্মের অমানুষিক ব্যভিচার করেছে ব'লেই সাব্যস্ত হয় না যে, দেবব্রতী সত্যধর্ম নামঞ্জুর। এ কথার সর্বচেয়ে বড় প্রমাণ—যুগে যুগে সব দেশেই বহু মহাপুরুষ তপস্যা ক'রে পেয়েছেন সেই দেবতার দেখা, যিনি আনন্দী শিব সত্য ও সুন্দর এবং এ কথার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দিয়েছেন নিজেদের নির্লোভ নিরভিমানিতায়, সর্বজীবের মঙ্গলসাধনে, অধ্যাত্মজ্ঞানে, স্বার্থত্যাগে পথনির্দেশে, ক্ষমায়, প্রেমে। তাঁরা সবাই একই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন নানা ভাষায়, নানা সুরে, নানা ছন্দে—যে, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন আত্মগোপন ক'রে, তাঁকে আবিষ্কার করলেই আপৎ শান্তি:

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
রচিলেন যে দেবাদিদেব এই মহাবিশ্ব—তার
প্রতি জীব-হৃদে নিত্যাসীন সেই মহাত্মা অপার।

আপনি আপনার নানা পত্রেই লিখেছেন, এ বিশ্বলীলায় সেই

নিত্যসীন মহাত্মার লীলা বোঝা ভার। ক্লিষ্ট প্রশ্ন তুলেছেন—কেন আবহমানকাল সর্বজীবেরই দুঃখশোকযন্ত্রণার অন্তহীন পুনরাবর্তন হয়ে এসেছে? আপনার আক্ষেপের যে হেতু আছে, জীবের জৈবিক যন্ত্রণা যে দুঃখময়, বিশেষ ক'রে মানুষের মিথ্যাচার হীনতা ও নিষ্ঠুরতার দুষ্প্রবৃত্তি যে জঘন্য, এ কথা কে না মানবে বলুন? যুগে যুগে দেশে দেশে হৃদয়বান্ মানুষ যাঁরা, তাঁরা সবাই দুঃখ পেয়েছেন মানুষের দুঃখ আর্তি দেখে। আর এ দুঃখ প্রায় নিরাশায় পৌঁছেছে যখন মানুষ নিজে খাল কেটে কুমার ডেকে এনেছে। প্রাকৃতিক দুঃখের উপর চাপিয়েছে স্বকৃত দুঃখ—man made misery—যুদ্ধবিগ্রহে, কাড়াকাড়িতে, দুর্বলকে আরও মাড়িয়ে গিয়ে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় মানুষ অশ্রুর অক্ষরে লিখে গেছে যে, সে ইতিহাস থেকে কিছু শেখেনি কোনদিনই। বারবারই দেখেছে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় যন্ত্রণায় দুর্ভোগে অবসাদে, তবু বারবারই বাছাই করে নিয়েছে পুণ্য ছেড়ে পাপকে, ধর্ম ছেড়ে অধর্মকে। গত যুদ্ধের সময় আমি প্রায়ই ভাবতাম—এই problem of choice-এর সমাধান কি? কেন মানুষ বারবারই খোলা চোখে দুষ্প্রবৃত্তির অতল গহ্বরে ঝাঁপ দেয়—অধর্মের পাওনা হয় বারবার চাক্ষুষ করার পরেও যে, সুপ্রবৃত্তির শুভদীপ নিভিয়ে দিলে তার অবসান—অন্ধকারে আত্মঘাতে?

একটা উত্তর কেবল পাওয়া যায়—যদিও পুরোপুরি জানাও কঠিন। সে উত্তরটি হল মামুলি—এ পর্যন্ত জগতের বিকাশ হয়ে এসেছে দ্বৈতের (duality) মধ্যে দিয়েই—আলোয় কালোয়, সুখে দুঃখে, বিয়োগে মিলনে, হাসি অশ্রুতে, ওঠা পড়ায়। দুঃখের এ-ব্যাখ্যায় কিছুটা সান্ত্বনা মেলে, কেননা যদি দুঃখ শোক জরা মৃত্যু পাপ তাপ আদৌ না থাকত তাহলে হয় ত সুখ অশোক যৌবন পুণ্য শান্তিকে তাদের স্বরূপে চেনাই যেত না। যাই হোক, এ হল জীবনের ছন্দ যাকে স্বীকার করেও আশাশীল (optimist) হওয়া সম্ভব। কিন্তু যখন মানুষের খুন চেপে যায়—যখন সে নির্লজ্জ হয়ে পশুর চেয়েও পাশবিক হয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে একেশ্বর (dictator) হতে, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুঃখবাদী (pessimist) না হ'য়ে মেনে নেওয়া একটু কঠিন হ'য়ে ওঠে যে, এত শত দুরাচরণের দরকার ছিল মহত্ত্বের মহিমা আরও বেশি ক'রে বুঝবার জন্যে।

কেবল তবু শেষমেশ একটি কথা মানতেই হয় যে, নৈসর্গিক ও মানবিক দুঃখকষ্টের অবধি না থাকা সত্ত্বেও মানুষ খতিয়ে অন্ধকার থেকে আলোর দিকেই চলেছে—এত শত ভূমিকম্প মহামারী কুরুক্ষেত্র ও অত্যাচার সত্ত্বেও নরখাদক গুহাবাস অধ্যায় থেকে উঠে গড়েছে সমৃদ্ধ সভ্যতার রাজধানী, যেখানে মহৎ শিল্পী, বিজ্ঞানের তপস্বী, জ্ঞানের দার্শনিক—সর্বোপরি, সর্বত্যাগী সাধুসন্ত, বিশ্বপ্রেমিক মহাতপা, সমুদ্র-উদার ভাবুক ও স্বপ্নচারী দার্শনিকের দেখা মিলেছে। মানুষ বারবার পড়েছে কিন্তু আবার উঠেছে, এও ত অস্বীকার করা চ'লে না। শেষে কি বিজ্ঞানলব্ধ মারণাস্ত্রেই তার বহুবিচিত্র, সভ্যতার ভরাডুবি হবে—যার পরে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না?

এ-আশাশীলতার ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল না হলেও ভয় হয়ই যখন দেখি, বিজ্ঞানের নানা বর পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের নানান নৈতিক অবনতি হয়েছে বিজ্ঞানপুষ্ট বস্তুতান্ত্রিকতার প্ররোচনায় ও বিজ্ঞানসমর্থিত নাস্তিক ভোগবাদের কুহকে। নইলে হয়ত আজ আদর্শবাদ, পরার্থনিষ্ঠা, ত্যাগব্রত ও ভগবদ্‌ভক্তি সেকেলে ব'লে এত অপদস্থ হ'ত না—কে জানে? অবশ্য ক'য়েকজন স্বভাবসুমতি ও ধর্মভীরু মহাত্মা চিরদিনই দেশে দেশে দেখা দিয়েছেন, যাঁরা পই পই ক'রেই সমসাময়িকদের মানা করেছেন কাম ক্রোধ লোভ মোহের মায়াকে আস্কারা দিতে। কিন্তু করলে হবে কি? জগতে অসংযমীরাই যে সংখ্যাগরিষ্ঠ—মেজরিটি। কাজেই এ দলে ভারি ভোগবাদীদের হাতে এল শক্তির রাশ—তাঁরা মানুষকে বললেন—"যেখানেই হাতে হাতে নগদ বিদায় মেলে সেখানেই রাজধানী বসাও, ভোগের পথে যারা বাধা দেয় তাদের উচ্ছেদ করো।" কথাটা একটু হাল্কা সুরে বললাম বটে, কিন্তু তা'বলে যুক্তির দিক দিয়ে খুব অপলকা নয়। কাড়াকাড়ি করতে যারা পটু তারাই রাজতক্তে উঠে বসে সব আগে। তারপর তারা যা বলে, কানপতলা মানুষ শুনতে শুনতে বিশ্বাস করে। ভেবে দেখে না যে, প্রেয় প্রথম দিকে স্বাদু হলেও অন্তিমে বিষময়, অন্যদিকে শ্রেয় প্রথম দিকে বিস্বাদ হলেও শেষরক্ষা করে—সাধনায় নীরস তপস্যাই আনে জীবনের স্থায়ী সরসতা, কিন্তু এ-বাণী তাদের কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পশে না, যারা তলিয়ে ভাবতে চায় না? শ্বাইৎজার

এই নিদানই দিয়েছেন তাঁর জীবন-দর্শনে। লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে (এপিলোগে) "দুটি:অনুভব আমার জীবনকে ম্লান করেছে: এক—এ জগৎ একটা হেঁয়ালি ; দুই—আমি জন্মেছি মানুষের এক গভীর আধ্যাত্মিক অধোগতির যুগে," যার নাম দিয়েছেন তিনি spiritual decadence। শুধু তাই নয়, তিনি আরও একটি কারণ নির্দেশ করেছেন এ অধোগতির: আমাদের সংশয়কে ক্রমাগত প্রশ্রয় দেওয়া—অর্থাৎ শুভবুদ্ধির ফল ফলতে দেরি হয় ব'লে সংশয়রূপী দুর্বুদ্ধিকে দিশারি ব'লে বরণ করা। গীতায়ও এই কথাই বলেছেন ঠাকুর "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"—অবিশ্বাসীর মরণ ধ্রুব। শ্বাইৎজার এ সূত্রটিকে আধুনিক জীবনের ভাষ্য দিয়ে ফলিয়ে বলেছেন (এপিলোগে): "সংশয়বাদের বীজে ফসল ফলেছে: মানুষ খুইয়ে বসেছে তার অধ্যাত্ম আত্ম-প্রত্যয়। বাইরে থেকে দেখলে তাকে হাজার আত্মনিশ্চিত মনে হলেও:অন্তরে সে অত্যন্ত আত্মসন্দিহান, বাস্তব জগতে সে সক্রিয় শক্তিমান হলেও আসলে সে বামনই রয়ে গেছে, বাড়তে পারে নি।"

কিন্তু এ মহামতি প্রতিভাধর কর্মী তথা দার্শনিক জগতের দুঃখব্যথায় বিষণ্ণ হলেও হাল ছেড়ে দেন নি। যেখানেই অসত্য অত্যাচার হীনতা ক্ষুদ্রতা দেখেছেন প্রতিবাদ করেছেন। আত্মজীবনীতে বড় গলা ক'রেই বলেছেন যে, সত্য যে আছে এ-বিশ্বাস তিনি হারান নি কোনোদিনই। তাই মানুষের দুঃখতাপে তিনি ক্লিষ্ট বোধ করলেও সংশয়ের ধারপাশ দিয়েও যাননি, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন আজও (নব্বই বৎসর বয়সে) যে, খ্রীষ্টের বাণী চিরন্তন সত্য যে, বাহ্য ঐশ্বর্যে মানুষের মুক্তি নেই, ধর্মের প্রেমদীক্ষায়ই কেবল মিলতে পারে আনন্দসিদ্ধি, বৈষম্যের সমাধান। খ্রীষ্টের এ মন্ত্র তিনি বরণ করেছেন মনে-প্রাণে: "যে শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চাইবে সে হবেই হবে সর্বহারা, আর যে ভগবানের জন্যে মরণও পণ করতে রাজী সেই হবে সর্বজয়ী, চিরজীবি।" (১৮ অধ্যায়)

আমি এ-মহাপুরুষের কথা এত ক'রে উদ্ধৃত করলাম শুধু এই জন্যেই নয় যে, তিনি এ-যুগের দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ভাবুকদের অন্যতম মুকুটমণি ; এ জন্যেও বটে যে, তিনি বারবারই সকৃতজ্ঞে অঙ্গীকার করেছেন যে, জীবনে তিনি অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রেও তাঁর পরার্থব্রত উদ্‌যাপন করতে

পেয়েছেন শুধু খ্রীষ্টের ধর্মদীক্ষায়। ধর্ম মানুষকে পরার্থনিষ্ঠার কি গভীর প্রেরণা দেয়, এ যুগে অনেক বিজ্ঞানোৎসাহী বস্তুতান্ত্রিক ভুলে যান ব'লেই আরো শ্বাইৎজারের ধর্মসিদ্ধির কথা তাঁদের প্রণিধানযোগ্য। ভাবুন কি গভীর সে-প্রেরণা, যার তাগিদে চব্বিশ বৎসর বয়সে দর্শনে পি-এইচ্-ডি উপাধি পাওয়ার পরে সাত বৎসরে ডাক্তার হয়ে অর্ধশতাব্দী কাল বিদেশে কোথাকার কে নিগ্রোদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করতে পারলেন—এখনও সেই বিদেশেই তাঁর স্থায়ী বসতি। আর মনে রাখবেন, এ দৃঢ় সঙ্কল্প বজায় রাখতে তাঁকে আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনের মুখর আপত্তি উপেক্ষা করতে হয়েছে। অভাবনীয় নয়? শুধু খ্রীষ্ট-উদ্বুদ্ধ ধর্মবাণীর প্রেরণায় দারুণ গ্রীষ্মপ্রধান মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে হাসপাতাল ডাক্তারখানা গ'ড়ে তোলা, তিন চার শ' কুষ্ঠরোগীর জন্য একটি চিকিৎসাগ্রামের পত্তন করা—আর-এমন বিভুঁয়ে যেখানে শুধু অসহ্য গরমই নয়—সভ্যতার আরামের কোন সুখ-সুবিধাই নেই, না মুনিসিপলিটি, না, সভ্য সংস্কৃতি, না বিজলী-পাখা কি বাতি। ডাক্তার হ'য়ে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে আজীবন—দিনে তের-চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে। কিন্তু এমনই কৃতসঙ্কল্প তাঁর প্রতিভা ও অধ্যবসায় যে, এরই মধ্যে তিনি সঙ্গীত-চর্চা ক'রে এসেছেন—য়ুরোপে বহু কন্সার্টে নিজে পিয়ানো ও অর্গান বাজিয়ে টাকা তুলেছেন স্বহস্ত-নির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্যে। লিখেছেন নানা গ্রন্থ—সঙ্গীত, খ্রীষ্টধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেও একটি বই লিখেছেন, তাঁর গভীর শ্রদ্ধার অঙ্গীকারে। তাঁর এ সাংস্কৃতিক অবদানের সম্পর্কে ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়লে মন ভ'রে ওঠে, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। * এঁর গুণকীর্তনে আইনষ্টাইনের একটি

---

* ব্রিটানিকা বিশ্বকোষে এঁকে বলেছে :

"Philosopher, theologian, musician, doctor, winner of Nobel Peace Prize of 1952···He has an astonishing capacity for arduous physical and mental···of relentless energy···above all an artist striving with humility to become as nearly perfect as possible in his Christian dicipleship and in all the manifestations of his manysided genius."

উক্তি বিশ্ববিদিত—"Here goes a great man!" এহেন মহামনীষী শিক্ষায় আধুনিক হ'য়েও দীক্ষায় ধর্মাশ্রিত। ভাবতে পারেন? নানা চিন্তাগভীর গবেষণার পরেও তিনি দেখতে পেয়েছেন—যে কথা বারবারই লিখেছেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—যে, খ্রীষ্টপ্রেম উদ্বুদ্ধ না হলে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ডুববেই ডুববে। অকুতোভয়েই অঙ্গীকার করেছেন যে, খ্রীষ্টের বেদবাক্যই তাঁর জীবনের গুরুবাক্য মন্ত্রবাণী।

বিশ্বাস করবেন—তাঁর জীবনী এত ক'রে ফলিয়ে লিখছি বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে খর্ব করতে নয়। বিজ্ঞান আমাদের অঢেল দিয়েছে, এ কথা কে না সকৃতজ্ঞে মানবে বলুন? আপনি লিখেছেন যে, বিজ্ঞান মানুষের অনেক দুঃখদৈন্যের লাঘব করেছে। আমি আরও বেশি বলি: বিজ্ঞান আমাদের অনেক কুসংস্কার ও ভয় থেকে মুক্তি দিয়েছে, নানা অসহায়তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, অন্তর্নিহিত পুরুষকারকে উদ্দীপ্ত ক'রে আমাদের স্বাবলম্বী হ'তে শিখিয়েছে। কিন্তু সব মেনেও বলতেই হবে সত্যের খাতিরে যে, বিজ্ঞানের মোহে না পড়লে আমরা এই জাজ্বল্যমান সত্যটি দেখতে পেতাম যে, সে মানুষের নাস্তিক্যবুদ্ধিকে খানিকটা আস্কারাই দিয়েছে, যার ফলে মানুষ—অন্তত: বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রথম পর্বে—ভেবে বসেছিল যে, সে খোদার উপর খোদকারি ক'রে ধর্মকে পুলিপোলাও চালান দিয়ে ছত্রপতি হবে এই দর্পের ঝাণ্ডা উড়িয়ে যে, বিজ্ঞানী বুদ্ধি যার নাগাল পায় না, সে সত্যের পদবী পেতেই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ-আস্ফালনও করেছেন নানা বিজ্ঞানমুগ্ধ কল্পনাবিলাসী যে, যে-চিরন্তন সত্যসন্ধান আমাদের অন্তরাত্মার সর্বোত্তম ক্ষুধা, বিজ্ঞানের প্রসাদে সে-

তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ Kulturphilosophie যখন দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয় তখন তাঁর ধীশক্তি ও বিশ্লেষণে সবাই চমকে ওঠে। প্রথম খণ্ডর নাম Verfall und Wiederaufbau der Kultur (Eng. translation—The Decay and Restoration of Civilisation), 1923, is a brief introduction, while the second, Kultur and Ethic (Eng. trans., Civilisation and Ethics) is a brilliant review of the history of ethical thought leading to his own original and positive contribution of reverence for life as the true and effective basis for a civilised life."

ক্ষুধানিবৃত্তি হ'ল ব'লে। কিন্তু তা হয়নি, হ'তে পারে না ব'লেই। আর পারে না শুধু এই জন্যেই যে, সব চেয়ে বড় সত্য—সত্যের সত্য, আলোর আলো, প্রাণের প্রাণ, সুধার সুধা ধরা-ছোঁওয়া দেয় না বস্তুবিচারী বহির্মুখী তথ্যনির্ণয়ে, যান্ত্রিক প্রগতিতে, পরিসংখ্যানে। তাঁকে জানতে হলে সব আগে ছাড়তে হবে বুদ্ধির জাঁক, কীর্তির অভিমান ও সংশয়ী যুক্তির তাঁবেদারী। হ'তে হবে শ্রদ্ধাপন্থী, অন্তর্মুখী ; দীক্ষা নিতে হবে প্রেমোজ্জ্বল শরণাগতির ; যে-মনের যুক্তি বলে : "আগে জানব তবে মানব" তার পরামর্শ ছেড়ে ধর্ণা দিতে হবে সেই মনের অতীত সহজবোধের দ্বারে, যে বলে : "আগে শ্রদ্ধাভরে না মানলে জানতে পারবে না সেই গুহ্য তত্ত্ব—পরাৎপরের কৃপা—যার বরে জন্ম সার্থক হয়, মানুষ বলতে পারে প্রহ্লাদের সুরে : কৃতকৃত্যোস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়—ভবিত্রী তৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—আমি ধন্য হলাম প্রভু আপনার এই ভরসায় যে আমার মিলবে অব্যভিচারিণী ভক্তি।" এই পরাভক্তিই পরাপ্রজ্ঞার জননী—বলতেন মহর্ষি রমণ। কেবল সে-ই-ডাক দিতে পারে সচ্চিদানন্দকে যিনি—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—বস্তুবিশ্বে মূর্ত হন রূপশ্রীতে, প্রাণলোকে শক্তিসামর্থ্যে, মনোলোকে জ্ঞানে ও হৃদয়ে প্রেমরসে। সব পাওয়া শেষ হলেও এই পরম-প্রাপ্তি বিনা যে মানুষ কৃতকৃত্য আপ্তকাম হতে পারে না, ধর্মাত্মা শ্বাইৎজারের জীবনী এই পরম সত্যটিরই যেন একটি আশ্বাসময় মহৎ ভাষ্য। তাই যখন নানা বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানোৎসাহী ধার্মিককে ধমকান : "ওসব সেকেলিয়ানা ছাড়, বিজ্ঞান ধ'রে ফেলেছে ধর্মের ধাপ্পাবাজি, ধর্মের দিন গত"—তখন উত্তরে শ্বাইৎজার প্রমুখ ধর্মবিদ্‌রা বলবেন : "এ-কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে শান্তির আশা দুরাশা, আনন্দের স্বপ্ন আকাশকুসুম, জীবনের অগুন্তি হানাহানিকে বিশ্ব-সৌভ্রাত্রের সুষমার রূপ দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ধর্ম মানুষের সমস্ত সত্তাকে অধিকার ক'রে তাকে মহত্তম ত্যাগব্রতী করতে পারে ব'লেই ধর্মের দুরভিসারে যুগে যুগে দেশে দেশে লোকোত্তর মহাত্মারা পরার্থব্রতী হ'য়ে এসেছেন তাঁদের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে। তাইত আবহমানকাল ধর্মের ডাকে যত মানুষ স্বার্থ ছেড়ে সর্বপ্রেমিক হতে পেরেছে আর কোন মানবিক বৃত্তির তাগিদে পারেনি সেভাবে আত্মোৎসর্গ করতে।"

বিজ্ঞানোৎসাহীদের একথা যদি আমরা মেনে নিই যে, ধর্ম একটা সেকেলে কুসংস্কার, যার ভিত্তি প্রাণিক ভীরুতা ও কৃপার কাঙালপনা, তাহলে মানুষের পক্ষে চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে শুধু যে দেবত্বলাভ অসম্ভব হ'য়ে উঠবে তাই নয়, তার মনুষ্যত্বও হয়ে দাঁড়াবে পাতালমুখী স্বার্থসাধনা, যার আভাস—Writing on the wall—জ্বলজ্বল করে উঠেছে গত দুই বিজ্ঞান-গাণ্ডীবী বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ টঙ্কারে। শ্বাইৎজার তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, নিগ্রোরা যখন তাঁকে বলেছিল: "তোমরা খ্রীষ্টান ও বুদ্ধিমান হ'য়ে কেন রুখে উঠে ভাই ভাইকে হত্যা করছ পিশাচের মত?" তখন তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন বৈ কি।

তবে ভগবান্ যখন আছেন এবং এ কালচক্র জগৎচক্র চালাচ্ছেন তখন বিজ্ঞানী বুদ্ধি তাঁর দিশা না পেয়ে তাঁকে বাতিল করলেই কিছু পরম-অস্তি নস্যাৎ হয়ে যাবে না—ধর্মের ডাকে সাড়া দিতে মানুষ কখনই নারাজ হবে না—ভুলবে না যে, মানুষ মহত্ত্বের তুঙ্গতম শিখরে উঠেছে ধর্মেরই আরোহনী বেয়ে। এ শুধু মাদৃশ ধর্মপন্থীর কথা নয়। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়েনবি (Arnold Toynbee) লিখেছেন তাঁর খ্যাতনামা Civilisation on Trial গ্রন্থে:

"The works of artists and men of letters outlive the deeds of businessmen, soldiers and statesmen. The poets and philosophers out-range the historians; while prophets and saints overtop and outlast them all."

অর্থাৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের কৃতি বণিক্, সৈনিক ও রাজনীতিকের চেয়ে দীর্ঘজীবী। কবি ও দার্শনিক, ঐতিহাসিকের চেয়ে বড়। আর সাধুসন্ত-নবীদের কীর্তি তুঙ্গতম ও কালজয়ী।

ইতি—ভবদীয় গুণগ্রাহী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুনশ্চ: শ্বাইৎজারের ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বইটি পড়ছি পরমানন্দে। তাঁর ধীশক্তি ও ঔদার্যে বিস্মিত হতে হয়—মনে সম্ভ্রম আসে তাঁর-চিন্তাশক্তির ও নিঃস্পৃহতায়। বইটির নাম Indian Thought and its Development। প্রথমেই চোখে পড়ল ভূমিকায় ভারত-দর্শনে তাঁর

শ্রদ্ধার একটি উজ্জ্বল অঙ্গীকার। তিনি লিখছেন (৬ পৃঃ): "প্রথম থেকেই আমার মনে এ প্রত্যয় এসেছিল যে, সব চিন্তারই শেষ বিষয়বস্তু একটি: কেমন ক'রে মানুষ অনন্ত সত্তার সঙ্গে আন্তর মিলন লাভ করবে। আমি ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হই—কারণ ভারত এই সমস্যা সমাধানের সাধনা করেছে এবং এ সাধনার মূল ধর্মের অতীন্দ্রিয়বোধে।" তিনি আরও লিখছেন (৯ পৃঃ): "প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য দর্শন বাদ-প্রতিবাদে যেন না চায় প্রমাণ করতে যে, আমি অভ্রান্ত তুমি ভ্রান্ত। অতীত ইতিহাসে নানা অনৈক্য চোখে পড়লেও আজকের দিনে যেন আমরা চাই—অনৈক্যকে ডিঙিয়ে ঐক্যের ভিত্তিতে পৌছতে—যে ঐক্যের সম্পদ অন্তিমে বিশ্বজনীন না হয়েই পারে না।" এ বইটিও প্রতি বিজ্ঞানোৎসাহীর পড়া উচিত, বিশেষ ক'রে নাস্তিক তার্কিকদের।

দুটি মহাজন

মহালয়া

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

প্রিয়বরেষু

আপনার পত্রটি আমার সত্যিই ভালো লেগেছে, নানা বিশ্লেষণে আপনি আপনার স্বজ্ঞা-র পরিচয়ও দিয়েছেন চমৎকার। কিন্তু আপনি যখন লিখে বসলেন: "মানুষের নিজের কোনো স্বাধীনতা আছে ব'লে আমি মনে করি না; এমনকি সে যে ইচ্ছা করে তাতেও তার স্বাধীনতা নেই; তার অন্তর ও বহির্জগতের নানা ঘাত প্রতিঘাতের ফলাফলই তার মনে জাগিয়ে তোলে বিবিধ ইচ্ছা; সে নিয়তির অধীন"—তখন একটু আশ্চর্য না হ'য়ে পারি নি। কারণ এ-কথা সত্য ব'লে মেনে নিতে হ'লে মানুষের আত্মিক সাধনার দুর্বার প্রেরণাকেও ধ'রে নিতে হয় এক বাইরের চাপে গ'ড়ে-ওঠা প্রণোদনা ওরফে অদৃষ্টবাদ। The old old story— হাজার হাজার চিন্তাশীল মানুষই পড়েছেন এই দুরন্ত অসহায় "বাদ"-টির কবলে। যুক্তির দিক দিয়ে এ-বাদটিকে কাবু করা যায় না। কারণ যা ঘটছে তা না ঘ'টেই পারত না একথা যদি কেউ বলে তাহ'লে সে না-ঘটাকে উল্‌টিয়ে (reverse ক'রে) সে-অবস্থায় আনা যায় না সে-অবস্থা ছিল ঘটনাটি ঘটবার আগে। গেলে মানুষের ইচ্ছার মোড় ফিরিয়ে পুরুষকারের সত্যতা প্রমাণ করা যেত যা ঘটেছে তার ভোল বদ্‌লে দিয়ে, নয়-কে হয় ও হয়কে নয় ক'রে।

একথাও বলা যায় সমান যুক্তির ঝোঁকে যে, মানুষের ইচ্ছা বা শক্তি সীমাবদ্ধ বলার মানে এ নয় যে এ-সীমার মধ্যেও তার স্বাধীন ইচ্ছা ব'লে কিছু থাকতে পারে না। উদাহরণতঃ, কোনো অদৃষ্টবাদী যদি ভবিষ্যদ্বাদী আমাকে সরোষে বলেন: "এই মুহূর্তে তোমাকে নাক খৎ দিতেই হবে" তাহ'লে আমি নাক উঁচু ক'রে তাঁকে দুয়ো দিয়ে প্রমাণ করতে পারি যে

এখানে কোনো নিয়তিরই সাধ্য নেই আমাকে নাক খৎ দেওয়ায়।” কিন্তু তার উত্তরেও অদৃষ্টবাদী বলতে পারেন (এবং সত্যিই ব'লে থাকেন) যে আমাকে নাক খৎ দিতে হবে এ-চ্যালেঞ্জ তথা সে চ্যালেঞ্জকে দাবিয়ে নাক উঁচু ক'রে প্রস্থানও ঐ অদৃষ্ট নিয়তিই লিখেছিলেন আমার ললাট-লিপি, তাহ'লে তাঁকেও অপ্রমাণ করা যায় না। কাজেই এ-দাঁড়ায় না-হার না-জিৎ তর্ক।

কিন্তু এ হ'ল খতিয়ে ন্যায়ের তর্ক—তৈলাধর পাত্র না পাত্রাধার তৈল—তর্কেরই সগোত্র। কেন না মুখে যতই বলি না কেন আমরা মনে মনে কেউই বিশ্বাস করি না যে আমার ইচ্ছার বিন্দুমাত্রও স্বাধীনতাই নেই, প্রতি ইচ্ছাই এক অলক্ষ্য সাপুড়ের অশ্রুত বাঁশির স্পন্দনে ফণা মেলছে বা মাথা নোয়াচ্ছে। আমার কাছে বেশি ভালো লাগে ভাবতে মহাজনদের কথা—যাঁদের ইচ্ছার বলিষ্ঠতা আমাকে মুগ্ধ করে—যাঁরা থেকে থেকে দেখা দিয়ে তাঁদের বিরাট্ প্রতিভা ও অগাধ মহত্ত্বের আলোয় আমাদের পথ চলার পাথেয় দেন, আঁধারে আলো ধরেন, তামসিক বিষাদে আমাদের সুপ্ত আত্মশক্তি জাগিয়ে তুলে উধাও করেন ধ্রুব স্বল্প ছেড়ে অধ্রুব অনল্পের দুরভিসারে।

এমনি একটি মহাপুরুষের কথা সম্প্রতি পড়ছিলাম মুগ্ধ হ'য়ে। তিনি দিনকয়েক হ'ল নব্বই বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন সুদূর আফ্রিকায় ল্যাম্বারেনে গ্রামে নিগ্রোদের মধ্যে যেখানে তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত হাসপাতাল গড়েছিলেন একক চেষ্টায়। তিনি পঞ্চাশ বৎসর আগে এ-পাণ্ডববর্জিত বিভুঁয়ে যান ডাক্তার হ'য়ে এক অজ্ঞাত বিদেশী জাতির সেবা করতে যাদের কাছ থেকে তিনি কোনো প্রতিদানই চান নি শুধু তাদের সেবা করার অধিকার ছাড়া।

এ-মহাপুরুষ জর্মন আলসেসে জন্মেছিলেন ১৮৭৫ সালে। মানস মনীষা ও শিল্পপ্রতিভা ছিল তাঁর যেন সহজাত কবচকুণ্ডল। শৈশব থেকেই তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি সবারই চোখে পড়েছিল। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি তিনটি বিষয়ে ডক্টর উপাধি পান—দর্শনে, সঙ্গীতে ও ধর্মতত্ত্বে (theology) সবাই আশা করেছিল তিনি অচিরেই দেশের ও দশের একজন হ'য়ে য়ুরোপের প্রতিভাধরদের সংসদে নিজের স্থান ক'রে

নেবেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মন মোড় নিল এক অভাবনীয় দিকে—তিনি স্থির করলেন তারপরে নয়টি বৎসর ধ'রে বিজ্ঞান ও আর্টের চর্চা ক'রে তারপরে ব্রতী হবেন মানুষের সেবায়।

কিন্তু কার সেবা? ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হ'ল যে তাঁকে সেবায় লাগতে হবে সবচেয়ে অনাদৃত যে-জাতি তারই, যাদের সঙ্গে সংস্কৃতিদীপ্ত পাশ্চাত্ত্য জাতি অমানুষিক ব্যবহার ক'রে এসেছে আবহমানকাল—অর্থাৎ নিগ্রো। তিনি বললেন—তিনি করবেন এর প্রায়শ্চিত্ত সবার হ'য়ে—খানিকটা খৃষ্টান vicarious atonement-এর সগোত্র বলব।

মানুষ সবদেশেই নানা আদর্শ গড়ে যুগে যুগে—বিশেষ কৈশোরে ও যৌবনে। কিন্তু সংকল্প ও ব্রতগ্রহণ এক জিনিষ নয়। শ্বাইৎজার সংকল্প করলেন ডাক্তার হবেন নিগ্রোদের জন্যে আফ্রিকায় হাসপাতাল গড়তে। অমনি পাঁচ বৎসর সব ছেড়ে ডাক্তারি পড়া সুরু হ'ল। ডাক্তারি পাশ ক'রে নানা শহরে পিয়ানো বাজিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে তথা চাঁদা আদায় ক'রে গেলেন মধ্য-আফ্রিকায় প্রিয় পরিজন সবারই আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে। (একেও কি বলবেন তাঁর নিয়তি, না পুরুষকারের স্বেচ্ছাব স্বাধীনতাকে খানিকটা মেনে নেবেন—হোক না গভীর অনিচ্ছায়?)

তারপর সেখানে গিয়ে সে কী যুদ্ধ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে! তাঁর স্বরচিত দুটি স্মৃতিচারণ পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'তে হয়: On the edge of the Primeval Forest ও More from the Primeval Forest. নিজে হাতে তাঁকে গ'ড়ে তুলতে হয়েছিল এই বিখ্যাত হাসপাতালটি যার জন্যে তিনি পরে নোবেল প্রাইজ পান। এক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় যে, যাদের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন তাদের সন্দেহ ও বিমুখতাও তাঁকে দমাতে পারে নি। এ-বই দুটি পড়তে পড়তে সত্যিই প্রাণে পুলকশিহরণ জাগে ভাবতে যে, মানুষ পারে পণ নিয়ে দেবতা হ'তে—সব মানবিক লোভ ভয় জয় ক'রে নিষ্কাম কর্মব্রতী হ'তে, আর সে এমন দুর্ভাগাদের সেবায় যারা তাঁকে (অন্তত: প্রথমদিকে বহুদিন ধ'রে) অবিশ্বাস করেই এসেছিল। তিনি হেসে লিখছেন—দ্বিতীয়বার যখন যান ল্যাম্বারীনে তখন এক নিগ্রো বালিকা তাঁর ছায়া মাড়াতেও চাইত না বলত human leopard; কেউ তাকে বোঝাতে গেলে সে মাথা নেড়ে

বলত : "তুমি বললেই হ'ল। কাল আমি স্বচক্ষে দেখলাম বাঘটা অমুককে সন্ধ্যাবেলা নিয়ে গেল তার হাসপাতালে, তখন সে বেঁচে ছিল। তারপরে সকালে তাকে নিয়ে যখন বাঘটা বেরিয়ে এল তখন সে মরে গেছে।"

এহেন পরিবেশে এই মহাত্মাকে কাজ করতে হয়েছে আজ পঞ্চাশ বৎসর। তিনি লিখেছেন প্রথম বইটিতে যে, অনেক বৎসর তাদের মধ্যে থাকার পরে তবে তারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। তখন সে কী তাদের কৃতজ্ঞতা! চোখে জল আসে পড়তে পড়তে! বিশদ বর্ণনা করার স্থানাভাব, তাই অনুরোধ করি বইটি পড়বেন। এমন বই কটা দেখা যায় যা পড়লে মন উন্নত হয়, মানুষে বিশ্বাস আসে? একদিকে আজ খবর পাচ্ছি নিরীহ নর-নারীর বাড়িতে—এমন কি হাসপাতাল গুরুদ্বারা ও গির্জায়ও একদল মনুষ্য নামধারীদের বোমা ফেলা—অন্যদিকে মনে পড়ে এই মহাপুরুষের কথা—যিনি এমন পরিবেশ বেছে নিলেন তাঁর সেবাব্রতের জন্যে যে-পরিবেশে খুব কম মানুষই স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারে। তাঁর বর্ণনা পড়লে দেখতে পাই যে যাদের মধ্যে তিনি গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এখনো (অনেক গ্রামেই) মানুষ মানুষকে খায়। কী? ভাবছেন বাড়িয়ে বলছি? তবে শুনুন মহাত্মা শ্বাইৎজারের নিজের লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি More from the Primaeval Forest-এর প্রথম অধ্যায়েই লিখছেন (অনুবাদই দিলাম এখানে):

"দু আলার মিশনরিরা নানা জেলায় এই নরখাদকরা তাণ্ডব নৃত্য ক'রে থাকে—যাদের উপাধি 'মানুষ বাঘ' (human leopard)। তাদের ভয়ে কেউ সন্ধ্যার পর ঘর ছেড়ে বেরুতে পারে না।

"এরা সত্যিই বিশ্বাস করে—" লিখেছেন শ্বাইৎজার—"যে তারা বাঘ, কাজেই মানুষকে তাদের মারাই চাই। তারা দল বেঁধে উধাও হয় হাতে বাঘের নখ বেঁধে। কোনো পথিক সামনে পড়লে বাঘের ম'তই সব আগে তার ঘাড়ের ধমনী ছিঁড়ে ফেলে (sever the cartoid artery)।

"সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল এই যে এরা সত্যিই অজান্তে বাঘ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো মানুষকে হত্যা করার পরে মানুষের মাথার খুলিতে করে তার রক্ত পান করে। আর যারাই এ-রক্ত পান করতে

বাধ্য হয় তাদেরই জোর ক'রে 'বাঘদের দলে' ভর্তি করা হয়। এমনি আদের প্রতাপ যে যারা রক্তপান করে তারাও বিশ্বাস ক'রে বলে যে তারা আর মানুষ নেই। তারপর তাদেরই কোনো একটি ভাই বা বোনকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়—পরে সকলেই সেই হত্যাকাণ্ডে যোগ দেয় মহোৎসবে।"

ভাবতে পারেন এত দেশ থাকতে সব ছেড়ে তিনি এই অমানুষিক-বর্বরদের দেশে স্বেচ্ছায় গেলেন—শুধু যাওয়া নয়, নিজে হাতে তাদের জন্যে হাসপাতাল গড়লেন একাই? পড়তে পড়তে যেন সত্যিই বিশ্বাস হতে চায় না--য়ুরোপের কোনো মহামনীষী ভেবেচিন্তে খোলা চোখেই ঝাঁপ দিতে পারেন এভাবে এমন অভাবনীয় গহ্বরে যার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না? বিচক্ষণরা বলেছেন "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে"—যে ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পিছনে ধাওয়া করে—তারই নাম মূঢ় আত্মঘাতী। সুবুদ্ধির দিক দিয়ে তাই বটে, কিন্তু এযুগের ইতিহাস যখন লেখা হবে (ধরুণ পঞ্চাশ বৎসর বাদে) তখন এখনকার বিচক্ষণদের কজনের নাম তাতে থাকবে বলা না গেলেও একথা বলা যায় অসংশয়েই যে, সেই-ইতিহাসে আধুনিক য়ুরোপের ছুটি মহাপুরুষের নাম স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকবে: পাদ্রে পিও ও আলবার্ট শ্বাইৎজার। শ্বাইৎজার পূর্বোক্ত বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন যে, থেকে থেকে তাঁর হাসপাতালে দেখা যেত নানা মুমূর্ষুকে তার প্রতিবেশীরা রাত্রে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু ত্রিকুলে যাদের কেউ নেই তাদেরও এ-মহাজন ফেলতেন না। দিতেন ঠাঁই, অক্লান্ত অনুকম্পায় করতেন চিকিৎসা—কখনো কুষ্ঠ রোগীর, কখনো সিফিলিস-রোগীর, কখনো দুষ্ট ক্ষতাক্রান্ত রোগীর—(আরো সে কত রোগ—যথা sleeping sickness, যক্ষ্মা হার্নিয়া পক্ষাঘাত ইত্যাদি)। লিখছেন তিনি:

"My hospital is open to all sufferers. Even if I cannot save them from death, I can at least show them love, and, perhaps, make their end easier. They are welcome, therefore, to come at night and lay such poor creatures at my door."

(অর্থাৎ, আমার হাঁসপাতালে সব আর্তেরই স্থান আছে। তাদের যদি

আমি বাঁচাতে না-ও পারি, অন্ততঃ স্নেহও তো পাবে তারা আমাদের কাছ থেকে—মৃত্যুযন্ত্রণা একটুও তো কমবে তাদের।")

আমাদের নানা দর্শনে মঙ্গল ও অমঙ্গলের নানা ব্যাখ্যা আছে। প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও কিছু সত্য থাকে—বলতেন শ্রীঅরবিন্দ। আমার মন যখন মানুষের দুঃখদৈন্যের কথা ভেবে গভীর দুঃখ পায় তখন আমি একটু সান্ত্বনা পাই ভাবতে যে, নরাধমদের বেশি দেখা মিললেও বিরল মহাজনদের আলোও তো থেকে থেকে এসে ছড়িয়ে পড়ে এ-আর্ত পৃথিবীতে—যার উদ্ভাসে কিছুটাও তো আঁধার কাটে, মন একটুও তো ক্ষতিপূরণ পায় দুরাচারদের অত্যাচারের! এ আমার কথার কথা নয়। বর্তমান যুদ্ধে চান ও পাকিস্তানের বর্বর আচরণের পাশাপাশি এই মহাপুরুষের কথা ভেবে সত্যিই আমার ক্লিষ্ট অশান্ত মন কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিল ব'লেই এ-মহাত্মার নাম করলাম আজ।

মন আমার সবচেয়ে অভিভূত হয় ভাবতে যে, এ-মহামনীষী প্রতিভাধর য়ুরোপে সর্বাদৃত শিল্পী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকের প্রতিষ্ঠা পাবার পরেও চান নি নাম যশ অর্থ দেহসুখ। সত্যিই সময়ে সময়ে তাঁকে নিজে হাতে হাসপাতালের দেয়াল তুলতে হয়েছে, ছাদ ছাইতে হয়েছে পত্রটালি (leaf-file) দিয়ে। একবার তিনি এক নিগ্রোকে বলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তাতে সে বলে "আমি বোঝা বইব! সে কি! আমি যে ইনটেলেকচুয়াল।" শ্বাইৎজার তাকে হেসে বলেন: "ধন্য। তুমি বনতে পেরেছ যা আমি চেষ্টা ক'রেও হ'তে পারিনি।"

এমনই সরল মানুষ ছিলেন তিনি। কখনো কারুর কাছে নিজের জন্যে কিছু চান নি। নোবেল প্রাইজের সবটুকু শুধু হাসপাতালে দেওয়াই নয়, থেকে থেকে ফিরে যেতেন য়ুরোপে নিগ্রোদের জন্যে কন্সার্ট দিয়ে টাকা তুলতে। এক এক সময়ে দারুণ পরিশ্রম করতে হ'ত এজন্যে—বিশেষ বৃদ্ধবয়সে। কিন্তু অসামান্য ছিল তাঁর কর্মশক্তি। তাই লিখেছেন তাঁর একাধিক জীবনীকার—তিনি নিয়মিত দিনে ১৩।১৪ ঘণ্টা খাটতেন। সন্ধ্যায় সময় পেলে তাঁর একমাত্র চিত্তবিনোদনের উপায় ছিল পিয়ানো বাজানো। আর সময় পেলে নানা দার্শনিক বা ধর্মীয় সাঙ্গীতিক বই লেখা, যথা The Philosophy of Civilization, The Quest of

the Historical Jesus, The Mystery of the Kingdom of God, J. S. Bach, Goethe. শেষ জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শনেরও গভীর অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন, লিখেছিলেন একটি চমৎকার বই Indian Thought and its Development. এছাড়া এঁর আরো অনেক বই আছে বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত বহুপঠিত।

এহেন মনীষী কেমন ক'রে এ-দুই সাধনা সমভাবে করে এলেন—দুর্গতদের সেবা ও ধর্মীয় দার্শনিক সাঙ্গীতিক গবেষণা! ভাবতে অবাক লাগে না কি? প্রতিভার বরপুত্রদের মধ্যেও কজন পারে এ-দুরূহ সমন্বয় করতে! বিরল আধার বৈ কি। কতখানি দুর্দম্য উৎসাহ প্রাণশক্তি তথা প্রেমের সম্পদ থাকলে তবে মানুষ পারে এ-অসাধ্য সাধন করতে, বলুন তো? এ-সবই কি নিয়তিনির্দিষ্ট ছককাটার পথে চলা বলবেন—না পুরুষকারেরও কিছু দান আছে এতে?

এ-মহাপুরুষের সম্বন্ধে আরো অনেক লিখবার আছে যা লিখতে শুধু যে ভালো লাগে তাই নয়, মন উন্নত হয় শ্রদ্ধাভক্তির আবেগে। কিন্তু মন আমার এখন উদ্বিগ্ন আছে দেশের অশান্তির কথা ভাবতে। দুদিকে দুই আসুরিক শক্তি খাঁড়া তুলেছে এ-পুণ্যভূমিকে খণ্ড বিখণ্ড করতে। প্রার্থনায় আমি বিশ্বাস করি। তাই প্রার্থনা করি বৈ কি রোজ সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। মাঝ রাতে জেগে উঠেও ডাকি ঠাকুরকে। জানি তিনি এ-পুণ্যভূমিকে তলিয়ে যেতে দেবেন না, তবু ডাকি জানি ব'লে যে, আমাদের মতন সামান্য সাধকের প্রার্থনাও তিনি তাঁর করুণা-পুরাণে টুকে রাখেন, শুধু যে ভক্তকেই রক্ষা করেন তাই নয়, পরের জন্যে তার নিঃস্বার্থ প্রার্থনায়ও কান দেন। তাই আজ আর কিছু লিখব না। শুধু বলি যে এ দুরন্ত যুদ্ধের সময়ে বারবারই মনে প্রশ্ন জাগছিল সে কী দুরারোগ্য মোহ যার ফেরে প'ড়ে মানুষ যুগ যুগ ধ'রে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ক'রে চলে—দেখেও দেখে না যে, ইতিহাসে কাড়াকাড়ি ক'রে কোনো জাতিকেই কখনো সত্যি বড় হতে দেখা যায় নি? জাতি বড় হয় কেবল মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে স্বপ্নকে অভীপ্সাকে রূপ দিয়েই। বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে: চালাকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ হয় না; চালাক বস্তুতান্ত্রিকতার অন্তিম ফল

সর্বনাশ। শ্বাইৎজার আমাদের প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণকে এই প্রশ্নটিই করেছিলেন ১৯৬২ সালে:

"Les deux nous avons le souci de l'avenir spirituel de l' humanité. Nous nous rendons compte qu'elle à de la peine à se défaire des pensées matérialistes auxquelles elle s'est adonné et de se décider pour les pensées du vrai et du biens qui sont conformes à notre nature véritable. Il faut qu'un autre esprit vienne animer et guider les hommes. Quand prendront conscience les peuples de notre epoque de la triste situation dans laquelle il se trouvent parce qu'ils restent sur la route du matérialisme au lieu de choisir celle de la spiritualité?·· Cette confiance mutuelle arriverat-elle à temps pour nous préserver de la guerre atomique, le terrible et inimaginable catastrophe, que nous avons a re·douter?

(ভাবার্থ: তোমাকে ও আমাকে মানুষের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়ে দিয়েছে বৈ কি। আমরা উভয়েই জানি অবশ্য যে, যে-বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা এতদিন লালন ক'রে এসেছি তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন—আমাদের আসল স্বভাবের অনুকূল সত্য ও মঙ্গলের চিন্তাকে বরণ করাও সহজ নয়। আমরা কবে সত্যি দেখতে শিখব—ধর্মের পথ ছেড়ে বস্তুতান্ত্রিকতার পথে চলতে গিয়ে আমাদের আজ কী দুরবস্থা হয়েছে?···যে-আণবিক যুদ্ধের কথা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় সে-ভয়াবহ ও অভাবনীয় বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে যদি আমরা অবিলম্বে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে না শিখি?)

এ-মহাত্মার চিঠিটি থেকে এতখানি উদ্ধৃতি দিলাম শুধু আমাদের এ-যুগের নাস্তিকতার মোহের নিদারুণ কর্মফলের কথা বলতেই নয়, ওদেশের একটি মহামনীষীর ভাবধারার খবর দিতেও বটে। শুধু মহামনীষী নয় —য়ুরোপে এ-যুগে তাঁকে অনেকেই "সেণ্ট" উপাধি দিয়েছেন। এ-যুগের বুদ্ধিবাদী সংশয়ী বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ সেণ্ট বা মহাপুরুষের জীবনের অনুকূল নয়। বিশেষ ক'রে তাঁদের জীবন যাঁদের স্বভাবের মূল প্রবণতা ধর্মের দিকে—শুধু জনহিত নয় খৃষ্টপ্রেমপ্রবুদ্ধ বিশ্বপ্রেমের দিকে। অবশ্য

ধর্মপন্থী সাধক সাধিকা ওদেশের নানা মঠে কনভেণ্টে আজও মেলে। কিন্তু ধর্মকে হৃদয়ে বরণ ক'রে তার আলোয় নিজের মানবিকতার সব নিম্নমুখী গতিকেই ঊর্ধ্বমুখী করতে পারা সম্ভব কেবল তাঁদের পক্ষে যাঁরা শ্বাইৎজার বা পাদ্রে পিওর মতন বিরল আধার, ওরফে যাঁরা তাঁদের সাধনায়, একান্তী—একজন নিষ্কাম কর্মযোগে নিজেকে নিয়োগ করেছেন, অন্যজন—পাদ্রে পিও—প্রেমোদ্বুদ্ধ কর্মতথা ভক্তিযোগে। তাই এবার এ-মহাত্মার সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলব। শুনুন।

শ্বাইৎজার ছিলেন জর্মন—আলসাস প্রদেশের। ফরাসী ভাষায়ও তাঁর অসামান্য দখল।

পাদ্রে পিও ইতালিয়ান।* ইতালির দরিদ্র পরিবারে এক অখ্যাত গ্রামে তাঁর জন্ম। আজ তাঁর বয়স আটাত্তর বৎসর। থাকেন এক মঠে পাহাড়ের উপর। মঠের পাশে একটি গির্জা আছে সেখানে রোজ হাজার হাজার নরনারী তাঁর সাধুতার টানে তাঁর কাছে আসে জীবনের গোপনতম কাহিনীও খুলে বলতে যার নাম "কন্‌ফেশন"। বৎসরের পর বৎসর রোজ সকাল সন্ধ্যা তিনি শতাধিক ধর্মার্থীর কনফেশন শুনে আসছেন অর্ধশতাব্দী ধরে। এছাড়া পাশের গির্জায় তিনি ভোর রাতে ভাষণ দেন (Mass)—শুনতে আসে দেশ দেশান্তর থেকে হাজার হাজার ভক্ত ও ভক্তিমতী। তাঁর প্রার্থনায় বহু নরনারীর রোগ সেরেছে, আজও সারে। তাই অজস্র নরনারী তাঁর কাছে আসে। সবারই যে রোগ সারে তা নয়, যাদের রোগ সারবে না তাদের পাদ্রে পিও খোলাখুলি ব'লে দেন যেমন দিতেন আমাদের বিখ্যাত যোগী সাঁইবাবা। + কবে রোগ সারবে, কার সারবে না তিনি জানতে পারেন সেই অন্তর্যামীর নির্দেশে যাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে তিনি দিনের

* পাদ্রে পিওর বহু জীবনী বেরিয়েছে দশবারোটি ভাষায়। আমি পড়েছি মাত্র পাঁচটি জীবনী: Face of Padre Pio—Maria Winovska-র লেখা Padre Pio—Oscar de Liso-র লেখা; Padre Pio—M. G. Carroll এর লেখা; Padre Pio—Rev. Carty-র লেখা; Padre Pio—Nesta de Robeck এর লেখা।

+ সাইবাবার সম্বন্ধে: একটি চমৎকার জীবনী লিখেছেন রমণ মহর্ষির শিষ্য আর্থার অসবোর্ণ The Incredible Sai Baba

পর দিন রুগ্নদের নিরাময় করেন। সব কথা অবশ্য তিনি খুলে বলেন না সবাইকে।—মন্ত্রগুপ্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন কিন্তু যার যেটুকু দরকার তিনি জানিয়ে দেন সোজাসুজিই। দীন দুঃখীর জন্য তাঁর অনুকম্পার অবধি নেই, কিন্তু সেন্টিমেন্টালিটির ধার পাশ দিয়েও তিনি যান না, আর্তের ধনমানপদবী নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা নেই। কেবল তিনি চান লোকে তাঁর কাছে এসে মিথ্যে বলবে না, বা বড়াই করবে না অবান্তর কীর্তিকলাপের। যারা জাঁকালো লোক তাদের তিনি অপদস্থ করেন প্রায়ই মৃদু হেসে। কারুর কাছে তো কিছুই চান না কখনো—কেউ কিছু দিলেও নেন না, তাই তিনি কাউকে রেয়াৎ করবেন কেন বলুন? এক গল্প মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় শুনেছিলাম। এক ফকির মসজিদের সামনে গলিতে পা ছড়িয়ে বসে। একদা আকবর বাদশা মসজিদে নমাজ পড়তে আসছেন তাঁর তাঞ্জামে চ'ড়ে। ফকির পা ছড়িয়ে সামনে বসে। বাদশার দেহরক্ষীরা এসে ধমকায়: "হটো।" ফকিরের তাপ উত্তাপ নেই—সমানে একভাবে বসে পা ছড়িয়ে। বাদশার হুকুম—ফকিরদের অসম্মান করা না হয়। কী করে? রক্ষীরা ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করে ফকিরের বেপরোয়া ঔদাসীন্যের। বাদশার মনে কৌতূহল জাগে। কে এ ফকির—যে আকবর বাদশার নাম শুনেও তটস্থ হয় না? তাঞ্জাম থেকে নেমে এসে মৃদু হেসে বলেন; "ক্যা ফকির সাব? পাঁও পসারে কবসে?" কবে থেকে পা ছড়িয়ে দিয়েছে? ফকির সাহেব হেসে মুটো করা হাত দেখিয়ে বললেন: "হাথ সমেটা জবসে।" (যেদিন থেকে হাত মুঠো করেছি—অর্থাৎ কারুর কাছে হাত পাতি না।) ভাবটা চমৎকার নয়? যে অনপেক্ষ, কারুর কাছে কিছু চায় না, সে রাজাউজীর কার ধার ধারবে? এমন যোগী আমি স্বচক্ষেই দেখেছি সাহেবসুবো রাজপুরুষেরাও যাঁদের কাছে এসে মাথা নোয়াত। এখনো এমন যোগী মেলে ভারতের নানা সাধনপীঠে—যাঁদের দলে ছিলেন সাঁই বাবা মুখহলসা মানুষ—যিনিই আসুন না কেন, স্রেফ ব'লে দিতেন যা বলবার। কারুর মুখে এক মনে আর হ'লে দিতেন ধমকে কেউ মিথ্যা বললে উপদেশ দিতেন সত্য কথা বলতে, কেউ দুরভিসন্ধি নিয়ে এলে করতেন তাকে নাজেহাল। কিন্তু সরল ভক্তিশ্রদ্ধা নিয়ে যারা আসত তাদের

পরে সাঁইবাবার করুণার অন্ত ছিল না। পাদ্রে পিওর সম্বন্ধেও অবিকল ঐ কথা। তাই পাশাপাশি বললাম এ-দুই মহাত্মার কথা।

পাদ্রে পিওর শৈশব কেটেছিল দারিদ্র্যে। বাপ আমেরিকা গিয়ে কিছু টাকা উপায় ক'রে ফিরে এসে ছেলেকে পড়ান কলেজে। সেখানে পাদ্রে পিও ল্যাটিন শিখেছিলেন ধর্মশাস্ত্র পড়তেই। আবাল্য ধর্মপ্রাণ। খেলাধূলায় মন ছিল না। প্রার্থনা ও উপবাসে দিনের পর দিন কাটত। ফলে দেহ দুর্বল হ'য়ে পড়ে। এক মঠে যান, তারা কিছুদিন বাদে ডাক্তার দেখায়। ডাক্তার বলেন: "বেশিদিন বাঁচবে না। ক্ষয়রোগ ধরেছে একে (tubercular)।" তারা ভয় পেয়ে তাঁকে পিতৃগৃহে ফেরৎ পাঠায়।

কিন্তু পাদ্রে পিওর বিশ্বাস ছিল অগাধ। কেবল প্রার্থনা ক'রেই সেরে উঠলেন কোনো ডাক্তারের সাহায্য না নিয়েই। মনের জোর এত বেশি ছিল যে একবার হার্নিয়ার অপারেশন সহ্য করেন ক্লোরোফর্ম বা অ্যানাস্থেটিক বিনা।

সেরে ওঠার পরে ফর্জ্জিয়া শহরের কাছে সান জিওভান্নি রতন্দো গ্রামের দরিদ্র মঠে আশ্রয় নেন। ১৯১৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেখানেই আছেন নিজের একটিমাত্র ছোট কুঠিয়ায় (cell)। এই ৪৭ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও বাইরে কোথাও যান নি। খান অতি সামান্য। ঘুমোন দিনে তিন চার ঘণ্টা। বাকি সময় কাটে তাঁর প্রার্থনায়, গির্জায় ভাষণে (mass) ও দিনের পর দিন হাজার হাজার নরনারীর কনফেশন শ্রবণে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি প্রার্থনায় ও ধ্যানে মগ্ন থাকেন নিজের কক্ষে। ভগবানের দেখা যে তিনি পেয়েছেন তা কাউকে বলেন নি কোনো দিনই, কিন্তু তাঁর ভাষণ থেকেই লোকে বুঝতে পারে। বলে সবাই: "He is not praying, he is a living prayer." তাঁর কয়েকটি প্রার্থনাও আছে অতি চমৎকার: "শাস্ত্রে আমরা ভগবানকে খুঁজি, ধ্যানে আমরা তাঁকে পাই।" "প্রার্থনা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কল—যার চাবিতে ভগবানের হৃদয়-দুয়ার খোলে" ইত্যাদি।

২০. ৯. ১৯১৮ তারিখে পাদ্রে পিওর জীবনে আবির্ভাব হয় খৃষ্টদেবের

দুঃখবরদান—বড় বিচিত্র ভাবে: হঠাৎ যন্ত্রণায় তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—হাত পা ও পিঠের দুদিকে দিব্য ক্ষতচিহ্ন দেখা দেয় ও রক্তস্রাব হ'তে থাকে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। একে খৃষ্টানরা বলেন stigmata—অর্থাৎ খৃষ্টের ক্রুসবিদ্ধ ক্ষতের পুনরাবির্ভাব তাঁর প্রিয় ভক্তদের দেহে। ইংরাজী বিশ্বকোষে (Encyclopaedia Britannica) পাই: খৃষ্টের বরপুত্র সেণ্ট পলের দেহে সব প্রথম এ-দিব্যক্ষত দেখা দেয়। তার পরে সেণ্ট ফান্সিস (যাঁকে অনেকে বলেন দ্বিতীয় খৃষ্ট) এ-পদবী পান ১৪. ৯. ১২২৪ খৃষ্টাব্দে। বহু সাক্ষী আছে এ-অঘটনের। বিশ্বকোষে আছে: "পোপ আলেকসাণ্ডার ও আরো অনেকে এজাহার দিয়েছেন যে, তাঁরা সেণ্ট ফ্রান্সিসের দেহে এ-দিব্যক্ষত দেখেছেন তাঁর মৃত্যুর পরেও।" অতঃপর (বিশ্বকোষে লিখছে) ৩৪১টি দিব্যক্ষত প্রকট হয়েছে—৪১টি ভক্তের দেহে, আর ৩০০টি ভক্তিমতীর দেহে। এঁদের মধ্যে তেরেসা নয়মানের কথা আমি লিখেছি আমার "অঘটনের ঘটা" রমন্যাসের ভূমিকায়। পাদ্রে পিওর কথা প্রথম ইংরাজীতে লিখি একটি পত্রে, সেটি ছাপা হয় গত বৎসর আমার FLUTE CALLS STILL গ্রন্থে। বাংলায় লিখব ভাবছিলাম অনেকদিন থেকে। অবশেষে আজ সময় পেয়ে কলম ধরেছি জেনে-শুনে যে, বহু সংসারী বুদ্ধিবাদীই বিশ্বাস করবেন না। নাই করলেন। সত্যকে অবিশ্বাস করলে ক্ষতি তো সত্যের হয় না, হয় তাঁদেরই যাঁরা সত্যকে অসত্য ভেবে মুখ ফিরিয়ে বসেন। একথা বিশেষ ক'রেই খাটে ধর্মীয় সত্য তথ্য তত্ত্ব ও উপলব্ধি সম্বন্ধে। তবে ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ বহু ধর্মসন্ধানী তথা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সৎকথায় প্রেরণা ও আনন্দ পান। তাঁদের কাছ থেকে বহু পত্র পাই। তাঁদের জন্যেই ধর্মের কাহিনী লেখা—চোরাদের জন্যে তো নয়। তাই বলি সোজাসুজি যা আমি সত্য ব'লে চিনেছি, বিশ্বাস করেছি, এবং লাভ করেছি এ-বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকে। যাঁরা অবিশ্বাস করেন থাকুন না,তাঁদের অবিশ্বাস নিয়ে। "To each his Eden", বলতেন শ্রীঅরবিন্দ।

খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের এক জায়গায় কিছু অমিল আছে। খৃষ্ট এসেছিলেন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তাকে মুক্তি দিতে যার

নাম খৃষ্টান পরিভাষায় vicarious atonement : মহামনীষী শ্বাইৎজারও এ-বাণীতে বিশ্বাস করতেন। কাজেই এ-বাণীকে ঠিক বুঝতে না পারলেও অশ্রদ্ধা করার প্রশ্নই ওঠে না। ভাগবতে ব্যাসদেব বলেছেন : প্রত্যেককে তার ধর্মেই চলতে হবে, কিন্তু অপরের ধর্মকেও শ্রদ্ধা করা চাই—যেখানে আমাদের ধর্মের সঙ্গে মেলে না সেখানেও। নানা আধারের জন্যে নানা ব্যবস্থা, বলতেন না শ্রীরামকৃষ্ণ? ওদের সংস্কার এই ভাবেই গড়ে উঠেছে, তাই খৃষ্টের এক নাম Man of sorrows, মানুষের দুঃখতাপে তাঁর মহান্ হৃদয় ব্যথিয়ে উঠত, তিনি চাইতেন তাদের দুঃখতাপ থেকে মুক্তি দিতে, তাই তাদের ডেকেছিলেন মন্ত্রময় ছন্দে "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest" (এসো তোমরা যারা আর্ত, আমি তোমাদের শান্তি দেব।)

পরের দুঃখের ভার বহন করে তাদের বেদনার বোঝা হাল্কা করা—খৃষ্টধর্মের এ একটি মহাবাণী। আমি আমার জীবনে তাঁর এ-সেবাবাণী থেকে কম প্রেরণা পাই নি। তাই হয়ত খৃষ্টদেবের অপার করুণার কিছু ছিটেফোঁটা পেয়ে থাকব যার আলোয় দেখতে পেয়েছি খৃষ্টধর্মের মহিমার দিকটা। এ-মহিমার গভীরতা ও দীপ্তি কাকে না অনুপ্রাণিত করবে যে মস্তিষ্ক দিয়ে ভাবা ছেড়ে হৃদয় দিয়ে ভাবার দীক্ষা পেয়েছে সাধুসন্তের প্রেমের কাছ থেকে? পাদ্রে পিওর কথা ভাবতে তাইতো আমার মন গলে। পঞ্চাশ বৎসর ধরে এই প্রাত্যাহিক বেদনার আগুনেই বুঝি তাঁর সব খাদও সোনা হ'য়ে গেছে। নৈলে কি তিনি দিনের পর দিন খৃষ্টের দেওয়া এই দিব্যক্ষত হাসিমুখে সহ্য করে আসতে পারতেন আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে? প্রতিদিন হাতে পায়ের ক্ষত থেকে হয় রক্তস্রাব। লিখতে পারেন না একছত্রও। হাত মুঠো করতেও না। কিন্তু কী সৌম্য তাঁর কান্তি, কী করুণাভরা দৃষ্টি! ছবি দেখেই মন মুগ্ধ হয়—সামনে দেখলে না জানি কী হ'ত!

আমাদের হিন্দুধর্মের বাণী এক্ষেত্রে ভিন্ন হ'লেও খৃষ্টধর্মের এই বেদনাশুদ্ধির বাণীর মহিমা আমি উপলব্ধি করি। আমাদের কৃষ্ণও দুঃখের বর দেন বৈকি তাঁর ভক্তকে। ভাগবতে বলেছেন তিনি যে যাকে তিনি অনুগ্রহ করেন তাকে তিনি সর্বস্বান্ত করেন। —"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে

তদ্ধনং শনৈঃ।" কিন্তু তবু তাঁর সত্তা খতিয়ে আনন্দময়ই বলব। দুঃখের আগুনে মানুষ শুদ্ধিলাভ করলেও তার অন্তিম লক্ষ্য আনন্দই বটে। আনন্দই এ-জগতের আদি উৎস, আনন্দই আশ্রয়, আনন্দই লয়স্থান, আনন্দ ব্রহ্মকে জানলে জীবনে আর ভয় থাকে না*—বেদের এ-সনাতন মন্ত্রবাণীতে আনন্দময় পুরুষোত্তমের পূর্ণ সায় আছে। তিনি এসেছিলেন এ-ধরণীতে দুষ্টদমন করতে একথা গৌণভাবে সত্য, তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রূপের মধ্যে দিয়ে প্রেম জাগিয়ে মানুষকে আনন্দের বৈকুণ্ঠে পৌঁছে দিতে। খৃষ্টদেবও আনন্দের কথা বলেছেন কিন্তু বারবারই বলেছেন যে আনন্দ এই মাটির পৃথিবীতে মিলতে পারে না যেখানে পরম ভাগবতের মাথা রাখবারও স্থান নেই+। মানুষের জন্যে খৃষ্টের প্রাণদান এরই খৃষ্টান নাম redemption যার প্রসাদে মানুষ পাপমুক্ত হ'য়ে ঠাঁই পাবে বিশ্বপিতার স্বর্গে—কিন্তু মর্ত্য যে স্বর্গ হতে পারে এ-ভরসা খৃষ্ট কোথাওই জোর ক'রে বলতে ভরসা পাননি। তিনি যে ভুক্তভোগী, দেখেছিলেন যে, মানুষ চায়না দেবতার প্রসাদ, চায় মিথ্যার পুরোহিতকে (false prophet) বরণ করতে। তাঁর একটি গভীর বেদনার দীর্ঘশ্বাস বাইরে ফুটেছে অপূর্ব বেদনার মাধুর্যে—দেবতার দুঃখ মানুষের মূঢ়তায়।—"O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them who are sent unto thee, how often would I have gathered thy children to-gether, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!"

দেবতার করুণাকে প্রত্যাখ্যান করার এই ট্রাজিডিই বাইরের মহানাট্যের উপজীব্য—খৃষ্টের জীবনবাণী: এ-জগত কী না হ'তে পারত

---

* আনন্দাৎ হি এব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ)

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন (ঐ)

+ The foxes have holes, and the birds of the air have their nests, but the Son od man hath not where to lay his head." (New Testament, Matth, 8.20)

যদি সে মনেপ্রাণে চাইত ভাগবতী করুণাকে, যদি সে দেববাণীকে হেনস্থা না ক'রে ভগবানের প্রিয়পুত্র ও সাক্ষাৎ প্রতিভূদের কথায় কান দিত—যাদের নাম সাধু সন্ত মুনি ঋষি দেবকুমার ও অবতার—এই বিষণ্ণ প্রশ্ন বাইরে খৃষ্টের নানা কান্নাই ফুটে উঠেছে মহিমময় হ'য়ে। খৃষ্টের এ-খেদ পড়তে পড়তে আমার বুকের মধ্যে বারবারই অশ্রুসাগর দুলে উঠেছে একথা সত্যিই অত্যুক্তি নয়। তবু আমি না ব'লে পারি না যে, আমার হৃদয় খৃষ্টের ভগবতন্ময় ক্ষমাসুন্দররূপে অভিভূত হ'লেও তাঁর এ-বাণীতে আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না যে এ মর্ত্য লোকে আমরা এসেছি বহু দুঃখ ভোগ ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে দেহান্তের পরে স্বর্গরাজ্যে বিশ্ব-পিতার শান্তিকোলে পৌঁছে তবে কৃতকৃতার্থ হ'তে। উপনিষদের অমৃত-শঙ্খই আমাকে ডাকে, কৃষ্ণের প্রেমের বাঁশি, শ্রীচৈতন্যের হরিনামসুধায় আনন্দ-মুক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের মা-কে পেয়ে "ধোকার টাটি" সংসারকে "মজার কুঠি"-তে রূপান্তরিত করা। শ্রীঅরবিন্দের মানুষের মানবতাকে দিব্য-জীবনের আনন্দে উত্তীর্ণ করার বাণীই আমার মনকে সবচেয়ে বেশি দোলা দেয়।

কিন্তু তা ব'লে আমার হৃদয় যে পাদ্রে পিওর অপার দিব্য করুণার বাণীতেও সাড়া দিতে অক্ষম এমন নয়। আর্ত মানুষের হাজারো কান্নায় তাঁর অক্লান্ত প্রার্থনা ক'রে ভাগবত কৃপার মাধ্যমে তাকে মুক্তি দেওয়ার প্রেরণাকে আমি নমস্কার না ক'রে পারি না। যে যেখান থেকেই আসুক না কেন, পাপী তাপীকে তিনি কখনো ফিরিয়ে দেন না। তাদের পাপ মুক্তি (absolution) দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। বিধাতার বর পেয়েছেন তিনি, তাই তাঁর আশীর্বাদে হাজার পাপী নিষ্পাপ হয়েছে তারা সকৃতজ্ঞেই স্বীকার করেছে। শত শত পঙ্গু রুগ্ন মুমূর্ষ নিরাময় হয়েছে তাঁর যোগ-বিভূতির স্পর্শে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর ভগবৎ-তন্ময় পুণ্য চরিত্রের দৃশ্যে অগুন্তি আর্তের মনেও ভগবানে শ্রদ্ধা বিশ্বাস যেন নতুন ক'রে জেগে উঠেছে, সংশয়ীর মন সংশয়মেঘকে কাটিয়ে বিশ্বাসের আলোকলোকে চিরাশ্রয় পেয়েছে, এমন কি রুক্ষ নাস্তিকদের মধ্যেও অনেকে তাঁর ভগবৎপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে বিষময় নির্দিশা জীবনে দিশা পেয়েছে অমৃত করুণার।

আর কী দীনতা। দুরারোগ্য রোগী তাঁর আশীর্বাদে মুহূর্তে রোগমুক্ত হয়েছে বহুক্ষেত্রেই * কিন্তু তারা তাঁর কাছে এসে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে না দিতে তিনি বলেন—তিনি শুধু প্রার্থনা করেন মাত্র—সারান ঠাকুর, বলেন: "ভগবান তোমাকে করুণা করেছেন—কৃতজ্ঞতা জানাও তাঁকে—আমাকে কেন?"

আপনি জানেন আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবান দরকার হ'লে অঘটন ঘটিয়ে নানা আর্ত বা শরণার্থীকে নিরাময় বা সংকট মুক্ত করেন। না, বিশ্বাস করি বললে কম বলা হবে—আমি চাক্ষুষ করেছি ভগবতী কৃপার নানা অঘটনী শক্তিকে। এসব ধন্য অভিজ্ঞতার কিছু খবর দিয়েছি আমার নানা প্রবন্ধে ও রমন্যাসে। অনেকে বিশ্বাস করেছেন আমার সাক্ষ্য, অনেকে করেন নি। যাঁরা করেন নি তাঁদের সম্বন্ধে আমার কিছুই বলবার নেই শুধু আমার একটি গানের আঁখর ছাড়া: "ওরা জানে না, তাই মানে না, আমি জানি তাই মানি, আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি তাই নাথ আমি জানি।"

না, আরো একটু বলা চলে। সাধু সন্তদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল এক সময়ে। দীনদরিদ্রের মনে এ-শ্রদ্ধা এখনো সমানই দৃঢ়মূল আছে। কিন্তু শিক্ষিত—বিশেষ ক'রে ইনটেলেকচুয়াল নামে যাঁরা পরিচিত হ'তে চান তাঁদের অনেকেই সাধুসন্তের মহিমাকে স্বীকার করাটা অন্ধবিশ্বাস বর্গীয় সেকেলে কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু এঁরা যদি একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে নানা খাঁটি সাধু সন্তের জীবনী ও অভিজ্ঞতার এজাহার পড়তেন তাহ'লে তাঁদের বুদ্ধিদৃপ্ত অবিশ্বাসের বদ্ধ হাওয়ায় অশান্তি সম্বল হ'য়ে কাল কাটাতে হ'ত না। জীবনের মহত্তম লক্ষ্য যে ভগবানকে পাওয়া এ-সত্যটি দেখতে পেয়ে সেই লক্ষ্যমুখে চলবার কিছু পাথেয় অন্ততঃ পেতেন প্রণামের আবাহনে।

---

*তাঁর সব কয়টি জীবনীতেই বহু সাক্ষ্য আছে ডাক্তার তথা নানা পরীক্ষকের যে তিনি শিবের অসাধ্য ব্যাধিও শুধু প্রার্থনা ক'রে সারিয়েছেন যেন অলৌকিক জাদু-বলে, যথা: ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, আর্থরাইটিস, মেনিনজাইটিস, প্লুরিসি, যক্ষ্মা, নানা ক্ষয়রোগ, রক্ত বিষিয়ে ওঠা, ম্যালেরিয়া, মৃগী, বিস্ফোটক, জরায়ুর নানা ব্যাধি, বধিরতা, অন্ধতা…কত বলব? কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি শেষের দিকে।

পাদ্রে পিও সার্বকালিক মহাপুরুষদের মতনই দিয়েছেন এই সার্বভৌম প্রণামের, বিনতির দীক্ষা, যে-দীক্ষা বিনা আঁধার মনে আলো নামে না, নামতে পারে না। যাকে বুদ্ধির বা জ্ঞানের অভিমান একবার পেয়ে বসেছে সে জানার ম'ত কিছু জানতে পারে না—শুধু শূন্যবাদের নিরালোক গোলোক ধাঁধায় ঘুরে মরে অন্তহীন লক্ষ্যহীন পার্থিব কর্মের ভ্রান্তিবিলাসে। অথচ এই সব কর্মই তাদের হ'য়ে উঠতে পারত সার্থক (ওরফে যুক্ত) কর্ম যদি ভগবানকে হৃদয়ে বরণ ক'রে তাঁর কর্ম ভেবে নিষ্কাম কর্মযোগে দীক্ষা নেওয়া হ'ত। কিন্তু এ-দীক্ষার মূল ভিত্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস বিনতি—বুদ্ধির মতামত নয়।

বলা বাহুল্য, পাদ্রে পিওর দীপ্ত পরার্থব্রতেরও আদিম প্রেরণা এই বিশ্বাস, যার বনেদের 'পরে তিনি গ'ড়ে তুলেছেন তাঁর প্রার্থনালব্ধ ধ্যান-সুন্দর প্রেমের সৌধ। তাই তো তাঁর মুখে ফুটে উঠল এমন অপূর্ব বাণী: "ঠাকুর! তুমি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছ যে আমাদের সাথী বন্ধুদের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে পারার নামই প্রেম। প্রেমের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হ'তে পারে?" অপিচ: "ঠাকুর! কত শত আর্ত যে আমার কাছে আসে যাদের দুঃখতাপের কিছু উপশমও হয় আমার প্রার্থনায়—তোমার এ-করুণার জন্যে আমি তোমাকে কী ক'রে জানাব আমার কৃতজ্ঞতা?"

ভগবানের কাছ থেকে সাধুদের এই করুণার আশীর্বাদের কথাই বলেছেন ঠাকুর গীতায় (৫·২৫):

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
নিষ্পাপ ঋষিরা—যাঁরা সংশয়ের পাশ ছিন্ন করি'
ব্রহ্মপদলাভে হন জীবন্মুক্ত একান্ত সাধনে—
ধন্যজন্মা হন তাঁর সর্বজীব সেবাব্রত বরি'।

কিন্তু হ'লে হবে কি, এই সেবা করবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। শ্রেষ্ঠ জীবসেবা করতে হ'লে সব আগে চাই জ্ঞান, নৈপুণ্য ও অতন্দ্র চিত্তশুদ্ধির সাধনা। কেননা শুধু সাধনার ফলেই আসে সেবার শক্তি, আর জ্ঞানই কেবল পথ দেখাতে পারে—কী ভাবে সেবা যথার্থ নিষ্কামব্রত হ'য়ে ওঠে।

বহুক্ষেত্রেই ঠাকুর তাঁর প্রিয় সাধকদের জীবন্মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে থাকেন যোগবিভূতি যার মাধ্যমে তাঁরা মানুষের নানা আধিব্যাধি দূর করতে সক্ষম হন। পরমহংসদেব এই অধিকার লাভ করাকেই বলতেন 'চাপরাশ ওরফে ভগবানের আদেশ পাওয়া। সাধুসন্তের জনসেবার ভিত্তি এই আদেশ, পথের পাথেয়—সাধনলব্ধ জ্ঞানের নির্দেশ। এ-নির্দেশ পেলে তবেই তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন তাঁদের যোগবিভূতি।

এ-সেবার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা নিশ্চয়ই মানুষকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেওয়া—যতটা পারা যায়। এ-মহৎ সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারেন কেবল অবতারকল্প বা লোকোত্তর মহাপুরুষেরা। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য সেবাও যথার্থ জনসেবা হ'তে পারে যদি সেবা নিষ্কাম হয় ও সাধু নির্দেশ পান আরাধ্যের কাছ থেকে এ-সেবার। বহু সাধুসন্তই নানা রোগীকে নিরাময় করেছেন যাতে ক'রে তারা রোগমুক্ত হ'য়ে ভগবানের দিকে চলতে পেরেছে। যেখানে তাঁরা দেখেন সে সম্ভাবনা নেই সেখানে তাঁরা জবাব দেন খোলাখুলিই। কিন্তু যেখানে দেখেন এ-সম্ভাবনা আছে সেখানে তাঁরা যে ভগবানের কৃপায় যোগলব্ধ শক্তিবলে তাদের রোগমুক্ত করতে পারেন এর বহু প্রমাণ আছে নানা সাধুর জীবনীতে। এ-যুগেও রোগমুক্তি দিয়েছেন নানা সাধু—যাদের মধ্যে সির্দির সাঁইবাবা ও পাদ্রে পিওর নাম বিশেষ ক'রেই উল্লেখযোগ্য। সাঁইবাবার যোগবিভূতির খবর পাবেন যদি আর্থার অসবোর্নের The Incredible Sai Baba বইটি পড়েন। এখানে আমি কেবল পাদ্রে পিওর যোগবিভূতির কিছু খবর দেব সংক্ষেপে।

তাঁর বহু রোগীকে নিরাময় করার দৃষ্টান্তই আশ্চর্য ও অলৌকিক। দুএকটির কথা বলি।

(১) ১৯৪৭ সালে সিসিলিতে জেম্মা ব'লে একটি মেয়ের দেখা যায় চোখের তারা নেই। জন্মান্ধ। ডাক্তারেরা জবাব দেয়, বলাই বাহুল্য। মেয়েটির ঠাকুরমা ডাক্তারের রায় নামঞ্জুর ক'রে নাৎনিকে নিয়ে গেলেন সোজা পাদ্রে পিওর কাছে জিওভান্নি দি রোতোন্দোয়। গির্জায় তাঁর ধর্মভাষণ শুনবার পরে ঠাকুরমা অন্ধ বালিকাকে নিয়ে বেদীর কাছে গিয়ে পৌঁছতেই পাদ্রে পিও তার দুচোখে হাত বুলোন। অমনি জেম্মা চেঁচিয়ে

উঠল আমি দেখতে পাচ্ছি। শুনে ডাক্তারেরা সবাই হতভম্ব। চোখের তারা অনুপস্থিত তবু জন্মান্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল কী ক'রে? এর ছবিও ছাপিয়েছেন রেভারেণ্ড কার্টি—বিশেষ ক'রে চোখের ফটোগ্রাফ।*

(২) ভেন্ত্রেল্লা দুটি সন্তানের মা। হার্ট-এর ব্যাধি। হার্ট স'রে গেছে কী ক'রে কেউ জানে না। কেবল বমন। মৃত্যু আসন্ন। পুত্র দুটিকে ডাকা হ'ল—মার মৃত্যুশয্যায়। রাত সাড়ে এগারটায় ছোট ছেলে যে মার শিয়রে জেগে ছিল হঠাৎ দেখল যে বিছানার ওদিকে পাদ্রে পিও তার মাকে আশীর্বাদ করছে। পরদিন ভেন্ত্রেল্লা সম্পূর্ণ সেরে উঠল ও কয়েকদিনের মধ্যেই চলাফেরা সুরু করল।+

(৩) অস্কার লিসো তাঁর জীবনীতে এক অবিশ্বাসী ডাক্তারের কাহিনী লিখেছেন ফলিয়ে ৯১—৯৪ পৃষ্ঠায়। আমি এখানে তার চুম্বকটুকু পেশ করছি।

ডাক্তার রিচ্চিয়ার্দি (Dr. Ricciardi) মনেপ্রাণে অবিশ্বাসী। কথায় কথায় ধর্ম, গির্জা, সাধুসন্তদের বিদ্রূপ করেন। বড় অহঙ্কার—তিনি বৈজ্ঞানিক-পন্থী ব'লে। বলেন: "Monks are smart and full of tricks" (সাধুরা নানা চতুর বুজরুকি জানে)

একদিন সকালে উঠে ডাক্তার দেখেন তিনি উঠতে পারছেন না। দুজন ডাক্তার বন্ধু—ডাক্তার মের্লা ও ডাক্তার যুভা—দেখে বললেন মস্তিষ্কে ফোড়া (brain tumour), কোনো আশাই নেই। ডাক্তার রিচ্চিয়ার্দি নিজে বিখ্যাত অধ্যাপক লম্ব্রোজোর শিষ্য, জানতেন যে, এ-

---

* এ-দৃষ্টান্তটি পাদ্রে পিও-র পাঁচটি জীবনীতেই আছে। এটি বিশদ ক'রে লিখেছেন M. G. Carroll সাহেব ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায়। শেষে তিনি মাদাম বিরের কথাও লিখেছেন—যিনি দুটি সন্তানের মৃত্যুর পর অন্ধ হয়েছিলেন ১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। তিনি লুর্দ-এ যান আগষ্ট মাসে ও ভার্জিন মেরির গুহার কাছে গিয়ে Holy Communion প্রসাদ পেতে না পেতে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। লুর্দ-এর কথা লিখেছি অন্যত্র—(করুণা অলৌকিকী নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)

+Rev Carty-র বইটি দ্রষ্টব্য—CURES-অধ্যায়, ১১৫ পৃষ্ঠা। এ-অধ্যায়ে তিনি শতাধিক অলৌকিক আরোগ্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

ফোড়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তিনি আগে থাকতেই বললেন; খবর্দার! পাদ্রে পিওকে যেন না ডাকা হয়।

(গ্রন্থকার পাদ্রে পিওর সূক্ষ্মদেহে গতিবিধির একটি প্রমাণ দিয়েছেন Father Orion-এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে।)

পাদ্রে পিওর অভ্যুদয় হ'ল মুমূর্ষুর শয়নকক্ষে। পাদ্রে পিও ল্যাটিনে জিজ্ঞাসা করলেন: "দৈব তেল নেবে কি আমার কাছ থেকে?" ডাক্তার পাদ্রে পিওর হাত চেপে ধরলেন সকৃতজ্ঞে, পাদ্রে পিওর দিব্যক্ষতের কথা ভুলে। পাদ্রে পিও অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠলেন ব্যথায়। ডাক্তার বললেন: "আমি নিতে রাজী।" পাদ্রে পিও বললেন মুমূর্ষুর পরিজনদের সামনে: "তোমার অন্তরাত্মার সুমতি হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার দেহও নিরাময় হবে।"

ডাক্তার ক্রিসমাস mass-ভাষণে গির্জায় গেলেন সেরে উঠে।—কেন? পূজা দিতে। অবিশ্বাসী নাস্তিক বৈজ্ঞানিক পুনর্মূষিক হ'য়ে ধার্মিক বদনাম কিনলেন।

মহীয়সী পুণ্যবতী সেণ্ট তেরেসা (আভিলার) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন খৃষ্টের কাছে প্রার্থনা ক'রে তিনি বারবারই কি ভাবে নানা মুমূর্ষুকে নিরাময় করতেন। সেণ্ট তেরেসা নয়মানের জীবনীতেও তাঁর এই অলৌকিকী শক্তির কথা লিখেছেন তাঁর নানা জীবনীকার। বুদ্ধিবাদীরা গায়ের জোরে অবিশ্বাস করলে হবে কী? এ যে অকাট্য সত্য যে প্রার্থনায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনা যায়। আমার নিজেরও তিনবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু সে অন্য কথা। পাদ্রে পিওর কথায় ফিরে আসি।

পাদ্রে পিওর আরও নানা যোগ বিভূতির কথা আছে তাঁর প্রতি জীবনীতেই। আমি বাহুল্যভয়ে কেবল একটির কথা বলব। রেভারেণ্ড কার্টি লিখেছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে একটি মেয়ে একদা পাদ্রের কাছে এসে প্রার্থনা করল তার স্বামীর জন্যে—যে সম্প্রতি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। পাদ্রে পিও বললেন: তাকে অন্ধ হয়েই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—তার পিতাকে মারার জন্যে। স্ত্রী বিশ্বাস করতে না পেরে ফিরে এসে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল। স্বামী প্রথমে অস্বীকার ক'রে

শেষে কবুল করলেন যে, তিনি একবার পিতৃনিগ্রহ করেছিলেন লোহার ডাণ্ডা মেরে।

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন একবার যে যোগেশ্বর যোগীদের নানা যোগবিভূতি দেন তাদের মাধ্যমে মানুষের সেবা সম্ভবপর হয় ব'লেই। তবে এজন্য সব আগে চাই যোগীর চরিত্র শুদ্ধি—অর্থাৎ আধারের শোধন। যারা লোককে চমকে দিতে যোগবিভূতির প্রয়োগ করে তারা বিপথে পা দিয়ে একুল-ওকুল দুকুলই হারায়। কিন্তু মহাযোগীরা যোগবিভূতির প্রয়োগ করেন যথাস্থানে—যেভাবে ভগবান চান সেই পথে, এ-শক্তি প্রয়োগে লোককে মুগ্ধ করতে বা নাম কিনতে নয়। তিনি নিজে যে তাঁর যোগ শক্তিতে অনেক রোগীর দুরারোগ্য রোগ্য সারাতেন একথা অনেকেই জানেন। আমি নিজে তাঁর এ-শক্তি কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছি সে বিবরণ অন্যত্র লিখেছি।*

কিন্তু এ-সব যোগবিভূতি আশ্চর্য ও সত্য হ'লেও পাদ্রে পিওকে আমি মহাপুরুষ বলে ভক্তি করি কোনো অলৌকিক শক্তির জন্যে নয়। আমার মনে হয়, মানুষ সবচেয়ে মহনীয় হয় নিঃস্বার্থ মানবপ্রীতি, শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি ও স্থায়ী পরার্থনিষ্ঠার সমন্বয়ে। এই নিরিখে পাদ্রে পিও ও আলবার্ট শ্বাইৎজারকে এযুগের য়ুরোপের দুটি লোকোত্তর মহামানব উপাধি দেওয়া চলে। আমার মন আরো সানন্দ বিস্ময়ে তাঁদের অভিনন্দন করে তাঁদের দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে। শ্বাইৎজারকে তাঁর আফ্রিকার হাসপাতালের জন্যে, পাদ্রে পিওকে তাঁর ইতালীর গ্রামে Casa Sollievo della sofferaza-র (আর্তের আরোগ্যালয়) জন্যে।

কিভাবে তিনি এ প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করেন সে আর এক অলৌকিক কাহিনী। শুনুনই না।

পাদ্রে পিও রোগক্লিষ্ট মানুষের যন্ত্রণায় অত্যন্ত দুঃখবোধ করতেন ব'লেই বহু রোগীর জন্যে শুধু-যে প্রার্থনা করতেন তাই নয়—বহু আর্তের চিঠি পেয়েও তাদের আশীর্বাদ পাঠাতেন। তাঁর জীবনীতে পাই তিনি গড়পড়তা দিনে সাত আটশো চিঠি পান, পঞ্চাশ থেকে আশিটা টেলিগ্রাম। তিনি

* Sri Aurobindo Came To Me দ্রষ্টব্য Messenger of the Incommunicable অধ্যায়।

বহুদিন (১৯২৪ এর পর থেকে) নিজে হাতে চিঠি লেখেন না। কয়েকজন সতীর্থ তাঁর চিঠিপত্র পড়েন, তাঁর নির্দেশে উত্তর দেন। কিছুদিন আগে আমাব এক বন্ধু তাঁকে লেখে তাঁর পিতার পক্ষাঘাত হয়েছে। উত্তরে পাদ্রে পিওর চিঠি আসে: "আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করব বৈ কি, তিনিও যেন করেন।"

১৯৪৬ সালে পাদ্রে পিও বলেন যে, তাঁদের গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

অসম্ভব কল্পনা! গত যুদ্ধে জর্মনির পরাজয়ের পরে ইতালীর সে কী দুরবস্থা! দেশব্যাপী নিরাশা, দৈন্য, হাহাকার। কিন্তু পাদ্রে পিও পেয়েছেন ঠাকুরের আদেশ, ধরলেন এ করতেই হবে, এবং হাসপাতালও গ'ড়ে উঠবেই উঠবে। তাঁর কাছে একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তিনি বললেন: "এই প্রথম চাঁদা নাও—আমার।"

ঠাকুরের কৃপা অলৌকিকী—আমি লিখেছি অন্যত্র। অঘটন ঘটল ফের। অপ্রত্যাশিত ভাবে চাঁদা আসতে লাগল পাদ্রে পিওর কাছে। তাঁর নাম আমেরিকায়ও পৌঁছেছিল, সেখান থেকেও এল বহু লক্ষ ডলার। দশবৎসরে বিরাট হাসপাতাল গড়ে উঠল (রেভারেণ্ড কার্টি এ-সুন্দর হাসপাতালটিরও ছবি দিয়েছেন)। The Fiorello La Guardia Clinica-র উদ্বোধন হ'ল ৫. ৫. ১৯৫৬ তারিখে। সব শুদ্ধ খরচ হ'ল পঞ্চাশ লক্ষ ডলার—দেশ দেশান্তর থেকে এল পনের হাজার তীর্থযাত্রী—ভক্ত ভক্তিমতী ধর্মার্থী কৌতূহলী। পাদ্রে পিও ভাষণ দিলেন প্রথমে স্বেচ্ছাবাহিনী ধাত্রীদের (ডাক্তারদেরও): "তোমাদের কাজ রোগীর পরিচর্যা। কিন্তু তোমরা মনে রেখো যে, এ-সেবা করতে হবে প্রেমের সঙ্গে। ডাক্তারেরা কিছু সর্বজ্ঞ নয়। ১৯১৬-১৭ সালে আমার যখন খুব অসুখ তখন ডাক্তারেরা আমাকে বলে—বড় জোর আর একটি বৎসর বাঁচব।...তাই বলি ভগবান্‌কে ডাক দিতে হবে রোগীদের রোগশয্যার পাশে। সে-আবাহনের শক্তি সব দাওয়াইকেই ছাড়িয়ে যায়।"

কিন্তু পাদ্রে পিও প্রায়ই বলেন যে, ডাক্তারি শাস্ত্রেও তিনি বিশ্বাস করেন, কারণ ডাক্তারদের বটিকা বা ছুরির পিছনেও ভগবানের করুণা আসীন। তীর্থযাত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে: "তবে তুমি কী করবে এ-হাসপাতালে?" উত্তরে পাদ্রে পিও বলেন: "আমি আছি রোগীদের

প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে। শোনো। আমি জানি—তোমরা খুঁজছ দুটি জিনিষঃ সুখ ও সত্য ওরফে ভগবান্। প্রথমটি পাওয়া অসম্ভব, কারণ এ-পৃথিবী হ'ল আসলে অশ্রু-উপত্যকা (valley of tears) যেখানে প্রতি যাত্রীকেই বইতে হয় বেদনার বোঝা। তাই পার্থিব সুখ হ'ল মরীচিকা। তবে দ্বিতীয়টি—অর্থাৎ ভগবান্—তোমরা পেতে পারো যদি চাও, কিন্তু আজকের দিনে তোমরা যে-পথে চলেছ সে-পথে চললে তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ এ-পথ হ'ল মিথ্যার পথ, অহঙ্কারের পথ। বিজ্ঞান পারে না তাঁর খবর দিতে। উচ্চতম বিজ্ঞানও তাঁর বিরাট্ মহিমার পাশে বামন—তুচ্ছ। তোমরা যদি ভগবানকে চাও তবে কাম ক্রোধ থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে, আর হ'তে হবে দীন—ধূলিলীন হ'য়ে করতে হবে প্রার্থনা (Drop passions from your heart, humble yourself in the dust and pray)। এ-ধর্মদীক্ষা যদি তোমরা গ্রহণ করো তবেই তাঁকে পাবে আর সেই সঙ্গে পাবে এ-জীবনে অচলা শান্তি ও পরপারে শাশ্বত আনন্দ।"

খৃষ্টধর্মের সেই চিরন্তনী বাণীঃ এ-জগত পান্থশালা, এখানেও সুখের আশা বিড়ম্বনা, জীবনে আশা কুহকিনী মরীচিকা, ভোগ ভ্রান্তিবিলাস জাঁকজমক সবই মায়ার ছায়ানৃত্যঃ

"Vanity, vanity all is vanity!" In the midst of life we are in death!" "Whited sepulchres which, indeed, appear beautiful outward, but within are full of dead men's bones..."

কিন্তু এ-দুঃখবাদ প্রতি ধর্মেই আছে, সব দেশেই জীবনের অন্তহীন দুঃখ নিয়ে হাহুতাশ করেছেন নানা যোগী ঋষি কবি দার্শনিক ভাবুক তত্ত্বজ্ঞ। নানা মুনিই সমাধান খুঁজেছেন জগৎকে মায়া বলে অস্বীকার ক'রে। কিন্তু খতিয়ে সবাইকেই দুর্দিনে যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে হয়েছে—মহাপুরুষদের দেহও সেই দুরন্ত ব্যাধিতে অবসন্ন হয়েছে বৈ কি। এ-চিরন্তন দুঃখ বেদনার তাৎপর্য কি? সুখকে আরো উজ্জ্বল ক'রে ধরতে? দ্বৈতবাদ? বিরহ বিনা মিলনের মহিমা কে জানত? অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য বুঝতাম কি আমরা···ইত্যাদি? এসব সান্ত্বনাই আমরা বহুবার শুনেছি। কিন্তু তবু দুঃখ যে সাড়ে পনের আনা মানুষকে আশ্বাস দিতে পারে না একথা বলা চলে!

উত্তর যদি খুঁজতে হয় যেতে হবে ঐ মহাজনদেরই কাছে—যাঁরা দুঃখ-নিবৃত্তি খুঁজেছেন পরার্থনিষ্ঠায়—অপরের দুঃখের ভার বহন ক'রে। এককথায়—প্রেমেই কেবল যা একটু শান্তি মেলে, অবুঝ মন মাথা নিচু ক'রে যখন দেখে—মহাপুরুষেরা পরের জন্যে হাসিমুখেই দুঃখ সয়েছেন, কখনো বলেন নি—আমার বা আমার সাঙ্গোপাঙ্গদের সুখ হ'লেই হ'ল। যোগি কবি জর্জ রাসেলের ভাষায় :

When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of life
For its tenderness.

হৃদয় দেবতা যখন জাগে,
থাকে না সে আর স্বল্পসুখী,
গাঢ় কোমলতা-আকিঞ্চনে
হয় প্রাণ তার বিশ্বমুখী।

পাদ্রে পিওকে আজ পঞ্চাশ বৎসর প্রাত্যহিক দেহদুঃখ সইতে হয়েছে চির-উন্মুক্ত ক্ষত থেকে রক্তস্রাবে। তিনি মহাপুরুষ পদবী পেয়েছেনও এই দুঃখেরই বরে। তাই তিনি হাজার হাজার দীন দুঃখী নিঃস্ব আর্তের কানে দিতে পেরেছেন খৃষ্টের প্রেমের মন্ত্রদীক্ষা : যে, পরের দুঃখ দূর করার মধ্যে দিয়েই মানুষ পৌঁছবে তাঁর চরণে, প্রেমের আলোই পথ দেখাবে দুঃখের কাঁটাবনে। শ্বাইৎজার এই দর্শনকে বলেন ধর্মের world-affirmation—কি না জীবনকে অঙ্গীকার করার দিক। পাদ্রে পিও আরো মধুর ধর্মীয় (মিসটিক) ভাষায় বলেন :

"The life of a Christian is nothing but a perpetual struggle against self ; there is no flowering of the soul to the beauty of its perfection except at the price of pain.

অর্থাৎ

ঈশার পূজারী তার যাপিবে জীবন নিরন্তর
স্বার্থ অহামিকা সাথে-সংগ্রামে। যে-সর্বাঙ্গসুন্দর
বিকাশ প্রাণের লক্ষ্য, মঞ্জরিতে পারে না তো তার
পানে হৃদি—না বরিয়া রক্তরাঙা ব্যথা-অভিসার। ইতি—

প্রীতিবদ্ধ দিলীপ

মহানুভব রোমাঁ রোলাঁ

ইংরাজীতে "গ্রেট ম্যান" ব'লে একটি উপাধি প্রায়ই মুখে মুখে বাটে। অমুক তমুককে ঘড়ি ঘড়ি এই তখমা দেওয়া হয়। বাংলায় এ-উপাধিব ঠিক তর্জমা আছে কি? সন্দেহ। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" বলেছে মহাভারতে। এখানে মহাজন মানে মহাভাগ বা মহাত্মা—গ্রেট ম্যান বলতে যা বোঝায় তা নয়। আইনস্টাইন বা বার্নার্ড শ নিশ্চয়ই গ্রেট ম্যান, কিন্তু মহাজন মহাপুরুষ বা মহাত্মা (সেন্ট) নন। আমি ভেবেচিন্তে "মহানুভব" উপাধিটিই গ্রেট ম্যান-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চালু ক'রতে চাই। এই ব্যঞ্জনায় রোলাঁ নিশ্চয়ই মহানুভব, ওরফে গ্রেট ম্যান।

আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর জাঁ ক্রিস্তফ (John Christopher ইংরাজীতে) প'ড়ে সেই রোমাঞ্চন—১৯২০ সালে। তখন আমি কেম্ব্রিজে। তাঁর নানা লেখাই আমার ডায়রিতে টুকে রাখতাম। জাঁ ক্রিস্তফের এক স্থলে তিনি লিখেছিলেন "আর্ট ফর আর্টস্ সেক! ওরে দুর্ভাগার দল! আর্ট হ'ল জীবনের সম্রাট্—জীবনকে জয় করলে তবেই আর্ট সুপ্রতিষ্ঠ হয়। কী করাছস তোরা বল্ তো? নিজেদের যত কুব্জতা, রুগ্নতা, ভীরু নিরুদ্যমতা, বিলাসলুব্ধতা, ইন্দ্রিয়বশ্যতা, মিথ্যা মানবতা এই সব নিয়েই তোরা বেসাতি করিস, ছি ছি!" প'ড়ে কী যে আনন্দ হয়েছিল কী বলব? ঝোঁকের মাথায় তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে ফেললাম—অবশ্য ইংরাজীতেই। ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই ইংরাজীতে লিখবেন। কিন্তু ওমা! তিনি লিখলেন ফরাসীতে যে, তিনি শূনেক ব'লে একটা সুইস গ্রামে আছেন, আমি গেলে সানন্দে দেখা করবেন। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটিতে রওনা হলাম সোজা সুইজর্লণ্ড। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটি পত্রে পরে লিখেছিলেন: ঝোঁকালো মনের বালাই বিস্তর। আমি শূনেকে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম: ওমা! রোলাঁ ইংরাজী জানেন না, আমিও ফরাসী জানি না। তবে যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন—বলতেন পরমহংসদেব, তাই তো শেষ রক্ষা হল তাঁর বোন

বিদুষী মাদলিনের কৃপায়। তিনি চমৎকার ইংরাজী জানতেন। (পরে আমার একটি রাগসঙ্গীতভাষণের ফরাসী তর্জমা ক'রে ফ্রান্সে ছাপিয়েছিলেন) তিনি হ'লেন দোভাষী ঘটকী! বেঁচে গেলাম। তাঁকে কথা দিলাম—পরের বার ফরাসীতেই আলাপ করব রোলাঁর সঙ্গে। পরেরবার—দু বৎসর বাদে ১৬ই ও ১৭ই আগস্টে—তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে শুধু যে কথাবার্তা চালিয়েছিলাম তাই নয়, পিঠ পিঠ সেসব আলাপের অনুলিপি লিখে তাঁকে পরে পাঠিয়েছিলাম ও তিনি অনুমতি দিলে (কয়েকটি স্থানে মাত্র দু-চারটি কথা বদলে বা জুড়ে) ছাপাই আমার তীর্থংকর তথা Among The Great-এ। সেসব কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যকও বটে, বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাই আমি বলব শুধু তাঁর মহানুভবতার কথা যথাসাধ্য বিশদ ক'রে। অর্থাৎ তিনি মহানুভব পদবী পাবার দাবি করতে পারেন কেন—কোন্ হিসাবে। এমন কথা বলতে হবে যা আগে লিখি নি। চেষ্টা করি তো। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

একসময়ে একটি ক্ষুব্ধ প্রশ্ন আমার মনকে টুকত: কেন সব মানুষ ঠাকুরের কৃপা পায় না। কেন যদু মধু বিধু সিধু সবাই উচ্চসঙ্গীতে আনন্দ পায় না? কেন মানুষ নিচুটানে গড়িয়ে চলে জেনেশুনে যে, তার ফল সর্বনাশ? রোলাঁ আমাকে তাঁর নানা কথায় তথা পত্রে এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যার মধ্যে আমি পেয়েছিলাম খানিকটা অন্তত সমাধান এ জাতীয় প্রশ্নের বা সমস্যার। তাঁর একটি বাণী ছিল এই যে, মানুষ সবাই শ্রদ্ধেয় হ'লেও সবাই কিছু সমান গ্রহিষ্ণু (রিসেপটিভ) নয়। "সাম্যবাদ" বরণীয় এই হিসেবে যে, সবাইকেই বড় হবার সমান সুযোগ দেওয়া চাই- যাতে ক'রে জন্মগত বৈষম্যের কিছুটা অন্তত নিরাকৃত হয়। কিন্তু তাব'লে সাম্যবুলিবাদ কদাচ সত্য নয়: যে, সব মানুষই সমান। তা' হ'তেই পারে না। রোলাঁ লিখেছিলেন আমাকে যে, ভারতবর্ষের গভীর প্রজ্ঞা জানে বরাবরই যে, "মানুষ জন্মায় নানা স্তরের চেতনা নিয়ে। প্রতিভা ও শক্তির সহজাত কবচ কুণ্ডল নিয়ে জন্মায় মাত্র দুচারজন মহানুভব। কিন্তু"—বলতেন তিনি চিঠিতেও লিখেছিলেন একথা—"মহানুভবেরা সামান্যদের বুঝতে পারলেও তাদের

ভালোবাসলেও সামান্য যারা তারা কোনোদিনই মহানুভবদের পারবে না বুঝতে কি ভালোবাসতে।"*

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারবারই বলতেন খুব জোর দিয়েই যে, মহানুভব হ'য়ে যে জন্মায় সে পরদুঃখকাতর না হ'য়েই পারে না। জোহান বয়ের-এর "দি গ্রেট হাঙ্গার" বইটির তিনি প্রভূত সুখ্যাতি করতেন। বইটির শেষে একটি উক্তি প'ড়ে আমি জোহান বয়েরকে চিঠি লিখেছিলাম দেখা করতে চেয়ে, তিনি সানন্দে উত্তর দিয়েছিলেন। উক্তিটি আজও ভুলি নি (ভাগ্যক্রমে স্মৃতিশক্তি আমাকে আজও পথে বসায় নি):

"Mankind must be better than the blind powers that order its ways."

উক্তিটি মহৎ যদিও খানিকটা নাস্তিকভঙ্গিমই বলব যেহেতু একদল অন্ধ শক্তিরা কিন্তু আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না, এ-সৃষ্টির পিছনে একটি মহৎ অভিপ্রায় সক্রিয় হ'য়ে এসেছে চিরকালই। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়:

The world was not built with random bricks of chance,
A blind God is not destiny's architect,
There is a meaning in each curve and line.

রচিত হয়নি বিশ্ব মিথ্যা আকস্মিক উপাদানে,
এক অন্ধ ধাতা নয় নিয়তির নিষ্ঠুর স্থপতি,
প্রতি রঙ রেখা নিহিতার্থে চিরদীপ্যমান।

কিন্তু আমরা তো পাই নি সে পূর্ণ দৃষ্টি যে দেখতে পায় এই নিহিতার্থ। তাই মহানুভব মানুষ যুগে যুগে থেকে থেকে নাস্তিকতার ঝাণ্ডা উড়িয়ে এসেছেন। তাই তো জোহান বয়ের-এর এই দর্শনে (যে মানুষকে খোদার উপর খোদকারি করতে হবে) রোলাঁ সাড়া দিয়েছিলেন —যদিও সাময়িকভাবে (কারণ তিনি ছিলেন মনে প্রাণেই আস্তিক) এ-উপমানটির নাম করলাম আরো এই জন্যে যে, এ-দৃষ্টিভঙ্গি গড়পড়তা

*(Ils peuvent comprendre cette foule. Ils peuvent meme (ils doivent) l amier. Mais cette foule ne les comprendra jamais, ne les aimera jamais pour ce qu'ils sont···La profonde sagesse de l'Inde a su voir, depuis longtemps, que tous les hommes ne naissent pas a re meme age".)

মানুষের নয়। মহানুভবতায় যার অধিকার সে ছাড়া কেউ সত্যি পরের দুঃখে কাঁদতে পারে না : আরো দুঃখের কথা—মহত্ত্ব দেখে অশ্রু ঝরাতে' পারে না—মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় :

"পরের দুঃখে কাঁদতে পারা তাহাই ভবে চরম নয়,
মহৎ দেখে কাঁদতে শেখা তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

রোলাঁর মধ্যে ছিল এ-দুই কান্নাই পাশাপাশি। আমাকে তিনি লিখেছিলেন একটি পত্রে (এ-চিঠিটি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ডায়রিতে ছাপা হয়)

"Il nous faut immédiatement courir a l'aide des opprimés—hommes et peuples—qui ne peuvent attendre. Nous ne reconnaissons pas le droit de distraire un seul instant de l'action présente.···mon premier devoir de batelier est, sur ces flots, de sauver ceux qui s'y noient, ou périr avec eux."

অর্থাৎ "যারা অত্যাচারে ক্লিষ্ট—মানুষই হোক বা সমগ্র জাতিই হোক—তাদের সাহায্য করতে আমাকে ছুটতে হবেই হবে—তর সয় না আমার। আমার পক্ষে দুর্গতদের সাহায্যে বিরত থাকা সম্ভব নয়—নিশ্চেষ্ট থাকার অধিকারই নেই আমার। আমি যে মাঝি, নৌকার টাল সামলাতেই হবে, যে ক'রে পারি যাত্রীদের বাঁচানো চাই, না পারি যদি মরব সেও ভালো, কিন্তু হাল ছাড়ব না কিছুতেই।"

এ চিঠিটির প্রথমার্ধ তীর্থংকর-এর তৃতীয় সংস্করণের ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে। কিন্তু এ-অংশটি আমি ছাপাই নি। সেদিন রোলাঁর মূল চিঠিগুলি পড়তে পড়তে এটি চোখে প'ড়ে চম্‌কে উঠলাম। মনে হ'ল—এই-ই তো ছিল তাঁর জীবনের একটি মূলমন্ত্র। কেন ছাপাই নি? কারণ এতে একটি ছত্র ছিল ভগবানকে ঠেশ দিয়ে লেখা। তাই আজ মনে হয়—কেন ভগবানকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম? শ্রীঅরবিন্দের কাছে বারবারই কি শুনি নি যে ভগবানকে ভুল বোঝা বা দোষ দেওয়া মানুষের মানবিকতার একটি দুরন্ত ব্যাধি? এ-ব্যাধির ফলে প্রলাপ বকতে বকতেই সে প্রলাপ তাঁর সঙ্গে কথালাপের দিকে মোড় নেয়—আবহমানকাল এই-ই হ'য়ে এসেছে।

রোলাঁ যে একথা বুঝতেন না তা নয়। তাঁর আর একটি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন:

E´coutons I'ensemble du concert : L'heure presente n'en est qu'un accord de passage—âpre, riche et cruel—qui bientôt va se resoudre dans la suite de la symphonie. Que chacun de nous n'ai souci de remplır exactement, since´rement, purement sa partie ! Et s'il arrive que ceux qui tiennent la partie la plus haute, ou bien sa plus profonde soient me´connus par les autres. ils ne sont pas a´ plaindre : ıls sont assez paye´s par la joie qu'ils e´prouvent du beau chant qu'est leur lot. Qu'importe que "les autres" les jugent mal ? "Les autres" ne sont pas les juges. Le Juge est le Maître Invisible de la symphonie.

অর্থাৎ--মহান রাগমালা শুনি এসো। আজকের দিনে যে-সুর বেজে উঠেছে তা সাময়িক মাত্র, কটু, সমৃদ্ধ, নিষ্ঠুর—কিন্তু এর পরেই শুনতে পাব বেজে উঠল সমৃদ্ধ একতান। এসো আমরা প্রত্যেকে যেন আমাদের ভূমিকা নির্বাহ ক'রে চলি নিখুঁতভাবে, সরল সুরে, পবিত্র ছন্দে। যারা সবচেয়ে উচ্চ পতাকা বহন করবার ভার পেয়েছে—তাদের যদি আর সবাই ভুল বোঝে তাহলেও তাদের কৃপার্হ মনে কোরো না। কারণ সে-পতাকার গুরুভার বহন ক'রে তারা যে-আনন্দ পেয়েছে তাতেই পেয়েছে তারা যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ—কারণ তারা শুনেছে সে-মধুর সঙ্গীত যা তাদের দুঃখ বহন ক'রে এনেছে। যদি আর সবাই তাদের 'পরে অবিচার করে তাতেই বা কি? এসব বাইরের বিচারকদের 'পরে তো পরম বিচারের ভার ন্যস্ত হয় নি। পরম বিচারক কেবল একজন—যিনি একতানের—সিমফনির শেষ নিয়ন্তা।"

কী সুন্দর কথা! রোলাঁর পরের দুঃখে কাতর হ'য়ে নিয়তির নামে ভগবানকে দায়িক করা তো নিছক অভিমান—যে-অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে রামপ্রসাদ বলেছিলেন:

'মায়ের এম্নি বিচার বটে,
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে তার কপালেই বিপদ ঘটে।"

কোন্ মহানুভব মানুষ না সময়ে সময়ে ভগবানকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁকে পুলি-পোলাও চালান দিয়েছেন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন ব'লে?

স্বয়ং ভক্তেরাও কি দেন নি? হৃদয়বত্তার একটি লক্ষণই তো এই। এও তো ঠাকুরেরই বলিয়ে নেওয়া ভক্তকে দিয়ে যে,

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে।

রোলাঁর মহানুভবতার আর একটি অভিজ্ঞান তাঁর মহানুভবদের জীবনী লেখার ব্রত গ্রহণ। এযুগে এত বড় জীবনীকার আর জন্মায় নি এক "শ্রীম" ছাড়া। এ-ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করতে পেরেছিলেন এই জন্যেই যে, যেখানেই তিনি মহত্ত্ব দেখতেন সেখানেই নত হ'তে তাঁর বাধত না। মাইকেল এঞ্জেলো, বীটোভেন, টলস্টয়, গান্ধি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ— কোন্ মহানুভব ও মহাত্মার না তিনি গুণগান করেছেন অকুণ্ঠে? এছাড়া Musiciens d'Aujourd'hui' ও Musiciens d'Autrefois (ইদানীন্তন সঙ্গীতকার ও পুরাকালের সঙ্গীতকার) এ দুটি বইয়েও তিনি নানা সঙ্গীতকারের ছবি এঁকেছেন। বলতে কি, তাঁর জীবনীগুলি সাহিত্য জগতে তাঁর অক্ষয় কীর্তিদের অন্যতম ব'লে গণ্য হবার দাবি রাখে। কত লেখক কত যে শিখেছে তাঁর কাছ থেকে—বিশ্বজাতিবাদ (internationalism) সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন সত্যিই মহত্ত্বের চারণ। বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে: "আমি সাধুও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না—যেখানেই মহত্ত্ব দেখব সেখানেই আমি যেন মাথা নোয়াতে পারি।"

বীটোভেনের জীবনীতে তিনি কী উল্লাসেই যে উদ্ধৃত করেছেন জর্মন ভাষায় বীটোভেনের একটি মন্ত্রবাণী: "Musik is hoehere offenbarung als alle Weisheit und Philosophie"

সঙ্গীত যে-দীপ্তি করে বিকীরণ—মহিমার তার
প্রতিস্পর্ধী নয় জ্যোতি দার্শনিক চিন্তার, প্রজ্ঞার।

বীটোভেনের সঙ্গীত তিনি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এই জন্যেই যে, সে-সঙ্গীত তাঁর হৃদয়কে মহত্ত্বের দিব্যালোকের অভিসারী হবার প্রেরণা দিত। জীবনের তীর্থযাত্রায় রোলাঁর শুধু পথের পাথেয় নয়, পারের পারানি ছিল এই মহত্ত্বের অনুরাগ, পরার্থনিষ্ঠার আনন্দবেদনা, সর্বোপরি আন্তর অনুভবের জ্যোতির্লোক। তাই তাঁকে আজ, ২৯এ জানুয়ারি, নমস্কার করি যে-দিনে এ-ধন্যজন্মা মহানুভব জন্মেছিলেন ফ্রান্সে শতবর্ষ আগে। জয় হোক তাঁর বিশ্বমানবতার মহাদর্শের।

কান্তকবি ও ভক্তিসাধনা

আজ একশো বৎসর আগে শ্রাবণ মাসে কান্ত কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলা দেশে। সে-মাসে আরো কতমানুষই কালস্রোতে ভেসে এসেছিল কোন্ অচিন লোক থেকে—যারা কবে ভেসে উধাও হয়ে গেছে সেই একই স্রোতে!—যে-ক্ষুদ্র চিহ্ন ব'য়ে এনেছিল কালের জোয়ার, ভাঁটায় সে-চিহ্ন মুছে গেছে, তারা ফিরে গেছে সেই অচিন লোকেই, কিম্বা হয়ত মোড় নিয়ে লুপ্ত হ'য়ে গেছে আর কোনো এক অজানা অতল-খাতে।

কিন্তু এক একজন মানুষ আসে তাদের কীর্তি মুছেও মোছে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের : "ওরে এসেছিস যদি একটা দাগ রেখে যা।" কান্ত কবি—রজনীকান্ত—এমনিই একটা ধন্য দাগ রেখে গেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, ছড়ায়, নক্সায়—সর্বোপরি তাঁর ভক্তজীবনের। এ-দাগ রেখে যেতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁদের স্বধর্ম ভক্তি, বা বলা যেতে পারে—যাঁদের ভগবান বরণ ক'রে কাছে ডেকে নিয়েছেন ভক্তের টিকা ললাটে পরিয়ে যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ···

রজনীকান্তকে ভক্তেরা ভালোবেসেছিলেন তাঁর ভক্তরূপে। অবশ্য এছাড়া তাঁর আরো রূপ ছিল—নীতিবাদী, দেশভক্ত, হাস্যরসিক, ইত্যাদি; সে সব রূপের কথা নিশ্চয়ই আরো অনেকে বলবেন তাঁর শততম জন্মস্মৃতি-বার্ষিকী বাসরে। আমি বলতে চাই বিশেষ ক'রে তাঁর এই ভক্তরূপের কথা, যার সঙ্গে আমার প্রেমের পরিচয় হয়েছিল সুদূর শৈশবেই বলব।

খুব স্পষ্ট মনে আছে—আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর দিনের পর দিন এসে পিতৃদেবের নানা গান ও গল্পগাছা শোনা, তথা আমাদের তাঁর স্বরচিত নানা গান শোনানো। পিতৃদেবকে (দ্বিজেন্দ্রলাল) তিনি "গুরুদেব" বলতেন। বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের হাসির গান তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল হাসির গান রচনায়। আরো অনেককেই দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের কীর্তি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে প্রতিভার অভাবে। সদানন্দ রজনীকান্তের গীতিপ্রতিভা ছিল খাঁটি। আবাল্য তিনি গভীরভাবেই সাহিত্য ও কবিতা ভালোবেসে এসেছিলেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরে তাঁর মৃত্যু হয়। আর

কয়েক বৎসর বেঁচে থাকলে তাঁর গীতিপ্রতিভা আরো উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করত সন্দেহ নেই। সাহিত্যে কীর্তির ছাপ রেখে যেতে হলে কিছুটা সময় লাগে কেননা সুদীর্ঘ সাধনা বিনা শিল্পে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। রজনীকান্ত নানা কারণে—বিশেষ ক'রে অর্থাভাবে পড়ার দরুণ—তাঁর সহজাত প্রতিভা ও শক্তিকে আবাদ করতে পারেননি নিখাদ সোনা ফলাতে। কিন্তু তবু দাগ রেখে গেছেন আমাদের সাহিত্যে অল্প বয়সেই। এ-কৃতিত্ব সামান্য নয়। তাঁর কবিতার ভাষা ছন্দ ভঙ্গি আরো শুদ্ধ হ'য়ে উঠতই উঠত যদি তাঁর অকালমৃত্যু না হ'ত। একথা বলছি তাঁর প্রতিভাকে ছোট করতে নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 'পরে জোর দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার গুণগান করতেই। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেছিলেন : বাণী, কল্যাণী ও অমৃত। এর মধ্যে প্রথম দুটিতেই তাঁর নানামুখী স্বকীয়তার পরিচয় মেলে, প্রতিভারও স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—যদিও সে-প্রতিভার আরো নিখুঁত বিকাশ হ'তে পারত যদি তিনি আর দশ পনের বৎসর সাহিত্য-সাধনা করতে পারতেন ভক্তির তীর্থপথে। কিন্তু না পারা সত্ত্বেও ভক্ত সাধক তথা সাহিত্যিকদের তিনি অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন যা মহনীয়, বরণীয়, উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে যে-তর্পণ করেছিলেন সে-তর্পণ কান্ত কবির সম্বন্ধেও অঙ্গীকার করা চলে :

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা। আজ হ'তে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

মনে পড়ে কান্ত কবির উদাত্ত স্তোত্র :

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান।...*

*অতুলপ্রসাদও "বিমান" শব্দটিকে ভুল ক'রে (কান্তকবির মতন) আকাশ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর একটি গানে—সম্ভবতঃ মিলের খাতিরে।

আর কি ভারতে আছে সে-যন্ত্র,
আর কি আছে সে-মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

মানুষ কোনো সত্য সৃষ্টিই করতে পারে না, যার সুরে তার প্রাণের তন্ত্রী সাড়া না দেয়। কান্ত কবির ছিল সরল, মহৎ প্রাণ। স্বভাবে ছিলেন তিনি উদার, নম্র, শ্রদ্ধাবান্, ভক্তিমান্। তাঁর নানা গানের নানা চরণেই ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে তাঁর এই মধুর স্বভাব, অটল বিশ্বাস, উজ্জ্বল আদর্শবাদ—যেমন এই গানটিতে ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে।

সুন্দরের ভক্ত ছিলেন তিনি মনে প্রাণে, তাই এমন মধুর "গুঞ্জরণ" তাঁর গানে শুনতে পাই—এ গানটি তিনি যে কী সুন্দর গাইতেন—আজো কানে বাজে :

তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্য-পুলক-গীতিমুখর-কলুষহর-তরঙ্গা
ধায় মত্ত হরষে সাগরপদপরশে
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুমগন্ধ বহিয়া,
আর্যগরিমা-কীর্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা কণ্ঠে বিজয়মালিকা
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।

আধুনিক ছান্দসিকেরা এ-গানটিতে ছন্দপতন হয়েছে বলবেন হয়ত, কারণ তাঁরা সংস্কৃত গুরুস্বরের উদাত্ত প্রায়ই যথাযথ পড়তে পারেন না। কিন্তু রজনীকান্ত যখন এ-গানটি গাইতেন তখন শ্যা, চা, ণী, পূ, হে, ভা, গী, ধা, মা, বে, হা, মা, জী-কে টেনে দুমাত্রা ধ'রে সুরে এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলতেন যে, কান মন উভয়েই মুগ্ধ হ'ত। এ-মুক্ত দলগুলিকে একমাত্রা ধরলে সুর কিছুতেই সেভাবে ছাড়া পেতে পারত না যেভাবে এখানে

পেয়েছে—তাছাড়া ছন্দপতন তো হ'তই। এ-বৈয়াকরণিক প্রসঙ্গ তুললাম—সংস্কৃত গুরুস্বরের তিনি অনুরাগী ছিলেন ব'লেই তার সুপ্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এই কথাটি পেশ করতে। তাঁর আরো নানা অনবদ্য গানেই এই দ্বিমাত্রিক গুরুস্বরের সুপ্রয়োগ পাই। কিন্তু সে অন্য কথা। কান্ত কবি মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ীতে এসে গাইতেন তাঁর একটি অপূর্ব গান, যা পরে প্রখ্যাত হ'য়ে ওঠে নানা গুণী তথা ভক্তের কণ্ঠে—মো-কে ভুমাত্রা ধরে :

তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-কালিমা ঘুছায়ে।

এ গানটি শুনে পিতৃদেব এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আমি তাঁকে শোনাতাম প্রায়ই, আজও গাই মাঝে মাঝেই—এযে বিশুদ্ধ সাধনার গান অনবদ্য বিনতির আত্মনিবেদনে মহিমময় :

পরের অন্তরা আভোগগুলি উপমায় আন্তরিকতায় ছবিখানি হ'য়ে ফুটে উঠেছে ঃ

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
আমি জানিনা কখন ডুবে যাব কোন্ অকুল গরল পাথরে!
প্রভু বিশ্ববিপদহন্তা তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা গুছায়ে।

মানুষ যখন প্রলোভনে দোলে পতনের মুখে, তখন সে যে এমনি আকুল হ'য়েই ডাকে বিশ্ববিপদহন্তাকে—পতনের পথরোধ ক'রে দাঁড়াতে। আর ডাকলে তিনি দাঁড়াও দেন যদি ডাকার মতো ডাকা যায়—যেমন ডাকতেন কান্তকবি তাঁর সরল ভক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে।

আরো আছে। বলিনি—এ সাধনার গান? যখন মানুষ কোনো মতেই তার আত্মাভিমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে দেখে চোখের সামনে আলো কালো হ'য়ে আসছে, বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠেছে—"তুমি আছ কি ভগবান" জিজ্ঞাসায়—তখন অন্তরগহনে এক গভীর প্রত্যয় ব'লে ওঠে যে, আমরা দেখতে চাই না ব'লেই অন্ধভাবে বরণ করি :

আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায় জলদের গায় শশিতারকায় তপনে।

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া ব'সে আঁধারে, মরি যে কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

এ-গানটি শুধু আমার নয়, বহু সাধকেরই অতি প্রিয় গান। এর মধ্যে যে রয়েছে একটি গভীর ইঙ্গিত—পরম প্রাপ্তির। যখন সংশয়ে মন আঁধার হ'য়ে এসেছে, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা চিনতে ভুল হ'য়ে প্রাণ পড়েছে অকূল পাথারে তখন সংশয়ী মানুষ ডাকবে কাকে? না, তাঁকেই যিনি সর্বত্র আছেন ও আমাদের ডাকছেন তাঁর চরণচ্ছায়ায়, কিন্তু হায়রে, আমরা যে আমাদের অবোধ অভিমানের ঠুলিতে চোখ বেঁধে ব'সে, তাইতো তাকে দেখতে, চিনতে বুঝতে পারছি না। তখন একটি মাত্র পথ আছে চোখের ঠুলি খসাবার: আত্মাভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে চোখের জলে ঠাকুরকে ডাকা: "আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে—মলিন মর্ম মুছায়ে।" শুধু বরণ করা, শরণ চাওয়া—তাহ'লেই চরণ পাওয়া যায়, মোহের পর্দা খ'সে পড়ে, আর অমনি দেখতে পাওয়া যায়:

আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে···

এ-গানের কি তুলনা আছে? কান্তকবি এমন নিখুঁৎ গান বেশি রচনা করেন নি বটে—সবশুদ্ধ দশবারোটি হবে, কিন্তু এই কয়টি গানের সুর ভক্ত প্রাণ ভুলতে পারবে না—নানা পরীক্ষায়ই এদের উদাত্ত মন্ত্ররবে ভরসা পাবে যে, তিনি জীবনে দেখা না দিলেও মরণের পরপারে ঠাই দেবেনই দেবেন। তাই তাঁকে যে সত্যি চায় সে বঞ্চিত হ'তেই পারে না, গীতার ভাষায়—ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি:

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে না তুলে লবে গো,
হ'য়ে পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে "পার করো" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীনশরণে?

কী মধুর! প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এরই তো নাম আকুল জিজ্ঞাসা, পরম আত্মনিবেদন, তাঁর করুণার অঙ্গীকার চোখের জলে। এ-গান কথা গেঁথে গেঁথে লেখা যায় না—অন্তর যখন আঁধারে তাঁর পায়ে মাথা ঠোকে পথ খুঁজে না পেয়ে—তখনই "তিমির-দুয়ার খোলে", তিনি বলেন: প্রশ্নের উত্তর তো প্রশ্নেরই বেদনায় দিয়েছি আমি যখন তুমি বলছ (প্রে—দ্বিমাত্রিক গুরুস্বর):

আমি শুনেছি হে তৃষাহারী,
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—
একি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে।

"বাজে"—কেন না শূন্যবাদী কুতার্কিক সংশয় স্বভাব-আস্তিকের কানে কানে নানা কুযুক্তি দিয়ে তাকে নাস্তিক্যে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করে। তাই সংশয় হ'য়ে দাঁড়ালো আসুরিক বৃত্তির প্রধান অমাত্য। সে বলে মুচকে হেসে: "কেন মিথ্যে নাস্তি-র কাছে হাতজোড় করছ ভাই? যা হবার নয় তা কি কখনো হয়? ভগবানের করুণা যদি থাকত তাহ'লে কি যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ এত দুঃখ পেত? তিনি যদি সত্যি 'তৃষাহারী' হ'তেন তাহ'লে কি কোটি কোটি অসহায় দুর্ভাগা অমৃততৃষ্ণা জপ ক'রে পেত বড় জোর এক আধ বিন্দু জল—যাতে তৃষ্ণা মেটে না? 'দীনশরণ' থাকলে কি কখনো কোটি কোটি আর্তের অনাহারে মরণ হ'ত?"... ইত্যাদি। কিন্তু অন্যদিকে অন্তরাত্মার মাঝে বন্দী পূজারী বলে: "তাঁর লীলা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু তবু আমি জানি যে, বিশ্বাসকে বরণ করলে আমার তৃষ্ণা তিনি মিটিয়ে দেবেনই দেবেন, শরণ চাইলে তিনি দীনশরণ হ'য়ে দীনের কাছে ধরা দেবেনই দেবেন।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন, হৃদয়কে: "ওরে হৃদয়, যার কেউ নেই, তার তিনি আছেন, তাই সে ভাগ্যবান্।"

এই গানটির বরেণ্য প্রেরণায়ই একদা আমি আলো পেয়েছিলাম, তাই দেখতে পেয়েছিলাম যে আমি সুধা চাই তিনি সুধার ক্ষুধা হ'য়ে

আমার অন্তরে নিজেকে জানান দিচ্ছেন ব'লেই, লিখেছিলাম গভীর আনন্দে যে তাঁর

গায় বাঁশি অকুল পাথারে ঝাঁপ দেয় স্মরি' কাণ্ডারী
না জেনেও জানে সে আঁধারে : "সুধাও ক্ষুধার অভিসারী"।

তারপর এই শাশ্বত সত্যটিকে আরো ফলিয়ে তুলতে চেয়ে আনন্দঝংকৃত বিরহবেদনার প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই (কান্ত কবির মতন) পেয়েছিলাম সেই পরম কারুণিক চিরসাথীর উহ্য সাড়ার আরো স্পষ্ট অঙ্গীকার :

নাথ, তোমার পানে কি শুধু আমরাই ধাই পথহারা পান্থ,
চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত ?
তুমিও কি ভালোবাসো না ?
নিতি বিছায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি কাছে আসো না—
যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত ?
তুমি যদি উদাসীন,
তবে বাহুবন্ধনে বেঁধে করো কোন্ প্রেমলীলা প্রেমহীন—
ওগো নিঠুর যুগযুগান্ত ?
কত অতৃপ্ত বাসনা,
কত সোনার-হরিণ-মরীচিকা, কত মরুবুকে তৃষাদাহনা
হয় পরশে তোমার শান্ত !

নদী যবে ধায় উছলি',
তার বাজে না কি বুকে যুগে যুগে তব সিন্ধুর নীলমুরলী,
ওগো সুন্দর, নীলকান্ত ?

মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে
কেন করো এ-ছলনা বন্ধু, বলো না মায়ার খেলায় ভুলায়ে ?
নয় বিরহ কি মিলনান্ত ?

প্রাণে অধীর প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে গানে গভীর সাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া—

এ-ভঙ্গি ভক্তিসাধকদের কাব্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। কান্ত কবিরও নানা কবিতায় আছে। একটি গান বড় মর্মস্পর্শী, গাইতে গাইতে মন ভ'রে যায়, আভাস মেলে এক অপরূপ নিশ্চিন্তির, মনে হয়—প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভরসার বান ডেকে যাচ্ছে সংশয়মরুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে। পরাভক্তির একটি বড় মধুর আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি। কান্ত কবি যখন গাইতেন, তাঁর চোখে জল ভ'রে উঠত, কণ্ঠে বেজে উঠত এক গভীর স্পন্দন পরম নৈশ্চিত্যের :

যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয় শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব চরণশরণ তরে এত ব্যাকুলতাভরে
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে তোমারে ডাকিয়া কবে
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি মধুর সান্ত্বনাভরে, তুমি না মুছাবে করে
কেন ভাসি নয়নসলিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা-গান
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো !
সকলি কি অর্থহীন ! শূন্য শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে-গীতি সৃজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু
একান্ত ও-চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবনপতি,
পতিতপাবন নাম নিলে গো ?

প্রতি যুগেই একটা না একটা স্রোত আসে, যাকে বলা যায় নতুন সৃষ্টি। পুরাতনের মধ্যেকার নিত্য সুর এ নব-আগমনীর সুরে ঢাকা পড়ে না, কিন্তু নতুন ভঙ্গির অভ্যাগমে এক অভিনব স্বাদ মেলে দেশকাল পাত্র ভেদে। একই ঋতু বার বার আসে বটে, কিন্তু তবু আসে প্রতিবারই নব নব ছন্দে। ভক্তিসাধনার নানা ঋতুর পর্যাবর্তন সম্বন্ধেও এই কথা। ভক্ত সব দেশেই আবহমানকাল চেয়ে এসেছেন ভগবানের সান্নিধ্যের আদরের

সাড়া, কিন্তু তার আকুল প্রাণের ডাক নিজেকে জানান দিয়েছে প্রতি যুগেই এমন একটা নতুন মিড়ে, যে-মিড় তার পূর্বসূরীদের ভক্তিকীর্তনে বাজে নি। বেদে একেই বলেছে ভগবানের একাধারে "সনাতন তথা পুনর্নব" রূপ। তাই তাঁর লীলা চিরপরিচিত হ'য়েও থাকে নিত্যনূতন। হাফেজের একটি গজলে আছে (গজল উভধর্মী—মানবপ্রণয়ী ও দেবসুন্দর দুই বন্ধুকেই সম্ভাষণ করতেন পারসিক ভক্তেরা):

মুৎরিবে খুষনভা বেগু তাজাবতাজা নওবনও।
বাদরে দিলকুষা বেজু তাজাবতাজা নওবনও।

আমার "সাঙ্গীতিকী"-তে আমি এর অনুবাদ ক'রেছিলাম:

তোমার কলকণ্ঠে গুণী, যেন শুনি নিতুই নব গান।
ঢালো তোমার নিতুই নব রঙিন সুধা, উছল ক'রো প্রাণ।

ভক্তও ভগবানকে এই ভাবেই ডাকেন নিতুই নব রঙিন ডাকে—তাঁর কাছ থেকেও নিতুই নব রঙিন সাড়া পেতে। এ যে না হ'য়েই পারে না। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন: "মানুষ যে ভগবানকে চায় সেটা হ'ল ভগবানের মানুষকে চাওয়ার সাড়া।" উপনিষদেও এই কথাই আছে: যা এখানে—তাই সেখানে। মানুষ কি কোনদিনও নিত্যনব সৃষ্টির এই মহাব্রত অঙ্গীকার করতে পারত—যদি ভগবান্ নিজে সে ব্রত উদ্‌যাপনের ভার না নিতেন তাঁর করুণার ধূপ দীপ ফুল সুর রং রেখা ছন্দ জুগিয়ে? কান্ত কবির ভক্তিসঙ্গীতে তাই পদে পদেই পাই এযুগের নানা স্বকীয় আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিমা—পুরাতনের মর্যাদা রেখেও নূতন সুরে তালে ছন্দে।

এর মধ্যে একটি সুর—কৃতজ্ঞতা। একটি গানে কান্ত কবি এমন প্রাণকাড়া সুরে গেয়েছেন কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকার—যে অঙ্গীকার আমাদের আগের যুগের ভক্তদের গানে ফুটে ওঠে নি এমন নিটোল হ'য়ে। আমরা বার বার পাই কত কী, কিন্তু বার বারই পাওয়ার দাম না দিয়ে তাঁর দানের অমর্যাদা করি। কিন্তু তিনি যে ক্ষমাসুন্দর, তাই বার বারই প্রতিহত হয়েও পিছু নিতে ছাড়েন না। ভাবরূপটি অনবদ্য। যতবারই কান্ত কবির এ-গানটি গাই, মনে জেগে ওঠে ঠাকুরের অহেতুক

করুণার কথা, মধুর লাবণ্যরসে নিষিক্ত হ'য়ে মনে কৃতজ্ঞতার সৌরভ ছেয়ে যায় ঃ

আমি অকৃতী অধম ব'লে তো আমায় কম ক'রে কিছু দাও নি।
পরে যা দিয়েছ তার অযোগ্য বলিয়া কেড়েও তো কিছু নাও নি।
তব আশিস-কুসুম ধরি' নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু চাও নি।
আমি ছুটিয়া বেড়াই না জানি কী আশে,
সুধাপান ক'রে মরি যে পিয়াসে,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি তুমি তো কিছুই পাও নি।
আমায় রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি—এক পাও ছেড়ে যাও নি।

এই কৃতজ্ঞতা কান্ত কবির ভক্তচরিত্রের একটি বাদী সুর ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। কত গানে ও কবিতায়ই যে তাঁর সরল অথচ তেজস্বী হৃদয়ের এই সজল অথচ সবল কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে ঃ

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয়মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির-অবহেলা পেয়েছ
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি' টেনে কোলে তুলে নিয়েছ।
"ওপথে যেও না, ফিরে এস" ব'লে কানে কানে কত কয়েছ!
(আমি) তবু চ'লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ।

কী সুন্দর সরলতা! অথচ এ-সরলতা অজ্ঞান নয়, পূর্ণ-সচেতন। আমি না চেয়ে পেয়েছি—তার দাম দিই নি ব'লে অপরাধী হ'য়ে যেন আরো গভীর বেদনায় দাম দিতে শিখেছি তোমার অপার করুণার। মানুষ ঘা খেলে মান করে, রাগ করে, অনুযোগ করে। কান্ত কবিও

করতেন নিশ্চয়ই—কিন্তু প্রথমটায়, যখন তিনি সংসারী মানুষ। তার পরই সচেতন হ'তেন সাধকের জাগৃতিতে—অমনি তাঁর ভক্তি এসে নামঞ্জুর ক'রে দিত সব খেদ ক্ষোভ অনুযোগ অভিযোগ, তিনি গেয়ে উঠতেন পরম অনুতাপে—গভীর অঙ্গীকারে :

ওমা, কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায় ?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর পরশরতন হারায় হেলায় ?
আমার মতন কে অবাধ্য ?
যার সংশোধন মা তোর অসাধ্য—
তুই "আয়" ব'লে যাস কোলে নিতে "দূর হ" ব'লে ঠেলে পালায় !
তোর বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি কেমন ক'রে ভুলে আছি
আমি এমন তো ছিলাম না আগে (বড়) সরল ছিলাম ছেলেবেলায়।

এ-গানটির সঙ্গে আমার নিজের ভক্তিসাধনার নানা স্মৃতি জড়িত। তাই বলি—অবান্তর হবে না যখন।

ছেলেবেলায় কে না সরল থাকে ? সংসারের নানা পাকে প'ড়ে নানা আশা চূর্ণ হবার আগে, নানা স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার আগে, বিশ্বাস ক'রে বার বার প্রবঞ্চিত হ'য়ে দুঃখ পাওয়ার আগে, বিশেষ ক'রে নিয়তির নানা অপ্রত্যাশিত নিষ্করুণতার ..পে দিশাহারা হ'য়ে খানিকটা "সিনিক" মতন হ'য়ে দাঁড়াবার আগে মানুষ সরলই থাকে। কিন্তু তবু দেখা যায়—নানা মহৎ মানুষ বহু ঘা খেয়েও তাঁদের সরলতা হারান না। পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এই জাতের মানুষ। (তাই হয়ত কান্ত কবির সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহবন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে গুরুদেব সম্বোধন করতেনও ঐ একই কারণে—ভক্তির ক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী ব'লে।) আরো কয়েকজন দেখেছি—যদিও বেশি নয়—যাঁরা মনে ধীর প্রবীণ হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও প্রাণে চির-নবীন সরল ভক্তি বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যেও রজনীকান্ত ছিলেন দেখবার মতো সরল। শ একবার আইনষ্টাইনের অভ্যর্থনাসভায় বলেছিলেন : "There are great men who are great among small men. There

are great men who are great among great men, and that is the sort of man we are honouring tonight.* কান্ত কবির এ-গানটি গাইতে গাইতে আমার মনে হ'ত বারবারই যে, কান্ত কবি শুধু যে অভক্তদের মধ্যেও ভক্ত ব'লে চিহ্নিত হ'তে পারতেন তাই নয়, ভক্তদের মধ্যেও বিশিষ্ট ভক্ত, সরলদের মধ্যেও বরেণ্য সরল ব'লে গণ্য হবার দাবি করতে পারতেন। হাসপাতালে ক্যান্সারে রুদ্ধবাক্ হ'য়ে ১৩১৭ সালে তিনি গভীর রাতে একটি গান লিখেছিলেন—উদ্ধৃত করি একথার ভাষ্যরূপে :

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ হরি মোর কুটীরে নিয়ত।
মোর দশা দেখি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা
(তারা) যত মোরে বড় করে আমি তত হই নত।
(তারা) একান্ত তোমার পায়
এ-জীবন ভিক্ষা চায়,
বলে "প্রভু ভালো ক'রে দাও তীব্র গলক্ষত।"
শুনিয়া আমার হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি',
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত!
তুমি জানো অন্তর্যামী,
কত যে মলিন আমি,
রাখো ভালো, মারো ভালো চরণে শরণাগত।

এ তো শুধু গান নয়—এ যে সাধনা, ভক্তিসাধনা, শরণাগতির মন্ত্রদীক্ষা! অনবদ্য ছন্দে ভগবানের স্তব লিখতে পারেন এমন কবি দেখা যায় (যদিও খুব বেশি নয়) কিন্তু সরলতা ও ভক্তি এ দুয়ের মণিকাঞ্চন

*Thirty Years With G. B. S. by Blanche Patch (Chapter-The Mystic.)

যোগ না হ'লে তীব্র যন্ত্রণায়ও মন মুখ এক ক'রে এমন প্রার্থনার সুর বেজে উঠতে পারে না (বাণী) :

সম্পদের কোলে বসাইয়ে হরি সুখ দিয়ে এ-পরীক্ষে।
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

তাই মনে হ'ত আমার বারবারই তাঁর নানা ভক্তি-উচ্ছল গান গাইতে গাইতে যে, কান্ত কবি শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন সরল। পেশায় উকীল হ'লেও নেশা ছিল তাঁর গান—যার শেষ লক্ষ্য ছিল সরল একমুখী ভক্তি। তাই সংসারে এসেও তিনি শেষ পর্যন্ত র'য়ে গিয়েছিলেন অসংসারী, সমাজে থেকেও ভক্ত, সুখের কোলে মানুষ হ'য়েও চিরবৈরাগী। নৈলে কি তিনি বাঁধতে পারতেন এমন ঐকান্তিক অমৃততৃষ্ণার গান :

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে ?
কবে তাপিত এ-চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে ?
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা ?
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা ?
এ-দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে ?
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

যত দিন যায় ততই তাঁর মন বৈরাগ্যকেই বরণ করে, কিন্তু সে-নির্ভেজাল বৈরাগ্য—শুধু সংসারে বিতৃষ্ণা নয়—সেই সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ । (পরমহংসদেব বলতেন এরই নাম সত্যিকার বৈরাগ্য—ঈশ্বরে অনুরাগ না থাকলে সাময়িক বিতৃষ্ণার নাম দিতেন তিনি মর্কট বৈরাগ্য) তাই গেয়েছিলেন :

আমায় পাগল করবি কবে ?
(কবে) মা মা বলতে অবিরত ধারে দুনয়নে ধারা ব'বে ?
(আমার) পাগল মনের যত কথা মা তোরি সঙ্গে হবে
(আমার) প্রাণ রবে তোর চরণতলায় দেহ রবে ভবে।

কিন্তু বড় আধারের পরীক্ষাও বড়। ভাগবতে ভগবান্ বলিকে

বলেছিলেন : "যাকে আমি কৃপা করি তাকে আগে নিঃস্ব করি—ব্রহ্মন্! যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।" নইলে কি ভক্তরাজ রামপ্রসাদকেও অভিমান করতে হ'ত :

মায়ের এমনি বিচার বটে,
যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালেই বিপদ ঘটে!

কান্ত কবি ছিলেন বিশুদ্ধ ভক্ত। তাই ঠাকুর তাঁকে এমন নিদারুণ পরীক্ষায় ফেললেন—যে-পরীক্ষায় পাস করা চাট্টিখানি কথা নয়। অত্যধিক গান করার ফলে তাঁর কণ্ঠে হ'ল দারুণ ব্যাধি—কর্কটরোগ—ক্যান্সার। আমার পিতৃদেব তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন, আজও মনে আছে। বলেছিলেন : "ওরে! এ-ঘোর কলিতেও ভক্ত জন্মায় রে জন্মায়!—দেখে এলাম যা দেখবার মতো, যা কালেভদ্রে চোখে পড়ে : ঐ দারুণ রোগ কিন্তু মুখে কী নির্মল হাসি রে! কথা বলার শক্তি নেই, কিন্তু প্রণাম করল আমাকে তেমনিই প্রসন্ন মুখে! করুণা যার কাছে সত্য নয় সে এ পারে না রে, পারে না।"

এই ধরনের উচ্ছ্বাস সত্যিই প্রকাশ করেছিলেন পিতৃদেব। বলেছি, কান্ত কবি তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন করতেন। শিষ্যকে মৃত্যুশয্যায় দেখে এসে পিতৃদেব বলেছিলেন : "এমন ভক্তের গুরু হওয়াও ভাগ্যের কথা রে!"

কে অস্বীকার করবে? যে-গুণী অসহ্য যন্ত্রণায় নির্বাক্ হ'য়েও গান বাঁধে :

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে দূর···
যত বাধা ছিল সরায়ে দয়াল করেছ দীন আতুর।

জীবনের পথচলায় শোকে তাপে দুঃখে সুখে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে ভক্তির সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে অনেকেরই প্রাণে—কিন্তু ভক্তিকে সত্যি সাধনা ব'লে বরণ করতে নিতে পারে কজন? কজনের গানে জগন্মাতার ডাক বেজে ওঠে এমন প্রাণকাড়া সুরে :

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, টেনে নে কোলে
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা নয়নের জলে।

এ-পারা সহজ পারা নয়। গড়পড়তা মানুষও ভগবানকে চায়। স্কটের অবিস্মরণীয় কবিতাটিকে একটু বদ্‌লে লেখা যায়:

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said:
The Lord's my Home,
my Native land?

না, প্রতি হৃদয়েই ঠাকুর আছেন—তাঁকে হাজার চেপে রাখলেও তাঁর প্রেম অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের মতো থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে ওঠেই ওঠে, মন না ভেবেই পারে না (কান্ত কবির সুরে): "আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বরি হে।" মানি। কিন্তু সাধারণতঃ এ-বরণ পূর্ণ বরণ নয়। কারণ সাধারণতঃ মানুষ "দেবতা"-কে চায় আর পাঁচটার সঙ্গে জুড়ে তবে। অর্থাৎ, এ ও তা চাই, তার মধ্যে ভগবানও একটি। এর নাম ভক্তিসাধনা নয়। ভক্তিকে বহুলালন করলে তবেই হৃদয়ের অতলে অনাদৃত প্রেমের স্ফুলিঙ্গ গনগনে আগুন হ'য়ে উঠে অহংকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলতে পারে, আর তখনই কেবল মানুষ বলতে পারে: "আমি দেখি বা না দেখি বুঝি বা না বুঝি—সতত শিয়রে জাগো" (কান্তকবি—কল্যাণী)।

ভগবানকে এই-যে চাওয়ার মতো চাওয়া—আর পাঁচটার মধ্যে নয়, সব বজায় রেখে নয়, সব ছেড়ে, সব ছাপিয়ে—কি না শুধু তাঁকে চাওয়া নয়—আর কিছুই না চাওয়া—এরই নাম ভক্তিসাধনা। এই সাধনাকেই বরণ করেছিলেন কান্ত কবি—যে-ভক্তির কথা বলেছিলেন নারায়ণকে সমুদ্রে মজ্জমান প্রহ্লাদ (কান্তকবির আসন্ন মৃত্যুলগ্নে বাঁধা গানের সঙ্গে এ-প্রার্থনার আদল আছে):

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥
ধর্ম-অর্থ-কাম-সিদ্ধি-বর নাথ সে কি চায়
মুক্তি চির-আজ্ঞাধীন তার,
নিখিল বিশ্বের নিত্যনিধান তোমার পায়
বিরাজে অচলা ভক্তি যার?

কাজী নজরুল ইসলাম

(স্মৃতিচারণী তর্পণ)

কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ ক'রে এসেছি অনুজের মতন। সেও আমাকে বরাবর অগ্রজের মতনই মান দিত ভালোবাসত। অতি সরল প্রশ্নহীন একমুখী ছিল সে ভালোবাসা। তার স্বভাবের গতিই যে ছিল একমুখী সরল। তার নানা গানই আমি গাইতাম ব'লে সে পরমানন্দে তার "বুলবুল"-এর উৎসর্গপত্রে আমাকে বরণ করেছিল এই ব'লে :

আমার শুধু এ-বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ-গান।
তুমি তারে দিলে রূপরঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ।
আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে-গানের বুলবুলি,
আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি।
আমার পাখীর কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে
আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হ'য়ে।

বেদনা পেয়েছিল সে—কারণ আমি হঠাৎ সংসারের নীড় ও গানের আগুন ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে চলে যাই পণ্ডিচেরি। তার আরো ব্যথা ছিল আমি গানের প্রচার ছেড়ে দিলাম যোগের নীরবতা বরণ ক'রে। অবশ্য নীরব আমি কোনো দিনই হইনি, (বরং আরও প্রকাশ-সমৃদ্ধিই লাভ করেছিলাম) কিন্তু সে ভয় পেয়েছিল ভেবে যে, আমি মৌনী হ'লাম ব'লে। তাই লিখেছিল দুঃখ ক'রে এসব কথা। কারণ এর আগে সে লিখেছিল তার অপরূপ ঢঙে আমাকে সম্বোধন ক'রে :

পূরবের তরুণ অরুণ পূরবে আসলে ফিরে,
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায় হিমানীর শৈলশিরে।
কুহেলির পর্দা ডারি'
ঘুমাত রূপকুমারী
জাগালে স্বপনচারী তাহারে নয়ননীরে।

তোমার ঐ তরুণ গলার শুনি গান সিন্ধুপারে,
দুলিত মধ্যমণি সুরমার কণ্ঠহারে।
খেয়ানী দিলে ধরা
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা.
এলে কি পাগল ঝোরা পাষাণের বক্ষ চিরে?

এ-গান দুটির উল্লেখ করলাম ভূমিকা হিসাবে—জানাতে সে কেমন উদার ছিল—যাকে বলা চলে সুন্দরের মনের মানুষ নৈলে কি এমন সুরেলা গান তার কণ্ঠে উৎসারিত হ'তে পারত?

আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি সংক্ষেপে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে তার স্মৃতি-সভাবাসরে। স্মৃতি মানে সে যা ছিল তার স্মৃতি। কারণ এখন সে তো থেকেও নেই—জীবন্মৃত।

আমি তাই আজ এ-সভায় সংক্ষেপেই বলব শুধু তার গুণের কথা প্রেমের কথা সৃষ্টির কথা মহৎ প্রাণের কথা—যা শুনলৈ সকলের মন খুশী হয় হৃদয় গৌরবে ভ'রে ওঠে ভাবতে যে এমন একজন গুণী আমাদের মধ্যে জন্মেছিল যার ওজস কারুণ্য দরদ স্নেহ শুধু যে তাকে মানুষ হিসেবে সুন্দর ক'রে তুলেছিল তাই নয়, কবিহিসেবেও বরণীয় ক'রে সাজিয়েছিল—শেষে বিশেষ ক'রেই বলব তার ভক্তি সঙ্গীতের কথা যার রসে সে আমাদের আবিষ্ট ক'রে তুলতে পারত এ নাস্তিক যুগেও। এইখানে তার কৃতিত্বের কথা মনে ক'রে আমার মন সানন্দ বিস্ময়ে ভ'রে ওঠে।

সব আগে মনে পড়ে তার দিলদরিয়া প্রাণের কথা। এমন প্রাণ নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়। মজলিশি সভাসদ, হাসিগল্পের নায়ক, ভাবালু গায়ক, বলিষ্ঠ আবৃত্তিকার, বিশিষ্ট সুরকার, গুণীর গুণগ্রাহী, উদার সরল মানুষ—যে রেখে ঢেকে কথা কইতে জানত না—যখনই আমাদের সভায় আসরে আসত আসত ছুটে, হেঁটে নয়—অট্টহাস্যে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে, এসেই জড়িয়ে ধরত "দিলীপদা" বলে—এমন মানুষ কটাই বা জীবনে দেখেছি?

এক সময়ে আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরনে চললো গোরী, এত জল ও কাজল

চোখে, কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর চেও না সুনয়না এ-নয়নপানে, কেন দিলে এ-কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে, কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে, নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া, আমাকে চোখ ইসারায় ডাক দিল হায় কে গো দরদী, করুণ যেন অরুণ আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু, প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল—সে-খাতাটি আজো আছে। কাজীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্মৃতির মাধ্যমে চাখতেই এ-কথার উল্লেখ করলাম—আশা করি এ-উৎসাহ নিন্দনীয় ব'লে গণ্য হবে না তার জন্মোৎসব-বাসরে।

তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, সে তার গানে সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দেই দিত যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ বরাবরই ছিলেন আমার দিকে। তাই তো "বুলবুল"-এর উৎসর্গে কাজী আমাকে লিখেছিল :

> যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
> ওগো গুণী, তুমি জড়ালে তাহারে সব বুকে, সবখানে।
> বুকে বুকে আজ পেল আশ্রয় আমার নীড়ের পাখী,
> মুক্ত পক্ষ উড়িতে যে চায় কেন তারে বেঁধে রাখি ?

সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামে বেঁধে রাখলে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রুক্ষ ক্রিটিকদের মাথা-নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল যে তার "বুলবুল" কাব্য গ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকে উৎসর্গ করে। সে-যুগে আমার বাংলা গানের পাঁচটি ধারা ছিল : পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের, কাজীর ও আমার নিজের। পণ্ডিচেরী চলে আসার আগে আমি সবচেয়ে বেশি গাইতাম অতুলপ্রসাদ ও কাজীর গান। মনে পড়ে কত আসরে এ-দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে শুনিয়েছি তাঁদেরই রচিত গান। এ-সৌভাগ্য কজন গায়কের

হয়েছে জানিনা। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ-স্মৃতি থাকবেই অনপনেয়—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ শ্রোতা তথা সমজদার।

কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে—রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া:

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকলপরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

রামমোহন লাইব্রেরিতে, ওভারটুন হলে ও য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে আমি মাঝে মাঝেই "চ্যারিটি কনসার্ট" দিতাম নানা অর্থার্থীব সাহায্যার্থে। সেবার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে—ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন—বিশেষ যখন সে গাইল:

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা,
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচাবকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এই উপমা প্রেরণা আসে উপব থেকে—যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry-তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এম্‌নি প্রেরণা নেমে এসেছিল তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহ-বন্দনায়:

আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল,

সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হ'য়ে। এর পরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হ'ত বরাবরই :

বল বীর, বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি' আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

বিদ্রোহী হওয়া এ-সংসারে সহজ নয়। মানুষ পারৎপক্ষে কাউকে বলতে চায় না যে, সে অন্যায় করেছে। থাকতে চায় নিজেরটি নিয়েই সুখে দুঃখে—they take life as they find it—বলে সাহেব পুরাণে। কিন্তু কাজী ছিল স্বভাববিদ্রোহী—born rebel : মেলামেশায় দহরম মহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া। অত্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি এঁরা দুজনেই ছিলেন খড়্গহস্ত।

কিন্তু কাজীর বিদ্রোহ ছিল যেন আরো অগ্নিময়, ঘরোয়া, তীব্র। যখন সে গাইত তার ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলিয়ে :

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া !
ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া !
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই ?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মা-র মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া !

—তখন আমাদের বুকের মধ্যে কিসের বান ডেকে যেত বলা ভার—দুঃখ, খেদ না ভণ্ডামির প্রতি ক্রোধ, কুসংস্কারের লজ্জা? কেবল একটা কথা বলা যায় : যে, আমরা সবাই অভিভূত হ'য়ে পড়তাম তার আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গিতে : এ-ধরণের চরণ কি স্বভাবপ্রতিভাধর ছাড়া আর কারুর কলমে এমন স্বত-উৎসারে বইতে পারে? কাজী বিদ্রোহী কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তার বিদ্রোহে মানুষের মনে ছোঁয়াচ লাগত এত ব্যাপক ভাবে। কত সভায় এবং চারিদি

কনসার্টেই না সে আমাদের গানের পরে এই ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়। কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না—আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ-মনমরা যুগে? সত্যিই আমাদের অবাক লাগত ভাবতে ভাঙা গলায়ও কাজী কোন্ জাদুতে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন—ভাবের ঢলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্ণা বইয়ে!

একটা টুকরো স্মৃতি মনে প'ড়ে গেল: সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল: 'ভাই, জেলে যখন ওয়ার্ডারে লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব! তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান:

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ-বেদী!

মান্দালয় থেকে একটি পত্রে সে কতকটা আভাষ দিয়েছিল একবার। লিখেছিল (২ মে, ১৯২৫):

'I do not think that I could have looked upon a convict with the authentic eye of sy. pathy had I not lived personally as a prisoner. And I have not the least doubt that the production of our artists and literateurs, generally, would stand to gain in ever so many ways could they win to some new experience of prison-life. We do not perhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi Nazrul Islam's verse to the living experience he had of jails."

(ভাবার্থ: "আমি কয়েদীদের দরদী হ'তে পারতাম না যদি না জেলে যেতাম। আমার মনে হয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও অনেক কিছু লাভ হবেই হবে যদি তাদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। কাজীকে জেলে যেতে হয়েছিল—এ-অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বোধহয় আমরা আজো উপলব্ধি করি নি।")

একথা পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে

যে, জেলে না গেলে কাজী কখনই লিখতে পারত না এমন প্রাণজাগানিয়া চরণ :

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুঞ্জয়ের ফল।

সেদিনও দিল্লীতে নেতাজী-স্মৃতি সভায় গেয়েছিলাম কাজীর একটি গান যা সুভাষ অত্যন্ত ভালবাসত :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।

কাজী যখনই এ গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হ'য়ে উঠত—বিশেষ ক'রে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে :

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান?

ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার এ-চরণটি ধরতে না ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভ'রে ওঠে। এ-জাতীয় চরণ কলাকৌশলে আসে না, কাব্যসাধনায়ও নয়—আসে কেবল অলোকলোকের প্রেরণার অবতরণে। কাজীর নানা কবিতায়ই পাওয়া যায় এই দিব্য প্রেরণা—বিশেষ ক'রে ওর নানা ভক্তির গানে। তাই ওর ভক্তির গানের কথা বলি—আরো এই জন্যে যে, ওর সঙ্গীতে ভক্তির অবদান সম্বন্ধে ওর ভক্তবৃন্দ প্রায় সবাই নীরব।

নীরব এই জন্যেই যে, সাহিত্যের রাজসভায় এ-যুগে ভক্তির গানের কোনো সত্যিকারের আদর নেই। আমি পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে যখন কলকাতায় ভক্তির গান গাইতাম, তখন এক সাংঘাতিক ইদানীন্তন কবি হেসে মন্তব্য করে ছিলেন : "দিলীপবাবুর ওসব কৃষ্ণ-রাধা শিব-দুর্গার গান এ-যুগে অচল।" এ কথা শ্রীঅরবিন্দকে লিখে জানাতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন পাল্টা হেসে :

"But what a change in India! Once religious and spiritual

poetry held the first place—Tukaram, Mirabai, Tulsidas, Suradas, Kavir, Tyagarj, the Tamil mystic poets and a number of others —and now spiritual poetry is not poetry, altogether 'achal' !! But luckily things are 'sachal' in this world and this 'movability' may bring back the older and sounder feeling."

(ভাবার্থ: "ভারতবর্ষে কী দারুণ যুগই এসেছে! একদা ভক্তি-কাব্যের স্থান ছিল সবার উপরে—তুকারাম, মীরাবাই, তুলসীদাস, সুরদাস, কবীর, ত্যাগরাজ, তামিল ভক্তকবিগোষ্ঠী ইত্যাদি—আর আজ ভক্তিকাব্য হ'য়ে দাঁড়ালো কি না "অচল" !! তবে এক ভরসা এই যে দিনদুনিয়ায় সবকিছুই "সচল"। তাই হয়ত এই সচলতার ফলেই বিগত যুগের গভীরতর মূল্যায়ন ফিরে আসবে।")

অনেকের ধারণা—কাজী ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন ব'লেই তাঁর মাথা খারাপ হ'ল। একদা শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রীর এই উক্তি কোনো ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলতে তিনি হেসে বলেছিলেন যে, যিনি চৈতন্যময় করুণাময়—যাঁর আলোতে ভুবন আলো—তাঁকে চিন্তা ক'রে কি কেউ পাগল হ'তে পারে? (ঠাকুর "বেহেড" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দ্রষ্টব্য)।

উদ্ধৃতিটি অবান্তর নয়—আরো এই জন্যে যে, আমার মনে হয় কাজীর প্রতিভার পরম পরিণতির পূর্বে সে যেসব মধুর ভক্তির গান বেঁধেছিল তাদের আদর হয় নি আজো। কাজী নিজে আজ এ গানগুলি তার চমৎকার আবেগময় সুরে গাইলে আজ অনেকেই হয়ত বুঝবার কিনারায় আসতেন যে, কাজীর মধ্যে ভাগবতী করুণার অবতরণ হয়েছিল ব'লেই সে শতাধিক ভক্তির গান না বেঁধে পারে নি। এদের মধ্যে অনেকগুলি গানেরই ভাব ভাষা ছন্দ অতি মর্মস্পর্শী। দু-একটা উদাহরণ না দিলেই নয়। তার একটি গান আছে:

তুই পাষাণগিরির মেয়ে হলি পাষাণ ভালোবাসিস ব'লে।
মা, গলবে কি তোর পাষাণ হৃদয় তপ্ত আমার নয়নজলে?

আন্তরিকতায় মন ভিজে ওঠে শুধু পড়লেই, না জানি সুরে শুনলে

আরো কত সহজে মন গলত! এর পরেই একটি শ্লোকের বাঁধুনি কী যে মধুর!—

কোটিভক্ত যোগী ঋষি ঠাঁই পেল না তোর চরণে
তাই ব্যথায়-রাঙা তাদের হৃদয় জবা হ'য়ে ফোটে বনে।

কিন্তু শুধু মধুর গানই তো নয়, কাজী ছিল শক্তিমান্ পুরুষ—তন্ত্রের পরিভাষায়, স্বভাবশাক্ত, তাই তো পারল এমন বলিষ্ঠ চরণের সঙ্গে কোমল ভাবের জোড় মেলাতে ঃ

তোর শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা।
দিব্য জ্যোতির দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথাহত শ্বেত শতদলের ম'ত
পুষ্পাঞ্জলি হ'য়ে মা তোর উঠবে ফুটে সেই সাগরে,
ভাগীরথী ধারার ম'ত সুধার সাগর পড়ুক ঝ'রে।

ইংরাজী ভাষায় কাব্যের শিখর গানের শিখরের চেয়ে উঁচু। ওদের শ্রেষ্ঠ বাণী মেলে কাব্যে—বিশেষ ক'রে অমিত্রাক্ষরে। কিন্তু ভারতে—আরো বেশি করে বাংলা দেশে—কাব্যের শিখর-মহিমা দীপ্ত হ'য়ে ওঠে গানেই বলব। এ আমার কথা নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা। আমার পিতৃদেবের মুখেও শুনতাম এই কথাই। একদিন বলেছিলেন তিনি ঃ "ওরে পরে বুঝবি আমি কী সব গান রেখে গেলাম।" রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই বলতেন—তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাঁর গান। মহাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ একথায় পুরোপুরি সায় দিতেন।

এ সম্বন্ধে আমি আমার "স্মৃতিচারণ"-এ লিখেছি যে, বাঙালী কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই ফুটে উঠেছে তার গানে। বাংলাদেশের মাটি গানের অশ্রান্ত জোয়ারে আজও উর্বর। শুধু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, শশিশেখর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্তগীতকারেরাই নন শত শত আউল বাউল সারি ভাটিয়ালি কথকতা বর্গীয় ভক্তিসঙ্গীত আমাদের মনের আকাশে বাতাসে নিরন্তর চলাফেরা ক'রে আসছে যার ফলে একটু উর্ধ্বদৃষ্টি হ'তে না হ'তে আকাশের সত্যও আমাদের মনের কানে কানে কথা কয়, আর অমনি

শ্রেষ্ঠ বাঙালী ভক্ত-কবির মন গান গেয়ে ওঠে—(দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়):

এখন বড় শ্রান্ত আমি ওমা কোলে টেনে নেনা
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

কাজীর ছিল এই শ্রেণীর শিশুসরল মন—স্বভাবপ্রবুদ্ধ কবিপ্রাণ, সহজ বিশ্বাসী অন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা; যার আবাহনে দিগন্তে অসীমের শুভ্রালোকের সঙ্গে মর্ত্যের অসীম আঁধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম নিত, অনন্যতন্ত্র ছন্দ-ভাষার কল্পলোকে। একথার একটি পরম পরিচয় আমি সে-যুগেই পেয়েছিলাম যখন সে ধর্মের দিকে পা বাড়ালেও সীমান্ত পেরোয় নি। লিখেছিল একটি অপরূপ সপ্তমাত্রিক শিবস্তোত্র, বসিয়েছিল মালকোষ ধামারে। এ-গানটি আমার ও অতুলপ্রসাদের একটি বিশেষ প্রিয় গান ছিল, আমি গাইতাম প্রায়ই তাঁর কাছে। শিবের এমন উদাত্তঝঙ্কার স্তোত্র এ যুগে সত্যিই বিরল:

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।
সে-নাচহিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন প্রাঙ্গনে,
আকাশে শূল হানি' শুনাও নববাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী প্রসীদ শম্ভু!
ললাট-শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি',
সে-শশী-চমকে গো, বিজলি ওঠে ঝলি',
কাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা,
আঁধারে পথহারা চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা ধরা নিরম্বু।

মিল ছন্দ উপমা সব জড়িয়ে কী অপূর্ব ছবিই না ফুটে উঠেছে এ-জমকালো গানটিতে।—পাখোয়াজে ধামারে গাইতে গাইতে শুধু যে আমিই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তাই নয়, শ্রোতাদেরও মন সম্ভ্রমে ভ'রে

উঠত যার ইংরাজী নাম awe। এমন শক্তিস্পন্দিত গান বাংলাভাষায় বিরল। তাই আরো দুঃখ হয় ভাবতে যে, কাজী তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের মধ্যাহ্ন-লগ্নেই নীরব হ'লেন কর্মফলে—যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুরূহ। সাধনার পথে সাধকের বিশেষ সাবধান হ'তে হয়। কিন্তু সে অন্য কথা।

এর পরেই তার জীবনের মোড় ফিরল ভক্তিসাধনার দিকে। ফলে একের পর এক কত গানই না সে বাঁধল! আমি ঠিক এই সময়েই পণ্ডিচেরি প্রস্থান করি বলে কাজীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর হয় নি। পণ্ডিচেরি থেকে এসে একবার মাত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বড় শোকাবহ পরিবেশে। তার বর্ণনা নিষ্ফল—তাই যাতে লাভ আছে তাতেই মন দিই, বলি কাজীর ভক্তিসঙ্গীতের কথা। তার সব গান রসোত্তীর্ণ না হ'লেও বহু গানই উদ্ধৃতিযোগ্য, স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটির কথা বলব। কিন্তু একটু ভূমিকা আছে।

মানুষের মনে যখন প্রথম বৈরাগ্যের সুর ভেসে আসে, তখন সংসারের খেলা মনে হয় মায়ার খেলা। পরে সে দেখে যে, মায়া নয় কিছুই, কিন্তু মায়াকে পেরুতে হ'লে নেতি-নেতির পথ নিতে হয় অনেক সময়েই। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও এ-সুর বেজেছিল তাঁর অনেক গানেইঃ শুধু দুদিনের খেলা, আমার আমার ব'লে ডাকি, জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল · ইত্যাদি। কাজীর গানের মঞ্জুষা ঢুঁড়লে এ-শ্রেণীর উদাসী গান নিশ্চয় মিলবে একের পর এক। আমি শুধু দুটি উদ্ধৃত করি (বুলবুল):

এ-কূলভাঙে ও-কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা
(রে ভাই) এইতো বিধির খেলা।
সকালবেলা আমীর রে ভাই, ফকীর সন্ধ্যাবেলা ॥
(সেই) নদীর ধারে কোন ভরসায়
(ওরে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়
(যখন) ধরল ভাঙন পেলিনে তুই পারে যাবার ভেলা ॥
(এই) দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
(যে) কুমোর গড়ে সেই দেহ—তার খোঁজ নিল না কেহ।

(রাতে) রাজা সাজে নাটমহলে
(দিনে) ভিক্ষা মেগে পথে চলে
(শেষে) শ্মশানঘাটে গিয়ে দেখে—সবই মাটির ঢেলা।
এই তো বিধির খেলা রে ভাই, ভবনদীর খেলা।।

সংস্কৃতে বলে: "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।" সংসারের সব কিছুই চঞ্চল ক্ষণিক—"নলিনীদলগত জলমতিতরলম্—তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"—পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতন মানুষের জীবন টলমল টলমল করছে, কখন ঝ'রে যাবে পাঁপড়ির সঙ্গে, কেউ কি জানে? যেখানে সব কিছুই অস্থায়ী সেখানে মানুষের মন ব্যথিয়ে ওঠে, বলে—ক্ষণিকের হাটে কিসের বেসাতি করব?—আমি যে চাই চিরদিনের সঙ্গে লেন দেন—ইংরাজীতে একটি বিখ্যাত গান আছে:

Abide with me, fast falls the eventide
The darkness deepens, Lord, with me abide!
Change and decay in all around I see,
O thou who changest not, abide with me!

থেকো প্রিয়, পাশে—সাঁঝছায়া আসে নেমে
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে।
সকলি ফুরায়ে যায় কাল সবই নাশে,
হে চিরন্তন, থেকো হে আমার পাশে।

এ ভাব বিশ্বজনীন, কেননা মানুষের অন্তরে শাশ্বতের জন্যে পিপাসা সার্বভৌম, দুরাশা সর্বকালীন। ফরাসী ভাষায় একটি নিটোল সুন্দর গান আছে মানবজীবনের সব কিছুরই এই ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে:

La vie est vaine!
Un peu d'amour,
Un peu de haine,
Et puis bonjour!
La vie est brève!
Un peu d'espoir,
Un peu de reve
Et puis bonsoir!

জীবন বিফল মেলা!
একটু বিরাগ-দ্বেষ,
একটু প্রেমের খেলা
তারপরে দিন শেষ।
ক্ষণিক হায় জীবন!
একটু আশার বাতি,
একটু সুখ-স্বপন,
তারপরে ছায় রাত্রি।

আমার বলবার উদ্দেশ্য—এ-মায়াবাদ শুধু আমাদের দেশেরই জীবনবেদ নয়, দেশে দেশে কালে কালে বহু শ্রেষ্ঠ মনই এ-গান গেয়েছে নানা সুরে নানা তালে, আর তাতে বহু বিকশিত মন সাড়া দিয়েছে এই জন্যেই যে, ভগবানকে না পেলে সত্যিই মনে হয়—"জীবন বিফল মেলা" —Vanity vanity all is vanity। তাই ভগবানের মোহানার দিকে তীর্থযাত্রা শুরু হয় সব দেশেই এই মূল বৈরাগ্যের তাগিদে যে, এ-জীবনকে একান্ত ক'রে ধ'রে রাখতে চাইলে সে ফস্কে যায় ব'লে জীবনের ওপারে কোনো শাশ্বত বস্তুকে পেতেই হবে যে ক'রে হোক। এমন কি বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তিবাদকে যিনি নামঞ্জুর করেছিলেন মনের এক বলিষ্ঠ মুড-এ তিনিই আর এক উদাস মুড-এ লিখেছেন ঃ

এই কথাটা ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে
যে-পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে।

অথবা

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।

অতুলপ্রসাদের নানা গানেও এ উদাস সুর বেজে উঠেছে (গীতিগুঞ্জ) ঃ

ওগো সাথী, চিরসাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমিররাতে।

রজনীকান্তের নানা গানে এ-বৈরাগ্যের সুর আরো পরিস্ফুট ঃ

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল নন্দনে ?
কবে তাপিত এ-চিত হইবে শীতল তোমার করুণাচন্দনে ?

রবীন্দ্রনাথের বৈরাগ্য-বিমুখ সুরে যাঁরা বলীয়ান্ হ'য়ে এ-উদাস সুরকে নকল করতে চান তাদের তিনি শুধু তাঁর নানা অলৌকিক গানেই নয় নানা উদাস মিসটিক কবিতায়ও নির্ভরসা ক'রে দিয়েছেন এই বৈরাগ্যকেই বরণ ক'রে। যথা :

বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হেথা নয় আর কোনো খানে।

কাজেই যাঁরা বড় গলা ক'রে বলেন—কবিগুরুর জীবন দর্শনে শুধু একটি মাত্র ঐহিকতার পৃথ্বীবিলাসের সুর বেজেছে, তাঁরা ভুল বলেন। সব দেশেই জীবনের চঞ্চলতা, মানুষের নানা হীনত্ব, নীচতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, পথচলায় কাঁটাবন, নিয়তির অবিচার, শক্তির অত্যাচার, হাত বাড়িয়ে না পাওয়ার বেদনা, কূলে এসে তরী ডোবার কারুণ্যের দৃশ্য আবহমানকাল আমাদের মনের এই চিরন্তন চাপা কান্নাকে ফুটিয়ে তুলেছে যে, জীবন কথা দিয়ে কথা রাখে না, "যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই" যা পেয়েছি তাতে মন ভরে না, এমন কি পেলে দেখি যে, সবই ছায়াবাজি, তাই প্রাণের চিরন্তন কান্না :

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।

কাজীর কবিমন বিকশিত মনের কোঠায় পড়ে। তাই তো তার জীবনে যশের দীপ্ত শিখরমুহূর্তেও এই ছায়ার সুর বার বারই বেজে উঠত যে, জীবনেও সব কিছু পেলেও মন হাৎড়ে বেড়ায় এমন কিছু পেতে যা না পেলে সব পাওয়াই ব্যর্থ মনে হয়, মানুষকে হাজার ভালোবাসলেও তার পরে পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না, তাই হে পরম অচিন-চেনা বন্ধু। তুমি এসো, না এলে মিটবে না আমার পিপাসা, সংসারের নিটোল সমৃদ্ধির মাঝেও মনে হবে নিজেকে নিঃস্ব, যাই কেন না রচি বহু যত্নে হ'য়ে উঠবে

তাসের ঘর, নীড় হ'য়ে উঠবে কারাগার। তাই গাইল সে যশের জয়াভিযানের আলোকলগ্নেই (গীতিশতদল) :

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু, আর তো হব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি এক জাগো ধ্রুবতারা।···
ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে।
আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয়, ল'য়ে বাঁচাও এ-বন্দীরে।
কী হবে ল'য়ে এ-মায়ার খেলনা, কী হবে ল'য়ে এ-তাসের ঘর ?
ছুঁতে ভেঙে যায়, তবু শিশুপ্রায় ভুলাও মোদেরে নিরন্তর।

তাই গাইলেন কাজী আকুল কণ্ঠে :

ডাকি' লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ নন্দন লোকে
শান্ত হোক এ-ক্রন্দন, আর সহে না এ-বন্ধন কারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।

কিন্তু সাধারণতঃ, যারা অল্পের বেসাতি ক'রেই তৃপ্ত থাকে তাদের কানে "নাল্পে সুখমস্তি"-র শঙ্খধ্বনিও বাজে না, বৃন্দাবনের অকূলবাঁশির আয় আয় ডাকও তাদের কূল ছাড়ায় না। এখানেই আসে ভগবানের কৃপার কথা : যাকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁর শরণ পায়। এ কথা উপনিষদে বলেছে সে কবে : "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" অন্যভাবে বললে বলা যায় যাদের মন বেশি বিকশিত (evolved) তারাই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অভিসারে উধাও হ'তে চায়। আর এ-উধাও হবার প্রথম পদক্ষেপ হয় বৈরাগ্যেরই টানে। তাই "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়" একথা রবীন্দ্রনাথের মুখে মানালেও বিধু সিধু যদু মধুর মুখে মানায় না, যারা পুঁজি আঁকড়ে থাকতে চায় ভয়ে ভয়ে—তাদের রবীন্দ্রনাথও কিছু কম ধম্‌কান নি :

সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে থাকিসনে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ আঘাত পেতেই হবে,
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি ছুটি তোরে পেতেই হবে।

কাজীর মন এ-জাতের নয়, ভয়ে ভয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে থাকার পাত্র সে নয়, সে এ-পারে আদৌ তৃপ্তিই পায় নি যে, কেমন ক'রে

বলবে—আমি যা পেয়েছি তাই নিয়ে ঘর করব? তাই তার ভক্তপ্রাণ কেঁদে উঠল (গীতি শতদল):

কেমন তব রূপ দেখি নি হরি,
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,
হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি'
বুঝিতে পারি না—তাই কাঁদে প্রাণ।

এ "কথামালা গেঁথে করতালি পাওয়া'র আশা নয়, এরই নাম খাঁটি দুরাশা, অভীপ্সা—aspiration: আমি তোমাকে যে-রূপে কল্পনা করছি তাতে তুমি খুশী তো? না হ'লে আমি কী করব প্রভু! কেমন ক'রে তোমার পূজা করব? তুমি প্রসন্ন না হ'লে যে আমার গতি নেই।—

তোমারে কী দিয়ে পূজি ভগবান্!
বুঝিতে পারি না তাই কাঁদে প্রাণ।

সাধনার পথ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এমনি অভিজ্ঞতা প্রায়ই হয় (যদিও সব সময়ে নয়) যে, তাঁরা কোনো কবিতা বা গানের মধ্যে লেখকের অন্তর উপলব্ধির স্পন্দন গভীর ভাবে অনুভব করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের নানা ভক্তির গানেই এই স্পন্দন স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই যেসব কবির নামডাক হয়েছে তাঁদের সবাই চলেছেন দেখা যায় "শিল্প শিল্পের জন্যে" (art for art's sake) এর মন্ত্র জপ ক'রে—তথাকথিত সুন্দরের অভিসারে। কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের জন্যে সুন্দরের পানে এ-অভিসারে শিব সত্যের সঙ্গে যোগ না হ'লে মানুষ কৃতার্থ হ'তে পারে না, অল্পের পসারীই থেকে যায়। তাই এ-জাতীয় সৌন্দর্য-সর্বস্বতা তাঁদের মন টানে না যাঁরা কবিতায় (বা বিশেষ ক'রে গানে) খোঁজেন অন্তরাত্মাব অসীমতৃষ্ণার কোনো অভিব্যক্তি। অবশ্য এই শ্রেণীর সন্ধানী কম সব দেশেই। তাই কবিতায় বা গানে ভক্তির বা সুদূরাশার কোনো পরিচয় না পেলে খুব কম লোকই মনে করেন কোনো বড় অভাব রয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা ভালোবাসেন গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, অর্থাৎ ভক্তিসঙ্গীত, তাঁরা কেমন ক'রে এই ভাবের দৈন্যকে বরণ করবেন পরম শিল্প ব'লে? তাঁরা চাইবেনই চাইবেন গানে অন্তরাত্মার এই পরম আকুতি যা যে-চারজন কবির নাম করলাম তাঁদের পরে পাই কেবল

কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী ও কবি নিশিকান্তের গানে। নিশিকান্তের তেমন নাম ডাক হয় নি কারণ তিনি ভক্তি ছাড়া আর কোনো রসের পরিবেষণ করেন না বললেই হয়। তাঁর জীবনদর্শন হ'ল (অলকানন্দা)

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা
দূর করো তার গভীর প্রবাহে প্রমত্ততা।...
কী হবে ভাষায়ে অকারণে শাদা মেঘের ভেলা ?
কী হবে আকাশকুসুমের রঙে রাঙায়ে বেলা ?
যে-কুসুম ফুটে ওঠে আঙিনায়
তাই দিয়ে যেন অর্ঘ সাজায়
তার প্রতিদলে পরশিয়া দাও তন্ময়তা।

কবিরে তোমার গাহিতে শিখাও গভীর কথা। এর ভাষ্য করা যেতে পারে এই ব'লে :

আমার সকল খোঁজার যখন হ'ল শেষ,
তোমার অপার আভাষ পেলাম যে এ-পারে,
চেয়ে তোমার আলোর পানে নির্ণিমেষ
আলো এ-সংসারের ডুবল অন্ধকারে।
আর রইল না তো দ্বন্দ্ব সে-লগনে
যখন উঠল তোমার প্রেম কুসুমি' মনে,
আমার অন্তর গান উঠল গেয়ে—যখন
দিলে রাঙা পায়ে ঠাঁই তুমি আমারে ;
আমার যা কিছু সব লুটে যখন নিলে,
এ-প্রাণ চলল শুধু তোমার অভিসারে।

কাজীরও জীবনে এল এই পরম বিকাশ, গভীর কথা গভীর সুরে বলার পরম অভিসারের লগ্ন। তখন রইল না আর বিষাদ ব্যথা, বিরহের আবাহনে মিলনীর আভাষ মিলল—হোক না ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু মিলল তো, জানিয়ে দিলেন তো তিনি—কাজীর ভাষায় (গীতিশতদল) :

সখি যায় নি তো শ্যাম মথুরায়...
সে যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়

মোর অন্তরতম আছে অন্তরে,
অন্তরালে সে যাবে কোথায় ?
আছে ধেয়ানে স্বপনে জাগরণে মোর
নয়নের জলে আঁখিতারায়।

সাধনজীবনে বিরহ আসে বারবারই, মিলনের আভাষ পাওয়ার ঠিক পরেই। এই আভাষ পাওয়ার লগ্ন মনকে মাধুর্যে জারিয়ে তোলে। কিন্তু এ মাধুর্যের প্রকাশ মর্মস্পর্শী হয় কেবল তখন যখন সাধক হ'ন প্রতিভাধর কবি—যেমন কাজী। এই ধন্য লগ্নে কাজী কয়েকটি অপরূপ গান বেঁধে গেছে—যদি আজ সে-কণ্ঠ নীরব না হ'ত তা'হলে সে এমন গান আরো কতই না বাঁধত। কিন্তু যা পাইনি তার খেদ রেখে তার কাছে যা পেয়েছি তারই খবর দেওয়া ভালো—কেন তার কবিকণ্ঠ নীরব হ'ল সে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ?

কাজী এই প্রাপ্তির লগ্নে বেঁধেছিল একটি অপূর্ব গান ঃ

বলরে জবা বল ঃ
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণ তল ?
মায়া তরুর বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল।

কোটি গন্ধকুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা-র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা ?
তোর ম'ত মার পায়ে রাতুল হব কবে প্রসাদী ফুল
কবে তোরই ম'ত রাঙবে আমার মলিন চিত্তদল ?
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল।

সব কিছুতেই কবি পেতে সুরু করেছেন মায়ের পায়ের পুলক-পরশ—যার ফলে তার হৃদয়ে জেগে উঠেছে রঙিন হ'য়ে ওঠার পরম কামনা। কী সুন্দর তথা সত্য উপলব্ধি !

কিন্তু বলেছি, এই উচ্ছল আনন্দের আভাষ স্থায়ী হয় না যতদিন না আমাদের প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই আসে বিরহ।

এরি তো নাম চির-পলাতকের সঙ্গে চির-সন্ধানীর লুকোচুরি খেলা। কিন্তু তবু একবার আভাষ পাওয়ার পরে যে-বিরহ আসে তারও রূপান্তর হয়। কারণ এ-মিলনের আভাষ পেলেও দুনিয়ার চেহারা বদ্‌লে যায়, ফলে বেদনা ব্যথা দিলেও আর নিরাশা আনে না। কেন না তখন যে অন্তর হ'য়ে ওঠে একান্ত। বিরহিণী লোভী হিয়া তখন আর কিছুই চায় না, শুধু তার এক ধ্যান এক জ্ঞান—গায় সে শুধু—দেখা দাও, তার জন্যে কলঙ্ক হয় হোক, সব ছাড়তে হয় ছাড়তে আমি রাজী—কাজীর ভাষায় (গীতিশতদল):

বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে এসো কিশোর বংশীধারী।
চূড়ায় বেঁধে ময়ূরপাখা, বামে ল'য়ে রাধা প্যারী।
আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারেব সাজে,
নয়নজলের যমুনাকে উজান বেয়ে ছুটুক বারি।
এম্‌নি চোখে তোমায় আমি দেখতে যদি না পাই হরি,
দেখাও পদ্মপলাশ-আঁখি! তোমার প্রেমে অন্ধ করি'।
ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ী,
পরাও তিলক কলঙ্কেরি,
"শ্যাম রাখি কি কূল রাখি"—শ্যাম হে, আর সইতে নারি!

কাজীর সম্বন্ধে আরো কত কথাই বলার ছিল। কিন্তু একটি নিবন্ধে অত ভার সইবে না। তাই তার ছন্দের কলি, সুরের বৈশিষ্ট্য, আনন্দের নানারঙা রূপ, উপলব্ধির পথে ভক্তির অনন্যতন্ত্র গতি—আরো কত কী বলা হ'ল না। নাই হোক। আরো কত গুণী দরদী রসিক আছেন তাঁরা বলবেন কাজীর এসব কীর্তির কথা, অবশ্য ভক্তি বাদ, ও যে অচল!

আমি শুধু শেষে কাজীর প্রাণের একটি মূল ধুয়া উদ্ধৃত ক'রে শেষ করি—যার নাম আমি দিতে চাই শাস্ত্রেরবাণী নয়—হৃদয়ের বাণী। কাজী ছিল না বুদ্ধিবাদী। তার একমাত্র নিকষ ছিল হৃদয়। এখানে তার ভুল হয় নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলেছে যে, সত্য ও শ্রদ্ধার পীঠস্থান মগজ নয়—হৃদয়:

হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি
হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতি

এই হৃদয়ের বাণী কাজী তার "সত্যমন্ত্র" শীর্ষক দীর্ঘ গানটিতে তার বিশিষ্ট ঢঙে ঘোষণা করেছে—যা পড়তে না পড়তে মন ভ'রে ওঠে—গানে, শুনলে নিশ্চয় অভিভূত হ'য়ে পড়তে হ'ত :

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক।
(এই) খোদার উপর খোদকারি তোর মানবে না আর সর্বলোক।...
বিধির বিধান মানতে গিয়ে নিষেধ যদি দেয় আগল,
বিশ্ব যদি কয় পাগল ..
বুক ঠুকে তুই সত্য বল্।
(তখন) তোর পথেরই মশাল হ'য়ে জ্বলবে বিধির রুদ্র রোষ।
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণের ঘরে সব সমান।
বিশ্বপিতার সিংহাসনের প্রাণবেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাই তো প্রাণ।
জাত সমাজের নাই সেথা ঠাঁই, জগন্নাথের সাম্যলোক,
জগন্নাথের তীর্থলোক,
বিধির বিধান সত্য হোক।*

---

*এ-গানটির মধ্যে অনেক দুর্বল চরণ আছে ব'লে সেগুলি ইচ্ছে ক'রে বাদ দিয়েই শুধু এই কয়টি চরণ উদ্ধৃত করলাম কাজীর কবিপ্রতিভার মর্যাদা একটুও ক্ষুন্ন না করতে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

(স্মৃতি তর্পণ)

নীরেনের সম্বন্ধে আমাকে লিখতে বলেছেন। আমি লিখব, তবে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিমায়—যার সাহেবি নাম Reminiscences. এ-শ্রেণীর লিপিভঙ্গির পক্ষপাতী আমি বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, স্মৃতিচারণে শুধু যে মনের কথা বলার সুবিধে হয় তাই নয়, বন্ধুর ছবি ফলিয়ে তোলাও সহজ হয়ে ওঠে। কেবল ব'লে রাখি—স্মৃতিচারণীর বহর একটু হয়ত বেড়ে যাবে। পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধুত্ব তো, লিখতে বসলেই এত কথা ভিড় ক'রে আসে যে—তবে থাক ভনিতা। বলি যা বলার—নিষ্পরোয়া হ'য়ে।

বাল্যকালে পড়েছিলাম—কোথায় মনে পড়ছে না—যে, জীবনের সহযাত্রী মুখ্যতঃ চতুর্বিধ বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা। শ্লোকটি এই :

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্র সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥

অর্থাৎ—

অসহ বিরহ যার—বন্ধু তারে জানি।
মতৈক্য যাহার সাথে—সুহৃৎ সে মানি।
মিত্র সে-ই—কর্মসাথী যে রয় আমার।
প্রাণ যার টানে প্রাণ—সখা নাম তার।

এ-সংজ্ঞা অনুসারে নীরেনকে বন্ধু বলতে পারি না, যেহেতু আমার পণ্ডিচেরি প্রয়াণের পর তার বিরহ সইত বৈকি বৎসরের পর বৎসর। মতান্তরও হ'ত নানা বিষয়ে—রুচিভেদ, দৃষ্টিভেদ, চিন্তার ধারায় ভেদ—কিসে নয়? কাজেই সুহৃৎও বলা চলে না তাকে। সহকর্মী সে ছিল না, কাজেই মিত্রও নয়। কেবল প্রাণ তার আমার প্রাণ টানত—তাই তাকে সখা বলা চলে—যদিও সখা অভিধাটির প্রয়োগ এ-যুগে খুব কমই দেখা যায়। তাই "প্রিয়বন্ধু" অভিধাই মঞ্জুর হোক—"সখা" অর্থে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন "আর্যা" বা "ভদ্রা" চালু করতে Madame সম্বোধনের প্রতিরূপ হিসেবে। কিন্তু চলে নি, চলল—দেবী।*

১৯২৮ সালে যখন আমি পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি তখন থেকেই—আর সব বন্ধুদের মতন—নীরেনের সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হয়, বলাই বাহুল্য। আর নিয়তি যখন বাদ সাধেন তখন সইতে না হয় কার? তাছাড়া এ-নিষ্করুণ জীবন সংগ্রামের যুগে প্রিয়বন্ধুর সঙ্গে ইচ্ছাম'ত দেখাসাক্ষাৎ, কথালাপ, হাসিগল্পের সুযোগ কজনের ভাগ্যেই বা ঘটে বলুন—যে-যুগে মানুষ (শ্রী অরবিন্দের ভাষায়) 'All sides he sees and turn to every call'— নানা হাতছানিতেই সাড়া দিয়ে ছোটে দিগ্বিদিকে। ফলে প্রায়ই দুই বন্ধুর মৈত্রী কৈশোরে প্রগাঢ় থাকলেও যৌবনে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসেই আসে; চিত্তের ক্রমবর্ধমান ভিন্নমুখিতার জন্যেও বটে, আদর্শ-সংঘাতের জন্যেও বটে। তাই নীরেনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হ'ত ব'লে আমাদের সৌহার্দ্যে যে কিছুটা ভাঁটা প'ড়ে এসেছিল এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আশ্চর্য ব্যাপারটা এই যে, মেলামেশার সুযোগ বেশি না পাওয়া সত্ত্বেও—এবং আমাদের ভিন্নমুখী আদর্শের উল্টাপাল্টা টানে আমাদের মধ্যে মতান্তর ও সময়ে সময়ে মনান্তর হওয়া সত্ত্বেও—আমরা পরস্পরকে দেখে বরাবরই সমান আনন্দ পেয়ে এসেছি। মনে পড়ে—নীরেনের সঙ্গে দেখা হ'লে ওকে শোনাতাম প্রায়ই একটি প্রখ্যাত সাহেবি কথিকা। এক অ।গন্তুককে পথে দেখে দাদা আগ্রহে 'আস্তাজ্ঞে হোক' ব'লে ডেকে শুধালেন: 'আপনার বুকের মাঝে কি একটি তিল আছে?'—'না তো!'—'হাঁটুতে একটি কাটা দাগ?'—'কাটা দাগ! সে কি?'—'কোমরে দাদ?' 'না না, দাদ থাকতে যাবে কেন?'—'তবে আর সন্দেহ নেই, ভাইরে। তুই-ই আমার সেই হারানিধি—long lost brother!' বলেই সাশ্রুনেত্রে আলিঙ্গন ও যবনিকা-পতন। নীরেন হেসে পাল্টা জবাব দিত: 'অত্র কে কার হারানিধি ভাই এই-ই হয় প্রশ্ন

*সখী অভিধাটিরও আধুনিক বাংলায় চল নেই, আমরা লিখি—বান্ধবী। এর চারা নেই। রবীন্দ্রনাথ বলতেন প্রায়ই যে, প্রতি ভাষাই খামখেয়ালী দেবী, চলেন নিজের মর্জিতে—কোনো কোনো শব্দকিঙ্করকে বাহাল ক'রে, কাউকে কাউকে বরখাস্ত ক'রে, কিন্তু কাকে বর্জন করবেন কাকে গ্রহণ—কেউ জানে না।

—আ লা শেক্সপীয়র।" এই রকম সে কত হাসিঠাট্টা—উত্তর-প্রত্যুত্তর! আর প্রতি হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়েই যেন আমরা পরস্পরের সখ্য নতুন ক'রে চাখতাম। হাফেজের গান: 'তাজা বতাজা নও বনও—নিতুই-নব রঙে রঙিন।'

এ কম কথা নয়। আমার আরো কয়েকটি বাল্যবন্ধু ছিলেন ছেলেবেলায় যাঁদের বিচ্ছেদে বিলক্ষণ কষ্ট হ'ত। কিন্তু কালাতিপাতে তাঁদের সঙ্গে কোনো সজাগ প্রীতির সম্বন্ধই স্থায়ী হয় নি। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল নিশ্চয়ই সুভাষ, (কৃষ্ণপ্রেমের অভ্যাগম হয়েছিল পরিণত যৌবনে—বিলেত থেকে ফেরার পরে), তারপরেই সত্যেন—খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু—নীরেন ও ধূর্জটি। ধূর্জটির সঙ্গে আলাপ বিলেত যাবার আগে হ'লেও ঘনিষ্ঠতা হয় ওদেশ থেকে 'বেকাব' হ'য়ে ফেরার পরে—শুধু গান ও কয়েকটি ভাষা শিখে—যেজন্যে ধূর্জটি পরে "অমৃত" পত্রিকায় লিখেছিল আমাকে সাবাস দিয়ে যে, আমি 'কস্‌মোপলিটান' আড্ডা দিতে শিখে ফিরেছি—সস্তা ভেতো আড্ডা নয়। কিন্তু নীরেন ও সত্যেনের বন্ধুত্ব ছিল আমার কৈশোরের একটি পরম সম্পদ। বলতে কি, আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটি বিচিত্র 'ত্রয়ী'-র সৌহার্দ্য গ'ড়ে উঠেছিল—নীরেন যার উপমা দিত প্রায়ই ডুামা-র 'থ্রী মাস্কেটিয়ার্স'-এর উল্লেখ ক'রে।

সত্যেনের ঘটকালিতেই আমার প্রথম নীরেনের সঙ্গে রাখীবন্ধন হয়। সে ছিল সত্যেনের যাকে বলা চলে 'নেওটো'। সত্যেন চিরদিনই বহু ভারিক্কি সুজনের প্রীতিশ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে, কিন্তু নীরেনের সঙ্গে তার সখ্যের যে ঠাসবুনানি প্রকৃতি দেবী গেঁথেছিলেন বহুদিনের (খানিকটা) পারিবারিক স্নেহাসক্তির কমনীয় তন্তুতেই বলব—তেমন সুন্দর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মানুষের গ'ড়ে উঠতে পারে কেবল তার সাহচর্যে যে তার সত্যিই "নেওটো"। এ-তৃপ্তিকর সম্বন্ধের গভীরতা তথা নিবিড়তার কথা আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে জানি, কিন্তু বন্ধু মারফৎ নয়, শিষ্য-শিষ্যার অনুরাগের মাধ্যমে। নীরেন হয়ত একদিক দিয়ে আসলে সত্যেনের শিষ্যই ছিল। নৈলে তার মেলামেশার ভঙ্গিমায়ও সত্যেনের অনন্যতন্ত্র সহজিয়া ভঙ্গির ছাপ এত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠতে পারত কি? সত্যেনের

মেলামেশার এই আশ্চর্য প্রতিভার সম্বন্ধে আমার "স্মৃতিচারণ"-এ আমি লিখেছি যে, পরকে বন্ধুরূপে কাছে টেনে প্রায় শিষ্য পদে বাহাল করার নৈপুণ্যে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। এক সুভাষ ছাড়া এভাবে দুদিনে মৈত্রীর অঙ্কুরকে প্রায় গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধে ফলিয়ে তোলার সহজপটুতা আমার বন্ধুদের মধ্যে আর দেখি নি।* কিন্তু তা ব'লে বলব না যে, নীরেনের মতন নেওটো বন্ধু সত্যেনও বেশি পেয়েছিল। এমন অনাবিল অনুরাগী কারুর ভাগ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে জোটে না। তবে সত্যেনের সঙ্গে তার জীবনের মধুর ও ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্যের কথা সে নিশ্চয় নিজেই লিখবে, তাই আমি আমার সঙ্গে নীরেনের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।

বন্ধুত্বে একটা সহজ প্রীতির লেনদেনের সম্বন্ধ গ'ড়ে না উঠলে তাকে বন্ধুত্ব নাম দেওয়াই চলে না। কিন্তু সে-বন্ধুত্বের ভিৎ আরো পাকা হয়ে ওঠে যখন বন্ধুপ্রীতি গাঢ় হ'য়ে স্নেহে ফুটে ওঠে। সত্যেনের ও নীরেনের সঙ্গে আমার ফুটে উঠেছিল এই নির্ভেজাল স্নেহের বিরল সম্বন্ধ। সুভাষ? না। তাকে আমি স্নেহ করতাম না বলি না। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল প্রত্যক্ষ ভক্তির আমেজ। আমেজ বলছি এই জন্যে যে, পরে আর এক বন্ধুর সঙ্গে আন্তর যোগাযোগ হওয়ার পরে দেখতে পাই ভক্তির বরণ-মালা কাকে বলে। সে কৃষ্ণপ্রেম। তাকে আমি করতাম পুরোপুরি ভক্তি। কিন্তু সুভাষকে যে প্রগাঢ় স্নেহ শ্রদ্ধা করতাম তার মধ্যেও ভক্তির সিঞ্চন ছিল। সুভাষকে আমার মনে হ'ত উচ্চকোটির আধার—কিন্তু ঠিক অধ্যাত্ম সাধকের ফোটা ফুলটির নয়—কৃষ্ণপ্রেমের মতন। সত্যেন নীরেনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল এর চেয়ে নিচের থাকের লেনদেন—মানবিক। হৃদ্য ও কমনীয়, বটেই তো, কিন্তু আত্মার আত্মীয়তা বলব না। সে-সম্বন্ধ (অন্ততঃ আমার জীবনে) এক কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া আর কোনো বন্ধুর সঙ্গেই গ'ড়ে ওঠে নি। অবশ্য বলাই বেশি যে আমি গুরু-শিষ্য-শিষ্যার আত্মিক (mystic) সম্বন্ধের কথা বলছি না—তার ছন্দ আলাদা, অনন্যতন্ত্র—কীভাবে, ব'লে বোঝানো অসম্ভব, চেখে চিনতে হয়।

* অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাধরদের কথা বলছিনা। বলছি আমার বন্ধু-সংসদের কথা।

নীরেন আমার কাছে আছে এই মানবিক স্নেহের প্রণালী বেয়েই বলব। সৌহার্দ্যের স্তরে এমন অনাবিল স্নেহ বড় বেশি মেলে না। আমার "স্মৃতিচারণ" দ্বিতীয় পর্বে আমি লিখেছি কয়েকজন বন্ধু বান্ধবীর কথা যাঁরা আমার চরিত্রকে এই নিবিড় নির্মল স্নেহ দিয়ে সমৃদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন, যথা কবি শহীদ সুবর্দি,* ভ্লাদিমির ভানেক, মার্থা, ওলগা বিররুফ, বলশেভিক শাপিরো, ধূর্জটি, জয়গোপাল, নলিনীকান্ত সরকার··· ইত্যাদি।

সত্যেন ও নীরেনের সঙ্গে প্রথম দিকে আমার সৌহার্দ্য আরো রসিয়ে উঠেছিল সত্যেনের প্রভাবজাত বিদেশী ভাষা-শিক্ষার উৎসাহে। বিশেষ ক'রে ফরাসী ভাষা শিখতে নীরেন ও আমি প্রেরণা পাই প্রথম তার ছোঁয়াচেই। মনে পড়ে ২২ ঈশ্বর মিল লেনে সত্যেনের ঘরে আমরা ত্রিমূর্তি ওর লালরঙের মেঝেতে মাদুরে ব'সে দিনের পর দিন কী দুরন্ত উৎসাহে নানা ফরাসী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, রাশিয়ান প্রতিভাধরদের রচনা নিয়ে আলোচনা করতাম: মপাসাঁ, রোলাঁ, মেটারলিঙ্ক, ইবসেন; স্ট্রিণ্ডবার্গ, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি······১৯২২ সালে আমি বিলেত থেকে ফেরার পরে সত্যেন-নীরেন-দিলীপ ত্রয়ীর সে-কত গল্পালাপ—আমার নানাদেশের নানাভাষী বন্ধু-বান্ধবীর মন-পাওয়া নিয়ে—আজও যেন সব ছবির মতন ভাসে আমার স্মৃতির পর্দায়। নীরেন আমার স্মৃতিচারণ-এ এদের কথা নতুন ক'রে প'ড়ে উচ্ছল আনন্দে আমাকে লিখেছিল: "তোমার স্মৃতিচারণে ধর্মের সম্বন্ধে নানা কথা আছে। তুমি তো জানোই ভাই যে, ও-রসে আমি বঞ্চিত। কিন্তু এ-বইটির মধ্যে তোমার বহুবিচিত্র বান্ধবিক অভিজ্ঞতা (যে-সব গল্প একদা আমি ও সত্যেন শুনতাম তোমার মুখে দিনের পর দিন)—যে অগণিত লোককে আনন্দ দেবে একথা ভাবতেও আমার আনন্দ। তোমার প্রতিভার নানাদিক নানা লোকের মন টানে, আমার মন খুব বেশি তৃপ্তি পায় তোমার এই মেলামেশার আশ্চর্য প্রতিভার কথা ভেবে। এত দেশের এতরকম বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে

---

* সুরবর্দির কথা আমি অন্যত্রও লিখেছি, যথা আমার "ভাবি এক হয় আর" রমন্যাসে যুসুফ। এছাড়া গতবৎসর অমৃতবাজার শারদীয়া সংখ্যায় An Unforgettable Character স্মৃতিচারণ দ্রষ্টব্য।

তোমার মতন এত সহজে আপন ক'রে নেওয়ার ক্ষমতা আমি আর কারুর মধ্যে দেখি নি।" আমার নিজের গুণগান করতে নীরেনের এ-চিঠিটি উদ্ধৃত করিনি—যশে মানে যখন "বস্তুলাভ" হয় না তখন কী হবে নাম যশের ধুমধামে! আমি এ-প্রশস্তিটি উদ্ধৃত করলাম সত্যিই দেখাতে চেয়ে—নীরেন কীরকম অনন্যতন্ত্র ছিল তার চিন্তায় তথা মানুষের মূল্যায়নে। কিন্তু যা বলছিলাম।

সত্যেন ও নীরেনের ফরাসী ভাষা শেখার অধ্যবসায় দেখে আমারও উৎসাহ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল, আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলের এক খাস ফরাসিনীকে মাসে ১০০৲ দক্ষিণা দিয়ে বাড়ীতে ডেকে ধুতির সঙ্গে ফুলমোজা প'রে দুর্দান্ত ফরাসী বুকনী কাটা সুরু করলাম। সত্যেন ও নীরেন আমার ফুলমোজা পরার সুখবরে হেসে কুটি কুটি হ'ত, কিন্তু সে-সময়ে মোজাহীন হয়ে সাক্ষাৎ মেমসাহেবের কাছে নিজেকে পেশ করতে সাহস পেতাম না কিছুতেই। যদি চরণকমল উঁকি মারে! কাজ কি?

ভাষাশেখায় সম্ভবতঃ আমার কিঞ্চিৎ সহজপটুতা ছিল। একবার তাই সত্যেন আমাকে polyglot উপাধি দিয়েছিল, আর নীরেন সখেদে লিখেছিল (তখন আমি ফরাসী ভাষা শেখার পরে বার্লিনে জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষা শিখছি) "ভাই, তোমার বা সত্যেনের ('দাদার') মতন তো আমার বহু ভাষায় ভাষণ-পটুতা নেই" ইত্যাদি। কিন্তু ওর এ-খেদ সত্যভিত্তিক ছিল না। ও বাংলা লিখত প্রাঞ্জল, ইংরাজী লেখা পড়া বলায় ছিল আশ্চর্য কুশলী; সংস্কৃত শিখেছিল; ফরাসী ভাষায় আলাপ করতে না পারলেও পড়তে পারত স্বচ্ছন্দেই—সর্বোপরি, দুরূহ রুষভাষায় ওর এমন দখল হয়েছিল যে, রুষ থেকে বাংলা অনুবাদেও সিদ্ধ হয়েছিল। ওকে বলতাম আমি অকপটেই: "মূল রাশিয়ান-এ তুমি যে টলষ্টয় ডষ্টয়েভস্কি টুর্গেনিভের রসগ্রহণ করতে পারো এজন্যে ভাই, তোমার কাছে আমাকে ও সত্যেনকে যুগপৎ হার মানতে হয়েছে।" ও সবচেয়ে গভীর ভক্তি করত টলষ্টয়কে কথাশিল্পী হিসেবে। যখন ও কয়েক বৎসর আগে মস্কো যায় তখন টলষ্টয়ের সমাধি দেখতে গিয়েছিল তাঁর বাস্তুভিটা 'য়াসনায়া

পলিয়ানা'-তে (Yasnaya Polyana)। সেখান থেকে টলষ্টয়ের নামাঙ্কিত ছবিকার্ড পাঠিয়ে আমাকে সোচ্ছ্বাসে লিখেছিল: "আমি ধন্য হয়েছি ভাই!" নিজে কম্যুনিষ্ট হ'য়েও টলষ্টয়ের মতন ধর্মবীরকে এমন ভক্তি করতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু এই-ই ছিল ওর স্বভাব: যাকেই ভালোবাসবে তাকে নিয়েই উঠবে উজিয়ে। কবি শহীদ সুরবর্দিরও ছিল এম্‌নি গভীর টলষ্টয়-ভক্তি—বলতাম আমি ওকে প্রায়ই। কিন্তু ও তার কবিত্বের অনুরাগী হ'লেও তার কম্যুনিস্‌ম্‌-বিরাগের জন্যে তার সঙ্গে মেলামেশা করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। বলত ভ্রুকুটি ক'রে তার বিরুদ্ধে যে, সে রুচিবাগীশ aesthete; একথার প্রতিবাদ করতে হ'ত আমাকে বাধ্য হয়েই। কারণ সুরবর্দী সৌখিন-রুচিবিলাসী ছিল না। তবে সে বন্ধুদের কাছে সহজে আত্মপ্রকাশ করত না ব'লে অনেকে তাকে ভুল বুঝত—একবার আমি লিখেছিলাম নীরেনকে। তবুও কম্যুনিস্‌ম-বিরাগে সুরবর্দির সঙ্গে আমার মতৈক্যের জন্যে নীরেন সময়ে সময়ে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারত না, বলত: "তুমি বহুপাঠী হওয়া সত্ত্বেও কম্যুনিস্‌ম্‌ সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞ হ'তে চাইলে না—এজন্যে আমার কী যে দুঃখ হয় কী বলব?" ওকে আমি অনেক ক'রে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতাম যে, ওর এ-দুঃখ ভিত্তিহীন। বলতাম: 'কম্যুনিস্‌ম্‌ সম্বন্ধে আমি বিস্তর বই পড়েছি ভাই, বিশ্বাস কোরো—রকমারি বই: নাটক উপন্যাস গল্প ভ্রমণকাহিনী প্রবন্ধ কবিতা—তাছাড়া আমার বহু রুষ বন্ধু বান্ধবীর মুখে শুনেছি রুষ রাষ্ট্রনীতির নানা চালের কথা—এমন কি নানা স্যোশালিষ্ট কম্যুনিস্টের জীবনী ও বিবৃতি পড়েছি বলশেভিকদের মনের কথা জানতে—যথা, মার্কসের এঙ্গেলসের নানা লেখা ও সেসবের অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনা—এ ছাড়া লেনিন, ট্রট্‌স্কি, বাকুনিন, প্রিন্স ক্রপটকিন, বার্ব্যুস, জন স্ট্রাচি, মানবেন্দ্র রায়, বোরিস পাষ্টেরনাক, ইলিয়া এরেনবুর্গ—আরও কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা কম্যুনিস্‌ম্‌ অনুরাগী ও বিরাগীদের বই—রাসেল, ওয়েলস্‌, অলডাস্‌ হাক্সলি, আঁদ্রে জিদ, দুহামেল, ইগনাৎসিও সিলোনে, লুই ফিশার, স্টিফেন স্পেণ্ডার, ক্যসলার, ক্রাভশেঙ্কো প্রমুখ কম্যুনিস্ট ক্রিটিকদের কথা তো ছেড়েই দাও। এছাড়া তুমি

জানো আমার 'ভাবি এক হয় আর' উপন্যাসে আমার এক অতি অন্তরঙ্গ বলশেভিক বন্ধুর কি রকম গুণকীর্তন করেছি।' ...কিন্তু বৃথা! নীরেনের খেদ একটুও কমত না—ও চাইত আমি সব আগে কান্টরবরির আর্চবিশপ-বর্গীয় উৎসাহীদের লেখা পড়ি—যাঁরা কম্যুনিস্‌ম্‌কে স্বর্গে তুলেছেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে আর বেশি লিখতে চাই না, যেহেতু এ-তর্পণে আমি নীরেনের সঙ্গে আমার মতানৈক্যের দিকটার পরে বেশি জোর দিতে চাই না, যদিও একথা ব'লে রাখাই চাই (নৈলে সত্যের অপলাপ হবে) যে, ওর হঠাৎ কম্যুনিস্ট বন্‌বার দরুণ আমি গভীর দুঃখ পেয়েছিলাম—যে-জন্যে ওর সঙ্গে মাঝে মাঝেই আমার এমন মনান্তর হ'ত যে, টাল সামলানো সত্যিই কঠিন হ'ত।*

এ-সূত্রে আরো একটা বলতে চাই। অনেক উদারপন্থীর মুখে শুনতে পাই যে, মতান্তরের জন্য মনান্তর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু একথা আধাসত্য ব'লেই আধা-অসত্য। অবশ্য নানা গৌণ বিষয়ে দুই প্রিয় বন্ধুর রুচিভেদ বা মতভেদ হ'লে উভয়েরই সহিষ্ণু হ'য়ে laissez-faire নীতি মেনে পরস্পরকে অন্তরঙ্গ ব'লে বরণ করা চলে এবং সেটা কাম্যও বটে। কিন্তু যখন বাধে এসে মূলগত বিশ্বাস ও অনুভবের অন্দরমহলে, জীবন দর্শনের মুখ্য মূল্যায়নে, তখনও প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকতে পারে বটে,

* যতদূর মনে পড়ছে জন স্ট্রাচির ক্লাস-ওয়ার সম্বন্ধে যে বইটি পড়েছিলাম সেটি নীরেনই আমাকে পণ্ডিচেরিতে পাঠিয়ে দেয়। ও নানা বইই আমাকে পাঠাত কম্যুনিস্‌মের দিকে টানতে। তেম্‌নি আমি ওকে পাঠাতাম নানা ধর্মীয় বই—বিশেষ ক'রে শ্রীঅরবিন্দের নানা উপলব্ধির কথা ও যৌগিক কবিতা। ওকে বিশেষ ক'রেই লিখেছিলাম Kravshenko-র "I CHOSE FREEDOM" বইটি পড়তে। লিখেছিলাম—ক্র্যাভশেঙ্কোর বইয়ের বিশেষ মূল্য এইখানে যে, তিনি ছিলেন ক্রেমলিনের উপরওয়ালাদের অন্যতম। তাই তিনি যখন শেষে হতাশ হ'য়ে আমেরিকা পালিয়ে এলেন স্বাধীন মানুষের আত্মসম্মানকে মান দিতে তখন (লিখেছিলাম আমি) ব্যাপারটা হ'য়ে দাঁড়ায় সঙিন কেন না এ-কনফেশন বিরুদ্ধবাদীদের প্রপাগাণ্ডা নয়। ক্রাভশেঙ্কোকে আমি পত্রও লিখেছিলাম তাঁর বইটির সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে। তিনি উত্তরও দিয়েছিলেন নিউয়র্ক থেকে। সম্প্রতি স্টালিনকন্যা Svetlana-র ধর্ম সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসও আমি নিশ্চয়ই নীরেনকে পাঠাতাম যদি ও থাকত। কিন্তু সে অন্যকথা।

কিন্তু অন্তরঙ্গতা কমবেশি জখম না হ'য়েই পারে না—হৃদয় ঘা খেলে মনের যুক্তি বিশেষ কাজে আসে না। উদাহরণতঃ, যে-মানুষ কৃষ্ণকান্ত, বা গুরুদাস তার সঙ্গে যে-মানুষ রোখোলো বস্তুতান্ত্রিক বা রাষ্ট্রবাদী নাস্তিক তার কোনো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব—যে-সম্বন্ধ বিনা বন্ধুত্বের বাদী সুরটি বেজে উঠতেই পারে না। জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করা যায় অবশ্য, উদারতার ভঙ্গি করাও সম্ভব, কিন্তু যে-জিজ্ঞাসু কোনো বিশেষ আদর্শের দিকে মনে প্রাণে ঝুঁকেছে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ উল্টো আদর্শপন্থীর প্রীতির সম্বন্ধের গোড়ায় এত বেশি টান পড়তে বাধ্য যে, তার ফলে সেই গভীর মিলের নড়চড় হ'য়ে যাবেই যাবে যে-মিল সৌহার্দ্যে সব চেয়ে নিবিড় তৃপ্তি দেয়। শিল্পীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের বা কবির সঙ্গে কর্মীর বন্ধুত্ব হ'তে পারে, কারণ শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের বা কবিতার সঙ্গে কর্মের কোনো মূলগত বিরোধ নেই। কিন্তু দেহবাদী নাস্তিকের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদী আস্তিকের কোনো অন্তরঙ্গ আত্মিক সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। পারত, যদি বিশ্বাসটা হ'ত উপরভাসা। কিন্তু বলেছি, নীরেন ছিল স্বভাবে উৎসাহী তথা ঐকান্তিক—যে-জন্যে তাকে শ্রদ্ধা না ক'রেই পারতাম না—যা সত্য মনে করত তার জন্যে দুঃখ সইতে সে পেছপাও ছিল না কোনোদিনই। তাই যখন ও আমাকে একদিন জাঁক করেই লিখল: "আমি আর ধর্ম, আত্মা, গুরু, দৈবী করুণা, পরলোক, পুনর্জন্ম—কিছুই মানি না—মনে করি 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—আর এ-বাণীর শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা এযুগে কার্ল মার্কস ও লেনিন"—তখন আমি ওর আন্তরিকতার জন্য ওকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করলেও ওকে না লিখে পারি নি: "একথা শুনে ভাই আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে—বিশেষ এই জন্যে যে, তোমার কাছে এর পরে আর বলতে পারব না যা বলতে আমি চিরদিনই এত আনন্দ পেয়েছি: যে, মানুষের জীবনে ভগবানের চেয়ে মহত্তর ও মধুরতর বাণী আর কিছুই নেই, থাকতে পারে না।"

এসূত্রে আমি নীরেনের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে চাই না।

কারণ একথা কে না মানবে যে, প্রতি মানুষই তার স্বধর্ম মেনে নিজের ছন্দে চলবে—এইটাই বাঞ্ছনীয়? আমি ধর্মের প্রসঙ্গ তুললাম শুধু ওর সঙ্গে আমার স্নেহ সম্বন্ধের পরে জোর দিতেই। আমি ওকে একদিন বলেছিলাম অকপটেই: "ভাই, তোমাকে আমি বর্জন করতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি—তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম ব'লে।" উত্তরে ও হেসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছিল—যেন একহাত নিতে: "আমি শুধু এইটুকু টুকব দিলীপ—আজো ভালোবাসি ব'লে।"

অবশ্য ও জানত বরাবরই যে, ওর প্রতি আমার ভালোবাসা অতীতের ইতিহাস নয়—বর্তমানেও তার বনেদ আহত হ'লেও বিধ্বস্ত হয় নি। তাই ওর যখন খুব অসুখ ও হাসপাতাল থেকে লিখেছিল: "ভাই দিলীপ, আমার অসুখের সব ব্যবস্থাই তুমি করতে চেয়েছ আমাকে পুনার নার্সিং হোমে রেখে—তোমার এ-হৃদয়বত্তায় আমি অভিভূত। কিন্তু ভাই, আমার হাতে এখনো কিছু টাকা আছে—তবে যদি দরকার হয় তোমার সাহায্য নিতে আমার বাধবে না, এটুকু বলতে পারি নিঃসন্দেহেই। ইন্দিরা দেবীকেও আমার সস্নেহ সম্ভাষণ জানিও। তিনি যে নীরেনদা ব'লে ডেকে নিজে হাতে আমার সেবাশুশ্রূষা করতে চেয়েছেন এতে আমার মন আর্দ্র হ'য়ে উঠেছে বৈ কি। কিন্তু তুমি তো জানো—কেন আমি তোমার পুনার মন্দিরে যেতে সাত পাঁচ ভাবি। অবশ্য তুমি উদার, দরদী—তোমার মতন বন্ধু পাওয়া যে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের কত বড় ভাগ্য বলতে গেলে সেন্টিমেন্টালের মতন শোনাবে। তাই যাক একথা। কেবল ইন্দিরা দেবীকে আমার সস্নেহ অভিবাদন দিয়ে বোলো—তাঁর অনুভূতি উপলব্ধি আমি অবিশ্বাস না করলেও আমার জীবনের আদর্শও ভিন্ন, পথও আলাদা। কিন্তু এ-আলোচনা এখন মুলতুবি থাক। যখন ফের দেখা হবে—(যদি হয় অবশ্য—কার কবে ডাক পড়বে কেউ কি জানে ভাই?) তখন দেখা যাবে।"

ওর এই চিঠিটি প'ড়ে সত্যিই মন ক্লিষ্ট হয়েছিল আমার। ইন্দিরার তো প্রায়ই চোখে জল আসত "নীরেনদা" বলতে। বলত: "আহা,

আমার 'চন্দা ধীরে ধীরে জানা' আর 'দীপক জলনা সারী রাত' গান দুটি নীরেনদা কী ভালোই বাসতেন!"

শেষবারে নীরেনের সঙ্গে যখন দেখা হয় (১৯৬৫ সালে) তখন আমাদের দুজনেরই মনে হয়েছিল ও বড় একলা, নিঃসঙ্গ। অবশ্য এ-জগতে নিঃসঙ্গ নয় কে? শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন মানুষের চিরনিঃসঙ্গতার বিরহরজনী পোহাতে পারে কেবল ভগবানের অরুণোদয়ে। সুইনবর্ণের Garden of Proserpine-এর একটি বিরহ-ব্যাকুল (nostalgic) কবিতা নীরেন মাঝে মাঝেই উদ্ধৃত করত (কবিত্ব-বোধের বিকাশ ওর চিরদিনই অনিরুদ্ধ ছিল তো):

From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
(Whateeer gods may be)
That no man lixes forever,
That dead man rise up never,
That even the weariest river
Winds somewhere safe to the sea.

গেছে গভীর জীবনতৃষ্ণা যখন স'রে'
নেই ভয় কি আশার লেশও কোনোখানে,
গাই দেবতাদের ক্ষণিক প্রণাম ক'রে
(যদিও স্বরূপ তাঁদের কেমন—কেউ কি জানে?)
"চির দিন থাকে না কেউ বেঁচে ধরায়
ফিরে আসেও না আর নিয়েছে যে বিদায়,
নদী যতই ক্লান্ত হোক না, পায়ই পায়
ঠাঁই শান্তি চির-সিন্ধুর শিথানে।

এ-প্রাণস্পর্শী কবিতাটির বিষাদের আবেদনে নীরেনের হৃদয় সাড়া দিত কেন কল্পনা করতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি। বাইরে ও মিশুক ও প্রফুল্ল ছিল বটে, কিন্তু ও ছিল স্বভাবে জিজ্ঞাসু—আর জিজ্ঞাসার শেষ আশ্রয় কোনো পূর্ণ তৃপ্তির নীড়ে, শান্তির কোলে। এ-শান্তির তৃষ্ণা

প্রতি সুধাসন্ধানীরই সহজাত—আর নীরেন ছিল স্বভাবে অমৃতসন্ধানী—তাই জীবনসমস্যার নানা মুখ্য প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রতি অমৃতাশী প্রাণই জন্মনিঃসঙ্গ—কেন না মানুষের সাহচর্যে সে কোনো চিরাশ্রয় পায় না, পেতে পারে না।—তার চিরঠাঁই ঐ চিরসিন্ধু শান্তি-শিথানেই, আর কোথাও নয়। ইন্দিরার "চন্দা ধীরে ধীরে জানা" গানটিতে ও গভীরভাবে সাড়া দিয়েছিলও হয়ত এই জন্যেই যে, এ-গানটিতে চিরন্তনী বিরহিনী মীরার নিঃসঙ্গতার করুণমধুর বেদনা কল্পনা ক'রে ওর নির্দিশা হৃদয় ব্যথিয়ে উঠত—প্রাণের পারে কোনো স্নিগ্ধ প্রাণাধীশের কোলে ঠাঁই পাবার ব্যাকুলতা ওর দাবিয়ে-রাখা সুধাতৃষ্ণাকে জাগিয়ে তুলত। গানটি উদ্ধৃত করলে হয়ত একটু প্রাঞ্জল হবে আমার বক্তব্য :

চন্দা ! ধীরে ধীরে জানা।
আজ মেরে ঘর প্রভু আয়েঙ্গে, জরা তু দীপ দিখানা॥
পল পল করকে বীত গয়া দিন, প্রভু মেরে নহিঁ আয়ে।
"প্রভু আয়েঙ্গে, প্রভু আয়েঙ্গে"—শ্বাস শ্বাস য়হ গায়ে।
আধি রাত হরি দরশন দেঙ্গে, তূ ভী দরশন পানা।

অম্বরসে কুছ তারে দে দে, হরিকা হার বনাউঁ।
জরাসা রূপা দে দে তনকা, নূপুর চরণ সজাউঁ।
ভুল গয়ে হোঙ্গে পথ প্রভুজী, জরা তু পথ দিখলানা।

ভোলে ভালে মোহন চন্দা, আবন কহ নহিঁ আয়ে।
প্রীত লগাকর, অপনা বনা কর বার বার বিসরায়ে।
পন্থ নিহার রহী হৈ মীরা জরা তু য়াদ দিলানা।

চল্ তুই চাঁদ ধীরে ধীরে।
আসবে বধু আমার ঘরে, দেখাবে না প্রদীপ ফিরে ?
দিনে দিনে যায় যে বেলা, কই এলো সে-নিঠুর বঁধু ?
"আসবে বঁধু আসবে বঁধু"—গায় প্রতি শ্বাস আমার শুধু।
গহন রাতে দেবে দেখা, তুইও দেখা তার পাবি রে।

আকাশ থেকে তারা দে না, গাঁথব মালা আমার বঁধুর।
অঙ্গ থেকে ঝরা সোনা, গড়ব রাঙা পায়ের নূপুর।
ভুলে গেছে পথ সে, তুই আয় পথ দেখাতে রাত গভীরে।

আনমনা সে মনচোরা, আসবে ব'লেও আসে না হায়!
প্রেমের ডোরে কাছে টেনে তাই বুঝি বার বার ভুলে যায়!
পথ চেয়ে তার আছে মীরা একলা—ব'লে আয় অচিরে।

গানদুটি আমি পর পর গেয়েছিলাম চৌরঙ্গিতে এক মিশ্র বাঙালী-অবাঙালীর আসরে। হিন্দিভাষীরা হিন্দি ভজনটি শুনে বিশেষ উজিয়ে উঠেছিলেন। নীরেন এসেছিল সে-আসরে ৬ই মার্চ (১৯৬৫) সকালে। ওর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

এ-বৎসর—১৯৬৬ সালে—যখন প্রথম খবর পেলাম ওর দেহাবসানের—তখন আমাদের দুজনেরই স্মৃতিপটে ভেসে উঠছিল ওর স্নেহসজল মুখের প্রত্যক্ষ সাড়া সেই শেষ দিনের শেষ আসরে। ও আমাকে অনুরোধ করেছিল গানটি অনুবাদ সুদ্ধ ওকে লিখে পাঠাতে। "এ গানটিতে কেন আমার বুকের তার বেজে ওঠে ভালো বুঝি না দিলীপ"—বলেছিল সেদিন এই নিঃসঙ্গ সত্যাশ্রয়ী মানুষটি যে কোনোদিনই নিজেকে বা অপরকে ভোলাতে চায় নি। তাই বলব আজ ওর এই একান্ত সত্য-নিষ্ঠার কথা—যে-ক্ষেত্রে ওর সঙ্গে আমার অন্তরের একটি গভীর মিল ছিল।

আমার "স্মৃতিচারণ" প্রথম পর্বে আমি লিখেছি—পিতৃদেবের মুখে প্রায়ই শুনতাম মহাভারতের একটি প্রখ্যাত শ্লোক:

ন চ সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং মহৎ।
ধর্মস্য হি স্থিতিঃ সত্যং তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ॥

অর্থাৎ

নাই সত্যের সমান ধর্ম, মিথ্যার ম'ত পাপও নাই।
ধর্মের স্থিতি সত্য, কোরো না সত্যের অপমান হে তাই।

এর মন্তব্যে আমি লিখেছি স্মৃতিচারণে:

"পিতৃদেবকে যাঁরা কাছ থেকে জানতেন তাঁদের সকলেরই দৃষ্টি পড়ত

সর্বপ্রথম তাঁর এই অনমনীয় সত্যনিষ্ঠার 'পরে। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন—"এ আর এমন নতুন কথা কি? সত্য কারই বা উপাস্য নয়?" কিন্তু যাঁরা যথার্থ সত্যনিষ্ঠ তাঁরা বলবেন না এমন কথা; কেন না তাঁরা জানেন হাড়ে হাড়ে—সত্যকে মনেপ্রাণে বরণ করে কত কম মানুষ।" (প্রথম পর্ব, উপক্রমণিকা)

এইখানেই নীরেনের সঙ্গে শুধু যে আমার একটি গভীর মনের মিলের ক্ষেত্র ছিল তাই নয়, মানুষের অসত্য-ভাষণ সম্পর্কে সে একবার আমাকে তিরস্কার ক'রে সচেতন করে দিয়েছিল তার নিজের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার প্রসাদেই বলব। ব্যাপারটা খুলেই বলি—কীভাবে ও জগতের হালচাল সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে দিত স্নেহের রূঢ়ভাষে। কিন্তু তার আগে কিছু ভূমিকার অবতারণা করতে হবে।

আমি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে প্রয়াণ করি ১৯২৮ সালে। অতঃপর আমার বাঙালী বন্ধুদের মধ্যে কেবল নীরেনই একবার পণ্ডিচেরি এসেছিল আমার টানে। সে সময়ে ও কম্যুনিস্ট দলে নাম লেখায় নি, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় ওর শ্রদ্ধাও টলমল ক'রে ওঠে নি। পণ্ডিচেরিতে প্রায়ই আমাকে বলত যে, শ্রীঅরবিন্দের নানা পারমার্থিক বাণীতে ওর মন আর তেমন সাড়া না দিলেও তাঁর "সিন্থেসিস অফ যোগ"-এর একটি ঐহিক বাণীতে ওর মন দুলে ওঠে—বাণীটির গভীর স্পন্দনেঃ 'We must bear the burden of others in divine self-interest,' পরে একটি চিঠিতে ও সোচ্ছ্বাসেই লিখেছিলঃ "ভাই, শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মবাদ ভালো বুঝি না—জানোই তো, কিন্তু তাঁর ইহবাদ, মানবতাবাদ আমার প্রাণের তারে আনন্দে রণিয়ে ওঠে, যেমন যখন তিনি বলেন Earth is the heroic spirits' battlefield বা Imperfect is the joy not shared by all—তোমার পাঠানো সাবিত্রী-চয়নিকায়ই পড়েছি এ-অনবদ্য চরণ দুটি—মন আমার বলেঃ এই দীক্ষাই সবার জন্যে—মানুষকেই তুলতে হবে সব আগে। তোমাদের 'বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্'-কে বদ্‌লে পাঠান্তর দিতে হবেঃ বৈরাগ্যম্ এব ক্লৈব্যম্'—রাগ কোরো না ভাই। তুমি তো জানো আমি ব্লাসফেমিতে কী গভীর আনন্দ পাই। তোমার 'এদেশে ওদেশে' বইটিতে পল রিশারের

ভগবান্ ও বাইবেলকে নিশানা ক'রে ব্যঙ্গের তীরন্দাজি একেবারে অন্তর্ভেদী।"

রসিকতায় ও মনে প্রাণে সাড়া দিত—সত্যেনের দীক্ষায় ফরাসী রসিকতায়ও ও নিবিড় রস পেত। পল রিশারের কথা যখন উঠলই তখন তাঁর দুটি রসিকতার নমুনা দিই আমার 'এদেশে ওদেশে'-এ তাঁর সঙ্গে আমার কথালাপের অনুলিপি থেকে Par cnnui Die´u crēa le monde, par honte depuis il se cache.

অর্থাৎ

বেকার ঠাকুর ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ ক'রে এ-জগৎ সৃষ্টি
লাজে রহিলেন পর্দানশীন—কেমনে সহেন লোকের দৃষ্টি ?

তথা

Dimanche : jour ou´ dieu s'e´tant repose´, ses fide´les l'en remercient.

অর্থাৎ

বিশ্রাম রবিবারে ঠাকুরের—হ'ল না নূতন সৃজন আর।
তাই তাঁর যত ভক্তেরা গায় : "ধন্য ধন্য, চমৎকার !"

নীরেন চোখ মিটমিট ক'রে বলত : "রসিক বটে এই ফরাসী জাত, দিলীপ! তোমাকে ঈর্ষা হয়, যে, ওদের দেশে খাস ফরাসীতে রসিকতা উপভোগ ক'রে এসেছ।" উত্তরে আমি বলতাম : "রসিকতায় শ্রীঅরবিন্দও কম যান না—পড়েছ তো আমার SRI AUROBINDO CAME TO ME ?" ও খুশী হ'য়ে বলত : "পড়েছি বৈ কি, তোমার সব বইই আমি পড়ি—কেবল দুঃখ এই যে, অনেক কিছুতেই সায় দিয়ে তোমাকে খুশী করতে পারি না—উপায় কি বলো ?" কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের শুধু ইহবাদ বা রসিকতাই নয়, তাঁর দীপ্র বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ যুক্তিকেও ও তারিফ করত, যদিও বিশ্বাসের ওকালতিকে নয়। ওর মন সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হ'ত তাঁর ঋষিত্বে নয়, কবিত্বে। এক্ষেত্রে ওর সঙ্গে আমার আরো একটা মনের মিল শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল—যেটা সত্যেনের সঙ্গে ছিল না ব'লে মনে মনে দুঃখ পেয়েছি এই ভেবে যে, এ-যুগের এমন একজন মহাকবির কবিত্বেও সে মনে প্রাণে সাড়া দিতে পারল না! দুঃখ পেয়েছি আরো

ঠেকে শিখে যে, দুই বন্ধুর প্রাণলোকে ব্যবধানের একটি মস্ত কারণ—যেখানে একজনের শ্রদ্ধা গভীর সেখানে অন্যজনের শ্রদ্ধার আত্যন্তিক অভাব। নীরেনের সঙ্গে নানা মতান্তর মনান্তর সত্ত্বেও এই সান্ত্বনাটুকু পেয়েছিলাম যে, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর কবিত্বে ও রস পেয়েছিল। এ আমার অনুমান নয়। গতবার কলকাতায় একদিন আমাকে ও নিজে থেকেই বলেছিল একথা। ও মুগ্ধ হয়েছিল বিশেষ ক'রে তাঁর অমিত্রাক্ষরের আশ্চর্য কীর্তিতে। তাই ১৯৬৫ সালে আমাকে ও বিশেষ ক'রেই অনুরোধ করেছিল সাবিত্রী-র একটি প্রাঞ্জল ভাষ্য ক'রতে, বলেছিল: "এ-কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।"*

শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য চারিত্রশক্তি, স্বর্ণোজ্জ্বল মনীষা, গভীর জ্ঞান, বহুমুখী প্রতিভা, দীপ্ত ব্যক্তিরূপ, অনমনীয় সাহস, অনন্যতন্ত্র ভাষাশৈলী—এসবেরই ও অনুরাগী ছিল বৈ কি, কিন্তু বোধ হয় ও তাঁকে সব আগে মনে করত কবি। আমি তাঁকে মনে করি এ-যুগের কবি-চূড়ামণি। এ-মূল্যায়নে ওর মনের সায় ছিল কিনা বলতে পারি না, কারণ এ নিয়ে ওর সঙ্গে আমি কোনো দিন খোলাখুলি আলোচনা করবার ভরসা পাই নি—পাছে ও সায় না দিলে মনে ফের দুঃখ পাই এই ভয়ে। নীরেনও আমাকে এ-মতানৈক্যের দুঃখ থেকে বাঁচাতে চাইত, রসাস্বাদের গরমিলে ও নিজেও দুঃখ পেত ব'লে। তাই ধর্ম সম্বন্ধে ভুলেও প্রশ্নবাদ করত না—বিশেষ ক'রে শেষের দিকে। আমিও ঠিক ঐ একই কারণে কম্যুনিস্‌ম্ সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করতাম না। ১৯৬৫ সালে সাবিত্রীর প্রশংসা করার সূত্রে ও আমাকে একদিন বলেছিল: 'সাবিত্রীর কবিত্বে ও ছন্দমাধুর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি একথা তোমাকে বলতে পারি অকপটেই, আর বলতে আনন্দও হয় বৈ কি। কেবল দুঃখ এই যে, তাঁর অন্য নানা মতামতেই সায় দিতে পারি না ব'লে তুমি মনে ব্যথা পাও।" স্নেহের এই সদাসতর্কতার দরুণ

* ওর প্রশংসা আমাকে এত উদ্দীপনা দিত যে, আমি সত্যিই এর পরে আমার "ঋষি শ্রীঅরবিন্দ" নিবন্ধে এ-ভাষ্য প্রণয়ন করি। দুঃখ এই যে, আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থের এই শেষ (ও শ্রেষ্ঠ) অধ্যায়টি ও পড়তে পেল না। পড়লে ওর মতন খুশী কেউ হ'ত না—অন্তত আমার ঐহিক বন্ধুদের মধ্যে।

ও আমার কাছে আরো প্রিয় তথা শ্রদ্ধেয় হ'য়ে উঠেছিল একথাও মনে পড়ে আজ আরো বেশি ক'রে ওর সদাস্নেহোজ্জ্বল মুখের স্মৃতিতে।

এ-উজ্জ্বলতা থেকে থেকে ম্লান হ'য়ে আসত আমাদের মতান্তরের জন্যে একথা বলাই বাহুল্য। ও দুঃখ পেত আমাকে ওর উপাস্য মার্ক্স লেনিনের মহত্ত্বের দিকে টানতে না পারায়, আমিও ঠিক অমনি ঘা খেতাম যখন দেখতাম যে, আমাদের অধ্যাত্মবাদ তথা সাধুসন্ত মুনিঋষির আপ্তবাক্য ও নস্যাৎ ক'রে দিতে চায় অদার্শনিক মার্ক্স ও এঙ্গেল-এর একরোখা বস্তুতান্ত্রিক নাস্তিক্যবাদের সমর্থনে। তাই বার বার পণ নেওয়া সত্ত্বেও থেকে থেকে তর্কসংঘাত বেজে উঠত বৈ কি। হাজার সাবধানে কথা বলি না কেন, যেখানে আমরা খুব প্রবলভাবে অনুভব করি সেখানে অমিল হ'লে বাজেই বাজে—বিশেষ ক'রে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মতান্তর হ'লে—যেমন হ'য়েছিল শেষবার একটি উল্লেখযোগ্য সংঘাতের পরে। ব্যাপারটি বলবার ম'ত তাই বলব—যথাসাধ্য সংক্ষেপে।

সিলভিউ ক্রাস্যুনাস নামে এক দেশভক্ত রুমেনিয়ান নাগরিক তাঁদের দেশে রুষ পুলিশের অরুন্তুদ অত্যাচারের কথা লেখেন "লস্ট ফুট্স্টেপ্স্" নামে একটি বইয়ে। বইটি বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ব'লে আমি বিলেত থেকে বইটি আনাই—বিশেষ ক'রে গ্রন্থকারের বর্ণিত একটি অঘটন-এর খবর পেয়ে। ব্যাপারটি এই যে, সিলভিউকে যখন জেলে পুলিশরা অসহ্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল সে-সময়ে সে আত্মহত্যা করার মুখে দেখা পায় এক যোগীর যিনি তাকে বলেন—তাঁর নাম Aurobin Dogos. তিনি তাকে আরো বলেন যে, আসুরিক শক্তির নিষ্ঠুরতা যতই কেন না প্রবল হোক হার মানা চলবে না। ব'লে অরবিন্ দোগোস (নামটির বানান লক্ষণীয়) তাঁকে ভরসা দেবার জন্যে একটি কথিকা বলেন। কথিকাটি শ্রীঅরবিন্দ—ওরফে Aurobin Dogos—তাঁকে গদ্যেই বলেছিলেন অবশ্য, কিন্তু আমি এর ছন্দে অনুবাদ করেছি কথিকাটি কাব্যধর্মী বলে :

শাবককে তার পিতামাতা পাখীদুটি প্রত্যহ শেখায়
উড়তে নীলাকাশে। তাদের সুদূর সাগরপারে দুদিন পরে
যেতে হবে আর এক দেশে। শাবকটি আনন্দে নীলিমায়
উড়তে গিয়ে একদিন হঠাৎ যায় প'ড়ে হায় জলে। তারস্বরে

বলে তাকে পাখীদুটি আকাশ থেকে : "থাক শুধু তুই ভেসে,
আমরা আছি ভরসা দিতে। দেখ্না তোকে বাঁচাই কেমন ক'রে।"
ব'লে, নেমে চঞ্চুপুটে দুবিন্দু জল নিয়ে ফিরে এসে
সৈকতে ঝরিয়ে—ফিরে উড়ে তারা যায় মহাসাগরে,
আবার দুটি জলবিন্দু শুষে নিয়ে সৈকতে ঝরায়।
"এমনি ক'রেই সিন্ধু ওরে ফেলব শুষে, মা ভৈঃ!" তারা গায়।

কথিকাটি ব'লে শ্রীঅরবিন্দ দুর্ভাগা বন্দীকে বলেছিলেন :

"The human will and spirit must also not be resigned at moments of crisis ; it must go no looking for a solution, how—• overwhelming the odds. You must not accept defeat, you must not believe your efforts to be in vain. If you have the blind courage to continue to endure and to struggle, you will find a new beginning in your life.*

কথিকাটি তথা তার মন্তব্য প'ড়ে আমার গভীর আনন্দ হয়েছিল কারণ এ-বিশ্বাস করতে আমাকে একটুও বেগ পেতে হয় নি যে, শ্রীঅরবিন্দের অমর আত্মা জগতের নানা আদর্শবাদী সাধকের মধ্যেই নানাভাবে কাজ করছে—যেমন করছেন আরো অনেক বিদেহী মহাত্মা। শুধু তাই নয়, এ-উদ্দীপনী বাণীটির মধ্যে আমি শুনতে পেয়েছিলাম যেন তাঁর মন্ত্রঝংকার—এই ঢঙেই যে তিনি কথা বলতেন। আমাকে তিনি একবার একটি পত্রে লিখেছিলেন (অবসন্নতার মধ্যে আমাকে উৎসাহ দিতে) যে, নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না, "ভগবানকে তোমার পেতেই হবে এই মন্ত্র জপ করে :

Have Him I wil' and have Him I must."

* "সংকটের দুর্লগ্নে তোমার দৃঢ় সংকল্প ও আত্মশক্তি হাল ছেড়ে দেবে কি? কখনই নয়। বাধা যতই দুস্তর হোক না কেন, সমাধান তোমাকে খুঁজতেই হবে, হার মানলে শুনব না। যদি দুর্দম সাহসকে বরণ ক'রে ল'ড়ে চলতে পারো তো তোমার নবজন্ম হবেই হবে"

THE LOST FOOTSTEPS···Silviu Craciunas P. 168
(With the kind permission of Collins and Harvill
Press···London)

তাঁর নানা বাণীর মধ্যেই এই ঝঙ্কৃত তেজোদীপ্ত শৈলীর পরিচয় মেলে। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই শুধু আমার এ-বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করতে।

একটি ফরাসী সাধককে তিনি একবার ব'লেছিলেন বহুবৎসর আগে (তিনি যে ভাষণটি ছাপিয়েছেন সম্প্রতি) যে, ক্লৈব্যকে বরণ করলে মানুষের বা জাতির আত্মঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে (MOTHER INDIA, May দ্রষ্টব্য):

"But if there comes to it a strong faith in itself and a robust will to live, if it is open to things that shall come, willing to seize on the future and what it offers and strong to compel it where it seems adverse, it can draw from the adversity and defeat a force of invincible victory and rise from apparent helplessness and decay in a mighty flame of renovation to the light of a more splendid life."

এর ভাবার্থ "মানুষের মধ্যে যদি অটল বিশ্বাস, অনাগত জীবনের অভীপ্সা ও বিরুদ্ধ নিয়তিকে জয় করবার দৃঢ় সংকল্প জেগে ওঠে তাহলে সে দুর্দৈব ও পরাজয় থেকেও অজেয় অভ্যুত্থানের শক্তি আহরণ করতে পারে, পারে—দৃশ্যমান অসহায়তা ও অবক্ষয় থেকে ব্যুত্থিত হয়ে নব জাগৃতির বহ্নিবিকাশে ধন্য হ'তে।"

তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতেও পাই এই দীপামান অভীপ্সার ঝংকার:

The spirit rises mightier by defeat,
Its godlike wings grow wider with each fall,
Its splendid failures sum to victory.

অর্থাৎ

প্রতি পরাজয় অন্তে অন্তরাত্মা আরো ঊর্ধ্বে উঠে
হয় আরো বলীয়ান্; তার মহীয়ান্ পর্ণ হয়
প্রতি স্খলনের পরে আরো অভ্রভেদী, প্রসারিত।
প্রতি দীপ্ত বিফলতা রচি' নব সোপান—জীবকে
অন্তিমে উত্তীর্ণ করে তুঙ্গতম জয়ের শিখরে।

* * * *

আমি যখন এ-বইটি প'ড়ে মহা উৎসাহে এসব কথা নীরেনকে লিখি

তখন সত্যিই কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে নতুন ক'রে কিছু বলতে চাই নি। (বলেছি তো, আমরা কয়েকবার ঘা খেয়ে দুজনেই ঠিক করেছিলাম পরস্পরের জীবন-দর্শন নিয়ে অনর্থক তর্কাতর্কি করব না।) আমি বিশেষ ক'রে এ-কাহিনীটির উল্লেখ করেছিলাম নীরেনকে জানাতে আমার আনন্দ যে, শ্রীঅরবিন্দ দুর্গত মানুষের জন্যে অলক্ষ্য লোক থেকে কাজ করছেন—যেমন বিদেহী মহাত্মারা প্রায়ই ক'রে থাকেন। অঘটন আজো ঘটে আমি বহুবারই চাক্ষুষ করেছি ব'লে আমি আসলে এ-চমকপ্রদ কাহিনীতে তাকে চম্‌কে দিয়ে নতুন ক'রে আত্মপ্রসাদের স্বাদ পেতেই চেয়েছিলাম। লিখেছিলাম যে, যারা বলে দৈবী অঘটন ঘটে না, অলোকদর্শন সবই কল্পনা—তারা জানে না ব'লেই এমন কথা বলে ; যারা জানে তারা না মেনে পারে না যে, ডাকার মতন ডাকলে ভাগবতী করুণা সাড়া দেয়, আমাদের বাঁচাতে আসে অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে। কিন্তু ও আমাকে ভুল বুঝে ভাবল—কম্যুনিস্টদের অত্যাচার কী ভীষণ দেখাতে চেয়েই আমি এসব লিখেছি। তাই উত্তরে লিখেছিল (ও স্পষ্টবক্তা ছিল, রুষ্ট হ'লে রেখে ঢেকে কথা কইত না সুশীল—মঞ্জুবাক হ'তে চেয়ে): 'দিলীপ, বয়স অনেক হ'ল, আর কেন এখনো আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে চাওয়া? তবে বোধহয় তোমার আত্মার মঙ্গলের জন্যে আমি যতটা ভাবি আমার আত্মার মঙ্গলের জন্যে তুমি তার চেয়েও বেশি ভাবো!" স্বভাবে একরোখা হ'লেও ও এরকম রূঢ় ভাষায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করত না সচরাচর। তবে প্রকৃতিতে ও ঝোঁকালো ছিল ব'লেই ওর আরাধ্য আদর্শকে কেউ গায়ে প'ড়ে ছোট করতে চাইলে প্রত্যাঘাত দিত সজোরেই। আমার একটা খেদ থেকে গেল যে, ওকে আমি এর পরে কোনোদিন নিরালায় বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাই নি যে, কম্যুনিস্‌মের মূল সোশ্যালিস্‌ম্‌-এর আদর্শের কোনো কোনো ভাবধারা সত্যিই আমার ভালো লাগত আরো এই কথা ভেবে যে, এ-সাম্যতন্ত্রের অভ্যুদয় না হ'লে নিষ্ঠুর ধনতন্ত্রীদের দল বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের হাতে মাথা কাটতই কাটত। একালে যে তাদের দম্ভ খর্ব হয়েছে এজন্যে কম্যুনিস্‌মের কাছে চিন্তাশীল দরদীরা কৃতজ্ঞ না হ'য়েই পারেন না। কিন্তু সে অন্য কথা। ফিরে হারানো খেই ধরি।

নীরেনের কাছে এই ঘা খেয়ে আমি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে তাকে চিঠি লেখা বন্ধ করি—আরো অদর্শনের ফলে ভুলবোঝা বাড়ে ব'লেই বলব। মানে, দেখা হ'তে না হ'তে অনেক সময়েই পুনর্মিলন হয় যেন চক্ষের নিমেষে—যেমন এ-যাত্রা আমাদের বিসম্বাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কেমন ক'রে, বলি।

হ'ল কি, ১৯৬১ সালে অক্টোবরের শেষে কলকাতায় এসেই খবর পাই যে, নীরেন হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যে বিশেষ অসুস্থ। বলেছি, ইন্দিরার সঙ্গে ওর আগেই ভাব হয়েছিল। ইন্দিরা প্রথম দর্শনেই ওর প্রাণখোলা হাসি ও সরল স্নেহময় আচরণে মুগ্ধ হয়েছিল—বালিগঞ্জে—তখন সত্যেন সেখানে ছিল। সেখানে নীরেনের হঠাৎ অভ্যুদয় হওয়ার দরুণ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ছুতিন বৎসর ছাড়াছাড়ির পরে। ইন্দিরা ওকে দেখবামাত্র আমাকে বলেছিল: "চমৎকার লোক, আর তোমার সত্যিকার বন্ধু—তোমাকে সত্যি স্নেহ করেন।" শুধু তাই নয়, ইন্দিরা আমাকে বলেছিল বেশ জোর দিয়েই: "ইনি যথার্থ সত্যনিষ্ঠ, মতান্তরের জন্যে এঁর সঙ্গে মনান্তর হ'তে দিও না।"

কিন্তু অতঃপর পত্রে শ্রীঅরবিন্দ-সংক্রান্ত অঘটনটির উল্লেখ করার ফলে আমাদের মধ্যে যে-মনান্তর (এইই আমাদের শেষ মনান্তর) তাকে আমি ঔদার্যের ভঙ্গি ক'রে এক কথায় নস্যাৎ ক'রে দিতে পারি নি। আমার মনে গভীর আঘাত লেগেছিল ভাবতে—এ-হেন প্রাণস্পর্শী অঘটনটির কথা লিখে বইটি ওকে পড়তে অনুরোধ করার অপরাধে ও কী ব'লে আমাকে এমন কড়া কথা লিখল? তাই ঠিক করেছিলাম—তেলে জলে মিশ খায় না—কী হবে ওর সঙ্গে সখ্যের বন্ধনরাখতে চেয়ে—যখন সে-সখ্যের কোনো দামই ওর কাছে নেই?

কিন্তু ভাগ্যক্রমে স্নেহপ্রীতির প্রতিভাও অঘটনী—তাই অঘটনকে সম্ভব করে এক মুহূর্তেই। হ'ল কি, ছু বৎসর পরে যখন আমরা কলকাতা যাই—১৯৬৩ সালে—তখন সত্যেন আমাকে বলে যে নীরেন হৃদরোগে শয্যাশায়ী, শুনেই আমার মন কেমন ক'রে উঠল, তার উপর ইন্দিরা ধরল: "নীরেনদার ওখানে যাই চলো।" ছুজনে গেলাম ওর আবাসে তখনি।

আমাকে ও বুকে জড়িয়ে ধ'রে ইন্দিরার হাত ধরে সাদরে বসিয়ে

বলল : "এ কী ব্যাপার—অভাবনীয়! সাক্ষাৎ 'ভীষণা দেবী' সশরীরে! আমায়—আমার—কী বলব—আমি ডাম্বফাউণ্ডেড · "ইত্যাদি। (টীকা : ইন্দিরার রকমারি vision—দর্শনাদির—কথা ও আমার নানা লেখায় পড়েছিল—তাই vision-এর উপর আপ্রত্যয় ক'রে ওকে ডাকত "ভীষণা দেবী" ব'লে।)

ওকে আমি যোগযাগের কথা না বললেও ইন্দিরার সমাধি-অবস্থায় নানা গান শুনে সমাধি ভঙ্গের পরে গান আবৃত্তির কথা বলাতে ও সত্যিই চম্‌কে উঠেছিল। সমাধিবর্গীয় নানা অনুভব উপলব্ধি দর্শনাদিতে ওর ঔৎসুক্য না থাকলেও ইন্দিরার হিন্দি মীরা ভজন ও আমার বাংলা তর্জমা যখনই গাইতাম ও গভীর আনন্দ পেত। সালে ৫ই এপ্রিল ও প্রথম ইন্দিরার হিন্দি গানের কবিত্বে আকৃষ্ট হয়—যখন 'দীপক, জলনা সারী রাত' আমি গাই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের বিরাট্ আসরে। (তারপরে প্রায়ই গানের আসরে ও শুনতে চাইত এই মীরা ভজনটি হিন্দি ও বাংলা দুটি ভাষায়ই। গানের শেষে প্রায়ই সখেদে বলত : "আহা, দিলীপ ভাই, এমন কণ্ঠ নিয়ে তুমি একটি বারও রাশিয়ায় গেলে না, মন আমার সত্যিই হায় হায় করে···"ইত্যাদি।) কারণ মতভেদ সত্ত্বেও ওর কবিত্ববোধ ছিল অনাহত। তাই ইন্দিরার মর্মস্পর্শী গানটি উদ্ধৃত করি, বিশেষ ক'রে ফুটিয়ে তুলতে—কী ধরণের কবিত্বে ও সর্বান্তঃকরণেই সাড়া দিত :

দীপক! জলনা সারী রাত।
আজ সুনা হৈ ইস তটপর আয়েঙ্গে মেরে নাথ॥
প্রাণ তু মেরে লে লে দীপক! করলে ইসকী বাতী।
রক্ত হৃদয়কা তেল বনা লে জলনা সারা রাতী।
বিরহামে হর অঙ্গ জলেগা মেরা তেরে সাথ।

আজ নহীঁ ছুপ জানা চন্দা, আজ নহীঁ ছুপ জানা।
সুনা হৈ যমুনাজীকে তটপুর আজ হরীনে আনা।
রূপা বন্‌কর চল জায়েঙ্গী যমুনাজীকি তরঙ্গেঁ।
চঞ্চল লহরেঁ করলে মেরী ব্যাকুল মনকি উমঙ্গেঁ।
লিপট লিপট জায়েঁ চরণনসে—জব আয়েঙ্গে নাথ॥

আজ ন রৈন গঁবানা মীরা, আজ ন রৈন গঁবানা।
খোলকে রখনা পট মন্দিরকে, পথ পর নৈন বিছানা।
সুনা হৈ আজ তুম্হারে আঙন মনমোহন আয়েঙ্গে।
তরসেঙ্গে না দুখিয়া নৈনা, আজ দরশ পায়েঙ্গেঁ।
দেখকে বন্দ দুয়ারে তেরে রূঠ ন জায়েঁ নাথ :
গোবিন্দ গোবিন্দ গা কে মীরা, কর দেনা পরভাত॥

এ-ভজনটির বাংলা অনুবাদেও ও সোচ্ছ্বাসে সাড়া দিত (বাংলায় এর অর্থপরিগ্রহ করা ওর পক্ষে সহজ হ'ত ব'লেও বটে) তাই আমার অনুবাদটিও উদ্ধৃত করি :

প্রদীপ! জ্বল তুই সারা রাত।
শুনেছি আজ যে. এই পথ বেয়ে আসিবে হৃদয়নাথ॥
আমার এ-প্রাণ নে তুই প্রদীপ, কর তারে শিখা তোর।
হিয়ার রক্ত আহুতি দিলে সে জ্বলিবে রজনীভোর।
প্রতি তনু-অণু জ্বলুক আমার বিরহে রে তোর সাথ।
রে প্রদীপ জ্বল তুই সারারাত॥
লুকাস নে তোর মুখ আজ চাঁদ, লুকাস নে মুখ আজ।
শুনেছি—আসিবে যমুনার তীরে আজ রাতে হৃদিরাজ।
রূপালি লহরে নামিবে রে আজ নীল যমুনার ঢল।
আমার মনের তৃষা যত হোক তেমনিই চঞ্চল—
লুটায়ে চুমিবে শ্রীচরণ তার যখন আসিবে নাথ।
রে প্রদীপ, জ্বল তুই সারা রাত॥
যেন না বিফলে যায় মীরা তোর এমন নিশার নিশা,
মন্দির-দ্বার খুলে পথ চেয়ে থাকিসরে অনিমিষা।
শুনেছি-আজ এ-আঙনে রে তোর আসিবে মনোমোহন।
রবে না নয়ন তৃষিত তো আর, পাবি তার দরশন।
দুয়ার বন্ধ দেখে যেন তোর না যায় ফিরে শ্রীনাথ।
"হরি হরি হরি" গান গেয়ে তোর রজনী হোক প্রভাত।
রে প্রদীপ, জ্বল তুই সারারাত॥

সেদিন নীরেন ফের বলেছিল এ-গানটির কথা ইন্দিরাকে। বলেছিল :

"এ-গানটির কবিত্বে আমার হৃদয় দুলে ওঠে—ঠিক যেমন উঠত একসময়ে দিলীপের মুখে 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম'-এর কীর্তন শুনে। ভক্তি আমি বুঝি না ভীষণা দেবী, কিন্তু কবিত্বে সাড়া না দিয়ে করি কী?"

এইরকম সে কত কথা—হাসি ঠাট্টা—বিশেষ ক'রে ইন্দিরাকে বারবার 'ভীষণা দেবী' ব'লে সম্বোধন করা। ও ক্রমাগতই চাইছিল ওর অসুখের কথা এড়িয়ে যেতে, কিন্তু ইন্দিরা ছাড়ল না। তখন অগত্যা বলল সব খুলে। ইন্দিরা বলল: "কিন্তু আপনি পুনায় এলে আপনার সেবা ক'রে আপনাকে সারিয়ে তুলতাম।" আমিও বললাম তখন: "আমি তোমাকে দু তিনবার লিখেছি পুনায় এসে একটু বিশ্রাম করতে—পুনার জলহাওয়া খুব ভালো।" ও বাধা দিয়ে বলল: "থাক ভাই ও-প্রসঙ্গ। তোমার এ-অযোগ্য বন্ধুটির' পরে যে তোমার করুণার সীমা নেই আমি জানি। কিন্তু ভীষণা দেবীর নিজের হাঁপানি—তার উপর আমার হার্টের কষ্ট ওর ওপর চাপাবার মতন হার্টলেস হই কেমন ক'রে বলো?"

বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল। আমি ওই দুই কাঁধে চাপড় দিয়ে বললাম: "এ যোগ্য-অযোগ্যর কথা নয় নীরেন, সাড়া দেওয়া না-দেওয়ার কথা। পুনায় খুব ভালো নার্সিং হোম আছে। চলো তুমি—চিকিৎসার সব ভার আমার।"

ওর চোখে জল চিক চিক ক'রে উঠল। প্রসঙ্গ পাল্‌টে বলল: "সে হবে ভাই। তবে এত দূরে থাকি যে—" আমি বললাম: "তাইতো কাছে টানতে চাই। বলতে কি, তোমার ওপর রাগ ক'রে তোমাকে আরো দূরে ঠেলতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে ঘটল উল্টো: তুমি যেন আরো কাছে স'রে এলে।"

ওর চোখ জলে ভ'রে এল। বোধ হয় অসুখের জন্যেই ও আবেগ সামলাতে পারে নি—চোখ মুছেছিল। ইন্দিরাও চোখে আঁচল দিল। আমি বললাম: "কিন্তু একটি কথা: আমি আজ সংস্কৃত কলেজে গাইব—তোমাকে আসতেই হবে।"

ও বলল করুণ হেসে: "ভাই, আমার কি অসাধ? তবে—

আমার যে নড়াচড়া একেবারে বারণ। একদম হাঁটতে পারিনে।” আমি বললাম: “আমি নিজে মোটরে ক’রে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।” ও আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বলল: “ধন্যবাদ না-ই দিলাম দিলীপ।” মনান্তরের এ-মধুর মিলনান্ত সমাপ্তির কথা কোনোদিনও কি ভুলব? এর পরে ওর সঙ্গে আর কখনো মনকষাকষি হয় নি—জয় গুরু জয়!

* * * * * *

ডায়রিতে পাই ৩০এ জুলাই সংস্কৃত কলেজে আসর ছিল। নীরেনকে সঙ্গে ক’রে নিয়ে সন্তর্পণে বসালাম আমার পাশেই মঞ্চে। সত্যেনও ছিল সেখানে—মঞ্চাসীন। বহুদিন বাদে দুই প্রিয় বন্ধুকে এক সঙ্গে এক আসরে কাছে পেয়ে আমার বৃদ্ধ ধমনীর মরা গাঙেও যেন যৌবনের বান ডেকে গেল। গানের মধ্যে একবার নীরেনকে জনান্তিকে বলেছিলাম: “নীরেন, ভাই, মনে পড়ে কি অতুলপ্রসাদের গান: কে আবার বাজায় বাঁশি এ-ভাঙা কুঞ্জবনে?”

গানের শেষে ওকে যখন ওর বাড়াতে পৌঁছে দিলাম তখন ও গাঢ় কণ্ঠে বলল: “দিলীপ! আজকের দিনটা আমার জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকালে উঠতেই সাক্ষাৎ ভীষণা দেবীর সম্ভাষণ। রাত্রে কিন্নর দেবের কীর্তন!”

এর পরে ও অনেকগুলি চিঠি লিখেছিল। প্রায় দেড় বৎসর বাদে সালে ওর সঙ্গে শেষ দেখা। ও তখন একটু ভালো ছিল। তবু বেশি চলাফেরা করতে পারত না ব’লে আমি আমার প্রত্যেক আসরেই ওকে তুলে নিয়ে যেতাম আমাদের মোটরে। দু তিন দিন মোটর পাঠিয়ে এলগিন রোডেও আনিয়েছিলাম আমার সান্ধ্য আসরে।

সে কত গল্পালাপ···হাসিঠাট্টা! সে কি ভুলবার! ওর স্নেহরসে আমার নানা পুঞ্জীভূত শুষ্কতাই কেটে যেত। মতান্তর মনান্তর সত্ত্বেও নীরেনকে দেখবামাত্র আমার মুখে যেন খই ফুটত! আমার গানে ভাষণে গল্পালাপে এমন মনেপ্রাণে সাড়া দিতে বেশি লোককে দেখিনি। আলাপের আর্টটিও ও জানত: অর্থাৎ যেখানে বলা চাই সেখানে বলা, আর যেখানে শোনা চাই সেখানে শোনা। তাছাড়া আমার জীবনের বিকাশের দৃশ্যে

ও তৃপ্তি পেত বরাবরই। বলত প্রায়ই : "তোমাদের ধোঁয়াটে যোগ-যাগের তত্ত্বের আমি সমজদার নই ভাই, দাদার (সত্যেনকে ও দাদা ডাকত) প্রতিভার মূল্যায়ন করতেও আমি অক্ষম। কিন্তু তোমার ও তাঁর হৃদয়ের খবর কিছু রাখি। আমার পক্ষে সেই ঢের—পেয়েছি অনেক, তাই (তোমারই ভাষায়) 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা' করি : যে, তোমার কাছে কী কী পাই নি ভুলে গিয়ে কত কী পেয়েছি সেই কথাই মনে টাঙিয়ে রাখতে চাই।" (সত্যেন ও নীরেনকে আমি কয়েকটি পত্রে এই অঙ্গীকারটি করেছিলাম)।

এমন স্নেহস্নিগ্ধ সদানন্দ হৃদয়বান্ মানুষ কটাই বা দেখেছি—বিশেষ ক'রে বিদ্বান্‌দের মধ্যে? বহুপাঠী বুদ্ধির ও পুঁথিসার পাণ্ডিত্যের বন্ধ্যা তাপে মানুষের প্রাণের রসকষকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যেতেই দেখে এসেছি, দেখেছি বুদ্ধিমান্ অনেককেও কথায় কথায় নারাজ হ'তে, বিজ্ঞ হ'তে গিয়ে 'সিনিক' বনতে, উত্তরোত্তর নিজেকে গুটিয়ে নিতে। কিন্তু দুরন্ত হৃদ্রোগ সত্ত্বেও নীরেন শেষ পর্যন্ত নিজের নানা স্বপ্ন আশাভঙ্গের ব্যথা চেপে বন্ধুসংসদে আজীবন শুধু হাসি-গল্পের আনন্দই বিলিয়ে এসেছে। এলা হুইলার উইলকক্সের চতুষ্পদীটি ও প্রায়ই উদ্ধৃত করতে ভালো বাসত :

Laugh, and the world laughs with you ?
Weep and you weep alone ;
For the sad old earth must borrow its mirth,
But has trouble enough of its own.

(হাসো যদি, সারা জগৎ উঠবে হেসে তোমার সাথে
কাঁদো যদি কাঁদবে একাই ভাই।
জর্জরা বিষণ্ণা ধরা চায় শুধু রংরসের ঝোরা
দুঃখতাপের অভাব তো তার নাই)।

কিন্তু শুধু রংরসের ঝোরাই নয়, প্রশংসার ঝোরাও ও ঝরিয়ে যেত অঝোরেই নানা উন্নাসিক ক্রিটিকের ম'ত একটি সাবাস-এর পরে দশটি কিন্তুর অবতারণা করত না 'নিরপেক্ষ' নাম কিনতে যেয়ে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া অপ্রসঙ্গিক হবে না :

সালে যখন পিতৃদেব (দ্বিজেন্দ্রলাল) সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর পর তিনটি ভাষণ দিই তখন নীরেন উপস্থিত ছিল তিন দিনই। তৃতীয় দিনে আমার আড়াই ঘণ্টা ধ'রে গান ও ভাষণের শেষে ও উজ্জ্বল মুখে বলল: "সত্তরের কোঠায় এ-অসম্ভবকে সম্ভব করতে এক তুমিই পারো। কাজেই মানতে হ'ল ভাই—অঘটন আজো ঘটে।"

মোটরে করে ফিরবার সময়ে ও আমার কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলেছিল: "ভাষণে তুমি বললে—তোমার পিতৃদেবের কাছ থেকে তুমি পেয়েছ তাঁর কণ্ঠসম্পদ। কিন্তু শুধুই কি কণ্ঠ? পাও নি কি তাঁর বুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সরলতা—সবার উপর, তাঁর কবিত্ব, বহুমুখী প্রতিভা?" আমি ওকে বলেছিলাম পিঠ পিঠ: "নীরেন, তুমি জানো—আমি দুঃখ পাই যখন আমার পুরোনো বন্ধুরা আমাকে শুধু 'গাইয়ে' ব'লে তক্‌মা দিয়ে প্রকারান্তরে কবি ব'লে মানতে নারাজ হন। এক্ষেত্রে তুমি যে অন্ততঃ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়লে এজন্যে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।" উত্তরে ও হেসে বলেছিল: "ভাই, আর কেউ না জানুক, তুমি তো জানো—আমি কত একলা—নিঃসঙ্গ। কেবল বন্ধুদের কাছেই যা একটু ছাড়া পাই, বলি যা প্রাণ চায়, তাই অপরে সায় না দিলে বলি: 'ব'য়ে গেল—আমার যা ভালো লাগে তার তারিফ করবই করব। একলা চলো রে।"

এমন মানুষকে উদার আদর্শবাদী ছাড়া কী শিরোপা দেব?

কথার স্রোতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। ফিরি।

পণ্ডিচেরিতে একটি অঘটন মতন ঘটে। একদা ওর সঙ্গে যোগশক্তির প্রত্যক্ষতা নিয়ে তর্ক হয়। ও ভাবটাবকে বিশেষ নেকনজরে দেখত না। কিন্তু হবি তো হ, আশ্রমে একদিন বেটক্করে ভাবাবেশে ভূমিশয্যা নেয়। আমি ওকে বলেছিলাম: 'কী নীরেন? ভাব হয় নি কি আজ?' ও বেশ একটু ভাবিত হয়েছিল বৈকি, কিন্তু কোনো মন্তব্যই করে নি।

অতঃপর আমার প্রথম কাব্যগুচ্ছ "অনামী" আত্মপ্রকাশ করে। নীরেন অনামীর নানা অনুবাদেরই সুখ্যাতি করলেও আমার কবিতার সুখ্যাতি করে নি মন খুলে। নানা কবিতার ভাবাবেগ ওর মনে সাড়া তুললেও লিখেছিল: "তোমার অনামীকে আমি স্বাগত সম্ভাষণ করছি। নানা দেশের নানা কবির নানা ভাবের নানা রঙের যে-স্বাদ তুমি আমাদের

দিয়েছ তার সমৃদ্ধিতে আমার মন সাড়া দেয়। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে তাই অনামীকে বঙ্গসাহিত্যে তোমার বিশিষ্ট অবদান ব'লে মানতে আমার বাধে না। কিন্তু ভাই তুমি জানোই তো আধ্যাত্মিক কবিতার মধ্যে আমি তেমন রস পাই না। তবে তোমার ছন্দ সম্বন্ধে আর বলবার কিছুই নেই আমার—যদিও পণ্ডিচেরিতে তোমার কোনো কোনো কবিতার ছন্দ-পতনে আমি আপত্তি করেছিলাম তোমার মনে থাকতে পারে…"ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে যখন অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন আমার কাব্য ও ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ১৩৩৭ সালে লেখা প্রশস্তিটি আমি আবার ছাপিয়েছিলাম।* নীরেন তাতে আপত্তি ক'রে আমাকে লিখেছিল (স্পষ্টবাদী ছিল তো ও স্বভাবে): "এ-প্রশস্তি এতদিন পরে আবার ছাপাবার সার্থকতা কী? একসময়ে—যখন অনেক সমালোচক তোমার ছন্দের নানা দুর্বলতার সম্বন্ধে নানা কথা বলতেন তখন রবীন্দ্র-নাথের এ-সার্টিফিকেটের মূল্য ছিল মানি, কিন্তু আজ তুমি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি —(লব্ধপ্রতিষ্ঠের নিচে দাগ দিয়েছিল)— "এখনও আর কারুর প্রশংসা উদ্ধৃত করা তোমাকে মানায় না ভাই, কিছু মনে কোরো না।" (এ-বিষয়ে ওর সঙ্গে ফের আমার মতান্তর হয়েছিল।)

কিন্তু আমার সাম্‌নে আমাকে অপ্রিয় সমালোচনা করলেও ও আমার আড়ালে আমার প্রশংসা করত মুক্তকণ্ঠেই। এ-কথা ও আমাকে লিখে জানিয়েছিল ১৯৫৮ সালে—যখন আমি চণ্ডীগড়ে "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য

* রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ পত্র তার শেষে ছিল: "কিন্তু এ কী ব্যাপার হে? অকস্মাৎ তোমার কান তৈরী হ'য়ে গেল কী উপায়ে?…আর তো তোমার ভয় নেই।·সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন, তখন নবজাগ্রত ভাষায় তোমার যাকিছু বলবার নিজের জবানিতেই ব'লে যেয়ো।"… আমি এ-প্রশস্তিটি শুধু অনামীতে নয় আমার তীর্থংকরেও ছাপিয়েছিলাম। নীরেনের আপত্তির উত্তরে তাকে বলেছিলাম বড় গলা করেই: "ভাই, শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্র-নাথের মতন মহাজনের প্রশস্তি নিয়ে গৌরব করা যদি দুর্বলতা ব'লে মেনেও নিই (তর্কের খাতিরে) তাহলেও বলবই বলব যে, এ-দুর্বলতা অশোভন নয়। সুতরাং আমি অননুতপ্ত। তুমি যদি কবিতা লিখতে তাহ'লে একথার মর্ম বুঝতেই বুঝতে··" ইত্যাদি।

সম্মেলনের" সভাপতি হ'য়ে ভাষণ দিয়েছিলাম ভারতীয় কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে। নীরেন ওর পত্রে লিখেছিল যে, বহুবৎসর আগে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে ও একদা বলেছিল: "দিলীপের কবিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভা একদিন স্বীকৃত হবেই হবে।" আমাকে ও গভীর স্নেহ করত ব'লেই আমার নানা গৌরবে ও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করত—যদিও সে-গৌরবের সরিক হ'তে এগিয়ে আসতে চাইত না কোনোদিনই—নিজেকে পিছনে রেখেই আমাকে আমার প্রাপ্য প্রশস্তি দিত সোচ্ছ্বাসে। যাক, তার পরের অধ্যায়ে আসি এবার।

অনামী প্রথম সংস্করণ যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন এক কবি আমার কাব্য-কৃতিকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন করার পরেই আমার কাব্যপ্রেরণাকে অপদস্থ করতে যত্র তত্র নানা বিরূপ মন্তব্য করেন—অথচ আমাকে নিজেহাতে চিঠি লিখেছিলেন অভিনন্দন ক'রে! তাঁর এই মিথ্যাচারে আমি ক্ষুণ্ণ হ'তে নীরেন আমাকে লিখেছিল: "তোমার অনেক গুণ থাকলেও এই একটি মস্ত দোষ আছে দিলীপ যে, তুমি নিজে সত্যনিষ্ঠ ব'লে সবাইকেই সত্যাশ্রয়ী মনে ক'রে পাকে পড়ো। তুমি কবে জানবে এ-দুঃখময় সত্যটি যে, সংসারে যথার্থ সত্যনিষ্ঠ মানুষ অতি বিরল?"

এ-চিঠিটি শুধু যে আমাকে চমকে দিয়েছিল তাই না, এই সূত্রে আরো দেখতে পেয়েছিলাম (যেন নতুন ক'রে) যে, নীরেন আমার কাছে কখনো মিথ্যা কি মন-রাখা কথা বলেনি।

কিন্তু তারপরে আমার আরো চৈতন্য হয়। আমি দেখি—আমিও তো সব সময়ে সত্য বলি নি। মিথ্যাবাদী না হ'য়ে এমন ভঙ্গি করি নি কি অনেক সময়েই যাকে বলা যায় শীলতার মিথ্যাচার? এই নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম পরে—এখানে তুলে দিলামই বা—স্মৃতিচারণের একটা মস্ত সুবিধেই তো এই যে, অবান্তরের অবতারণা করলে তার জাত যায় না। আমি লিখেছিলাম:

My critics tell lies! I feel sad
And then in a high self-righteous mood
Inveigh against them; "Oh, they're bad—
These slanderers; black envy's brood!"

And then, reviled, I start to get
My own back and these knaves condemn
Loudly behind their backs and yet
Face to face bill and coo with them!

মিথ্যার নানা রূপ আছে ঃ ভণ্ডামি, বড়াই করা, অতিরঞ্জন, কুৎসা-রটনা, সুবিধাবাদ···ইত্যাদি। স্বভাবে সে বহুরূপী। কখনো কখনো এমন মোহন বেশে আসে যে, সত্যিই মনে হয়—সে অনবদ্য না হোক রূপবান্ বৈকি। আমি এখানে বলতে চাইছি যাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন ঃ 'শীলতার অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা।' সমাজে থাকতে হ'লে এ-শ্রেণীর মিথ্যা কে না বলে? সাহেব পুরাণে একে lie বলা হয় না, নরম ক'রে বলা হয় fib.

কিন্তু আমার সত্যিই দুঃখ হ'ত ভাবতে যে, আমি সংসারী না হ'য়েও (মানে যোগপন্থী সাধক হওয়া সত্ত্বেও) মিথ্যাচারীদের সঙ্গে সুশীল ব্যবহার করি—ভদ্র হ'য়ে হাসি, মুখে অভ্যর্থনা করি তাদের সগোত্রদেরও! কিন্তু মিথ্যা কমপ্লিমেণ্ট, সাবাস, সুপারিশ, ছোটকথা বড় ক'রে বলা—এ সবই তো মিথ্যাচার। সত্যাশ্রয়ী মানুষ যখন সত্যিই চায় সত্যের সাধনা করতে, তখন সে বলে ঃ "আমি বরং সত্য ব'লে একঘরে হব কিন্তু মিথ্যা ব'লে পপুলার হতে চাই না।"

একথার মানে এই নয় যে, কোথাও মিথ্যা বা অত্যাচারের ছিটে-ফোঁটা দেখলে ডন কুইক্‌সটের মতন তার উদ্দীপ্ত প্রতিবাদ ক'রে মানহানির মোকদ্দমায় জেলে না গেলে মান থাকবে না। শহীদেরা (martyr) পূজ্য একথা সত্য হ'লেও সবাই যে স্বধর্মে শহীদ একথা সত্য নয়। কিন্তু একটা কথা সত্য-সাধককে মনে রাখতেই হবে যে, শীলতা যেখানে ভাবের ঘরে চুরি ক'রে সামাজিক হ'তে চেয়ে মিথ্যাচারী বনে, সেখানে তাকে পোষাকী বেশে সুভদ্র দেখালেও তার আসল নাম কপটতাই বটে। নীরেন সুশীলতার অজুহাতে সভ্যভব্য কপটতাকে শিরোপা দিত না। তাই অনেকেই তাকে অপছন্দ করত, বলত গোঁড়া।

আমি জানি না অবশ্য নীরেন তার শেষ জীবনে অত্যুৎসাহে অজান্তে খানিকটা গোঁড়া মনোভাবের দুরন্ত প্রভাবে প'ড়ে গিয়েছিল কি না। আমি

শেষের দিকে তার সঙ্গে মন খুলে আলাপ করার সময় পেতাম না, তাই বলতে পারি না। তবে একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে, সে পরমহংসদেবের নিষেধের তারিফ করত যে,“মতুয়ার বুদ্ধি” (dogmatism) নিন্দনীয়। গোঁড়া উৎসাহীরা মতুয়ার বুদ্ধিকে ধর্মের নামে প্রশ্রয় দিয়ে যে মানুষের ভেদবুদ্ধির (দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির) দুঃখবৃদ্ধি করে একথা কে না মানবে ? কিন্তু নীরেনের ম'ত আরো কয়েকটি নাস্তিক বন্ধু যখন আমাকে বলতেন যে, ধর্মই গোঁড়ামির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক তখন প্রতিবাদ করতেই হ'ত। কারণ মানুষ স্বভাবে অজ্ঞান ও অবোধ ব'লে সে প্রায় প্রতি প্রচেষ্টায়ই নিষ্ঠার নামে গোঁড়ামিকে বরণ ক'রে এসেছে আবহমানকাল—শিল্পের গোঁড়ামি, বিজ্ঞানের গোঁড়ামি, রাষ্ট্রনীতির গোঁড়ামি, আইনের গোঁড়ামি, এমন কি স্বাধীনতার গোঁড়ামিও মানুষকে যুগ যুগ পেয়ে ব'সে তাকে স্বেচ্ছাচারের (license) ঢালুপথে রওনা ক'রে দিয়ে দ-য়ে মজিয়েছে। কিন্তু সে-জন্যে দায়িক মানুষের অজ্ঞান—ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান নয়। ধর্মের একটা উদাহরণ দিই আমার বক্তব্যটির ভাষ্য করতে, আরো এই জন্যে যে, নীরেন-প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের মুখে প্রায়ই শুনতাম যে, ধর্মই যত নষ্টের গোড়া—সর্ববিধ কুসংস্কারের মহাগুরু। খাঁটি ধার্মিকদের সঙ্গে যারই একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে তারই চোখে পড়তে বাধ্য দুঃখময় জগতে এই আনন্দময় সত্যটি যে, যথার্থ ধার্মিক পরধর্ম-অসহিষ্ণু ও গোঁড়া হ'তেই পারেন না। কারণ ধর্মসাধনায় সাধকের অন্তরে ভাগবতী করুণার আলো নামার সঙ্গে সঙ্গে সে-আলো প্রেমে রূপান্তরিত হয়, যার প্রসাদে সব অহঙ্কারের কালোই বিলুপ্ত হয়—যে অহঙ্কারই খতিয়ে সর্বাধিক গোঁড়ামির জনক, ভেদবুদ্ধির ধারক। যাহোক এবার উদাহরণটি দিই :

পুনায় ইন্দিরা একটি কুষ্ঠাশ্রমে কাজ করে। সেখানে একটি বৃদ্ধ খৃষ্টান ধর্মযাজকও (Father) কাজ করতেন তাঁর কয়েকটি সহকর্মীর সঙ্গে। ফলে ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর ভাব হয়। দীর্ঘ কাহিনী, প্রবন্ধের কায়া বেড়ে গেছে তাই সব বলা অসম্ভব। সংক্ষেপে, ইন্দিরাকে তিনি বলেন : “মা, তুমি জীসাসেরই কাজ করছ তোমাদের মন্দিরে—আর তাঁর আশীর্বাদও পেয়েছ জেনো।” ইন্দিরা সবিস্ময়ে বলে :

"ফাদার, আপনার আশ্বাসে উৎফুল্ল হ'লেও আশ্চর্যও হয়েছি কম নয়। কারণ আমরা যে পৌত্তলিক, মন্দিরে কৃষ্ণের পূজা করি।" ফাদার হেসে বলেন: "তাতে কি মা? কৃষ্ণ খৃষ্ট কি ভিন্ন?" ইন্দিরা বলে: "কিন্তু আপনারা কি বলেন না যে, ভগবানের একটি মাত্র অবতারী পুত্র—জীসাস?" ফাদার হেসে বলেন: "মা, ভগবান্ তাঁর অবতারী সন্তানদের জন্ম দেবার সময় ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেন না।" ইন্দিরাকে তিনি এত ভালোবাসতেন যে, বরাবর ওর হাঁপানির দামী দাওয়াই—"টেডেরাল"—সরবরাহ করতেন বিনামূল্যে। গত ১৮ই ডিসেম্বর তিনি দেহরক্ষা করার মুখে শিষ্যদেব ব'লে যান ইন্দিরাকে তাঁর শেষ উপহার তিন বোতল টেডেরাল পাঠিয়ে দিতে। আর মহাপ্রয়াণের সময় শেষ নিশ্বাসে বলেছিলেন: "Oh my Lord, Oh my Lord!" তিনি খৃষ্টের দর্শন পেয়েছিলেন। ব'লে গিয়েছিলেন তাঁর দেহ যেন কুষ্ঠাশ্রমে পাঠানো হয়—তাঁর কুষ্ঠরোগী সন্তানেরা দাহ করবে।

এরই নাম খাঁটি ধার্মিক—যার মনে ভাগবতী করুণার আলো নেমে প্রেমের দৃষ্টি জাগিয়ে সব ভেদবুদ্ধি, গোঁড়ামির অজ্ঞান আঁধার দূর ক'রে দিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

কিন্তু ভাগবতী করুণার এ-আলো কিছু সকলের মধ্যেই নামে না। যারা নিটোল ঐকান্তিকতার তাগিদে প্রাণসাধনায় এ-আলোর শরণাপন্ন হ'তে না চায়, তারা বুদ্ধিবিচার তর্কযুক্তি পরখ-যাচাইয়ের পথে কিছুটা ঐহিক বিচক্ষণতার অধিকারী হ'য়ে ফুটে উঠলেও যথার্থ জ্ঞান, ওরফে পরাপ্রজ্ঞার নাগাল পেতেই পারে না। তাই নীরেন তার বুদ্ধিবাদী সাধনায় জ্ঞানদৃষ্টির অধিকারী হয় নি বললে তার উপর অবিচার করা হবে না, আরো এই জন্যে যে, সে নিজেই বলত—পরাপ্রজ্ঞার কোনো তৃষ্ণাই তার ছিল না। সে চাইত—এ-যুগের হৃদয়বান্ বুদ্ধিবাদীরা জীবনের তীর্থপথে যা চায় তাই—তার বেশিও নয়, কমও নয়: অর্থাৎ, বুদ্ধিবিচার যাকে মঞ্জুর করে সেই আলো—ভক্তি জ্ঞান দর্শনাদি নয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমি একটি মহাসত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম: যে, বুদ্ধিবিচারতর্কযুক্তি ভগবানের চরণে আত্ম-

সমর্পণের উদ্দীপনা দিতে পারে না (যাকে "ফাদার" বলতেন: "Thy will be done—not mine"), আর এ-নিরভিমান আত্মসমর্পণ বিনা কিছুতেই অজ্ঞানের রাত পোহাতে পারে না—মানুষ থাকে কণিকা-সত্য, সিকি সত্য, বড়জোর অর্ধ সত্যের রাজ্যে কায়েমী হ'য়ে। তাই নীরেনকে আমি প্রায়ই বলতাম যে, বুদ্ধিবিচারের মন্ত্রণা আমাদের অনেক কাজে এলেও তার এলাকা—jurisdiction—হ'ল: এক, সংসারের চৌহদ্দি ওরফে বৈষয়িকতা; তুই, বস্তুবিশ্লেষণের পরীক্ষাগার ওরফে ল্যাবরেটরি। এককথায়, লৌকিক বুদ্ধির সাধনা রকমারি সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ভোগমুখী প্রসাধন ও উত্তেজনার পথ বাৎলে দিয়ে নিত্যনতুন চমক জাগাতে পারলেও মানবাত্মার অন্তিম চাহিদার—তাপহরা শান্তি ও পূর্ণআত্মজ্ঞানের—দিশা দিতে পারে না। তার জন্যে চাই—শ্রদ্ধার নির্দেশ মেনে "তত্ত্বদর্শীদের" কাছে ধর্ণা দেওয়া, কারণ তাঁরা ছাড়া সত্যের সত্যে দীক্ষা দেওয়ার অধিকারী গুরু আর নেই এজগতে।*

নীরেন গীতার একথা মানত না, বলত: "বুদ্ধিবিচার ছাড়া জীবনের কাঁটাবনে আর কোনো পথিকৃৎ নেই, বিশ্বাস অন্ধ ব'লেই নামঞ্জুর।" সেই সনাতন বিতণ্ডা আর কি: সত্যের পরম দিশারি কে?—তর্কযুক্তি, না, শ্রদ্ধাভক্তি? মগজ না হৃদয়? গীতার সমাধান: "স্বধর্ম বরণ ক'রে চলো।" নীরেন তার স্বধর্ম মনে করত তর্কবিচার-যুক্তিকে, আমি—শ্রদ্ধাবিশ্বাসভক্তিকে। হোক্, তবু অচিনের তীর্থযাত্রায় শেষ পর্যন্ত আমার মতন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মীও যে হৃদয়ের স্নিগ্ধ শান্ত অঙ্গনে তার হাতে হাত মিলিয়ে বলতে পেরেছিল: "তোমাকে কিছুতেই ভালো না বেসে পারি নি ভাই,"—এইখানেই হয়ত অন্তিম সমাধান—শুধু প্রেমের অঞ্জনেই হয়ত পরাপ্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়, যার প্রসাদে দেখতে পাই যে, শঙ্কর বাণীর দ্বিতীয় পাদ—"জগৎ মিথ্যা" নামঞ্জুর হ'লেও, তৃতীয় পাদ—"জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—

---

*তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

'জীবই শিব', এ-বাণী সত্যের সত্য ; আর এই মহা-উপলব্ধির আলোকেই জীবনের সব স্বার্থসাধ মিথ্যাচার রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির নির্বাসনে এ-পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে উঠতে পারে। নীরেন শিবকে না মানলেও ভরসার কথা এই যে, জীবকে ভালোবাসতেই হবে একথা মনেপ্রাণে মানত—বলত উঠতে বসতে। বিবেকানন্দের "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর" এ-মহাবাক্যে ওর বিবেকের পুরো সায় ছিল। হোক না সে-প্রীতি ব্যক্তিগত কি গোষ্ঠীগত—প্রলেটারিয়েটের জয়গান। হৃদয়কে মানুষ যখন পুরোপুরি খুলে ধরতে পারে কোনো নিবিড় অনুরাগকে বরণ করতে তখন সে-"কল্যাণকৃৎ"-এর আর তো "দুর্গতি" হ'তে পারে না। কারণ, সেই সসীম প্রীতির প্রণালী বেয়েই তার অন্তরমন্দিরে প্রেমের ঠাকুর একদিন না একদিন আবির্ভূত হ'য়ে সব ভেদবুদ্ধির নিরসন করবেনই করবেন। যুগাবতার পরমহংসদেবের উপমায় : "শ্রীক্ষেত্রে কেউ অভুক্ত থাকবে না গো, তবে কারুর পাত পড়ে সকালে, কারুর বা নিশুত রাতে।"

নীরেনের কাছে আমি এ-উপমাটি পেশ করতে সে বলত : "ভাই দিলীপ! বিশ্বাস যার আসে তার আপনা থেকেই আসে, কেন না সে স্বভাবে স্বয়ম্ভূ ভুঁইফোঁড়। তোমাদের উপনিষদেও এ-কথা মেনে নেয়নি কি যখন নচিকেতাকে যম বলেছিলেন যে ভগবান সকলের জন্য নন শুধু কৃপাধন্যরাই তাঁকে পায়—'যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্?' যদি তুমি মেনে নেও যে, ভাগবতী করুণা সম্বন্ধে একথা খাটে তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মানতে হবেই হবে যে, বিশ্বাস সম্বন্ধেও একথা সমান প্রযোজ্য, অর্থাৎ 'যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে'—বুঝলে না? তাই আমি যুক্তির খুঁটি ছেড়ে অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চাই না—সেটা আমার সাধ্যের অতীত ব'লে। আমি যেটা পারি সেটা হ'ল—সত্যকে দেখতে চাওয়া যুক্তিরই দিব্যদৃষ্টি দিয়ে।"

আমি বলতাম হেসে : "নীরেন, তোমার কথাটা শুনতে খাসা, কেবল দুঃখ এই যে যুক্তির পথে নৈশ্চিত্যের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। তার প্রসাদে বুদ্ধির কসরতে এক ধরণের ব্যায়ামানন্দ লাভ হ'তে পারে, কিন্তু যে

সত্যকে পেলে 'ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' সে-সত্যের দেখা পাওয়া যায় না। শ্রীঅরবিন্দ কি বলেননি সাবিত্রীতে যে—

Not by reason was creation made
And not by reason can the Truth be seen*

"একথার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাবে। একটি দৃষ্টান্ত আমার মনে গেঁথে আছে। যে-নাজিদের তুমি আমি উভয়েই মানুষের মহাশত্রু মনে করি, সেই নাজিবাদের হর্তাকর্তা বিধাতা অসুর হিটলারেরও এমন বহু আন্তরিক পূজারী ছিল যারা তাঁর জন্যে সর্বস্ব ছেড়েছিল। রমেলের সৈন্যদের মধ্যে এক পদাতিক দেশ ছেড়ে, বহু যুদ্ধে আহত হ'য়ে দুঃখ পেয়ে শেষে হেরে মরবার সময় বিদেশে বিভূঁয়ে—মিশরে—'হাইল হিটলার' জয়ধ্বনি করেছিল শেষ নিশ্বাসে। বলবে কি, তার যুক্তি তার নিজের কাছে ভ্রান্ত মনে হ'ত? কত বিদ্বান বুদ্ধিমন্ত হিটলারকে জর্মনদের ত্রাতা দেবতার পদে বসিয়েছিলেন জানো তো? তাঁরা কি বলতেন না যে, ষ্টালিনকে যারা দেবতা বলে তারা নরকে যাবেই যাবে? শ্রীঅরবিন্দ তাই আমাকে লিখেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা: "যে, মানুষে মানুষে প্রতি মূলগত মতান্তরের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিই বিচারকের মঞ্চাসীন হ'য়ে এমন রায় দিতে পারে না, যাকে বিরুদ্ধ যুক্তি সমান ভারিক্কি চালে কাটতে অক্ষম। এক কথায়, যুক্তি হল পেশাদার উকিল—যে-কোনো মক্কেল তাকে বাহাল করতে পারে নিজের তরফে।" নীরেনকে একদিন কলকাতায় মোটরে আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলাম যুক্তিকে শ্রীঅরবিন্দ কী রকম অকাট্য ব্যঙ্গ করতেন (সাবিত্রী ২. ৯ দ্রষ্টব্য):

An inconclusive play is Reason's toil.
Each strong idea can use her as its tool;
Accepting every brief she pleads her case.
Open to every thought she cannot know.

---

*রচিত হয় নি বিশ্ব বুদ্ধির প্রখর যুক্তিবলে
পারে না লভিতে বুদ্ধি যুক্তি আদিসত্যের দর্শন।

আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" গ্রন্থে এছাড়া আরো কয়েকটি উদ্ধৃতির অনুবাদ দ্রষ্টব্য মগজী বুদ্ধিজাত যুক্তির হ্রস্বদৃষ্টি সম্বন্ধে।

The eternal Advocate, seated as judge,
Armours in logic's invulnerable mail
A thousand combatants for Truth's veiled throne
And sets on a high horseback of argument
To tilt for ever with a wordy lance
In a mock tournament where none can win

(বিচিত্র বুদ্ধির লীলাখেলা ! তার বাঙ্ময় যুক্তির
বহু প্রয়াসেরও অন্তে পায় না সে নিশ্চিতির দিশা !
প্রতি দীপ্ত ভাবধারা করে তাকে নিত্য আজ্ঞাবাহী ।
বরণ করে সে প্রতি চিন্তা—তবু লভে না তো জ্ঞান !
একাধারে চিরন্তন ব্যবহারাজীব বিচারক
সত্যের-প্রচ্ছন্ন-সিংহাসনলুব্ধ লক্ষ যুধ্যমানে
ন্যায়ের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিয়া—করিয়া আসীন,
তুঙ্গ-তর্ক-তুরঙ্গমপৃষ্ঠে করে উদ্দীপিত শুধু
তাদের অসাঙ্গ কথা-কথাসার মল্লযুদ্ধে—এক
মায়া-রণাঙ্গনে—যেথা পারে না কেহই হ'তে জয়ী ।)

ঠাট্টাটা ক'রেই আপশোষ হয়েছিল ঃ "যাঃ! দেখ দেখি—ফের বেফাঁস কথা ব'লে ফেলেছি ! ও অসুস্থ, হয়ত ফের আমাকে ভুল বুঝবে —যে, আমি ওর উপাস্য বুদ্ধিকেই অপদস্থ করতে চাচ্ছি ।" কিন্তু সেদিন ও আমাকে ভুল বোঝে নি, বলেছিল ঃ "ভাই, ব্যঙ্গ হিসেবে এ-তীরন্দাজি চমৎকার হ'লেও এ হ'ল খতিয়ে বুদ্ধি দিয়েই বুদ্ধির সীমান্ত দেখিয়ে দেওয়া । এতে ক'রে বিশ্বাসের অকাট্যতা প্রমাণ হয় না ।" তাতে আমি বলেছিলাম ঃ "মানি । তবে কি জানো নীরেন ? বুদ্ধি বনাম বিশ্বাস, এ-সনাতন তর্কের কোনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তিই হ'তে পারে না বাক্-এর আখড়ায় । শুধু অনির্বচনীয়ের উপলব্ধিই আবাহন করতে পারে সেই প্রজ্ঞার আলো যার বরে সব সংশয় কাটে । তাই গীতার নজির দিয়েই এ-দুরন্ত তর্কের সমাপ্তি টানি—যে, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্—শুধু বিশ্বাসের পথেই জ্ঞানের তীর্থলক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, দাদা ।"

শেষে কেবল আর একটি কথা বলার আছে—যাকে নীরেনও স্বীকার

কবত : যে মানুষ যখন কোনো জীবন-দর্শন—philosophy of life গ'ড়ে তোলে তখন সে-সৌধনির্মাণের কাজে বুদ্ধি ও যুক্তির কিছুটা হাত থাকলেও তার স্থপতি—architect— এমন এক স্বয়ম্ভু প্রত্যয়বুদ্ধি—যুক্তি যার কোনো নাগালই পায় না। একথা ও মানত সম্ভবতঃ খ্যাতনামা বিজ্ঞান-দার্শনিক হোয়াইটহেড সাহেবের অকাট্য রায়কে মেনে নিয়ে যে, বিজ্ঞান চর্চার আদিম প্রেরণা একটি বিশ্বাস – বা যুক্তিনিরপেক্ষ প্রত্যয় যে, বিশ্ব-প্রকৃতি মেনে চলেন এক অলংঘ্য নিয়মকানুনকে যার ইংরাজী নাম law বা order :* আপ্তবাক্যে একে বলে 'ঋতম'—অর্থাৎ স্বজ্ঞার (intuition) আলোয়-দেখা কোনো এক অবোধ্য শক্তির (energy) চলাফেরা—প্রকৃতির অতীত কোনো পুরুষের হুকুম মেনে। নীরেন তার "জীবনদর্শন" সম্বন্ধে আমাকে নানা সময়ে যা বলেছিল বা পত্রে লিখেছিল তার মূলেও ছিল মানুষের ভবিষ্যতে এক যুক্তিনিরপেক্ষ বিশ্বাসই বলব—কেননা যুক্তি দিয়ে তাকে না করা যায় প্রমাণ না অপ্রমাণ—তার জীবনদর্শনের কাব্যরূপ খানিকটা এই ধরণের ছিল :

আমার কাছে বন্ধু, তুমি বলতে গাঢ়কণ্ঠে—পড়ে মনে :
"সত্য কাকে বলে জানা যায় কি বিনা বুদ্ধিবিশ্লেষণে ?
দৈববাণী যখন বেজে ওঠে না ভাই আমার হৃদয়তারে,
কেমন করে করব শপথ বলো দেখি প্রাণের অন্ধকারে—
দেবতাকে আলোর নিশান ব'লে আমি দেখেছি নয়নে ?

---

*বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হোয়াটইহেড তাঁর বিশ্ববিশ্রুত Science and the modern world-এ লিখছেন :

"There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an Order of things and in particular of an order of Nature." এখানে দ্রষ্টব্য—conviction—প্রত্যয় হ'ল বিশ্বাসেরই বলিষ্ঠতম বিকাশ, সুতরাং যুক্তিনিরপেক্ষ, যেহেতু বিশ্বাসের ভিৎ বুদ্ধি নয়, বিশ্বাস আবহমানকাল ভর ক'রে এসেছে বুদ্ধির অতীত কোনো আত্মসিদ্ধ স্বজ্ঞার 'পরে বার্গসঁ যার স্তবগান করেছেন "ইনট্যুশন" নাম দিয়ে।

এ-বিষয়ে আমার "বিজ্ঞানের ট্রাজিডি ও সুমতি" নামে প্রবন্ধটিতে বিশদ ক'রে লিখেছি প্রথমেই।

নই মনীষী মুনি—মানি আমি, তবু অন্তর গহনে
কে যেন গায় গভীর সুরে : যাকে বরণ করলে সত্য ব'লে
ভ'রে ওঠে মন, প্রত্যয়-অরুণরাগে যায় কুয়াশা গ'লে,
আজ চলো সেই পথেই, যদি কাল শুনে আর কোনো পথের ডাক
দেয় সাড়া মন তোমার প্রেমে, ক'রে বরণ সে-নবানুরাগ
চলতে যেন পারো। কোথায়? নাই জানলে। চলারই আবেগে
চলবে কেটে বিপথে পথ, নিরাশায়ও উঠবে আশা জেগে
মানুষেরই সেবায়, গেয়ে : প্রেম ছাড়া নই নই কিছুরই আশী।
বাসতে ভালো শিখেছে যে থাকতে কি সে পারে উপবাসী?"

নীরেনের সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু লিখবার ছিল—হয়ত কোনোদিন লিখব—স্মৃতিচারণে। ইতি।

দীপ্তিময়ী নিবেদিতা

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার দেহরক্ষার পরে লিখেছিলেন: "নিজেকে এমন করিয়া নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই··প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে-জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল—যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন—নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।······একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না······তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।"

লোকোত্তর প্রতিভাধরের যোগ্য তর্পণ মহীয়সী প্রতিভাময়ীর উদ্দেশে।

উপমাসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: মানুষগুলো বাইরে থেকে দেখতে প্রায় এক রকমেরই মনে হয় বটে, কতকটা পুলিপিঠের মতন। কিন্তু তফাৎ হয় পোরের স্বাদে। কারুর মধ্যে গুড়ের পোর, কারুর নারকোলের—তবে সেরা পুলিপিঠের মধ্যে থাকে ক্ষীরের পোর।

মহীয়সী নিবেদিতা জন্মেছিলেন অমৃতের সঙ্গে সুধার পোর নিয়ে। আত্মনিবেদনের অপরাজেয় শক্তি ও পরের দুঃখে ব্যথিয়ে ওঠার কমনীয় শক্তি ছিল যেন তাঁর সহজাত কবচকুণ্ডল। ভবভূতির উপমায়: 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন ফুলের মতন নরম, সুন্দর—স্নেহে দরদে সেবায়—অন্যদিকে তেমনি বজ্রের চেয়েও কঠিন, অসহিষ্ণু—দাম্ভিক অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

ভোগবাদী খ্রীষ্টান পরিবেশে তাঁর জন্ম—আয়র্লণ্ডে। বড় বিচিত্র

এই আইরিশ সংস্কৃতি—সমন্বয়শালী: আদর্শবাদ ও বাস্তবপ্রীতি, স্বপ্নচারণ ও ব্যঙ্গবিলাস, বর্ণময় কবিত্ব ও গন্তময় নিষ্ঠা—সার সার এই ধরনের নানা স্ববিরোধী প্রবণতার সমাহার।

আইরিশ চরিত্রে দেখতে পাই আর একটি সহজ উন্মুখতা: রূপ ও অরূপের সঙ্গম—মিস্‌টিসিস্‌ম্‌ ওরফে অতীন্দ্রিয় অলোকপন্থা। এ-ভাব যাদের মনে একবার ঠাঁই পায় তারা পৃথিবীতে থেকেও আর কিছুতেই পার্থিব বা বিষয়ী হ'তে পারে না—রূপকে তাদের মন মানলেও গভীরে অন্তরাত্মা তৃষিত থাকে সব রূপের উৎস অরূপের নাগাল পেতে—মন্ময়তাকে পাশ কাটিয়ে তন্ময় হ'তে। তাই তো নিবেদিতা বস্তুতান্ত্রিক আবহে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের মৃন্ময়ী সত্তাকে কোনোদিন অঙ্গীকার করতে পারেন নি, চেয়েছিলেন পদে পদে চিন্ময়ী হ'য়েই ফুটে উঠতে। ফের সেই দুই স্ববিরোধী সমন্বয়: কুসুমের সঙ্গে কুলিশের। তাঁর স্বাদেশিক কবি জর্জ রাসেলের (A. E) মধ্যেও পাই এই মহনীয় সমন্বয়। তাই না তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন নয়া আয়র্লণ্ডের এক দিক্‌পাল স্থপতি।

নিবেদিতারও হ'তই হত কোনো অনুরূপ মহৎ বিকাশ দেশে থাকলেও। অগ্নিশিখা যার আত্মার উপজীব্য তার প্রাণ কি না গেয়ে পারে: "মাটির সাথে ছিলাম মাটির ম'ত—শিখার ম'ত উঠেছি আজ দুলে!" এখানে লোকোত্তর গুরুর সঙ্গে অসামান্যা শিষ্যার সাদৃশ্য বিস্ময়কর: উভয়েই জন্মেছিলেন ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিসত্তা নিয়ে। তাই উভয়েরই পরের দুঃখে প্রাণ কাঁদত, উভয়েই ছিলেন কল্পনায় ঊর্ধ্বচারী, প্রতিভায় সমধর্মী, চরিত্রে একনিষ্ঠ অথচ সাড়ায় বহুমুখী। শ্রীঅরবিন্দের সংজ্ঞা "All sides he sees and turns to every call" উভয়েরই সম্বন্ধে সমান প্রযোজ্য।

নিবেদিতা তাই সিন্ধুপারে ভোগবাদীদের আরামনিলয়ে ব'সে আথাল পাথাল ভাবতেন—নিজের জীবনকে কোন্ আদর্শের মুখে চালাবেন? নানামুখী ছিল যে তাঁর মনের গতি, প্রাণের তৃষ্ণা।

এমনি সময়ে তৃষার্ত পেল দিশারির দেখা: বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হ'তে না হ'তে তাঁর সব অনৈশ্চিত্যের দোলাই থেমে গেল। ঘর ছাড়তে তিনি তো প্রস্তুতই ছিলেন, কেবল ডাক শোনার অপেক্ষা। সে-ডাক বেজে উঠল তাঁর নিয়তি-নির্দিষ্ট গুরুর কণ্ঠে: "আমি চাই কুড়িটি শিষ্য

শিষ্যা যারা নিঃস্ব হ'য়েও বলবে অকুতোভয়ে যে, তাদের ভগবান ছাড়া কোনো সম্পত্তিই নেই! কে সাড়া দেবে এ-ডাকে?" নিবেদিতা লিখছেন: "বলতে বলতে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন, বললেন জলদমন্ত্রে: 'কিসের ভয়? ভগবান যদি সত্যি থাকেন তবে কার পরোয়া? আর যদি না থাকেন তবে বেঁচে কী হবে?'*

এই ডাকটির জন্যেই নিবেদিতার প্রাণ মন ছিল পথ চেয়ে—ঠিক যেমন বৃন্দাবনের গোপীরা থাকতেন বাঁশির ডাকের পথ চেয়ে। ইন্দিরা দেবীর একটি অপূর্ব হিন্দি মীরাভজনে আছে:

ইক বাঁসরি থী বাঁসরি মধুবনমে বজ রহী।
ইৎনী জরাসি বাতপে দুনিয়া বদল গঈ।
জীবন বদল গয়া সখি, দুনিয়া বদল গঈ ॥
(নীল যমুনায় উঠল বেজে বাঁশের বাঁশি তার।
ছোট্ট সে-ডাক শুনে ভেসে গেল এ-সংসার।
জীবন মরণ অম্‌নি আমার হ'ল একাকার ॥)

গুরুর বৈরাগ্য শঙ্খরবে নিবেদিতারও সংসার গেল ভেসে, জীবনমরণ হ'য়ে গেল একাকার। সত্যিই তো, কিসের পরোয়া? কী যায় আসে ভোগ হাতছাড়া হ'লে যদি ভগবান এগিয়ে আসেন সব সাধ মেটাতে? আর যদি তিনি না থাকেন তবে কী হবে দুদণ্ড রঙিন ঝিনুক নিয়ে খেলা ক'রে? এ-আনন্দ কি ভোগ না দুর্ভোগ?

অথ, নিবেদিতা ছাড়লেন দেশ, হ'লেন ঘরছাড়া। ঠিক ব্রজগোপীদের মতনই যেন এসে ধর্না দিলেন দিশারির দরবারে:

ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্। (ভাগবত)
ওগো দুর্লভ! দাও তাহাদের ঠাঁই যারা প্রেমে যাচে শরণ,
করুণাকোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে বরণ।

---

*বিবেকানন্দের মন্ত্রোক্তিটির বাংলা' অনুবাদ হয় না। তিনি বলেছিলেন: "If this is true, what else could matter? *If it is not true, what do our lives matter?*" (নিবেদিতার *My Master as I saw Him*, দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গুরু ডাকলেনও বটে, শিষ্যা সাড়া দিয়ে কাছে এনে তাকে গ্রহণ করলেনও বটে—যখন সে বলল: "গুরুদেব! এসেছি তোমার চরণে সব ছেড়ে, দেখ চেয়ে—সন্ত্যজ্য সর্ববিষয়ান্ তব পাদমূলম্"—কিন্তু বহু পরীক্ষা ক'রে তবে তাকে দিলেন দীক্ষা—যাকে চলতি ভাষায় বলে 'বাজিয়ে নেওয়া'।

গর্বী জাত আইরিশ—আরো বেশি, স্পর্শকাতর। নিবেদিতা ছিলেন মনেপ্রাণে আইরিশ। সুতরাং অভিমানিনী। কাজেই গুরুর সঙ্গে তাঁর বাধত প্রায়ই। সময়ে সময়ে সংঘাত এমন মর্মান্তিক হয়ে উঠত যে মনে হ'ত—আর পারবেন না—বিশেষ যখন গুরু তাঁকে ধমকাতেন: "সব আগে তোমাকে ছাড়তে হবে শ্বেতাঙ্গিনীর দুরভিমান—নত হতে হবে দীনতম ভারতীয়ের কাছে—বড়র কাছে মাথা নিচু করতে কে না পারে? তোমাকে হ'তে হবে নিচুর কাছে নিচু।"

নিবেদিতা ক্ষুব্ধ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, মনের দুঃখে চোখের জলের নদী ব'য়ে যেত। কিন্তু হার মানবেন কেমন ক'রে—যখন গুরুকে মহাপুরুষ ব'লে চিনেছেন একবার? নিবেদিতা বিদ্রোহের পরে আত্মজয় ক'রে শেষে মাথা নিচু ক'রে এসে দাঁড়াতেন—মেনে নিতেন গুরুর আদেশ অকুণ্ঠেই, ফের যথাবিধি সুরু হ'ত তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য: দুঃখীর সেবা, নিরক্ষরকে পড়ানো, রুগ্নের শুশ্রূষা, আর্তদের সদাসতর্ক পরিচর্যা—দীনতম খুঁটিনাটিতে, ক্লিন্নতম পরিবেশে।

কিন্তু গুরু শিষ্যাকে পদে পদে শাসন করলেও তার আশ্চর্য মহিমার মর্মজ্ঞ ছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁকে একবার লিখেছিলেন (২০ জুন, ১৮৯৭) "Every word you write I value, and every letter is welcome a hundred times." (তোমার প্রতিটি কথা আমার কাছে মূল্যবান, প্রতিটি পত্র আমার কাছে বহুবাঞ্ছিত)। শুধু তাই নয়, তাঁর মনের কত গভীর বেদনার স্বপ্নভঙ্গের কথাই যে তিনি বলতেন এই প্রাণপ্রিয়া অন্তরঙ্গার কাছে—সে বিচিত্র রমন্যাস পথ চেয়ে আছে কোনো এক মহাশিল্পীর যে এ-দুই অগ্নিসত্তার কাহিনী ফলিয়ে তুলবে অতুলনীয় নাট্যকাব্যে।

কিন্তু সবচেয়ে গভীর আনন্দচমকের মধুস্বাদ উপস্থিত হয় এই দুই

মহৎ আত্মার শুভদৃষ্টির ইতিহাস থেকে। এর আগে ঘটেছিল ঠিক এমনিই আর এক শুভদৃষ্টি—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের। বালসরল গুরু সে-ক্ষেত্রে শিষ্যকে বলেছিলেন অকপটেই যে, তিনি শুধু তার পথ চেয়েই ছিলেন এতদিন। নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ কোনোদিন এমন কথা খুলে বলেন নি বটে, কিন্তু শিষ্যার নানা রচনা তথা গুরুর নানা পত্রাবলী থেকে আভাষ মেলে এর চমকপ্রদ নাট্যরসের: যে, এ-দুই অগ্নিসত্তার দীপ্ত সহযোগ ছিল তাঁর নির্দিষ্ট যিনি উভয়কে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাহনরূপে গ'ড়ে, পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাণীবাহ হ'তে—নবভারতের জাগৃতিব্রতের পূজারী পূজারিণী পদে বাহাল ক'রে।

নিবেদিতার কথা প্রথম শুনি লণ্ডনে আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসুর মুখে। তাঁর নাম করতেই আচার্যের মুখের ভাবান্তর হ'ত। "সে ছিল একটা দেখবার মতন বস্তু দিলীপ, অথচ দেখেও যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না।" এই ধরনের সে কত চমৎকার কথা! অনুচ্ছ্বাসী মানুষের মুখে উচ্ছ্বাস যেন আরো মর্মস্পর্শী হ'য়ে ওঠে।

তারপর শুনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখে। আমাকে একাধিকবার বলেছিলেন তিনি: "নিবেদিতার ছিল সেই ভালোবাসা দিলীপ, যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।"

কবির কথা অপ্রতিবাদ্য। নিবেদিতার জীবনচরিতের প্রতি পাতায় মেলে তাঁর দিব্য রূপান্তরের কাহিনী: তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘটেছিল একটি মানুষের আবির্ভাবে: স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁকে ভালোবেসেই তিনি শিখেছিলেন হিন্দুর দেবদেবীকে ভালোবাসতে, ভারতকে পুণ্যভূমি ব'লে চিনতে, ভারতের দীন দুঃখী আর্ত নিঃস্বকে কোল দিতে নিজের সন্তানের ম'ত।

সর্বোত্তম প্রেমের উদ্ভব পূজার তৃষ্ণায়, সঞ্চরণ—সেবার আনন্দে, কৃতার্থতা—আত্মনিবেদনে। তাই তিনি নামের মধ্যে দিয়েই দিয়েছিলেন আত্মপরিচয়—আর আত্মবোধ তাঁর মধ্যে উন্মেষিত হয়েছিল গুরুর দীক্ষায়ই। তাই তো তিনি গুরুর তিরোধানের পরে দেখতে পেয়েছিলেন সারা ভারতে তাঁর আবির্ভাব। এ-অসম্ভব সম্ভব হয় কেবল অঘটনঘটনী প্রেমদীক্ষার জাদুমন্ত্রে, যোগবলে। তাই গুরুর মহাপ্রয়াণের পরেও তিনি

শুধু যে তাঁর স্বজাতি স্বদেশকে আপনার জাতি ও দেশ ব'লে বরণ করতে পেরেছিলেন তাই নয়, সে-দেশ ও জাতির মুক্তিরণে বিপ্লববাদীদের সঙ্গে প্রাণকে পণ ক'রেও যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আর এইখানেই ঘটেছিল তাঁর নিরুদ্ধ অগ্নিসত্তার চোখ-ধাঁধানো বিস্ফোরণ—যার উল্লেখ ক'রে শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলতেন: "She was a veritable live wire!" নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল এই অগ্নিলোকের অন্দরমহলেই। তাইতো নিবেদিতা বুক দিয়ে এসে পড়েছিলেন সতীর্থের সহকারী হ'য়ে, তাঁকে চন্দননগরে পাঠাতে অগ্রণী হয়েছিলেন নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে।

এর পরে তাঁর কথা শুনি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের মুখে। নিবেদিতার কথা বলতে তিনি আত্মহারা হ'তেন সত্যিই। "আহা, কী মানুষ ছিলেন তিনি দিলীপ—সে দেখাও একটা ভাগ্য—এমন আধারকে পেয়েছিলাম আমরা না চাইতেই—অথচ যেন চিনতে পারি নি।"······ইত্যাদি। তাঁর সে-উচ্ছ্বাসের বারো আনাই ভুলে গেছি, মনে আছে শুধু তাঁর নিবেদিতার নামে উজিয়ে ওঠা—যার একটি অপরূপ পরিচয় পাই তাঁরই লেখায়। তাঁর "জোড়াসাঁকোর ধারে"-তে তিনি লিখেছেন (১১৪-৫ পৃঃ):

"আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে. আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি।······বড় বড় রাজরাজড়া সাহেব মেম গিস গিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু ক'রে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হ'ল! সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হ'য়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্রফ, ব্লাণ্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

" 'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বলো তোমরা জানি নে। আমার কাছে সুন্দরীর আদর্শ হয়ে আছে কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হ'য়ে উঠল।......সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।......কী করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। জুটি যে দেখি নি আর, উপমা দেব কি ?"

তাঁর সম্বন্ধে আরো কত কথা বলার আছে। কিন্তু ছোট পরিসরের প্রবন্ধকে টেনে বড় করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া, বলেছি, নিবেদিতার কথা বলার মতন ক'রে বলতে হ'লে লিখতে হয় একটি নিটোল রমন্যাস—প্রবন্ধে সানাবে কেন? তাই ইতি করি শুধু শেষে তাঁর সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের তর্পণের প্রতিধ্বনি ক'রে যে, তাঁর শুধু রূপ নয়—অগ্নিসত্তারও উপমা দেওয়া যায় না। মনে পড়ে সুভাষের একটি প্রায়োক্তি : "দিলীপ, আমাদের দেশকে যারা কথায় কথায় ছোট করতে চায়·আমাদের হাজারো গ্লানির জর্জরতার জন্যে, তাদের পড়তে বলি নিবেদিতার *My Master as I saw Him*। এতবড় স্রষ্টা গুরুর এতবড় দ্রষ্টা শিষ্যা জগতে আর হয়েছে ব'লে জানি না।"

মহীয়সী নারী যে একধারে শক্তি তথা লক্ষ্মী এ স্বর্ণসত্যের সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতার পাতায় মিলবে। এ যুগে নিবেদিতা শুধু সে-সাক্ষ্যে আরো উজ্জ্বল ক'রে দাগা বুলিয়েছেন তাঁর দীপ্র আত্মনিবেদনের স্বর্ণাক্ষরে :

"বিনা শক্তি নাই মুক্তি"—গাহিলেন তন্ত্রে সদাশিব।
"বিনা লক্ষ্মী নাই গৃহ"—গাহিলেন ঋষি সংহিতায়।
গাইলেন কবি : "বিনা দীপ্তিময়ী প্রেরণাপ্রদীপ
কে জ্বালে স্রষ্টার প্রাণে ?" গাহিল সাধক : "এ-ধরায়
বিনা দেবী অধরায় কে আহ্বান করে যুগে যুগে
পূর্ণ আত্মনিবেদনে জাগৃতির মন্ত্রে বুকে বুকে ?"

শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী

(তর্পণ)

রণু

স্নেহাস্পদেষু

তুলসীর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছ। আমি অনেকদিনই ভেবেছি তার সম্বন্ধে আমার কিছু স্মৃতিচারণী তর্পণ লেখা চাইই চাই, কিন্তু নানা কারণে হ'য়ে ওঠে নি। তাই তোমাকে ধন্যবাদ যে, আমাকে কর্তব্যসাধনে উস্কে দিলে। আমি স্মৃতিচারণী শৈলীতেই লিখব। এ-শৈলী আপনা থেকেই গ'ড়ে উঠেছে তাই হয়ত অনেকের ভালো লেগেছে আমার বিরাট্ "স্মৃতিচারণ"—তিন পর্বে। তাতে তুলসী ও নীরেনের কথাও লেখা উচিত ছিল, কারণ এরা তুজন ছিল আমার অতি প্রিয় বন্ধু যদিও নানা কারণে তুলসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার তত সুযোগ আমি পাইনি যত পেয়েছিলাম নীরেনের সঙ্গে। এর একটা কারণ—তুলসী সুভাষের প্রভাবে প'ড়ে রাজনীতির আখড়ায় পদার্পণ করার পরে তার সঙ্গে দেখাশুনোর সুযোগ ক'মে গিয়েছিল। আর একটা: আমার পণ্ডিচেরি-প্রয়াণ। মাঝে মাঝে যখন ফিরতাম তুলসীর সদাস্নিগ্ধ অভ্যর্থনা থেকে বঞ্চিত হই নি বটে, কিন্তু কলকাতায় নানা সাঙ্গীতিক আসরে ছাড়া তুলসীর সঙ্গে বড় একটা দেখা হ'ত না। অবশ্য মাঝে মাঝে তাকে নিরিবিলি পেতাম। কিন্তু তার জন্যে সজাগ ভাবে চেষ্টা করতে হ'ত আমাদের তুজনকেই। তবে মূল্যবান্ কোন্ বস্তুকেই বা বিনা চেষ্টায় মেলে বলো? সুভাষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও ঐ কথা। যাহোক ভূমিকা রেখে এবার স্মৃতিচারণের অঙ্গনে নামি।

* * *

এক একজন বন্ধু মনের পটে এক-একটা বিশিষ্ট ছাপ রেখে যায় যে-ছাপ কালের হাজার স্থূলহস্তাবলেপেও মোছে না। তুলসীর ব্যক্তিরূপ আমার স্মৃতিফলকে যে-রেখারূপ উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছে তার একটি চমৎকার শিরোনামা দেওয়া যায়: দিলদরিয়া। "উদার" বিশেষণটিও

বিকল্পে প্রয়োগ করা চলে, কিন্তু দিলদরিয়ার মধ্যে যে নিষ্পরোয়া দানের আমেজ আছে—যাকে ইংরাজীতে বলে abandon—সে-ভাবানুষঙ্গ নেই। অনেক হিন্দুস্থানী বা উর্দু বিশেষণ সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যাদের আমরা বাংলায় সাদরে বরণ করেছি যেমন ধরো—খানদানী। কুলীন বা অভিজাত বললে তেমন রস পাই না যেমন পাই যখন বলি--তুলসী ছিল খানদানী রসিক।

বহুদিনের কথা—নানা খুঁটিনাটি তারিখ ইত্যাদিতে ভুল থাকবেই--আমার স্মৃতিশক্তির জৌলুষ সত্ত্বেও—তুলসীর বিস্ময়-উক্তি মনে পড়েঃ "এত কথা তোমার মনে থাকে কেমন ক'রে দিলীপ! সাধে কি তোমাকে 'শ্রীম' ব'লে গিয়েছিলেন নানা মহাপুরুষের কথামৃত ডায়রিতে লিখে রাখতে!" শ্রীম'-র এ-আদেশের কথা আমি আমার স্মৃতিচারণ প্রথম পর্বে লিখেছি ফলাও করে। এজন্যে যদি গৌরবের অহঙ্কার কিছু ফাঁশ হ'য়েই প'ড়ে থাকে তবে আশা করি সে-অপরাধের জন্যে তোমরা আমাকে পুলিপোলাও চালান দেবে না? সাক্ষাৎ শ্রীম-র অভিনন্দন!—সে যে আশীর্বাদ। গৌরব করব না?

যতদূর মনে পড়ে—তুলসীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শ্রীরামপুরে তার গঙ্গাতীরবর্তী নয়নানন্দ প্রাসাদে। গঙ্গায় যখনই নৌকাবিহার করতাম— বারাকপুর থেকে বেরিয়ে—তুলসীদের এই সুরম্য অট্টালিকা চোখে পড়ত আর ভাবতাম তুলসী কী ভাগ্যবান্!—গঙ্গাতীরে বাস, তার উপরে এমন রম্য নিলয়ে! গঙ্গাতীরে বাস আমার কাছে বরাবরই মনে হয়েছে বিধাতার বরদান। পা বাড়ালেই অন্তর্জলী! ভাবতেও শিহরণ জাগে। শঙ্করাচার্যের অঙ্গীকার তো আর অত্যুক্তি হ'তে পারে নাঃ

তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ!
সুরধুনী! তোমার পুলিনে বাস যার,
ধ্রুব বৈকুণ্ঠেই নিবাস মা তার।

এ-গানটি তুলসীকে গেয়ে শোনাতাম মাঝে মাঝে শুধু জানাতে আমার ঈর্ষা তার মহাভাগ্যে। সে পিঠ পিঠ উত্তর দিতঃ "আমি তো গাইয়ে

নই দিলীপ, নইলে তান দিয়ে ঈর্ষার বদলে হিংসা পালটে দিতাম শ্রীঅরবিন্দের চরণপুলিনের উপমা দিয়ে।” ঠাট্টা করবামাত্র সে সুদশুদ্ধ ফিরিয়ে দিত। দেবে না—যে স্বভাবে রসিক?

তুলসীর খানদানী চালচলনের কথা বলতাম আমার দিদিমাকে—তুলসীর সঙ্গে কথালাপ সেরে ফিরে এসে। তিনি ছিলেন শ্রীরামপুরের শ্রীমন্তিনী—জানতেন তুলসীর পিতৃদেব রাজা কিশোরীলালকে। বলতেন: “ওরে! সেদিনকার ছেলে তুলসীর কী ক্ষ্যামতা বল্? খানদানী চাল ছিল ওর বাবার—যিনি ছিলেন রাজার মতন রাজা—লোকলস্কর বরকন্দাজ ফরাস ফরসী কী নয়?—কিন্তু (তাঁর দেহান্তের পরে) সে-রামও নেই, সে-অযোধ্যাও না ··” ইত্যাদি। দিদিমা বলতেন: “আর জানিস—তিনি ছিলেন দেউলে রাজা নয়—সিন্ধুকে অগুন্তি টাকা আর জমিজমায় অগুন্তি ফসল। আজকালকার জমিদার কি আর জমিদার রে? তারা তো জমাদার।” তুলসী কী যে হাসত দিদিমার এ-ধবণের কথা শুনে!

কলকাতায়ও তুলসীর একটি সুরম্য নিলয় ছিল—বালিগঞ্জে। বোধ হয় বেণী পার্ক-এ, না? নামটা মনে পড়ছে না। ঐ দেখ, স্মৃতিশক্তির দর্প বুঝি দর্পহারী চূর্ণ করেন বা!

আর একটি সুরম্য অট্টালিকা ছিল তার কাশীতে। মনে আছে—সেখানে একবার রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলাম কাশীর এক বিখ্যাত বাইজীর গান—হুসনা জান। কবে? যে-বৎসর প্রথম প্রবাসী বাঙালীদের সভা বসে। রবীন্দ্রনাথ সে-সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন, আর আমি গেয়েছিলাম গান—পিতৃদেবের “মহাসিন্ধুর ওপার থেকে” আর “নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ”—হাসির গান। তুলসী কী যে খুশী হয়েছিল—বিশেষ হাসির গানটি শুনে! রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেছিলেন সে সময় (যে কথা ইতিপূর্বে লিখেছি একাধিকবার—ত্রুটি মার্জনীয়): “দিলীপ গাইলে বটে তোমার বাবার হাসির গান। কিন্তু তেমনটি হ'ল না। তিনি যখন গাইতেন এসব গান লোকে হাসতে হাসতে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ত।” তুলসী সেই সময় থেকেই ইংরাজী কবিদের কাব্য

রসিয়ে পড়ত। বলেছিল আমাকে জনান্তিকে: "মিলটনের লালেগ্রো মনে পড়ে ভাই এ-হাসিতে:

But come thou Goddess···bring with thee
Jest and youthful Jollity···
Sport that wrinkled are derides
And Laughter holding both its sides
(এসো দেবী, সাথে নিয়ে মৃদু পরিহাস,
যৌবন-উচ্ছল ফুল্লবিলাস—
বরে যার জীর্ণ ভাবনা হয় দূর,
কুটি কুটি হই হেসে পুলকে মধুর)

সে সময়ে ইংরাজী আমি তেমন ভালো জানতাম না। (ইংরাজী আমি সত্যি শিখি প্রথম শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে।) বিশেষ ক'রে দুজনের ইংরাজীতে আমার 'ঈর্ষা' হ'ত: সুভাষ ও তুলসী। তুলসীর ইংরাজী ছিল আরো সরেস—বিশেষতঃ উচ্চারণে। পরে অক্সফোর্ডে গিয়ে এ-উচ্চারণ হ'য়ে উঠেছিল একেবারে নিখুঁৎ যাকে বলে। অক্সফোর্ডের ইংরাজী উচ্চারণই হ'ল উচ্চারণের নিকষ কুলীন, জানো তো? স্বভাব-কুলীন অভিজাত এই সাহেবি কৌলীন্যেও উত্তীর্ণ হয়েছিল যেন হেসে খেলে। সুভাষের যুগে ইংরাজীতে বক্তা ব'লে ওর নামডাক হয়েছিল কম নয়। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনবদ্য ইংরাজী উচ্চারণ আর কারুর ছিল না—এমন কি সুভাষেরও না। আর শুধু উচ্চারণই নয়, ইংরাজী লেখার শৈলীতেও তুলসীর হাত পেকে গিয়েছিল কৈশোরে না হোক তরুণ যৌবনে তো বটেই—মানে, অক্সফোর্ডের বিলিতি বৈকুণ্ঠবাসের প্রসাদে। কিন্তু হুসনা জানের কথা বলছিলাম।

তুলসী আমাকে চুপি চুপি বলল কবিকে তার প্রাসাদে অতিথি রাখার তো দায়িত্ব আছে, তাঁর চিত্তরঞ্জন করা যায় কী ক'রে? আমিও চুপি চুপি উত্তর দিলাম: হুসনা জানের অপরূপ খেয়াল ঠুংরি শুনিয়ে। বর্ষীয়সী বাইসাহেবার কণ্ঠস্বর একটু ভাঙা ভাঙা ছিল, যাকে বলে husky —কিন্তু এমন সুরেলা কণ্ঠ ও অপরূপ গায়িকা যে, কবি শুনে খুশী হ'য়ে তুলসীকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন। তুলসী সত্যনিষ্ঠ গৃহকর্তা, বলল হেসে:

"ধন্যবাদ দিতে হয় দিলীপকে দিন, কারণ এ-চক্রান্ত ওরই। আমি কেবল paid the piper—tune call করেছে ও-ই, আমি না।"

এ-আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার তুলসীরই প্রসাদে তাই একটু ফলিয়ে (অল্প একটু রং ঢং দিয়ে) বললাম। এর অনেক বৎসর পরে ওর এই কাশীর প্রাসাদেই ফের আমাকে ও ঠাঁই দেয়, যদিও সেসময়ে ও নিজে আমাদের দেখাশুনো করতে পারেনি। আমি কতিপয় বন্ধু বান্ধব ও আমার কনিষ্ঠ মাতুল সহ ওর কাশীধামে পরমানন্দে কাটিয়েছিলাম পাঁচ সাত দিন। সবচেয়ে আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেবার কাশীর গঙ্গায় বিজয়া দশমীর ভাসান দেখা। সে-বিবরণ আমি অন্যত্র লিখেছি—গঙ্গাবক্ষে সেই অপরূপ দৃশ্য—প্রতিমার পর প্রতিমার বিসর্জন —অবিস্মরণীয়! এ-ও সম্ভব হয়েছিল তুলসীরই বদান্যতায়। ওর শুধু তো ধনবল নয়, লোকবলও ছিল অপর্যাপ্ত। তারাই ভাসান দেখার সব ব্যবস্থা ক'রে দেয়। এ-ধরণের আতিথ্য ধনী অভিজাতের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের মতন মধ্যবিত্ত বড় জোর আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কাউকে কাউকে দুচারদিন অতিথি রেখে খুশী করতে পারে। ও অনেকবার বলেছিল আমাকে ওর শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরবর্তী প্রাসাদে থাকতে। কিন্তু সে-সময়ে ও কলকাতায় সুভাষের সহকর্মী হ'যে রাজনীতির আখড়ায় মহা ব্যস্ত, তাই বলেছিল: "আমি নিজে থাকতে পারব না, কিন্তু তাতে কি? ..." ইত্যাদি। আমার মন রাজী হয় নি বার বার কর্তা-কর্ত্রীহীন গৃহে মালীর অতিথি হ'য়ে থাকতে। আমি চাইতাম ও নিজে থেকে সব দেখাশুনো করবে ওর কমনীয় হাসিতে মন খুশী করবে, সরস আলাপে প্রাণ টানবে, স্বভাব-ঔদার্যে অন্তরতল নন্দিত করবে। এ সবই ওর কাছে সুসাধ্য ছিল বিশেষ ক'রে ওর ব্যক্তিরূপের প্রসাদে। ওকে আমি প্রায়ই বলতাম: "ভাই, তোমার মতন ওয়র্ডসওয়র্থ শেলি মিলটনের চরণ আমার তো মুখস্থ নেই তাই দিই আমাদের ঘরোয়া কবির উদ্ধৃতি। তোমাকে দেখে তোমার আলাপে ম'জে, প্রাণের টানে দুলে উঠে যতই আশ্চর্য হই ততই মনে পড়ে কবির উক্তি: যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে। তুমি অনেক কিছুই পারো। কিন্তু সবচেয়ে সহজে পারো আনন্দের ফুল ফোটাতে তোমার দিলদরিয়া প্রাণস্পর্শে।

যাঁরা তুলসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেননি তাঁদের কাছে হয়ত এ-ধরণের উচ্ছ্বাসকে অত্যুক্তি মনে হ'তে পারে। নিরুপায়। কারণ তার কথা ভাবতে সব আগে মনে পড়ে তার এই দিলদরিয়া প্রাণ আর সহজ কমনীয়তা। ইংরাজীতে যাকে refined বলা হয় তার ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। কমনীয় সুশীল সুকুমার এই তিনটি বিশেষণের তাল পাকালে তবে মেলে refinement—তুলসীর উপাধি—যার প্রসাদে সে হ'য়ে উঠেছিল lovable তথা loving : তাই তো তাকে কাছে পেলে মন চাইত আরো কাছে টানতে। সে ভালোবাসত সহজেই, তাই পেতও বন্ধুদের প্রীতি। আমার ওকে দেখে একটি মত বদলাতে হয়েছিল : যে, ধনীরা বন্ধুদের সত্যিই ভালোবাসতে পারে না। তবে হয়ত আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ ব'লেই ধনীদের 'পরে সুবিচার করতে পারি নি—আরো এই জন্যে যে, আমার বন্ধুবান্ধব সবাই ছিল মধ্যবিত্ত। এমন কি সুভাষকেও তুলসীর মতন জমিদার রাজন্যদের কুলতিলক নাম দেওয়া যায় না তো—যাকে বলা চলে নিযুতপতি (millionnaire) বা ক্রোড়পতি (multi-millionnaire)। এহেন ধনকুলীন—born aristocrat—যে আমার কাছে বন্ধু হ'য়ে ধরা দিতে পারে এমন অসম্ভব কল্পনা আমার মনে ঠাঁই পায় নি তুলসীকে ভালোবেসে বন্ধুবরণ করবার আগে।

কিন্তু তবু প্রথম দিকে আমার মনে একটা সঙ্কোচের কাঁটা ছিল ওকে স্নেহশীল ও দিলদরিয়া ব'লে চিনতে পারা সত্ত্বেও। হাজারই সুশীল সুভদ্র কমনীয় হোক না কেন, জলজ্যান্ত নিযুতপতি তো! ঐশ্বর্যকে যতই কেন না গালমন্দ করি, ঐশ্বর্যের সমারোহের সামনে এলে মনে একটু সমীহ মতন না এসেই পারে না। তখন তো আর যোগপন্থী গুরুবাদী হই নি যে শঙ্করাচার্যের সুরে সুর মিলিয়ে বেপরোয়া হ'য়ে ঐহিক সমৃদ্ধিকে ধিক্কার দিতে সাহসী হব :

শরীরং সুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
গুরোরংঘ্রি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

যদি দেহ হয় তব কান্ত সবল, অতুল কীর্তি যশমান
হয় হিমালয় সম দীপ্ত অমেয় তব ধন,
তবু গুরুর চরণকমলে লিপ্ত না রহিলে তনু মন প্রাণ,
হায় এ-সকলই ছায়া ছায়া ছায়াবাজি, হে সুজন!

তাছাড়া আমি তো কোনো উগ্র শ্রেণীযুদ্ধের (class-war) আবহাওয়ায়ও গ'ড়ে উঠি নি যে, ধনসমৃদ্ধির শোভাযাত্রায় রাগ কি ক্ষোভ এসে আমার আলোভরা মনকে শ্রেণীবিদ্বেষে মিশ কালো ক'রে দেবে? তাই একবারও আমার মনে হয় নি যে, নিযুতপতিদের নির্মূল ও নির্বংশ না করলে আশু রামরাজ্যের পত্তন হওয়া অসম্ভব। তুলসীর সঙ্গে আলাপ ক'রে শুধু মনে হ'ত—প্রথম দিকে—"সৌজন্য মনোরম বৈ কি, কেবল ধনীরা ছোঁওয়া দিয়েও ধরা দিতে চায় না যেন!"

এককথায়, একটা অনপনেয় ব্যবধান মতন ছিল বহুদিন যার ফলে কাছে এলে তুলসীর সঙ্গে হাত মেলালেও কাঁধ মিলিয়ে চলা সম্ভব মনে হ'ত না। কিন্তু এ-কুণ্ঠার জন্যে দোষ আমারই—ওর কোনো অপরাধ ছিল না, কারণ ওর মনটি ছিল সত্যিই গঙ্গাজল, ধনী হওয়ার জন্যে কোনোদিনই ও নিজেকে নির্ধনদের চেয়ে উঁচু থাকের জীব মনে করে নি।

এ-আড়াল প্রথম কাটে অক্সফোর্ডে, আমি যখন কেম্ব্রিজে, কী ভাবে—একটু ফলিয়েই বলি। কারণ বলবার ম'ত।

সে আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর আগেকার কথা—১৯১৯-২১ সাল। লণ্ডনে শেক্সপীয়র হাট্-এ ও কেম্ব্রিজে ভারতীয়দের মজলিশে আমার ডাকসাইটে নাম হয় দুটি কারণে—প্রথম, দিলীপ শুধু গাইতে পারাই নয়, নানা ভাষায় গান পরিবেষণ করতে পটু; দ্বিতীয়—দিলীপ সুভাষ বোসের প্রিয়বন্ধু। লণ্ডনে যখন তুলসীর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তখন সে আমার হঠাৎ-ফুলে-ওঠা নামডাকে খুশী হ'য়ে আমাকে বলত প্রায়ই স্নিগ্ধ হেসে: "দিলীপ, তুমি একটা সোজা লোক নও ভাই—ওরফে you are not a straight man—" খিল খিল খিল্। ও স্বভাবে দিলদরিয়া হ'লেও চলন-বলনে ছিল অতি সংযত—তাই অট্টহাস্যে ওর মতি ছিল না, স্মিতহাস্যেই রতি—যেমন স্নিগ্ধ তেমনি

মধুর। কতকটা রবীন্দ্রনাথের মতন—সাহেব পুরাণে যাকে বলে bland smile বা soft chuckle—loud guffaw নয়। চলতে ফিরতে নানা রসাল মন্তব্য—চিম্‌টি কাটা টিপ্পনির সঙ্গতে। এককথায় মঞ্জুল সুষমিত—harmonious—ব্যক্তিরূপের মঞ্জরণ। এবার আসি ওর অক্সফোর্ডীয় আতিথ্যের অধ্যায়ে।

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ভারতীয় ছাত্রেরা পরস্পরকে প্রতি term-এ (তিনমাসে) একবার ক'রে নিমন্ত্রণ করত—"মজলিস"-এ তর্করণে—debate-এ—যোগ দিতে। হঠাৎ আমার কাছে তুলসীর এক চিঠি: "দিলীপ, এ-টার্ম-এ তুমি গাইতে এলে সুখী হব—আমার অতিথি হ'য়ে।" যতদূর মনে পড়ে সে-সময়ে তুলসীই ছিল আক্সফোর্ড মজলিস-এর অধিনায়ক—প্রেসিডেণ্ট।

অক্সফোর্ড! বিখ্যাত অক্সফোর্ড! কত সুঁয়োপোকা অভাজনই না অক্সফোর্ডের তর্ক গুটি—chrysalis—ভেদ ক'রে পার্লামেণ্টারি প্রজাপতি মহাজন হয়েছেন! আহ্লাদে আমি তো আটাত্তর খানা! তুলসীকে এই ধরণের এক ছড়ায় অভিবাদন করলাম (আমি রসিক বন্ধুদেরকে অনেক সময়েই ছড়ায় চিঠি লিখতাম, আজও লিখে থাকি—খুশ-খেয়ালে):

গাইতে যাব অক্সফোর্ডে লক্ষ্মী ছেলে ব'নে
তোমার অতিথ্ হ'য়ে? তা আর বলতে? কপালখানা!
গান-গাওয়া যার পেশাও বটে নেশাও কুহুস্বনে,
তুলসী তাকে মান দিলে সে বলবে কি: "না না না?"

উত্তরে তুলসী আমাকে কী লিখেছিল মনে নেই, থাকতে পারে না। তবে শেলি ও খুব ভাসবাসত তো, তাই তাঁর বিখ্যাত Skylark কবিতাটি থেকে একটি অভিনন্দন উদ্ধৃত ক'রে পাঠিয়েছিল তা কি আর ভুলতে পারি? সেটি এই:

Waking or asleep,
    Thou of death must deem
Thinus more true and deem
    Than we mortals dream,
Or how could thy notes flow in such a crystal stream?

ঘুমে কি বা জাগরণে
মরণেরো তুমি পেলে পাখী চিন্তায়
আরো কি গভীর সত্য ভাষ্য ?—আমরা আজো স্বপনে,
মাটির মানুষ, পাইনি যে-দিশা হায় !
নহিলে কেমনে স্ফটিকধারায় বহাও সুরঝোরায় ?

এর একটু টীকা আছে। তুলসীকে আমি প্রায়ই বলতাম "জীবন সংগ্রামের উর্ধ্বে ঝোঝুল্যমান ভাগ্যবান্ নিশ্চিন্ত।" কাটতাম এই ধরণের ছড়া :

লাগে নি যার ধুলো গায়ে রাজসিংহাসনে
কী জানে সে রক্ত ব্যথার জীবন-কাঁটাবনে ?

ও ছড়া কাটতে না পেরে ওয়র্ডসওয়র্থের ঢঙে আমাকে তখমা দিত মুক্তপক্ষ গগনবিহঙ্গ ব'লে—বিশেষ ক'রে তাঁর বিখ্যাত স্কাইলার্কের প্রথম শ্লোকটি আওড়ে :

Ethereal minstrel, pilgrim of the sky .
Dost thou despise the earth where cares abound ?
হে নীলিমা তীর্থপান্থ, অশরীরী মূর্ছনাবিহারী !
অধন্য তোমার কাছে কি এ-লক্ষ তাপতপ্তা ধরা ?

যাহোক গেলাম অক্সফোর্ডে দুর্গা ব'লে। সচরাচর ছাত্রেরাই চাঁদা তুলে নিমন্ত্রিত ছাত্রদের আতিথ্যসৎকার ক'রে থাকে। কিন্তু তুলসী চাঁদা তুলবে ? ও কি সেই পাত্র ? নিজেই আমাদের তিনচারজনের জন্যে থাকার ব্যবস্থা করল অক্সফোর্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে। সব খরচের ভার ওর একার।

ও বাবা! এ কী রে: এ যে পেল্লায় হোটেল! ব'লে রাখি, তখন পর্যন্ত আমি বিলেতে কোনো হোটেলেই থাকি নি। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—হয় কোন ছাত্রাবাস, না হয় ইংরাজপরিবার, না হয় কোনো ঘরভাড়া নেওয়া ল্যাণ্ডলেডীর আতিথ্যে। এই-ই আমার প্রথম হোটেল বাস, আর হবি তো হ—একেবারে প্রথম শ্রেণীর হোটেল! আমি তো ভেবেই অস্থির! আমার মাত্র দুটি স্যুট : নীল ও পাটল রঙের। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর হোটেলে সান্ধ্য ভোজনের ড্রেস স্যুট!

তুলসী বদান্য হেসে অভয় দিল: "মাভৈঃ! তোমাকে ঘরেপ্রাতরাশ—breakfast—দিয়ে যাবে, লাঞ্চ ও ডিনার খাবে আমার সঙ্গে।"

আঃ, বাঁচলাম! আহা, তুলসীর সঙ্গে নিরিবিলি ব'সে ওর ইলাহী ফ্ল্যাটে ভোজন—চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়! মন একেবারে গান গেয়ে উঠল বৈকি। আর এই ওর সঙ্গে সৌহার্দ্যের প্রথম পত্তন হ'ল—মানে, সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যার প্রসাদে ব্যবধান লুপ্ত হয়, আড়াল কেটে যায়। সে কত হাসি গালগল্প বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের নানা খবর। ও ছুটিতে প্রায়ই প্যারিস যেত। ফরাসী বলতেও পারত—উচ্চারণও ছিল চমৎকার কিন্তু খুব দ্রুত বলতে পারত না। ওর কাছে তালিম নিলাম প্যারিসে গিয়ে কী ভাবে চলতে হবে, কী কী দেখাই চাই···ইত্যাদি।

সুযোগও মিলে গেল কয়েকমাস বাদেই—যখন আমি প্যারিসে যাই। আমি গিয়ে উঠেছিলাম Jules Block ব'লে এক সদাশয় প্রাচ্যবিৎ ওরিয়েন্টালিষ্ট ফরাসী প্রফেসরের আতিথ্যে। তুলসী ছিল Avenue de Champs Elysee মহাসরণীর মহত্তম হোটেলে। সেখানে ওর আতিথ্যে একেবারে সেরা ফরাসী খানা খাওয়া ওর সঙ্গে ব'সে। কিন্তু বলতে হচ্ছে সত্যের খাতিরেই যে, এ-ধরণের ধুমধড়াক্কা হোটেল ভোজ আমার আদৌ ভালো লাগে নি। মনে হ'ত যেন এত আলো উর্দি সাজ-সজ্জা ফ্যাশানের জৌলুষের মধ্যে বেমালুম হারিয়ে গেছি আমি। তারপর ওর অনুরোধ সত্ত্বেও আর খানা খাই নি জগতের শ্রেষ্ঠ কুলীন রাজধানীর শ্রেষ্ঠ মহাসরণির শ্রেষ্ঠ হোটেলে। ওকে ছড়া কেটে এই ধরণের ক্ষমাপ্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলাম ওর নিমন্ত্রণের উত্তরে:

সবাই কি সব পারে রে ভাই?
দিলীপ তো নয় তুলসী গোঁসাই।
নেই রেশমী মোজা কি টাই,
আমরা ঘরেই যা পাই খাই,
মনে কিছু কোরো না ভাই,
লক্ষ্মীটি ভাই, লক্ষ্মীটি ভাই!

*　*　*

ফের ব'লে রাখি—ঠিক এ-সব ছড়া সে-সময়ে কাটি নি। তবে এই ধরণের ছড়া কেটে ওকে—এবং আরো অনেক বন্ধুকে—লিখতাম স্রেফ মজা ক'রে, তাদের কাছ থেকে মজার মজার জবাব পাবার লোভে। কেউ কেউ সাড়া দিত এ-দৈলিপী মজার মজলিসে—যার মধ্যে ছিল তুলসীই প্রধান। তবে বলেছি, ও শোধ তুলত বিলিতি কবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে। এতে আমার লাভ হ'ত এই যে, আমি বিলিতি কবিদের কবিতা আর একটু মন দিয়ে পড়তাম—বাধ্য হ'য়েই বলব। আমি বিদেশী কবিতায় সত্যিকার দীক্ষা পাই পরে—শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে, যে-কথা লিখেছি আমার "যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দ" স্মৃতিচারণে "কবি শ্রীঅরবিন্দ" অধ্যায়ে। এর বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই। কেবল আবার ব'লে রাখি—খুঁটিনাটিতে ভুল কিছু থাকতে পারে আমার স্মৃতিশক্তির বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও। তবে অতীতচারণ করার একটা সুবিধা আছে এই যে, দেখতে পাওয়া যায় কোথায় কোন্ কোন্ সোপানে সত্যি উঠেছি, কোথায় নেমে গেছি ভুল ভ্রান্তির নিচুটানে। তুলসী আমাকে উঁচু দিকে টানত বিশেষ ক'রে ওর ইংরাজী কাব্যসংস্কৃতির গুণে। আমার কোনো বন্ধুরই ইংরাজী কাব্যলোকে এত গভীর প্রবেশ ছিল না, এমন কি নীরেনেরও নয়। সুভাষ? না, তারও নয়। কারণ ইংরাজী গদ্যে তার প্রবেশ থাকলেও কবিতার সে বিশেষজ্ঞ ছিল না তো—যদিও সে শেক্সপীয়র ও ওয়র্ডসওয়র্থ মন দিয়েই পড়েছিল। কিন্তু আমার তরুণ যৌবনে আমাকে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যে প্রবেশের প্রেরণা দিত তুলসীই সবচেয়ে বেশি—বিশেষ ক'রে তার সরস সুন্দর আবৃত্তি ও পত্রের প্রসাদে। বহুবৎসর পরে যখন আমি শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষায় ইংরাজীতে কবিতা লেখা সুরু করি তখন সে আমাকে সাবাস দিত সর্বান্তঃকরণেই কারণ সে ছিল প্রথমতঃ খাঁটি সমজদার, দ্বিতীয়তঃ, শ্রীঅরবিন্দের কবিতার ভক্ত। তবে হয়ত (জোর ক'রে বলতে পারি না) শ্রীঅরবিন্দের কবিতার দিকে, বিশেষ ক'রে সাবিত্রীর দিকে, আমিই সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে থাকব। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি এ-স্মৃতিচারণে বলতে চাই—এক, ওর কাছে আমি কী কী লাভ করেছিলাম; দুই, ও কী ধরণের সুন্দর বিকাশে ফুটে উঠেছিল ঔদার্য ও কমনীয়তার রসসিঞ্চনে।

এরপরে যখন কলকাতায় ওর সঙ্গে দেখা হয় তখন ওর মধ্যে আর একটি মহনীয় বিকাশ লক্ষ্য করি: মহৎ চরিত্রকে ওর গভীর শ্রদ্ধা করার বর্ধমান প্রবণতা। এ প্রবণতায় ওকে উস্কে দিয়েছিল প্রধানতঃ দুটি মহাজন: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশনেতা সুভাষচন্দ্র। ওর মধ্যে এ-প্রবণতার গভীরায়মান প্রগতি দেখে আমার কী যে আনন্দ হ'ত। হবে না। আমিও যে অনন্যুতপ্ত born hero-worshipper—মহৎপূজারী—জানোই তো। আমার বিজ্ঞ বন্ধুদের অনেকেই এজন্যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন—সম্ভবতঃ আজও করেন—কিন্তু আমি মহৎপূজায় যা পেতাম সে-সম্পদের দীপ্তির পাশে তাঁদের বিজ্ঞ ব্যঙ্গের অজ্ঞ ঝাঁঝ টিঁকবে কেমন ক'রে? আমি মনে করি আজও যে, গীতার কথা অকাট্য—যার যেমন শ্রদ্ধা তার তেমন বিকাশ। শঙ্করাচার্যের একটি শ্লোকও আমার মন নিয়েছে:

> ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্‌বস্তু নিশ্চয়াত্মনা
> পুমাং স্তদ্ধি ভবেৎ শীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ।

অর্থাৎ যার ধ্যান করি অবিলম্বে তার সারূপ্য লাভ করি যেমন কীট ভ্রমরের ধ্যানতন্ময় হ'য়ে ভ্রমর ব'নে যায়।

তুলসীকে একথা একদিন বলতেই সে উজিয়ে ওঠে, বলে: "ঠিক কথা ভাই! আমাদের মনে আগুন ঝরায় কেবল সে-ই—যার চরিত্রের দীপ্তি সুভাষের মতন—আমাদের মন টানে অন্তরে আলো জ্বেলে দিয়ে।"

এ ওর মুখের কথা ছিল না। ওর রাজনৈতিক জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমরা দেখতে পেতাম আদর্শবাদ ওকে কী ভাবে পেয়ে বসেছিল, দেশবন্ধু ও সুভাষকে ভালোবেসে ওর কী ভাবে নবজন্ম হয়েছিল দেশাত্মবোধের পুণ্য চেতনায়। কত টাকা যে ও দেশের জন্যে দুহাতে দান করত বাইরের লোক কোনদিনই জানতে পারে নি, জানত কেবল সুভাষ—যার কাছ থেকে আমি কিঞ্চিৎ খবর পেয়েছিলাম ওর দানশীলতার। তুলসী দেশের কাজে ওর নানা শক্তিকেই প্রকাশ্যে নিয়োগ করত, কেবল ধনশক্তিকে রাখত গোপনে। সত্যিই মনে হ'ত আমার—যে কথা একদিন সুভাষকে বলেছিলাম—যে, তুলসী ইদানীন্তন হ'য়েও বোধ হয় উপনিষদের কথায় বিশ্বাস করে: "শ্রদ্ধয়া দেয়ং, হ্রিয়া দেয়ং—দিতে হবে

সশ্রদ্ধে ও সলজ্জে।" উত্তরে সুভাষ বলেছিল অনেক কথাই তুলসীর গুণকীর্তনে। সব কথা আমার মনে নেই, তবে মনে আছে, শেষে বলেছিল: "ওর সঙ্গে আর একটু মিশো দিলীপ—ও সাধারণ ধনীর মতন নয়, বড় সুন্দর মানুষ, মনটা ওর যেমন নরম তেমনি স্নেহশীল—আর সব চেয়ে বড় কথা—ও স্বভাবে মহৎ…"মহৎই যে মহৎকে এক আঁচড়ে চিনে নেয়—না জানে কে?

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই ও প্রায়ই বিষম ঘা খেত সহকর্মীদের নানা কদাচারে, অনাচারে। ও শেক্সপীয়রের টেম্‌পেস্ট-এর একটি উক্তি প্রায়ই আবৃত্তি করত: "We are such stuff as dreams are made on." ("আমরা স্বপন পসারী") করবে না? ও যে স্বধর্মে সত্যিই ছিল "স্বপনী"—dreamer—তাই তো রাজনৈতিক ক্লিন্নাঙ্গনে এত হাঁপিয়ে উঠত—যদিও সহকর্মীদের নানা হীনতায় দুঃখ পেলেও আমাকে কোনোদিনই মুখে বলে নি ওর বেদনার কথা। ও স্বভাবে এত সুকুমার ছিল যে পরচর্চায় ওর রুচি ছিল না সত্যিই। কেবল মাঝে মাঝে ওর স্বভাবসিদ্ধ স্মিতহাস্যে আভাষ দিত তাদের হসনীয় মূঢ়তার। দু একটা নমুনা দিই।

একদিন বলল: "জানো দিলীপ, সেদিন অমুখ বাবুসাহেব কী চোস্ত ইংরাজীর ফুলঝুরি কাটলেন? সাহেবদের গালমন্দ করতে উঠে দারুণ ইংরাজী ব্যঙ্গ ঝাড়লেন: 'But I contend sirrah, that a blind uncle is better than no uncle.' আর একজন ধামাধরা মডারেট বলেছিলেন: 'আমাদের কী কাজ আমেরিকান স্বাধীনতার বুলি নিয়ে? How dare a ginger-merchant enquire about the ship?"·· খিল খিল খিল!

ও শুধু যে স্বভাবে মহৎভক্ত ছিল তাই নয়, ছিল গুণগ্রাহী তথা রসিক ভক্তও বটে। ওর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল অধ্যাপক রসরাজ শাহেদ সুরবর্দি—যার কথা বছর দুই আগে অমৃতবাজার শারদীয়া সংখ্যায় লিখেছি হয়ত প'ড়ে থাকবে। শাহেদ যখন থিয়েটার রোডে থাকত আমাদের ঠিক সাম্‌নেই তখন তুলসীর সঙ্গে তার কাছে গিয়ে কত গাল গল্পই যে করতাম! সে-সব রসাল কথালাপের সাড়ে পনেরো আনাই

ভুলে গেছি—তুলসী ও সুরবর্দীর উত্তর প্রত্যুত্তর। বিশেষ উপভোগ্য ছিল ওদের রসাল ফরাসী রসিকতা। এর টিপ্পনিতে দুজনেই পরস্পরকে উস্কে দিত। ডায়রিতে যদি লিখে রাখতাম, হায় রে! তবে একদিনের কথা মনে আছে, বলি।

সুরবর্দি সেদিন কথায় কথায় একটি ফরাসী রসিকতা পেশ করে তুলসীর বাড়ীতে সান্ধ্য আসরে আমার গানের শেষে। ব্যাপারটা এই: ফরাসী লোকসভায় (Chambre des Deputés) মহাতর্ক—মেয়েদের ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া উচিত কিনা। উগ্র পুরুষপন্থীরা বললেন: "না। অসম্ভব।" ততোধিক উগ্র নারীপন্থীরা চ'টে বললেন: "না? Sacrebleu! কেন শুনি?" প্রতিপক্ষ বললেন: "কারণ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে তফাৎ আছে—Il y a de la différence entre l'homme et la femme." সঙ্গে সঙ্গে সব সভ্য একজোটে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি: "Vive la différence—বেঁচে থাক এ- তফাৎ!"

তুলসী পিঠ পিঠ বলল: "তবে আমিও বলি এই তফাৎ নিয়ে একটি ফরাসী গল্প। এক নিরীহ ব্রাহ্ম ভদ্রলোক প্যারিসে এক কাফে-তে ব'সে সন্ধ্যাবেলায় সামনের এক আলাপী অতিথির সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলেছেন—এমন সময় দোরের কাছে আর এক অতিথির অভ্যুদয়। ব্রাহ্মটি শুধালেন: "এ কী বেশ? উনি কে বলতে পারেন? পুরুষ না মেয়ে?' অতিথি চটে আগুন, হাঁকলেন: "Tonnerre de Dieu! (বিধাতার বজ্র!) পুরুষ কেন হ'তে যাবে? ও যে আমার মেয়ে!" ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সকুণ্ঠে বললেন: "Je vous demande pardon, Monsieur! মাপ করবেন—আমি জানতাম না আপনি ওর বাবা।' তিনি আরো অগ্নিশর্মা হ'য়ে বললেন: "Mille tonnerres! (হাজার বজ্র!) বাপ হব কী দুঃখে? আমি যে ওর মা!'"

কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়। এবার গম্ভীরের অঙ্কে ফিরি।

সংসারে শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটছে তো প্রত্যহই দিনের পর দিন! মানুষ ভাবে এক হয় আর তো প্রায় পথের প্রতি বাঁকেই। সুরবর্দি একদিন আমাকে বলেছিল (তখন তুলসীর খুবই দুর্লগ্ন বা দুর্দৈব বলাই ভালো): "দিলীপ, সংসারে অনেক কিছুই ঘটে যা শোচনীয়, কিন্তু একটি

দুঃখের সান্ত্বনা পাওয়া ভার : দুর্জনকে বিশ্বাস ক'রে সজ্জনের ঘা খাওয়া। তুলসী এর দৃষ্টান্ত। ওকে কত দুঃখই যে পেতে হয়েছে অপাত্রে দান ক'রে, মিথ্যুককে সত্যবাদী ব'লে বরণ ক'রে, আলেয়াকে তারা মনে ক'রে…" আমি বলেছিলাম : "কিন্তু শহীদ, দেখ ওর মহত্ত্ব। বারবার এত ঘা খেয়েও ও কি সিনিক বনেছে? না তো। আরো যেন মধুর হ'য়ে ফুটে উঠল দুঃখের মধ্যে দিয়েই—আরো সহিষ্ণু হ'য়ে, নম্র হ'য়ে, দরদী হ'য়ে, নয় কি? সমর্সেট মম তাঁর একটি ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়ে—দুঃখে দুর্দৈবে মহৎ কীভাবে আরো মহৎ হ'য়ে উপরে ওঠে, যেমন হীন আরো হীন হ'য়ে নিচে নেমে যায়।"

তুলসীর জীবনের শেষের দিকে ওর নানা দুঃখশোকের পুরো খবর আমি রাখি না। কারণ পণ্ডিচেরি প্রয়াণের পরে ওর সঙ্গে আমার বড় বেশি দেখাসাক্ষাৎ হ'ত না। কিন্তু ফি বছর যখনই কলকাতায় এসেছি গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে টাকা তুলতে—ও আগেকার মতন সাগ্রহেই চ্যারিটি কন্সার্টের টিকিট কিনত, আমার নানা সম্বর্ধনা সভায়ও তেম্নি হাসিমুখেই আসত। শুধু তাই নয়, আমার সম্বর্ধনার উদ্যোক্তাদের বার-বারই বলত মোটা চাঁদা দিয়ে : "কিন্তু দিলীপের সম্বর্ধনা হওয়া উচিত রীতিম'ত কমিটি ক'রে। কারণ ওকে এখন আর প্রাইভেট গায়ক ব'লে মনে করা ঠিক নয়। ও যে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিনিধিও বটে একথা ভুললে চলবে না।"…ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ এল ভালোই হ'ল। কারণ ওর শেষ জীবনে ও সত্যিই তাঁর দিকে ঝুঁকেছিল। আমি ওকে তাঁর দিকে টানতাম, বলাই বাহুল্য। ওকে নানা সময়ে পণ্ডিচেরি থেকে চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে-লেখা শ্রীঅরবিন্দের নানা পত্রই পাঠাতাম। কিন্তু ও শুধু এইজন্যেই তাঁর ভক্ত হ'য়ে উঠেছিল বললে ভুল বলা হবে। স্বভাবে ও মহাজনের ভক্ত ছিল—আগেই বলেছি। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের কবিতার ছিল ও গভীর অনুরাগী। শেষের দিকে ও তাঁর "সাবিত্রী-র" মহা ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বলত মহোল্লাসেই : "এরই নাম এপিক—মহাকাব্য।"

ওর কাব্যোৎসাহী মনের এ-গভীর সাড়ায় আমার আনন্দ আমি ওকে কয়েকবার জানিয়েছিলাম। কিন্তু তখন ওর অসুখ, তাই উত্তর পাই

নি। শেষবার, কলকাতায় ডোভার লেনে ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয় অনেক-ক্ষণ ধ'রে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে। ও তখন শয্যাশায়ী। কিন্তু বলেছিল করুণ হেসে: "এযাত্রা যদি সেরে উঠি দিলীপ, যাবই যাব শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে। মানব না আর মনের কোনো কুণ্ঠা।"

আমি: কিন্তু কুণ্ঠা কেন তুলসী? সাধুদর্শনে মহাপুরুষ দর্শনে—

তুলসী: জানি ভাই। (হেসে) নিমতলাও চিনি, কাশী মিত্তিরের ঘাটও চিনি, কেবল গণকের গণনায় ম'রে আছি যে। না, ঠাট্টা নয় দিলীপ। আমার বরাবরই তাঁর দর্শনে যেতে বাধত এই ভেবে যে, যখন তাঁর ডাকে পুরোপুরি সাড়া দিতে পারছি না তখন শুধু চোখের দেখা দেখে কী হবে—এখান থেকে তাঁকে স্মরণ ক'রে বরণ করাই ভালো নয় কি?

আমি: এ তোমার একটা কথাই নয় তুলসী, মাফ কোরো ভাই। মহাজনের শুধু দর্শনেও যে কত অঘটন ঘটে আমি চাক্ষুষ করেছি অনেক-বার। দেখেছি সাড়া দেওয়ার শক্তিকেও উস্কে দেয় বারবার দর্শনের প্রেরণা—ঠিক আগুনের ম'ত। তুমি এসো পণ্ডিচেরি সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে—অবশ্য আমার ওখানেই থাকবে। আর গড়িমসি নয়।

কিন্তু আসা হ'ল না ওর কিছুতেই—এ-দুঃখ আমার আজও আছে। কি জানি কেন কেবলই মনে হয়—হয়ত ওর গ্রহবৈগুণ্য কেটে যেত যদি ও তাঁর প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেত।

কিন্তু ওকে আমি এই তিরস্কার করায় ও শোধ তুলেছিল পাণ্টা তিরস্কারে। কী ভাবে ব'লেই এ-তর্পণের সমাপ্তি টানব।

আমাদের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হ'ত সুভাষকে নিয়ে। সেদিন সুভাষের স্বাবলম্বী তেজের প্রসঙ্গ উঠতেই আমি বলেছিলাম: "আমার এক উভয়সংকট হয়েছে কী জানো তুলসী? আমি স্বাবলম্বীও হ'তে চাই গুরুবাদী ব'লেও পরিচিত হ'তে চাই। কিন্তু you can't have it both ways, can you?"

তুলসী (হেসে): ভাই, মানুষ কি সবাই একরোখা—consistent, বলো তুমি? রাজার মধ্যে কি ফকিরও বসবাস করে না?

আমি: কালে ভদ্রে—এক আধটা বুদ্ধ বা অশোক মিলতে পারে—

কিন্তু তুমিই তো বলো ঘড়ি ঘড়ি : one swallow does not make a summer ; আমার বলবার উদ্দেশ্য—আমি একসময়ে সত্যিই নিজেকে গুরুবাদী ব'লে ভাবতাম। কিন্তু আজকাল মনে হয় যে, খাঁটি গুরুবাদী হ'তে হ'লে সব আগে হ'তে হয় ঐকান্তিক, একনিষ্ঠ।

তুলসী : তার মানে ? তুমি একনিষ্ঠ নও ?

আমি : কেমন ক'রে—যখন দেখি যে আমি জীবনের নানা সংকটে আলো পেয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী থেকেও বটে ? এ আমার কথার কথা নয় ভাই, বিশ্বাস করো। আমার সত্যিই মনে হয় আজকাল যে, আমার দুই গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দ। এহেন দুমুখী শিষ্যকে কি গুরুবাদী বলা চলে ?

তুলসী : ভাই তোমার সঙ্কোচ হয়ত আমি একটু একটু বুঝি—যদিও গেটের বিখ্যাত উপন্যাস* WERTHER-এর একটি কথায় আমার মন সাড়া দেয় : যে, জগতে একজন কিছুতেই আর একজনকে ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু এ-কথাটা মেনে নিয়ে তবু বলা চলে না কি যে, যাদের আমরা প্রতিভাধর বলি তাদের মধ্যে ঐকান্তিকতা না থেকেই পারে না ? অন্ততঃ যে-তোমাকে আমি শ্রীঅরবিন্দের মানসপুত্র ব'লে মনে করি সে-তুমি গুরুবাদী নও—একথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমি (হেসে) : তুলসী, তুমি কতবারই আমার কাছে খেদ করেছ যে, তোমাকে দেশভক্ত বললে অত্যুক্তি হয়। প্রায়ই ব'লে থাকো : যথার্থ দেশভক্ত শুধু সে যে মনে প্রাণে দেশসেবক—যেমন সুভাষ। তবু আমিও ভাবতেই পারি না যে, তুমি দেশভক্ত নও। How now, Horatio ?

তুলসী, (মৃদুহেসে) : Tit for tat ? হাত দাও ভাই। We are quits. কিন্তু ঠাট্টা রেখে সত্যি বলো তো, তুমি তো বহু যোগীকে দেখেছ—শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কারুর কাছে কি তুমি নিজেকে এভাবে বিলিয়ে দিতে পারতে—যেকথা একদিন সুভাষও আমায় বলেছিল ?

আমি : পারতাম হয়তো—যদি পরমহংসদেবকে পেতাম গুরুর পদে।

*গেটের WERTHER উপন্যাসের নায়ক একটি চিঠিতে তার বন্ধুকে লিখেছিল : "এ-জগতে একজন মানুষ আর একজনকে সহজে বুঝতে বুঝতে পারে না : "Wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht."

সত্যি বলছি, তুলসী, আমার মনে একটা গভীর খেদ আছে যে, তাঁকে আমি দেখি নি চর্মচক্ষে—যদিও তাঁর কৃপা পেয়েছি বহুবারই। আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু।

তুলসী (একটু চুপ করে থেকে): না ভয় নেই দিলীপ, তোমাকে ভুল বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল একটা কথা বলব তোমাকে —তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। কথাটা এই যে, তোমার মতন মহাভাগ্যবানের অন্তত: এ-খেদ মেটা উচিত্ ছিল শুধু অরবিন্দকে দর্শন ক'রেই। কারণ মনে রেখো—তুমি যা হ'য়ে উঠেছ তার মূলে আছে তাঁরই দর্শনের পুণ্যফল, তাঁর অগাধ স্নেহ, আশীর্বাদ।

জানি না শ্রীঅরবিন্দের কয়জন শিষ্য একথা বলতে পারেন এমন ছন্দে, এমন জোর দিয়ে।

ইতি তোমার
নিত্যশুভার্থী দিলীপদা।

সাহিত্যে ভারতের আদর্শ

(নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের' ৩৯ তম 'অধিবেশনে চণ্ডীগড়ে মূল সভাপতির ভাষণ)

আমি আজ আমার ক্ষুদ্র সাধ্য ম'ত বলব—আবাল্য সাহিত্যচর্চা করতে করতে যা আমার মনে হয়েছে। আমার অভিভাষণটি সুরু করব ভারতমাতার বন্দনা ক'রে। বন্দনাটি আমি রচনা করেছিলাম ১৯৬২ সালে যখন চীন আমাদের দেশ আক্রমণ করে :

আজ দেখা দিলে ঝলকি' নিখিলে মৃন্ময়ী মাগো, কালো নিশায়,
বিদলি' তিমির চিরন্তনীর বিলায়ে আশিস আলোশিখায়।
আমরা যে সাড়া দিই খনে খনে
মিথ্যামলিন কামনা কূজনে
সাধিয়া আঁধার শুনি না তোমার শঙ্খ, যে ডাকে : "আয়রে আয়"!
তাই কি অশনি মন্দ্রি' জননী, জাগালে তন্দ্রালস হিয়ায়।।

মাটি নও তো মা, তুমি নিরুপমা! চিন্ময় তব প্রতি অণু।
এসেছেন যুগে যুগে তব বুকে নারায়ণ ধরি' নরতনু।
তোমারি তো ডাকে গোলোক-মুরলী
কত শত প্রাণ পুলকে উছলি'
শ্যামল-করুণা-কোমল-যমুনা বহালো বৃন্দাবন-লীলায়।
তোমার আকাশে তোমার বাতাসে আজো সে-অমরা স্মৃতি বিছায়।।

কত কবি গুণী যোগী ঋষি মুনি নমি' মা তোমার ধূলিকণা
হয়েছে ধন্য চিরবরেণ্য—অসীম উছাসে উন্মনা।
তোমারি কোলে মা গগনগঙ্গা
ধায় গেয়ে গান নীলতরঙ্গা,
তপন বাহিনী! মরণ তারিণী! কৈলাস শিরে তোমার ভায়
কনককান্ত ধ্যান-প্রশান্ত যুগযুগান্ত বন্দনায়।।

আজ প্রার্থনা : তোমার সাধনা পল তরেও না যেন ভুলি।
ত্যজিয়া স্বার্থ যেন পরার্থ-ব্রতে অন্তর ওঠে দুলি'।
যেন পারি মাগো তোমার প্রসাদে
আপনারে দিতে বিলায়ে দুহাতে—
প্রতি জীব মাঝে যে-শিব বিরাজে বরি' তারে তাপিতের সেবায়।
আজ দেখা দিলে স্বরূপে নিখিলে প্রেমের প্রতিমা মধুরিমায়॥

আমার ভাষণের বিষয়বস্তু হবে সাহিত্যে ভারতের সনাতন আদর্শ। সনাতন আদর্শ বলতে আমি কি বুঝি ব্যাখ্যা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে মহাভারতের একটি মহামন্ত্র গাওয়া। এ-মন্ত্রটি মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বর্গারোহণ পর্বে গেয়েছিলেন, ভারতের আদর্শ-চিত্রণে মূল বাণীটি গেয়ে তার অনুবাদও গাইছি, শুনুন :

ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ ধর্মং ত্যজেদ্ জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥
কাম-ভয়-লোভবশে করিওনা ধর্মেরে ত্যাগ কভু,
প্রাণও যদি যায়—ধর্মে বিদায় দিও না দিও না তবু।
ধর্ম নিত্য, দুঃখ বা সুখ অনিত্য, চঞ্চল
মানুষ নিত্য, জীবন ভিত্তি করে তার টলমল।

এ-সভায় অনেক অবাঙালী আছেন, তাঁদের জন্যে এ-গভীর বাণীটির ইংরাজী তর্জমা আবৃত্তি করি :

Thou shalt not disown dharma on earth, impelled
By greed, concupiscence or fear; for know
That dharma is eternal, whereas joy
And pain are transient; the soul is everliving,
Although its basis in the world's unstable.

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম অধিবেশনে পুণ্যধাম বারাণসীতে সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বলেছিলেন আজ আমাদের মনে রাখাই চাই আরো বেশি ক'রে। কথাটি এই : "বাঙালী তার আনন্দময় সত্তাকে প্রকাশ করবার একমাত্র ক্ষেত্র

লাভ করেছে বাংলাভাষার মধ্যে।" চেস্টারটন তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন (The Great Minimum):

In a time of sceptic moths and cynic rusts,
And fatted li 'es that of their sweetness tire,
In a world of flying loves and fading lusts,
It is something to be sure of a desire.

যে-যুগে প্রতিষ্ঠা পায় সংশয়ী প্রবীণ ব্যঙ্গহাসি,
অতিভোগস্ফীত দেহবিলাসীর ক্লান্তি আসে ভোগে,
যে-জগতে প্রেম ক্ষণস্থায়ী, কাম বিবর্ণ শ্রীহীন,
ধন্য সে-একান্তী—যার প্রাণ-লক্ষ্য রাজে অচঞ্চল।

বাংলা ভাষা যেন বিশেষ ক'রে আজকের অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যের যুগে আমাদের মন একান্তী করে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়কে ফুটিয়ে তুলে ধন্য হ'তে চায় উত্তরোত্তর। কাশীতে আমিও গেয়েছিলাম দ্বিজেন্দ্রলালের মর্মস্পর্শী বঙ্গবাণী-স্তোত্র:

চাহি না কো কিছু, তুমি মা আমার,
এই শুধু জানি, নাহি জানি আর,
তুমি গো জননী হৃদয় আমার তুমি গো জননী আমার প্রাণ।
জননী বঙ্গভাষা। এ-জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল কমল চরণে স্থান।

তিনি প্রায়ই বলতেন বাংলার নানা দুঃখ দৈন্যের কিছু সত্যিকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছি আমরা বঙ্গসাহিত্যের বহুমুখী বিকাশে। পরে কবি অতুলপ্রসাদও এ-সভার আর একটি অধিবেশনে এই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে গেয়েছিলেন:

মোদের গরব মোদের আশা,
আ মরি, বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি, ভালোবাসা!
কী যাদু বাংলা গানে!—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা!
আ মরি, বাংলা ভাষা!

আজও আমার কানে বাজে ভক্ত কবির এ-গানটি তাঁর নানা ভক্তি সঙ্গীতের সঙ্গে।

আপনারা আজ আমাকে প্রীতিমাল্যে বরণ করেছেন এ-সাহিত্যসভার মূল সভাপতি-রূপে। এ আমার মহৎ সম্মান। না, শুধু চিরাচরিত অনবদ্য ঢঙে বিনয় প্রকাশ ক'রেই ঋণশোধ করলে চলবে না। ঐ সঙ্গে আমি চাই আজ এ-সভায় এই কথাটি স্বীকার করতে যে, এ-বরমাল্য পেয়ে আমি আনন্দিত আরো এই জন্য যে, এতদিনে আমি সাহিত্যিক ব'লে প্রথম "প্রকাশ্য" অভিনন্দন পেলাম। আজ চল্লিশ বৎসর ধ'রে আমি বঙ্গবাণীর পূজা ক'রে এসেছি গানে ও সাহিত্যে। সাহিত্যে আজ তার প্রথম দরবারী পুরস্কার মিলল আপনাদের দাক্ষিণ্যে। অথ, "নারায়ণং নমস্কৃত্য দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব জয়মুদীরয়েৎ" আচমন ক'রে গৌরচন্দ্রিকা সুরু করি। কেবল তার আগে ঈষৎ সলজ্জে ব'লে রাখি যে, যেহেতু আমি কোনোদিনই মামুলিপন্থী নই সেহেতু আমি যা বলতে যাচ্ছি তাতে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সায় দিতে পারবেন না। নিরুপায়, কারণ আমি গীতার মহাবাক্য মানি যে, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" আমি যা বলতে যাচ্ছি তা আমি যা হ'য়ে উঠেছি তারই তো অভিব্যক্তি হবে। ইংরাজ কবি মিথ্যা বলেন নি :

Whatever thou lovest, man
That, too, become thou must :
Light if thou lovest Light,
Dust if thou lovest dust

যা কিছু ভাই বাসবে তুমি ভালো,,
হ'তেই হবে তাই তোমাকে শেষে :
আলোয় ভালো বাসলে হবে আলো,
ধুলো হবে ধুলোয় ভালোবেসে।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। বটে, কিন্তু জীবনের এই একটা আশ্চর্য রহস্য যে, যাঁরা স্বধর্ম পালন ক'রে মরতেও রাজী তাঁরা মরেন না, হন চিরঞ্জীবী। মহাকবি মধুসূদনের ভাষায় :—

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজনে।

এ-বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের এক দিক্‌পাল, অলডাস হাক্সলি, আমাদের জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর প্রতিভাগৌরবে আমাদের মনো-মন্দিরবাসী হয়েছেন। তিনি প্রথম জীবনে সাহিত্যে শুধু শিল্পকলারই উপাসক ছিলেন, "আর্ট-ফর-আর্টস্‌ সেক" বুলি আওড়াতেন ; পরে অন্তরে "হৈমবতী (কেনোপনিষদ) ছোঁয়ান তাঁর সোনার কাঠি, তিনি হিন্দু গুরুর কাছে ধর্ম ও যোগ দীক্ষা নিয়ে লেখেন তাঁর Time Must Have a Stop উপন্যাসে "Find out how to become your inner self in God while remaining your outer self in the world." বর্তমান যুগ বুদ্ধিবাদী নাস্তিকতার যুগ ব'লেই হয়ত তিনি এভাবে মন্ত্রগুপ্তিকে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতে তো ধার্মিকের ছদ্মবেশ ধরবার প্রয়োজন নেই। ধার্মিক, যোগী, সন্ন্যাসী সাধুসন্ত আজও এদেশে মান পান। তাই আমি অকুতোভয়েই করব আমাদের সাহিত্যে ভারতের সনাতন আদর্শের জয়গান।

আনাতোল ফ্রান্স-এর একটি রসাল গল্পই হোক উপক্রমণিকা। এক রাজা তাঁর সভাপণ্ডিতদের বললেন : "মানুষের জীবন-ইতিহাস জানতে চাই। লেখো।" পণ্ডিতেরা কুড়ি বৎসর ধরে কুড়ি খণ্ড লিখে ধরলেন রাজার সামনে। রাজা তো রেগেই আগুন : "কুড়ি খণ্ড ইতিহাস ? আমার বয়স পঞ্চাশ পেরুলো। এ-অতিকায় বিশ্বকোষ পড়বার সময় কোথায় ? সংক্ষিপ্ত করো।" "তথাস্তু" বলে পণ্ডিতবৃন্দ আরো দশবৎসর খেটে দশখণ্ডে শেষ করলেন ইতিহাস। রাজা উত্যক্ত হয়ে বললেন : "বয়স আমার ষাট হ'তে চলল। দশখণ্ড পড়ব আমি ? কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমাদের ? ছোট করো।" আরো পাঁচবৎসর খেটে পণ্ডিতেরা পাঁচখণ্ডে এসে দাঁড়ালেন। রাজা এবার ক্ষেপে গেলেন : "বয়স আমার পঁয়ষট্টি" —ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা কী করেন, আরো পাঁচবৎসর আপ্রাণ খেটে এক-খণ্ডে ইতিহাস লিখে রাজার কাছে গেলেন ভয়ে ভয়ে। তখন রাজার নাভিশ্বাস উঠেছে, তিনি বললেন : "হা কপাল ! বড় সাধ ছিল মরবার আগে মানুষের ইতিহাস জেনে যাব। তা আর হ'ল না।" সেখানে ছিলেন এক বিচক্ষণ সাধু। তিনি গুটি গুটি এগিয়ে এসে রাজার কানে কানে বললেন :

কাঁদিসনে বাছা! শোন, মানুষের ইতিহাস আজ বলি তোরে:
জন্মে সে বাড়ে, ভোগে, বুড়ো হয়, শেষে খাবি খেয়ে যায় ম'রে।

শ্রীঅরবিন্দ একবার লিখেছিলেন আমাকে, প্রতি দার্শনিকের সিদ্ধান্তের মধ্যেই বিশ্বসত্যের কোনো-না-কোনো বিভাব (aspect) ফুটে ওঠে। এই বৈরাগী সাধু রাজাকে যখন বলেছিলেন মানুষ ভুগে বুড়ো হ'য়ে শেষে খাবি খেয়ে পটল তোলে, তখন তিনি মানুষের একটি চিরন্তন অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করেছিলেন জোর দিয়ে, যে, সব জীবনই দুর্ভোগ, একটু আধটু সুখ আমাদের মনকে দোলায় দুঃখের শোকাবহতা—ট্রাজেডিকে—আরও ফুটিয়ে তুলতে। এ একটি দৃষ্টিভঙ্গি—দুঃখবাদীর।

এই ট্রাজেডির রসরূপ দিয়েছিলেন আশ্চর্য মর্মস্পর্শী ভাবে গ্রীক নাট্যকার-ত্রয়ী: এস্কাইলাস, য়ুরিপিডিস, সফোক্লিস্। তাঁরা বললেন: মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, শেষে নিয়তি জয়ী হবেই হবে। তার স্বাধীনতা মায়া, আসলে তাকে নাকে দড়ি দিয়ে চালায় এক অলক্ষ্য, অলংঘ্য বিধান। বর্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর পর ভালেরি বহু চিন্তাগবেষণা করে শেষে বললেন: Nous tous sommes les jouets des forces absentes" অর্থাৎ আমরা খতিয়ে নানা অদৃশ্য শক্তির হাতেরি খেলার পুতুল। সফোক্লিস্ তাঁর বিখ্যাত নাটক রাজা ইডিপাস—যা যুগে যুগে শক্তিমত্তায় মানুষকে অভিভূত করেছে—এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই ফুটিয়ে তুলেছে যে, মানুষ যূপকাষ্ঠে বাঁধা পশুর মতন শেষে অসহায় হয়ে মরবেই মরবে নিয়তির খাঁড়ায়, তার পুরুষকার তাকে বাঁচাতে পারে না, কেন না নিয়তির বিধান দুর্লংঘ্য। রাজা ইডিপাস তাঁর পিতাকে হত্যা করে মাকে বিবাহ করবেন এইই ছিল তাঁর ললাটলিপি। তিনি কত চেষ্টা করলেন কিন্তু হার মানতে হ'ল। অরেক্ল এর ভবিষ্যদ্বাণী ফলল: তিনি পিতৃহন্তা হয়ে বিধবা মা জোকাস্টাকে বিবাহ করলেন না জেনে। শেষে যখন জানতে পারলেন, তখন জোকাস্টা আত্মহত্যা করলেন ও ইডিপাস নিজের চোখ উপড়ে ফেললেন।

শেক্ষপীয়রের রচিত নানা ট্রাজেডির মধ্যেও আমরা পাই তাঁর এই জীবন দর্শন—যাকে অক্সফোর্ডের প্রফেসর ব্রাডলি তাঁর বিখ্যাত Shakespearen Tragedy গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন net of fate ব'লে! যথা,

ওথেলোর ডেসডিমোনাকে গভীর ভাবে ভালোবাসা সত্ত্বেও দশচক্রে প'ড়ে হত্যা করে, নিজের এই মর্মান্তিক সংজ্ঞা দেওয়া : "One that loved not wisely but too well!" কিম্বা ধরুন, হ্যামলেটের না জেনে পলোনিয়সকে বধ করার ফলে তাঁর কন্যা—নিজের প্রিয়তমা—ওফেলিয়ার পাগল হয়ে জলে ডুবে মরার কারণ হওয়া—আর শেষ অঙ্কে প্রায় সকলেরই মৃত্যু! দৃষ্টান্তের সংখ্যা-বৃদ্ধি করে আমার ভাষণকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবু গ্রীক ও ইংরাজী ট্রাজেডির উদাহরণ দিলাম শুধু আমার এই বক্তব্যটিকে পেশ করতে যে, প্রতিভা থাকলে যেকোনো জীবন-দর্শনকে, মতবাদকে এমন চমৎকার করে ফুটিয়ে তোলা যায় যে, আমাদের মন না মানলেও হৃদয় মুগ্ধ হয়। কিম্বা বলা যেতে পারে—এক একটি জীবনদর্শন মানুষের এক একটি মেজাজের—"মূড"এর—মঞ্জরণ এক্সপ্রেশন যেমন ধরুন, আর একটি সার্বভৌম জীবন দর্শন যে, এ-জীবনে একটু আধটু সুখ থাকলেও উল্টোপিঠে থাকবেই থাকবে দুঃখ আর খতিয়ে আর সবই ফক্কিকারি—vanity, vanity, all is vanity! বাল্মীকি বললেন (উত্তরকাণ্ড, রামায়ণ):

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তা সমুচ্ছ্রয়াঃ
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

প্রতি সঞ্চয় হয় শেষে ক্ষয়, উত্থান শেষে হয় পতন,
মিলনের শেষে বিরহবেদনা, জীবনের শেষে চিরমরণ

এ সত্য বিশ্বজনীন, চিরন্তন। একটি ফরাসী কবিতায় আছে:

La vie est vaine :
Un peu d'anour,
Un peu de haine,
Et puis bonjour !
La vie est breve :
Un peu d'espoir,
Un pue de reve,
Et puis bonsoir !

এ-জীবন নিষ্ফল:

একটু প্রেমের রেশ,
একটু হিংসা ছল,
তারপরে দিন শেষ !
এ জীবন তুদিনের
একটু আশা প্রভাতী
ক্ষণলীলা স্বপনের
তারপরে কালো রাতি !

জীবনের এই লক্ষ্যহারা নিরর্থক গতির ট্রাজিডি নিয়ে দেশে দেশে কত হৃদয়বান্ কবি ও ভাবুকই না কান্নাকাটি করেছেন, ফেলেছেন দীর্ঘশ্বাস। এ-ও একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

কিন্তু আরো অনেক দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে নিজের স্থান করে নিয়ে রকমারি রসের মেলা বসিয়েছে: তুঃসাহস, যুদ্ধবিগ্রহ, উদ্ভটতা, হাসি, ব্যঙ্গ, ভয়, শৃঙ্গার, প্রণয়, সখ্য, বাৎসল্য, দিগ্বিজয়, প্রীতি, লয়ালটি··· কত বলব ? একসময়ে শুধু ঘটনাবহুল কাহিনীর রসই ছিল পাঠকের উপজীব্য, পরে এল এক একটা মেজাজ mood নিয়ে গল্প, রকমারি কথালাপের রসায়ন, দোটানাদোতুল মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, অবৈধ প্রণয়ের মধ্যেও বিষামৃত-রসাস্বাদ—এমন কি পতিতা, গণিকা, মাতাল, লম্পট তুরাচারের চিত্রণেও আমাদের মনকে জাগিয়ে মাতিয়ে তোলা। নীতি তুর্নীতির সত্যাসত্য সাহিত্যে অবান্তর, কী আঁকছ তা নিয়েও কথা নয়, কেমন করে আঁকছ সেই বিচারেই রসের বিচার। বদ্‌লেয়ার বীভৎস, জঘন্য, কুৎসিতকেও কাব্য পাংক্তেয় করে কবিখ্যাতি পেলেন। বললেন স-দাপটে: La poesie n'a pas verite pour object—কাব্যের লক্ষ্য সত্য নয়—মনকে খুশী বা আবিষ্ট করতে পারলেই হ'ল। সমর্সেট মম Magician বলে একটি বই লিখেছেন। পড়তে পড়তে রোমহর্ষণ হয় তার বীভৎসতায়, অথচ সুরু করলে ছাড়া যায় না। এর কারণ—বীভৎসতার মধ্যেও রস আছে। গোয়েন্দা কাহিনী, ভয়াবহ থ্রিলার এসবও প্রতিভাধরের হাতে রসবস্তু হ'য়ে উঠতে পারে যথা কনান ডয়েল, আগাথা ক্রিষ্টি।

সবই মানি। তাছাড়া কালিদাস বলেছেন লাখকথার এককথা:

ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। জীবন বহুবিচিত্র রসে উচ্ছল, অগণন, মানুষের রুচিও রকমারি। কেউ ভালোবাসে বীর্য, কেউ হুহুঙ্কার, কেউ শান্তি, কেউ বৈরাগ্য, কেউ কর্ম, কেউ শক্তি, কেউ নেশা, কেউ উত্তেজনা, কেউ চমক। সাহিত্য যখন বাক্-এর মাধ্যমে জীবনের আত্মপ্রকাশ—তখন তাকে নানা রসের রসদদার হ'তেই হবে—নীতিবাদীর ধমক সে শুনবে কেন? কোন্‌টা সুনীতি কোন্‌টা দুর্নীতি তার অভ্রান্ত নিরিখ কে পেয়েছে? কাজেই সহিষ্ণু হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, আমার যা ভালো লাগে তোমার তা লাগে না এ নিয়ে তর্জন গর্জন নিষ্ফল, পণ্ডশ্রম।

এই হানাহানি কাটাকাটি মতভেদের গোলোকধাঁধাঁর জগতে অশান্তি নিবারণের একটিমাত্র মহৎ উপায়—the wayout—আছেঃ সুষমা, হার্মনি। কিন্তু অনেকগুলি সুরের সমাহারে তবে সুষমা গ'ড়ে ওঠে, তাই এ-সমাহার সম্পন্ন হ'তে পারে না যদি মানুষ মারমুখো হ'য়ে উঠে বলে ডিক্টেটরী গর্জনেঃ আমার মত যে না নেবে তার দফাবফা করব। কিন্তু এখনো জগতে স্বাধীন মতের বাঁচবার উপায় আছে। তাই ধার্মিকের রুচির তথা যুক্তির এ-রায়কেও মঞ্জুর করতেই হবে যে, ধর্মের প্রেরণাও সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি করতে পারে—যার ফলে একটি উপরি লাভ হচ্ছে রসের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ-বাদের অভ্যুত্থান। এ-আদর্শবাদ বলেঃ হীনতা নীচতা জঘন্যতার ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু শুধু মহত্ত্ব উদার্য নির্মলতাকে আরো উজ্জ্বল ক'রে ধরতে। মনের কুরুক্ষেত্রে স্বর্গ ও নরকের শক্তির চিরযুদ্ধের বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু দেখাতে যে, নারকীয় শক্তির ক্রিয়াকলাপ বাস্তব উত্তেজক ও দুর্দান্ত হ'লেও ভাগবতী করুণার স্বর্গীয় শক্তি ঢের বেশি জীবন্ত—সুন্দর ও বরেণ্য তো বটেই।

তর্ক উঠবে—একথার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তরে বলবঃ আছে—সেই সব মহাজনের অভিজ্ঞতা যাঁরা কৃপাধন্য হ'য়ে এজাহার দিয়েছেন তাঁদের উপলব্ধির। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-পরম উপলব্ধি হয় খুব কম মানুষেরই—গীতার ভাষায়—'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে, যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি

তত্ত্বতঃ।' অর্থাৎ হাজার হাজারের মধ্যে মাত্র দুচারজন ঠাকুরকে জানতে চান আর এ-জিজ্ঞাসু সাধকদের মধ্যেও এক আধজন তাঁর খবর পান। পরম সিদ্ধি এত দুর্লভ কেন এ-প্রশ্নের উত্তরে বলব: ভাগবতী করুণার মহাসত্য প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত হয় শুধু একান্তী ধ্যানী ভক্ত ও তপস্বীর আবাহনে, আর তাঁরাও জীবত্ব ডিঙিয়ে শিবত্বে পৌঁছন সুদীর্ঘ তপস্যার, সাধনার পরে—আগে নয়। কারণ শুধু এই সাধনার ফলেই সেই নির্মল চিত্ত অধিগত হয় যে-চিত্তে করুণা অবতরণ করতে পারে।

তাই উপনিষদে বলেছে—সেই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান অজর অব্রণ পরমপুরুষকে দেখে মানুষ অমৃত হয় "ধাতুপ্রসাদাৎ" অর্থাৎ সাধনলব্ধ চিত্তশুদ্ধির প্রসাদে।

কী ভাবে মানুষ অমৃত হয় তার দিশা পেতে হ'লে নানা দেশের মহাসাধক মহাপুরুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় একটি উপায়। আর একটি উপায়—এ-অধ্যাত্মজ্ঞানের ফলে যাঁরা ঋষিদৃষ্টি লাভ করেছেন সেই তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম প্রশ্ন ও সেবা ক'রে ইষ্টলাভ করা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে:

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

কিন্তু আরো একটি উপায় আছে—আর এইটিই আমার আজকের বিষয়বস্তু—অর্থাৎ সেই মহাসাহিত্যের কাছে হাত পাতা, প্রেরণা চাওয়া যে-সাহিত্য গড়ে তুলেছেন মুনি ঋষি কবিবৃন্দ।

পাশ্চাত্য দেশে ঋষিকবির দেখা মেলে না মেলে মহা সাধকের: সেণ্ট, মেসাইয়া, পোপ, অ্যাপস্‌ল ও ভক্ত। কিন্তু ঋষি ও কবির সমন্বয় পেতে হ'লে হাত পাততে হবে ভারতের কাছে: যথা বৈদিক ঋষিগণ, বাল্মীকি, বেদব্যাস, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাজন। শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে বেদ উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, শ্রীঅরবিন্দের "দিব্যজীবন" (Life Divine), "যোগ সমন্বয়" (Synthesis of Yoga) এবং সাবিত্রী —ইংরাজী অমিত্রাক্ষরের শিখরচারী মহাকাব্য।

এখানে একটি কথা ব'লে রাখি—নইলে হয়ত অনেকেই আমাকে ভুল বুঝতে পারেন। আমি বলতে চাই না যে, যাঁদের নাম করলাম তাঁরা

ছাড়া জগতে আর কারুর অধ্যাত্ম কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় নি। আমি নিজে বাইরে খৃষ্টের নানা উক্তির কবিত্বে গভীর ভাবে মুগ্ধ হয়েছি। শুধু আমি কেন রাসেল যে রাসেল—তিনিও খৃষ্টের প্রতি বিমুখই বলব—তিনিও লিখেছেন তাঁর Portraits from Memory-তে: "Nothing could be better in style than the Prayer Book and the authorized version of the Bible." কিন্তু ওদেশে আরো অনেকেই চমৎকার অধ্যাত্ম গান ও কবিতা লিখেছেন: যথা গেটে, দান্তে, ব্লেক, ব্রণ্টে, ওয়র্ডসওয়র্থ, টেনিসন, শেলি, জর্জরাসেল, কত শত গির্জার স্তব স্তোত্র requiem hymn, psalm litany প্রভৃতি। খৃষ্টের নানা উক্তি কত শত অধ্যাত্ম গানের প্রেরণা জুগিয়েছে কে বলবে? এছাড়া শুনেছি লাটিন ও গ্রীক ভাষায়ও অপরূপ কবিত্বময় ধর্মসঙ্গীত আছে যার ছন্দোবন্ধে কত শত প্রতিভাবান ধার্মিক গীতিকারের আত্মার আনন্দ বেদনা প্রার্থনা আকুতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্লেটোর গ্রীক ভাষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে: ভগবান যদি ভক্তের জন্যে অবতীর্ণ হ'লে এই দেবভাষাতেই কথা কইতেন। ওদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার বীটোভেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত "নবম সিম্ফনিতে" জর্মন কবি শিলার-এর যে অপরূপ স্তবটির সুর দিয়েছেন তার একটি স্তবক উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ কবতে পারছি না, কেন না এ-স্তবটিতে মুগ্ধ হ'য়ে ওদেশেব হাজার হাজার নরনারী স্বর্গীয় অভীপ্সার (himmlische Sehensucht) প্রেরণা পেয়ে আজো গান:

Freude, schoener Gotterfunken,
Tochter aus Eiysium!
Wir betreten feuertrunken
Himmlische dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brueder
Wo dein sanfter Fluegel weilt.

স্তবটি সুদীর্ঘ, তাই বাকি স্তবকগুলি গাইলাম না। এখন এর বাংলা তর্জমাটিও গেয়ে শোনাচ্ছি ঐ সুরেই, শুনুন:

আনন্দময়ী হে দেবদীপ্তি, নন্দিনী নভোনন্দনের!
অগ্নি-আবেগে এসেছি আমরা দ্বারে তব শিবমন্দিরের।
তোমারি জাদুতে ভেদবুদ্ধির যুগযন্ত্রণা পলে মিলায়,
দেখ—ভাই বোন আমরা দাঁড়ায়ে তোমার প্রেমের পর্ণছায়।

আমি নিজে কতবার বিখ্যাত Abide with me ; Saviour, let me walk with thee ; Lead kindly Light বর্গীয় ভক্তির গান উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গেয়েছি মূল ইংরাজীতে ও তার অনুবাদে! ভগবদ্‌ভক্তি অধ্যাত্ম জ্ঞান, আনন্দের আলো, সৌহাত্রের অভীপ্সা, নির্মলতার সাধনা, পরার্থে আত্মবিসর্জনের আকুতি সার্বভৌম—কে না মানবে? কিন্তু সব মেনেও তবু বলব—ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদ ভক্তি যোগ ও জ্ঞানের বীজে যত ব্যাপক ভাবে মানুষের মনের মাটিতে পারমার্থিক ফসল ফলিয়েছে তার তুলনা নেই। ভক্তি-সঙ্গীতের যে-বহুমুখী বিকাশ হয়েছে আমাদের বাউলে, ভজনে, কীর্তনে, গানে, দোঁহায়, গুরুগ্রন্থে, স্তবে, স্তোত্রে, গুরু-বন্দনায়, অন্তহীন বৈষ্ণব পদাবলীতে—তার জুড়ি বিশ্বে মেলে না। সর্বোপরি অধ্যাত্মবাদে জ্ঞানভক্তির প্রেরণায় ভারতীয় ঋষি কবিদের মহাকাব্যে যে-আনন্দময় অমৃতলোকের বাণী সমুদ্রকল্লোল তুলেছে ধর্ম সাহিত্যে তার মহিমা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই বলেছেন যে, বেদ ও উপনিষদে নানা স্থলেই লোকোত্তর কাব্যবাণী রূপ নিয়েছে। ঋষিরা এ-বাণী শুনতেন তাঁদের অন্তঃশ্রুতি দিয়ে। তাই বেদের অন্য নাম "শ্রুতি"। অনেকে হয়ত আপত্তি করবেন : বেদ উপনিষদ কাব্য নয়—দর্শন। কিন্তু কাব্যের কেবল একটি মাত্র নিকষ আছে : যে, সে বুদ্ধির দরবারে নয়, হৃদয়ের দরবারেই আনন্দ-সঞ্চারে রসসৃষ্টি করে। বেদের দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত, স্বর্গীয় নানা আবাহন প্রার্থনা তথা উপনিষদের নানা ঝংকৃত মন্ত্রে হৃদয়ে এমনই রসাবেশ জাগে যার ফলে দুনিয়ার চেহারাই যেন বদ্‌লে যায়। কাজেই বেদ উপনিষদকে কবিতার পর্যায়ে ফেললে সেটা অত্যুক্তি হবে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও উপনিষদের নানা মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হ'য়ে অপরূপ ভাষ্যের পর ভাষ্য করেছেন তাঁর "শান্তিনিকেতন" ভাষণে। তাঁর কবি-হৃদয় উপনিষদের মহাকাব্যে কী ভাবে দুলে উঠত তার আরো নিবিড়

প্রাণস্পর্শী অঙ্গীকার পাই তাঁর "নৈবেদ্যে"। শ্বেতাশ্বতরের কয়েকটি মন্ত্রে তাঁর হৃদয় কী ভাবে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল শুনুন একটু :

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ

এ-মন্ত্রগুলির ভাষ্যে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠলেন :

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বরে
ঘোষণা করিয়াছিলে সবার উপরে
অগ্নিতে জলেতে এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে-বাক্য উদার
এই ভারতেরি।...
একদা এ-ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে : "শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো। অন্য পথ নাহি।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই উপনিষদের নানা মন্ত্রকাব্যের মহিমার কথা বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা ও গুরু যমের কথা বলতে বলতে তিনি আনন্দে অনেক সময়ে আত্মহারা হতেন, আবৃত্তি করতেন কম্প্রকণ্ঠে :

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তিমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

এ-মন্ত্রটি তাঁকে ধ্যানাবিষ্ট করত। নির্বিকল্প সমাধির ফলে তিনি এর ভাষ্য করেছিলেন একটি স্বরচিত গানে ঃ

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর!
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর।

তাঁর "জ্ঞানযোগ" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রাচীন উপনিষদ সমূহ অতি উচ্চস্তরের কবিত্বপূর্ণ। এইসব উপনিষদ-স্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন মহাকবি।...কবিতার মাধ্যমে মহত্তম সত্যোপলব্ধি-রাশি জগৎকে দান করার জন্য বিধাতা উপনিষদের ঋষিদের সাধারণ মানব থেকে অনেক উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছিলেন।"

কেবল দুঃখ এই যে, বেদ ও উপনিষদের অধ্যাত্ম কাব্যের কবিত্বের অমৃতস্বাদ পেতে হ'লে সংস্কৃতে প্রবেশ চাই। এ-প্রবেশ যাঁদের নেই তাঁরাই ব'লে থাকেন বেদ উপনিষদ মহাকাব্য নয়, দর্শন মাত্র।

রামায়ণ মহাভারত ভাগবত সম্বন্ধেও ঐ কথা ঃ অনুবাদের মাধ্যমে এ-মহাকাব্যত্রয়ের পূর্ণ রসাস্বাদ পাওয়া অসম্ভব। তাই এ-ত্রয়ীর কাব্য-কল্লোল ও মন্ত্রমহিমার সম্পর্কে আরো দুএকটি কথা বলতেই হবে।

রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি লিরিক ও এপিক কবিতার সমন্বয় সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন মহৎ মানুষের হৃদয়ের অপার সৌন্দর্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর National Value of Artএ লিখেছেন যে, নীতিবাদের ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যবোধ। রামের সত্যনিষ্ঠা, সীতার পাতিব্রত্য, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, হনুমানের রামনিষ্ঠা এত সুন্দর ব'লেই তারা আমাদের ক্ষুদ্রতম গভীরতম প্রেম প্রীতি ভক্তিশ্রদ্ধা আনন্দ বেদনা জাগিয়ে তুলেছে রামায়ণের কবিত্বের পাষাণভাঙা ঝর্ণার নির্মল উৎসারে। কত গল্প, যাত্রা, নাটক, কাব্য, কথকতা, গান, দোঁহাই না সৃষ্ট হয়েছে রামায়ণের প্রেরণায়! আমাদের জাতীয় ভক্তি নিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধকে তুলসীদাস, কৃত্তিবাস প্রমুখ ভক্তকবিরা কতখানি উস্কে

দিয়েছেন তার কে পরিমাপ করবে? বলতে কি, আমাদের মহত্ত্ব ও প্রেমপ্রীতি আনন্দ সম্ভ্রমবোধকে রূপোচ্ছল রামায়ণের কাব্যরস তথা নাট্যরস যুগ যুগ ধ'রে লালন করেছে বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু তারোপরে আছে : রামায়ণই আমাদের প্রথম অবতারবাদে দীক্ষা দিয়েছে। করুণাময় রামচন্দ্র যে নররূপী নারায়ণ—দুর্জন রাক্ষসদমন ক'রে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতেই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ-বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে উঠে তাদের ভক্তির পুষ্টি সাধন ক'রে এসেছে রামায়ণের বর্ণনার প্রসাদেই।

ক্ষুৎপিপাসাতুর, আধিব্যাধি-ক্লিষ্ট রক্তমাংসেগড়া মানুষের মধ্যে 'যে দেবতা এসে জীবনকে ভক্তিবর দিয়ে তাকে দেবত্বের দীক্ষা দিতে পারে একথা অগণন ভক্ত কিছুতেই এত সহজে মেনে নিতে পারত না যদি রামকে বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে পরমসুন্দর দেবতার রূপে দীপ্যমান ক'রে না তুলতেন। তাঁর অপরূপ রূপচিত্রণে আমাদের মন মজেছিল—প্রাণ দুলেছিল হৃদয় জেগে উঠেছিল ব'লেই আমরা রামকে "তুমি আমার" গেয়ে মাথায় ক'রে নিয়েছিলাম যখন তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন :

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

অর্থাৎ যে আমার শরণ চায় "আমি তোমারই" বলে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে ভয় হ'তে মুক্তি দেই—এইই আমার ব্রত।

ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ঔদার্যের দীক্ষা দিয়ে ভারতকে ব্যাপকভাবে আত্মার দিশা দেখিয়েছেন আমাদের দেশে প্রথম মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণে রামের চিত্রাঙ্কনে, পরে বেদব্যাস মহাভারত ও ভাগবতে কৃষ্ণের রূপায়নে। বেদ বেদাঙ্গ ন্যায় স্মৃতি ষড়্দর্শনের প্রভাব ভারতীয় মনে এই মহাকাব্য-যুগলের প্রভাবের মতন ব্যাপক হ'তে পারেনি তার একটি কারণ নিশ্চয়ই রামায়ণ মহাভারতের বহু চরিত্রের প্রাণকাড়া মানবিক আবেদন। স্ত্রীর পাতিব্রত্য বলতেই আজো আমরা সীতা সাবিত্রীর গান্ধারীর দৃষ্টান্ত দেই। ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বলতে না বলতে মনে পড়ে রামলক্ষ্মণ বা পঞ্চপাণ্ডব। বীরের কথা ভাবতেই মনে পড়ে রাম, হনুমান, ভীষ্ম, অর্জুন,

দ্রোণ, অভিমন্যু, কর্ণের কথা। নির্লোভ ধার্মিকের কথা উঠলেই মনে পড়ে বিদুরের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে নিটোল, ধ্রুবসুন্দর হ'য়ে উঠেছে মহাভারতের (ও পরে ভাগবতের) অবিস্মরণীয় কৃষ্ণ-চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আসমুদ্রহিমাচল রচিত হয়েছে সে কত অফুরান স্তবস্তুতি, গীতা পুরাণ, রসালাপ, প্রেম প্রীতি বাৎসল্যের ছবি, প্রণয়, সখ্য, ফুলদোল, রলরোল, অশ্রুহাসি, নৃত্যবাঁশি, বিরহমিলন কথা—গোপ-গোপীদের নিয়ে প্রাণোন্মাদী বৃন্দাবনলীলা! উৎসবে সঙ্গী, যুদ্ধে সারথি, সংশয়ে দিশারি, ভক্তিতে বরদাতা, ভয়ে আশ্রয়দাতা, পাপে দণ্ডধর, নৈতিকতায় উপদেষ্টা। মানবিক নীতি লঙ্ঘন ক'রেও দেবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা! নীতির মূলাধার হ'য়েও নীতির অতীত, প্রেমিক হ'য়েও বৈরাগী, শিশু হ'য়েও জ্ঞানীর জ্ঞানী, ভক্তাধীন হয়েও মধুর ছলনাময়, রূপরাজ হ'য়েও রূপে-অনাসক্ত, ক্ষর ও অক্ষর হ'য়েও পুরুষোত্তম—যিনি সগুণ-নির্গুণের মধ্যে সেতু বাঁধেন ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তারে—এ হেন চরিত্র কি ঋষি কবি শিরোমণি বেদব্যাস ছাড়া আর কেউ আঁকতে সাহস করতে পারত? বলতে পারত আর কেউ এমন জলদমন্দ্রে যে দেবমানব কৃষ্ণ মানুষের পড়া নীতি দুর্নীতির পাকে পাপপুণ্যের ঊর্ধ্বে যিনি (গীতার ভাষায়):

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম ॥

তথা (মহাভারতে ভীষ্মের স্তব—সভাপর্ব):

কৃষ্ণ এব হি ভূতানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥
এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোচ্যুতঃ ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমাশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চ যে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অগ্নিহোত্রমুখা বেদা গায়ত্রী ছন্দসা মুখম্।
রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্ ॥
ঊর্ধ্বং তির্যগধশ্চৈব যাবতী জগতো গতিঃ।
সদেবকেষু লোকেষু ভগবান্ কেশবো মুখম্।

উদয় লয় স্থিতির হরি উৎস অমরণ,
স্থবির জঙ্গমের বুকে যাঁর আকিঞ্চন,
প্রকৃতি তথা পুরুষ যিনি, অচল, সনাতন,
বন্ধনের কেন্দ্রে যিনি বিগত বন্ধন,
চন্দ্রমা আদিত্য গ্রহ তারকা দশদিশি
আদেশে যাঁর 'ঝলকি' যায় তাঁহারি বুকে মিশি,
রম্য যত বিকাশ মাঝে শশী রম্যতম,
অনিন্দিত ছন্দ মাঝে গায়ত্রী পরম,
তেজের মাঝে তপন, নরপতি নরের মাঝে
বহমানের মাঝে নিধির সমান কে বা আছে ?
উর্ধ্ব অধ কুটিল যত গতিরে ভবে জানি,
সবারি মূলাধার কেশব—জগৎ লয় মানি'

কিন্তু হ'লে হবে কি, কৃষ্ণ মহাভারতে খানিকটা যেন গাঢাকা দিয়েই ছিলেন বলব। দুচারজন দ্রষ্টা তাঁকে পুরুষোত্তম বলে সনাক্ত করলেও তিনি তাঁর নরলীলায় প্রায় সর্বত্র পাণ্ডবসখা দ্বারকাপতি রূপেই নিজেকে জানান দিয়েছিলেন। সাহিত্যে এই যে আশ্চর্য ছদ্মবেশের চিত্রণ এ-ও কেবল অঘটনঘটনকৌশলী বেদব্যাসেই সম্ভব।

কিন্তু সেই জন্যেই নারদকে স্বর্গ থেকে এসে তাঁকে বলতে হল যে কৃষ্ণলীলার কথাও তাঁকেই বলতে হবে, আর কারুর সাধ্য নেই তাঁর কথামৃত বলবার। ব্যাস "তথাস্তু" বলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এর ছবি আঁকলেন, বললেন আর সকলেই অংশাবতার শুধু কৃষ্ণই পূর্ণাবতার। এ-ভাগবত তিনি পড়ালেন পুত্র ভক্তরাজ শুকদেবকে, আর ডাক দিলেন রসিক ও ভাবুককে কৃষ্ণ-কথামৃত পান করতে।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

অমৃতময় ভাগবতের যে-বাণী নির্ঝরে
শুকদেবের শ্রীমুখ হ'তে ঝরিল ধরা প'রে

পুণ্যমহাকল্পতরু বেদের ফলসুধা
মুহুর্মুহু করিয়া পান মিটাও চিরক্ষুধা
রসিক সুধী ভাবুক সবে! শুন হে সমসুখে
সাধনপথে সাধনশেষে একথা যুগে যুগে।

কথামৃতই বটে—তবে শুধু অমৃতই নয়, বিস্ময়েরও অবধি থাকে না: এ কী সমারোহ: স্তবে স্তোত্রে ছন্দে বর্ণনায় উপদেশে নিসর্গচিত্র কল্পনার বর্ণ প্রপাতে, অগণন চরিত্রের শোভাযাত্রায় একের পর এক—রাজা বৈরাগী জ্ঞানী গুণী ঋষি মুনি ভক্ত অবতারকল্প মহাজন—সর্বোপরি কৃষ্ণবিলাসিনী সর্ব-হারা-সর্বজয়া গোপীদের অতুলনীয় চিত্রায়নে! আর এই বিরাট পটভূমিকায় দীপ্ত হয়ে উঠল চরাচর কৃষ্ণের ব্যক্তিরূপের আনন্দ প্রভায়—যার আলোকবর কালজয়ী চির-অম্লান সর্বক্ষেমদাতা বরাভয়দাতা (ভাগবতের ভাষায়)

মামেকমেব শরণম্ আত্মানং সর্বদেহিনাম্!
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্থা হ্যকুতোভয়ঃ।।
নিখিল দেহীর অন্তরবাসী আমার শরণ চায়
যে আমারে জানি নিয়ন্তা—লভে বরাভয় সে ধরায়।

বরাভয়ের চেয়ে মহৎ আশ্বাস আর কী আছে? কোন্ সাহিত্য তাকে ছাপিয়ে যেতে পারে যে দুঃখে শান্তিদাতা, বিপদে বন্ধু, জীবনে আনন্দ, মরণে আশ্রয়? কিন্তু এখানেও কৃষ্ণলীলার শেষ নয়। এ-লীলার কি শেষ আছে? সম্ভবামি যুগে যুগে—বলেননি কি তিনি? তাই তো নন্দনন্দনকে আবার জন্ম নিতে হল শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যরূপে—একাধারে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রূপে—প্রেমের আশ্রয় তথা বিষয় হয়ে—রাধাভাবের উদ্দীপনে। আর যেম্নি এ আবির্ভাব হ'ল অম্নি (ভক্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের অপরূপ ভাষায়)

পরে একদিন এই পণ্ডিত সমাজে
এই স্মৃতিশ্রুতিন্যায় নীতিচর্চামাঝে
এই কূট তর্কের আবর্তে এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা ভক্তির মহতী

দুর্দাম বন্যার মত পড়িল আসিয়া
ভৈরব মধুর স্বনে, দিল ভাসাইয়া
ভাঙিয়া বিচূর্ণ করি নিয়ম, আচার,
সমাজনীতি ও ধর্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিতবক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল উপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব
নবযৌবনের মত কোথা হতে নেমে!
অমনি উঠিল নৃত্য, মহানৃত্য প্রেমে!
আর সেই সংকীর্তনে মধুর মৃদঙ্গে
সুমধুর হরিনাম ছাইল এ-বঙ্গে।

আর সে কী মধুর নামকীর্তন! কত ভক্ত ভক্তিমতী বৈরাগী ভিখারী আবালবৃদ্ধবনিতা যোগ দিল সে গীতসজ্যে—ঝংকৃত হয়ে উঠল বৈষ্ণব পদাবলী—যার অফুরন্ত সম্ভার আজো বিশ্বের বিস্ময়। নয়? এত প্রাণোন্মাদী স্তব কি ভক্তির নাটমঞ্চে আর কোনো দেশে সর্বজনের চিত্তাকাশকে ছেয়ে গেছে? প্রেমোচ্ছল নগরসংকীর্তন এহেন ব্যাপক ভাবে আর কোথাও কি যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মাতিয়ে তুলতে পেরেছে? বলা হবে: "ও তো হুজুগ, ফেনা—তামাশা দেখতেও কি লোক জমে না?" কিন্তু এ-জনসংঘ যখন চৈতন্য নিত্যানন্দের কীর্ত্তনে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে নৃত্য করত, হরিনামের জয়ধ্বনিতে যখন সারা নবদ্বীপ কেঁপে উঠত—মুসলমান কাজি এসেও ভাবাবেশ নামগানে যোগ দিতেন তখন? আর শুধু নগরসংকীর্তনই তো নয়—পালাকীর্তনে নরনারী প্রেমের যত চরম আবেগ, উচ্ছ্বাস, মান, অভিমান পূর্বরাগ, সখীসম্বাদ, নৌকাবিহার, গোষ্ঠভঙ্গ, মাথুর, বিরহ, মিলন, মানভঙ্গ......সে কত বিভাব কৃষ্ণরাধাগোপীপ্রেমের! সাহিত্য কাব্য জীবনী নাটক তাই বা কত! শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, স্বরূপ দামোদর......আরো কত ভক্তবৈষ্ণব সংস্কৃতে অগণ্য পদ রচনা করলেন। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য এনেছিলেন তাঁর প্রেমে যেন এক নবশিহরণ

হিল্লোলের যুগ। তাঁর পাবন স্পর্শে তথা প্রেরণা-উদ্দীপ্ত কাব্যে গানে নাট্যসঙ্গীতে যেন বাংলায় বসেছিল নব বৃন্দাবনের প্রেমের হাট!—চরিত্রের শোধন করতে মানুষের কী প্রাণান্তপরিচ্ছেদ! হরিপ্রেমস্পন্দিত কাব্যসঙ্গীত রাগমালায় ছন্দোবৈচিত্র্য তালফের তার সব আবর্জনায় যেন আগুন ধরিয়ে তাকে শুদ্ধিদান করল! সাহিত্য ও সঙ্গীতের মিলনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রাণেও যুগান্তর আনল এই যে দিব্যশক্তি, দিব্য আদর্শ—তার মূল্যায়ন করব আমরা কোন্ নিরিখে ?

এ যুগকে অনেকে বলেন নাস্তিক যুক্তির যুগ, বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের যুগ অতিকায় রাষ্ট্রশক্তির যুগ। হ'তে পারে। কিন্তু আবার এক যুগাবতার আবির্ভাবে হয়ত এ সবই ভেসে যাবে প্লাবনের স্রোতে খড়কুটোর ম'ত। রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্করাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ের আগে প্রতি যুগের গণমন কি ভেবেছিল এক নব যুগ এলো ব'লে ?

এ যুগের ঋষিকবি—শ্রীঅরবিন্দ। আমরা আজ বুদ্ধি বিচারের তর্জনে শান্তি ও বিশ্বাস হারিয়েছি। কিন্তু বুদ্ধিবিচার যে বিধান দিচ্ছে তাকে নাকচ করতেও ভরসা পাই না। শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হল এই সঙ্কটলগ্নে। তিনি তাঁর অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির ঝঙ্কারে এলেন আমাদের ভারত-আত্মার বাণী শোনাতে। বুদ্ধিদীপ্ত দর্শনের আলোয় দেখতে পেলেন যে, ভারতের সনাতন বোধির বর না পেলে এ-যুগসংকটে নিস্তার নেই। অমনি জেগে উঠল তাঁর কণ্ঠে "দিব্যজীবনের" দৈববাণী। সাবিত্রীর ঋঙ্মন্ত্রে ঃ

> A few shall see what none yet understands ;
> God shall grow up while wise men talk and sleep ;
> For man shall not know the coming till the hour
> And belief shall be not till the work is done···
> I am a deputy of the aspiring world,
> My spirit's liberty I ask for all···
> A death-bound littleness is not all we are :
> Immortal our·forgotten vastnesses
> Await discovery in our summit selves····

লভিবে এ-ধ্যানসত্য শুধু কতিপয় ঋষিকবি
বোধে যারে পায় নাই আজো কেহ। স্বয়ম্ভু অরূপ
দিনে দিনে অভিনব রূপায়ণে লভিবে বিকাশ
সুবিজ্ঞের গবেষণা, অঘোর নিদ্রার অন্তরালে।
সে-আবির্ভাবের লগ্ন না আসিলে জানিবে না কেহ,
প্রত্যয় হবে না মূর্ত সাধনার সিদ্ধি নাহি হ'লে।
আমি প্রতিনিধি আজ অমৃতত্বরাশী ধরিত্রীর,
আমার আত্মার মুক্তি চাই আজ সকলের তরে।···

কারণও তিনি দিলেন:

মৃত্যুঘেরা নগণ্যতা নহে যে স্বরূপ আমাদের:
বিস্মৃত বিপুল ব্যাপ্তি আছে পথ চেয়ে—আপনারে
আমরা করিব আবিষ্কার তুঙ্গ আত্মার শিখরে।

মানুষের দুটি রূপ: বাহ্য ও আন্তর, ক্ষণায়ু ও অবিনশ্বর। প্রথম রূপকে সত্য মনে হয় যখন জীবকে আমরা তার বাইরের রূপ দেখে বিচার করি, আর তখন মনে হয় সে কী অসহায় নগণ্য অকৃতার্থ:

All sidee he sees and turns to every call,
He has no certain light by which to walk···
Always he builds but finds no constant ground,
Always he journeys but nowhere arrives.
চারিদিকে দৃষ্টি তার, প্রতি ডাকে দিতে চায় সাড়া,
নাই তার ধ্রুব দিশা, গতিপথে দিতে সুনির্দেশ,
অশ্রান্ত সৃজনশীল, কিন্তু নাই স্থির ভিত্তি তার,
চিরযাযাবর, শুধু পারে না কোথাও উত্তরিতে।

বহির্নেত্রে দেখলে মানুষকে ঠিক এম্‌নিই তো মনে হয়—অশান্ত, লক্ষ্যহারা, অতৃপ্ত, চিরপরাজিত। কিন্তু এ তার রক্তমাংসের মায়ামূর্তি, আসলে সে যে দুঃসাহসে তার স্রষ্টারই পার্থিব বিগ্রহ, জীব যে ছদ্মবেশ-ধারী শিব:

A nomad of the far mysterious light···
A colonist of Immortality···
Heaven's fixed regard beholds him from above.

সুদূর রহস্যময় আলোকের পথিক-সন্ধানী…
অমর পরিব্রাজক মর্ত্যলোকে এসে রচে গৃহ…
ঊর্ধ্ব হ'তে নির্ণিমেষে স্বর্গ তার পানে রয় চেয়ে!

অর্থাৎ চর্মচক্ষে দেখলে যাকে মনে হয় দীনহীন অণীয়ান্ অপল্কা—শিবনেত্রে দেখলে দেখি—সে দীপ্তিময়, মহীয়ান, মৃত্যুঞ্জয়। সাহিত্য তো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ত্রিশঙ্কু বাগানের ফুল নয়—জীবনের মাটি থেকেই তার উদ্ভব, জীবনের রসেই তার বিকাশ। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোনো মনগড়া থিওরির মোহে প'ড়ে তাকে শুধু একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব কেন? বাস্তববাদীর সুর মিলিয়ে বলব কেন—মানুষ অকৃতার্থ? না, আমাদের চাইতে হবে আমাদের জন্মস্বত্ব, কেন না

He has made this tenement of flesh His own,
His image in the human measure cast,
That to His divine measure we might rise··
We are sons of God and must be even as He.
এ-দেহনিলয় সে-বিদেহ বিভু করেছে বরণ,
মানবিক উপাদানে আপন বিগ্রহ সে রচিল—
মানব অমর্ত্যলোকে আরোহিতে শিখিবে বলিয়া:
দেবকুমারের হবে লভিতে সালোক্য দেবতার।

আজ মানবসভ্যতাকে মুখোমুখি হতে হবে এই তারক দেবতার সঙ্গে, নৈলে দানব হিংসার গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে না আদর্শচ্যুত ভোগবাদী মানব। সাহিত্যকেও তাই সহায় হতে হবে, আমাদের ঊর্ধ্বে আরোহণের। বিশ্বপ্রেমিক ডাক্তার আলবার্ট স্বাইৎজার তাঁর Reverence for Life প্রবন্ধে সভ্যতার পতনের জন্যে খেদ ক'রে বলেছেন সুপ্রাপার্সনাল রেস্পন্সিবিলিটির কথা, সম্প্রতি তিনি আমাদের প্রেসিডেণ্টকে লিখেছেন হাহাকার ক'রে যে হয়ত আমরা বাঁচব না এই ভয়াবহ "কল্পনাতীত আণবিক কুরুক্ষেত্র" থেকে (la terrible et inimaginable guerre atomique)। সম্প্রতি আইনষ্টাইনের একটি জীবনী পড়লাম—চমৎকার

লেখা। তিনিও বলেছেন: এ-যুগে মানবসমাজ টিকবে এ বিশ্বাস প্রায় লুপ্ত হয়েছে।*

মানব সভ্যতার এ-দারুণ দুর্লগ্নে ভারতীয় সাহিত্যিকেরা একটি কাজ অন্তত করতে পারেন: বলতে পারেন—"আমরা মানি না আর্ট ফর আর্টস্ সেক আমরা জপব ভারতের সনাতন মন্ত্র: "আর্ট ফর দি ডিভাইন্‌স্ সেক" —যেকথা শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন আধ্যাত্মিক সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে।

এ যদি আমরা মানতে রাজী থাকি তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্যে ভগবানের করুণাকে আবাহন করার সময় এসেছে। ঠেকে শিখবার লগ্ন এসেছে যে, পাশ্চাত্যের ক্রম-বর্ধমান নিরীশ্বর শক্তিবাদ ও ভোগবাদ আমাদের জোগাতে পারেনা অন্তিম তৃষ্ণার জল যার নাম শান্তি ও প্রেম, সৌভাগ্য ও শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। আজ আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রেমিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করছি। তাই এ দুই মনীষীর এ-অঙ্গীকারে কান দেওয়ার সময় এসেছে যে, ভারত পুণ্যভূমি এবং ভারতের সনাতন আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যদি আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে রণচণ্ড ও ভোগবাদী হই, তাহলে আমাদের আশু ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই আজ আমাদের বিশেষ ক'রেই স্মরণীয়—আমেরিকা থেকে ফেরার পরেই কলম্বোয় ১৬ই জানুয়ারি ১৮৯৭ সালে স্বামীজি আমাদের কী বলেছিলেন:—

"এক সময়ে আমি ভাবতাম যে ভারত পুণ্যভূমি। আজ আমি আপনাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলছি যে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।……এই পুণ্যভূমি থেকেই ধর্মনায়কেরা বারবার পৃথিবীতে নির্মল চিরন্তন অধ্যাত্ম সত্যের বান ডাকিয়ে গিয়েছেন। এখান থেকেই ভাগবত দর্শনের বিপুল জোয়ার উদ্বেল হ'য়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্লাবিত করেছে……আর এখান থেকেই আবার সে-স্রোত বইবে যার পুণ্য স্পর্শে জগতের সর্বনাশা বস্তু-

*"In these ten years, confidence in the stability—yes, in even the very basis of existence—of human society has largely vanished …The sanctity of Life has vanished" Einstein: Profile of the Man by Peter Michelmore. ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত—Frederic Muller Ltd এ বইটি সর্বজনপাঠ্য।

তান্ত্রিকতার অগ্নিশিখা নির্বাপিত হবে। আপনাদের বলছি আমি—এ হবেই হবে।"

তিনি প্রচার করেছিলেন ভারতের সনাতন আদর্শ—আর কী অগ্নিস্রাবী ভাষায়।

"হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই·· ·· ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুকন্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বলো ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ····· হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।

ভারতের কল্যাণ মৃত্তিকা আদর্শ কী বস্তু বোঝাতেই আমি বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। বলতে চেয়েছি এত জোর দিয়ে যে মানব সভ্যতার এ-গভীর সংকটলগ্নে প্রবধর্মের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে ভারতের সনাতন আদর্শ থেকে চ্যুত হ'লে স্বধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে বিস্মৃতির রসাতলে বিলীন হয়ে যাবই যাব।

একথা আমার আরো মনে হয় ভারত-পূজারী মহানুভব ভক্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যসৃষ্টির বিকাশ পর্যালোচনা ক'রে। ভারত যে পুণ্য-ভূমি সে কথা তিনি বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেরও আগে ১৮৮২ সালে—আর্যগাথা প্রথমভাগে উনিশ বৎসর বয়সে

"আর্য!

সেই স্থানে আজ করো বিচরণ
পবিত্র সে-দেশ পুণ্যময়স্থান।
ছিল সে একদা দেবলীলাভূমি,
কোরো না কোরো না তার অপমান।"

দ্বিজেন্দ্রদীপালী নামক স্মারক গ্রন্থে আমি একয়টি চরণের অনুবাদ করেছি:

O Aryan! know that this our Motherland's soil.
On which you tread, is a land, hallowed and hoary.
Which was of yore the playground of the Gods;
Beware of tarnishing her stainless glory!

ভারতের ধর্ম-সত্তায় এই কৈশোর শ্রদ্ধা তাঁর শেষ বয়সে পরিণত হয়েছিল উচ্ছল ভগবদ্‌-ভক্তিতে। তাই দেহরক্ষার ঠিক আগের সপ্তাহে তিনি লিখেছিলেন তাঁর অপূর্ব ভারতস্তোত্র :

ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা,
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম, শিল্প, ধর্মশিক্ষা।

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে,
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে-দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম,
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল সোঽহং ধর্ম।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর উদিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি ?—নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে চ'লে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত তারা কখনই নহে কো তুচ্ছ।

ভারত আমার ! ভারত আমার !—সকল মহিমা হৌক খর্ব
দুঃখ কী যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ?
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

ভারত আমার ! ভারত আমার ! কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

স্বামীজির সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও গেয়েছিলেন : "আবার তোরা মানুষ হ" গানে :

ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।

ভুলিয়া যা রে আত্মপর পরকে টেনে আপন কর…
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ।

ধর্ম ভগবান্ মহাজন ভক্তি সর্বজীবে প্রেম এই সব আত্মিক ইষ্টার্থকেই (values) আমি বলতে চাই ভারতের সনাতনধর্ম যা যুগে যুগে আমাদের কাব্যে দর্শনে ভাস্কর্যে চিত্রে গাথায় ভজন কীর্তন পদাবলীতে ঝংকৃত হয়ে মরা গাঙে বারবার বান ডাকিয়ে আমাদের প্রাণভূমিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, উর্বর করেছে। নৈলে যে দ্বিজেন্দ্রলাল যৌবনে বিলেত থেকে ফিরে হ্যাট-কোট পরে সাহেবিয়ানা করাকেই সভ্যতার পরম অভিজ্ঞান মনে করতেন তিনি শেষ বয়সে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে-কে মা বলে ডেকে এ অপূর্ব স্তব গাইতে পারতেন না, যা শুনে বহু লোক অশ্রুপাত করেছে ঃ

পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! সুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!

পারতেন না জগন্মাতাকে নিজের মা ব'লে বরণ ক'রে এমন অপূর্ব প্রার্থনা করতে ঃ

আয় মা, এখন তারারূপে, স্মিতমুখে, শুভ্রবাসে—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে—

বেজে উঠত না শেষের দিনে এমন পরম শরণাগতির সুর ঃ

সাঙ্গ আমার ধুলাখেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এইছি করে হিসেবনিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা,
এখন বড় শ্রান্ত আমি, ওমা, কোলে তুলে নে না,
যেখানে ঐ অসীম শাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো
নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।

শুধু দ্বিজেন্দ্রলাল নয় ভারতের বরেণ্য কবি ও গীতকারদের কণ্ঠেও কি বেজে উঠত এ আত্মিক সুর যথা রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, কাজি নজরুল।

শেষে একটি প্রাণস্পর্শী গোপীপ্রেমের মীরাভজন এ-বিদ্বৎসভায়

শোনাতে চাই "মধুরেন সমাপয়েৎ" নীতি মেনে। না, শুধু আপ্তবাক্যের মর্যাদা রাখতেই নয়, আপনাদের এ-পুণ্য পঞ্চনদের দেশে এসে পাঞ্জাবের এক ভক্তিমতীর আধুনিক গানের দৃষ্টান্তে এ সুদীর্ঘ ভাষণের সমাপ্তি টানা সব দিক্ দিয়েই শোভনীয় হবে—আরো এই জন্যে যে, এ-পুণ্যবতীর গানে ভক্তি ছন্দ ও কবিত্বের বিরল ত্রিবেণীসঙ্গম হয়েছে। তিনি আমার কন্যাশিষ্যা ইন্দির দেবী—মাত্র কয় বৎসরে সাত আটশো উৎকৃষ্ট মীরাভজন রচনা করেছেন দিব্য প্রেরণায়। মূল ভজনটি তাঁর দ্বিতীয় ভজনগীতালি "প্রেমাঞ্জলি"তে প্রকাশিত হয়েছে আমার অনুবাদ সহ:

ভৈরবী রাগিণী—সপ্তমমাত্রিক তেওরা তাল

য়াদ আতা হৈ সখী, মধুবনসে আনা শ্যামকা।
মুকুট সুন্দর মাল গল নূপুর সুহানা শ্যামকা
রৈন দুল্‌হন্‌সী সজী, খিলতী হুই বহ চাঁদনী।
বাদলোঁকী টোলিয়াঁমে ঝিলমিলাতী দামিনী।
রূপ কলিয়োঁকা লজাতী রাধিকা মনভাবনী।
সাঁবরেকো মিলন আঙ্গ মোহিনী বহ কামিনী।

মধুর মুরলীকে তরানোঁসে বুলানা শ্যামকা।
য়াদ আতা হৈ সখী, বহ গুনগুনানা শ্যামকা।।
মুস্করাতে চাঁদকা যমুনাকো আকে চূমনা।
পবনকী সুন্ রাগিণী মস্তীমেঁ মনকা ঝূমনা।
বন্ সঁবর পনঘটপে আ সখিয়োঁমে পীকা ঘুমনা।
ওস গহনোঁসে হো ভারী হঁস কলীকা দূমনা।
রাস বৃন্দাবনমেঁ সখিয়াঁ সঙ্গ রচানা শ্যামকা।
য়াদ আতা হৈ সখী, বহ দিল লুভানা শ্যামকা॥
য়াদ হৈ গোকুলকি রাহেঁ, তটপে হোলী—য়াদ হৈ।
শ্যামসঙ্গ্ তারোঁকি ছাঁওঁ আঁখমিচৌলী—য়াদ হৈ।
য়াদ হৈঁ বিরহাকে আঁসু, ভীজী চোলী—য়াদ হৈ।
হুক দিলকী বাবরী কোয়ল কি বোলী—য়াদ হৈ।

প্রীত করনা, না নিভানা ভূল জানা শ্যামকা :
য়াদ আতা হৈ সখী বহ দিল্ লগানা শ্যামকা

আসে যে ফিরে ফিরে কেবলই মনে সখী, শ্যামের সেই আসা মধুবনে;
মুকুট সুন্দর কণ্ঠে মালা, কলনূপুরশিঞ্জন শ্রীচরণে।
বধূর সাজে সেই শর্বরীর সাজা, ফুলের ম'ত ফোটা চাঁদিনীর ;
মেঘমৃদঙ্গের সভায় ঝলকন নয়নরঞ্জন দামিনীর ;
কুঁড়ির হওয়া ম্লান দেখে সে অফুরান রূপ রাধিকা মনোহারিণীর ;
শ্যামমিলন-আশে উধাও হওয়া সেই তিলোত্তমা কুলকামিনীর ;
প্রণয়যমুনায় ডাকা সে-উভরায় বাঁশির "আয় আয়" মূরছনে :

আসে যে ফিরে ফিরে কেবলি মনে তার গাওয়া সে-গান মৃদুগুঞ্জনে !
হাসিভরা সে-চারুচন্দ্রমার করা কালিন্দীর নীল জল চুমন ;
মলয়মর্মর-রাগিণী শুনি' সেই আবেশে পল্লবে জাগা কাঁপন ;
পরিয়া মঞ্জুল ভূষণ বন্ধুর কুঞ্জে সখীদের সঞ্চরণ ;
মর্মপুটে বরি' নর্ম শিশিরের কুসুমকলিকার সে-শিহরণ ;
বৃন্দাবনে করা রচনা শ্যামলের সে-রাসমণ্ডল হরষণে :
আসে যে ফিরে ফিরে কেবলি মনে তার চিত্তরঞ্জন নন্দনে !

পড়ে যে মনে পথ ব্রজের, নদীকূলে সে দোললীলা প্রাতে
—ভোলা কি যায় ?
তারার চাঁদোয়ার তলে সে-লুকোচুরিখেলা শ্যামের সাথে
—ভোলা কি যায় ?
অঝোর আঁখিনীরে কাঁচলি সিঞ্চিত হওয়া বিরহরাতে
—ভোলা কি যায় !
বুকের ব্যাথামিড় শোনা সে-কোকিলের সুরের সম্পাতে
—ভোলা কি যায় ?
তার সে অপরূপ প্রেম-আলিঙ্গন, পরে সে ভুলে-যাওয়া খনে খনে :
আসে যে ফিরে ফিরে মনচোরার করা সবার মন চুরি—পড়ে মনে ॥

শিল্পাৎ পরতরং নহি?

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বন্ধুবর!

আপনার সঙ্গে সাহিত্যশিল্প সম্বন্ধে আমার কিছুটা মতৈক্য থাকলেও মতানৈক্যও আছে। মতৈক্য হ'ল এই যে, শিল্পকলায় সবচেয়ে বড় কথা—ফুটে-ওঠা, যা বলতে চাই তাকে বলবার মতন ক'রে বলতে পারা, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি কানের দেউড়ি দিয়ে সরাসর মরমের অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রে তবে ক্ষান্ত হবে, শুধু শ্যাম নামের দোহাই দিলে আর যারই চলুক না কেন, তার চলবে না: তাকে চাইতেই হবে শ্যামের অশ্রুত ঝঙ্কারকে বাক্ বিভূতির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে। সে বলবে না "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" সে বলবে (গোবিন্দদাসের ঢঙে):

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ।"

ধ্বনির, মন্ত্রের সত্যকে যে তার চাইই চাই, কেন না ইন্দ্রিয়াতীতেরও চিরন্তন প্রবণতা—ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আবেশে অর্চনায় গন্ধে ধূপে ছন্দে গানে তালে সুরে আপনাকে বিলিয়ে দিতে, মিলিয়ে নিতে, ধরিয়ে দিতে। অতীন্দ্রিয়ের পরমতম অমৃতধারা ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে হ'লেও ইন্দ্রিয়ের আরতিপাত্রে শিল্পী কলালক্ষ্মীকে উদ্দেশ ক'রে অঙ্গীকার করতে পারেন (ভবভূতি—উত্তররামচরিত):

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমাদো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্প: কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণা
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।"
দুঃখ না এ সুখ?—শুধায় বিহ্বল প্রাণ আমার।
মোহ না তন্দ্রা এ? বিষ না সুরা? ঢল নামিল কার?
পরশে তব ছায় অবশ ইন্দ্রিয়ে আবেশ-সুর।
চেতনা শিহরিয়া অমনি মূরছায় সুধামধুর।

কিন্তু হ'লে হবে কি, মুস্কিল এই যে, শিল্পে ফুটে-ওঠাটা খুবই বড় কথা হ'লেও একমাত্র কথা নয় নয় নয়। ইন্দ্রিয়কে বিহ্বল করতে চাওয়া কলালক্ষ্মীর একটা আদিম এষণা বটে, কিন্তু রস বা আবেশেরও ক্রমপরিণতি আছে, প্রেরণার স্তরভেদ। সুতরাং কাকে ইন্দ্রিয়ের গোচর করা হচ্ছে সেটা শিল্পে অবান্তর হ'তে পারে না। কিন্তু আর্টফর আর্টস্ সেকিস্ট ওরফে এস্থীটরা বলছেন: কাকে বা কী প্রকাশ করছি—এসবই অবান্তর—কেমন ক'রে প্রকাশ করছি এইটাই আসল। আপনিও এই কথারই প্রতিধ্বনি করছেন দেখছি যখন বলছেন—অলডাস হাক্সলির অনবদ্য উক্তিটি সত্য নয়, যে, "Nobody can seriously be as much interested in napkins, apples and bottles as in his lover's face, or the resurrection, or the destiny of man." আপনার মূল যুক্তিটি দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু শিল্পী মানুষের ভবিষ্যৎ তথা আপেল "দুয়েরই ঊর্ধ্বে যেহেতু ও-দুয়ের গোপন আনন্দ-রহস্য তার কাছে মূর্ত হ'য়ে ওঠার বাধা থাকে না। শিল্পিপ্রবর হাতের একই তুলি দিয়ে রাজপ্রাসাদ ও কুঁড়েঘর আঁকেন"......ইত্যাদি......ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা: যেহেতু শিল্পিরাজ হচ্ছেন জীবনের মাটি হ'তে উন্মূলিত এক আশ্চর্য জহুরি—nondescript connoisseur—সেহেতু তাঁর কাছে মুড়ি মিছরির একদর হ'তে বাধা নেই।

একথা আপনার মতন যোগপন্থী কবির মুখে শুনে একটু বিস্মিত না হয়েই পারিনি। কেন—একটু বিশদ ক'রে বলি।

ধর্মের সিংহাসন-চ্যুতির পরে দুটি সাধনা রাতারাতি সে-শূন্য ময়ুর সিংহাসনে বসতে চেয়েছিল: বিজ্ঞান ও শিল্প। ফলে এ দুই সাধন ক্ষেত্রের বাণীবাহকে মানুষ প্রথমটায় অবতার, ঋষি, স্বয়ম্ভু, বিশ্বকর্মা, আরো কত কি উপাধি দিয়েছিল। এ-মাতামাতির অসারতা সব প্রথম ধ'রে ফেলেন মহামতি টলষ্টয়। কিন্তু যেমন প্রতি অত্যুক্তির বাড়াবাড়ির ফলে নিন্দোক্তিরও বাড়াবাড়ি হয়—প্রতিক্রিয়ার নৈসর্গিক ধর্মবলে—তেমনি টলষ্টয়েরও বেলায়ও ঘটেছিল। তাঁর জগবিখ্যাত What is Art বইখানির অনেক সারগর্ভ বাণীর মধ্যে তাই ভ্রান্তদর্শন

উড়ে এসে জুড়ে বসল। কিন্তু তাঁর নানা মতামতের মধ্যে অত্যুক্তি থাকলেও তিনি এমন অনেক কথাই বলেছিলেন যা অনস্বীকার্য।* তাই শিল্পকে টল্স্টয়ের একেবারে নস্যাৎ করার চেষ্টাকে অপচেষ্টা ব'লে মেনে নিয়েও বলা চলে যে, তিনি শিল্পীদের নানা উক্তির অসারতা ও আত্মম্ভরিতাকে খর্ব ক'রে শিল্পলোকের সত্যসন্ধানীদের প্রভূত উপকার করেছেন। যেমন, যখন তিনি বলেছিলেন: শিল্পীকে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, তিনি মোটেই আকাশ কিরীটি অতিমানব জাতীয় অবতার নন। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল, ব্যস, জগদ্গুরুও নন দ্রষ্টা ঋষিও নন। অলডাস হাক্সলীর ভাষায়, তাঁদের শুধু এইটুকু মাত্র বাহবা দেওয়া চলে সত্যের অপলাপ না ক'রে:

"An artist is a man equipped with better tools than those of common men—sometimes, too, with a divining rod by whose aid he discovers, in the dark, chaotic men, veins of hitherto unsuspected treasures, new meanings and values." (TEXTS AND PRETEXTS……Aldous Huxley)

(ভাবার্থ: শিল্পী সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু বেশি তোড়জোড় নিয়ে জন্মেছেন, কখনো বা এমন কোনো যাদুদণ্ড যার প্রসাদে তিনি আঁধার-উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মধ্যেও অচিন্তনীয় মুক্তামণি বা কৃতকৃত্যতার সম্ভাবনার আভাষ দিতে পারেন।)

ঠিক কথা। তাই শিল্পীকে জীবনের দিশারি বা সারথি ব'লে গণ্য করা না গেলেও মানুষের নানা সম্ভাবনার অঙ্কুরকে ফুটিয়ে তোলার মালী বলা চলে—এমন মালী যিনি মনের জমির কিছুটা খবর রাখেন; কিন্তু তাই জন্যেই আরো মানতেই হবে যে, শিল্পের উদ্ভব জীবনের মাটিছাড়া হ'তে পারে না।

একথা যদি আপনি মেনে নেন তাহ'লে এ-ও আপনাকে মানতেই

---

*মানুষ তার বল্লভের মুখ, দেবতার অবতরণ বা মানুষের নিয়তির ধ্যানে তন্ময় হ'তে পারে তোয়ালে নাসপাতি বা বোতলের ধ্যানে কিছুতেই তেমন তন্ময় হ'তে পারে না।

হবে যে, জীবনের নানা মূল্যায়ন শিল্পেও বর্তাবেই বর্তাবে। অলডাস হাক্সলি তাঁর Antic Hay উপন্যাসে এই কথাটি মোক্ষম ক'রে বলেছেন জোর দিয়েই :

"That is the stupidity of all this chatter about art for art's sake and the aesthetic emotion and the purely formal values and all that. It's only the formal relations that matter ; one subject is as good as another—that's the theory. You have only got to look at the pictures of people who pot it into practice to see that it won't do."

(ভাবার্থ : শিল্প শুধুই শিল্পের জন্যে এই সব অর্বাচীনের বুলি—আবেগকেও সাজিয়ে তোলা, রূপের মধ্যে কেবল সৌষ্ঠবই গণ্য এই জাতীয় বাজে কথা। কী ? না, রূপের কাঠামোর মধ্যে এ-রং-রেখার সঙ্গে ও-রং-রেখার সম্বন্ধ ঠিক থাকলেই হ'ল, আসলে সব বিষয় বস্তুই তুল্য-মূল্য—এই হল তাঁদের থিওরি। কিন্তু যাঁরা এই মন্ত্রের মন্ত্রী তাঁদের ছবির দিকে একটিবার খোলাচোখে দেখলেই ধরা পড়ে যায় এসব বুলি কী অসার, ফাঁপা।)

কিন্তু হ'লে হবে কি, এস্থীট বর্গীয় সোখীনেরা খুব গম্ভীরভাবেই এ-থিওরি প্রচার ক'রে থাকেন ভুলে গিয়ে যে, সৌখীন রুচিবিলাস খতিয়ে মিথ্যে ভাববিলাসই বটে। সংসারে সব কিছুরই উচ্চতর বিকাশ নিম্নতর বিকাশকে ছুয়ো দেয়। তাই অলডাস হাক্সলির কথাই সত্যি : যে, গাধার নিখুঁত চিত্রণে রসিকজন কিছুটা আনন্দ পেলেও রাফাএলের আঁকা মাদোনা বা শ্রীনন্দলাল বসুর শিবপার্বতীর সমতুল্য আনন্দ দিতে পারবে এমন দেবত্ব গাধার মধ্যে অন্ততঃ আজও স্ফুরণ লাভ করেনি। ধরুন না কেন, এ-ইন্দ্রিয়বোধ্য জগতের প্রতি স্তরেই এমন অনেক কুৎসিত বা বেসুরো উপাদান নিত্যই থাকে যারা ইন্দ্রিয় ও মনকে এত আঘাত করে যে, হাজার সহিষ্ণু হ'তে চাইলেও তাদেরকে কিছুতেই কাব্যপাংক্তেয় করা যায় না। এ-কথা অস্বীকার করা হবে গোঁয়ার্তুমি। লিখুন দেখি কেউ কংগ্রেসের রেজলুশন জলের পাম্প বা ষাঁড়ের গোবর নিয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা। এ-অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে না ব'লেই দুটি বিষয়-বস্তু যদি নিখুঁৎ ভাবে ফুটে উঠে থাকে তাহ'লেও তাদের রসমূল্য সমান হবেই হবে

সরাসর এমন বিধান দেওয়া চলে না—বিষয়বস্তুর স্বকীয় মূল্যকেও গণনার মধ্যে আনতে হবে। এ-কথার ভাষ্য: দুটি ছবি সমান সুন্দর আঁকা হলেও মহত্তর বিষয়বস্তু মহত্তর প্রেরণা দেবে, শুভ্রতর আনন্দ দেবে, স্থায়িতর পাথেয় দেবে। আপনার ও একটা কথাই নয় যে, "শিল্পীর কাছে হৃদয়ানন্দদায়িনীর মুখ ও আপেলের লালিমা সমান রসবস্তু হ'য়ে উঠতে পারে।"* পারত হয়ত, যদি শিল্পী জীবন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে একটা নিরালম্ব লম্বোদর বায়ুভুক গোছের উদ্ভট জীব হ'তে পারত। এটা তিনি কোনো দিন পারেনও নি—পারবেনও না—যদিও অহমিকাবশে বার বার তিনি নিজেকে এই ভাবেই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু চাইলে হবে কি, শিল্পী যতই হাঁকডাক করুন না কেন, তিনি মানুষই তো—জীবনের জলহাওয়া তাঁরও তো কল্পনার রস সম্ভার জোগায়। কাজেই কেমন ক'রে সুচিত্রিত বেগুন বা লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি সম্বন্ধে কবিতা তাঁকে সে-আনন্দ দেবে যে-আনন্দ তাঁকে দিল লোকললামভূতা ভিনাস ডি মিলো বা "স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী উষসী উর্বশী"? কাজেই বুঝতে পারছেন আমার "ইঙ্গিতে"র প্রবন্ধটি খুব ভেবেচিন্তেই লেখা। তাছাড়া আমার নিশানা কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, আমার লক্ষ্য—আত্মস্তবী শিল্প ও একদেশদর্শী এস্থেটিসিস্‌ম্‌—অমুক তমুক লেখক ছিলেন এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য মাত্র।

* এ বিষয়ে আর্ট-ফর-আর্ট-সেকিষ্টদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছেন একটি লাখ কথার এক কথা: "ওঁরা বলছেন যে, যদি দুটো বিষয় সমান শিল্প-নৈপুণ্যের সাথে আঁকা হয়, তাহ'লে রস হবে তুল্যমূল্য; অর্থাৎ কিনা, বিছানার চাদর বা ছারপোকার ছবি যদি চমৎকার ক'রে আঁকা হয় তবে সে দেবতার ছবির মতনই রস জোগাবে। আধুনিক থিওরি আরও বেশি দূর যায়: বলে কুৎসিত জঘন্যদের এঁকে ফোটানোই হ'ল যথার্থ শিল্প—সুন্দরকে বা সুষমাকে আঁকা—ও হ'ল démodé—সেকেলে। কিন্তু তবু আমি ছারপোকার ছবির চেয়ে দেবতার ছবিকেই বেশি ভালোবাসি, কারণ আমার মনে হয় দেবতার ছবিতে ছারপোকার ছবির চেয়ে বেশি রস আছে।" এই ছারপোকা-দেবতা-সাম্যবাদের প্রতি তাঁর সার্থক ব্যঙ্গ লক্ষ্য করবেন—কারণ এই হ'ল আমারও প্রতিপাদ্য: যে, বিষয়বস্তুর গৌরব শিল্পকে মহত্তর করে—**other things being the same.**

আসলে আর্ট-ফর-আর্টস্‌-সেকিস্টদের দৃষ্টি বিভ্রম হয়েছে কেন জানেন? তাঁরা কথার মার প্যাঁচ দিয়ে কালোকে সাদা প্রমাণ করতে চেয়েছেন ব'লে। শুধু বাগাড়ম্বরের ভেল্কিতেই তাঁরা তাঁদের কথাকে একরকম খাড়া ক'রে দাঁড় করিয়েছেন। বুদ্ধি থাকলে কুকীর্তিকেও চলনসই রকম ক'রে সম্ভ্রান্ত দাঁড় করানো যায়, বাক্‌চাতুর্যের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় অসার কথাকেও প্রথমটায় জ্ঞানবত্তার পরাকাষ্ঠা ব'লে প্রতিপন্ন করা যায় এ কথা কে না জানে? সক্রেটিসের তর্ক স্মরণ করুন। শুধু কথার মার-প্যাঁচকে তিনি শিল্পকলা হিসাবে প্রয়োগ করতেন কত সময়েই। কিন্তু ধোপে যা টেঁকে না সে-রংবাহার, ডায়ালেকৃটিক্‌সে মানুষের শ্রদ্ধা কতদিন থাকে বলুন? মুখে যতই বলি না কেন, শিল্পীর চোখে শকুনি ও ভীষ্ম, মন্থরা ও সীতা, ইয়াগো ও কর্ডেলিয়ার চরিত্র সমান আদরণীয়—কারুর চোখই কি ও-রায়ে সায় দেয়? ইয়াগোর অঙ্কন-নৈপুণ্যের দাম নেই বলি না অবশ্য, যেমন মন্থরার হিংসা বা শকুনির কাপট্যেরও চিত্রমূল্য আছেই, কিন্তু তাই ব'লে ব্রুটাস, কেণ্ট, পোর্শিয়া ভীষ্ম, সীতা এদের আনন্দদানের ক্ষমতার পাশে ইয়াগো-বর্গীয় দুঃশাসনদের আনন্দদানের ক্ষমতা পাণ্ডুর হ'য়ে যায় না কি? কার্যক্ষেত্রে আনন্দ কী রঙে ফলে উঠল তাইতেই থিওরির অগ্নিপরীক্ষা। আপনি নিজেই তো বলেছেন—পেটুকের ও শিল্পীর কাছে লাড্ডু কখনই সমান আদরনীয় হ'তে পারে না। একথা যদি সত্য হয় তবে বলবেন কি—শিল্পী লাড্ডুর "গোপন আনন্দ-রহস্যের" চিন্ময় আকাশবাণী শুনেছেন ব'লে গাইবার অধিকারী যে, তাঁর ভাবলোকে "জনম অবধি হম লাড্ডু ভখিনু, তবু রসনা না তিরপিত ভেল" পদটি বিদ্যাপতির ভাবলালিত্যের প্রতিস্পর্ধী—যেহেতু লাড্ডুর স্বাদরূপ ও শ্রীরাধার অপার্থিব রূপ দুই-ই জাত-শিল্পীর চোখে সমান মহিমায় মণ্ডিত হ'তে বাধ্য? এহেন উদার মন্ত্র শুনতে বেশ —মানে, উড়োতর্কের আখড়ায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বলবেন কি, কৃষ্ণের গান গেয়ে বেদব্যাস মানুষকে যে-অফুরন্ত আনন্দের সম্পদ দান ক'রে গেছেন সে-শ্রেণীর আনন্দ মিলতে পারে যদি নিখুঁৎ সুরে তালে গাই—

(ও ভাই,) মণ্ডা খেয়ে ষণ্ডা হ'লে কৃষ্ণ পাবি সদ্য :
(কারণ) মণ্ডাও যে কৃষ্ণ—এ যে লজিক অনবদ্য।

না, বন্ধুবর! যতই কেন না মোহন ছাঁদে উড়োতার্কিক ডায়ালিক্‌টিক্‌-সের মালা গাঁথুন—এ হবার নয়। রসের সমীকরণে মণ্ডা = কুষ্ঠ, এ একটা কথাই নয়। মানুষের আনন্দ-আহরণ করার পদ্ধতি "বিচিত্র"—মানি, কিন্তু এত উদ্ভট নিশ্চয়ই নয়। আনন্দ রসের প্রেরণার বা ভাব প্রকাশের জাতিভেদ না থেকেই পারে না। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আনন্দ আর অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার আনন্দ কখনই সমশ্রেণীর রসসঞ্চার করতে পারে না। স্থূল ও সূক্ষ্মের অভিব্যক্তিতে গভীর ভেদ আছে—এ হ'ল মানব-চেতনার সনাতন এজাহার। সুতরাং অন্য সব কিছুরই মতন চিত্রকলায়ও আঁকার-ভঙ্গিই শেষ কথা হ'তে পারে না—কী আঁকা হচ্ছে সেটাও বিচার্য। Le style est l' homme même * ব'লে শুধু মানুষের না, আর্টেরও ইতি করা যায় না।

আমায় ভুল বুঝবেন না কিন্তু। সামান্যকে নগণ্যকে শিল্পকলায় রূপ দেওয়ার আমি বিরোধী নই, আমি কেবল বলছি, জীবনে সামান্য-অসামান্যের মধ্যে যে-রসভেদ স্তরভেদ মূল্যভেদ আছে তাকে শিল্পী অস্বীকার করতে পারেন না। যা কিছু আছে তাকেই রূপ দেবার এক্তিয়ার তাঁর আছে—মানি, এবং স্বভাব-শিল্পীর তুলিতে দৃশ্যতঃ সামান্যের মধ্যেও অসামান্যতার আভাষ নিত্যই ফুটে ওঠে একথাও মানা চলে, কিন্তু তাই ব'লে একথা কখনই সত্য নয় যে, শিল্পীর তুলিতে ধুলোবালিও নীহারিকা হ'তে পারে বা ডাঁটা চচ্চড়ির কবিতা পদ্ম প্রশস্তির কবিতার সমকক্ষ হ'তে পারে। আর পারে না এইজন্যেই যে, মানব-হৃদয় এমনি ছাঁদে গড়া যে, যুগে যুগে বিপুলের অনন্তের বাঁশি লোকোত্তর মানুষের অভীপ্সাকে যে-ভাবে ডাক দিয়েছে আটপৌরে আশার জাঁতাজয়ধ্বনি তাকে সে-ভাবে ডাক দিতে পারে নি। আপনি কবি, তাই আপনারই দোহাই দিয়ে বলি—যে-আপনি লিখেছিলেন :

"আজ আমাদের স্বপ্ন চোখে,
নবীন তরুণ স্বপ্ন লোকে
দেখ্‌ছে কোথায় জাগ্‌ল প্রবাল-দ্বীপ,

* শৈলীই হচ্ছে মানুষের সবটা Georges Louis Lectere de Buffon.

আজ আমাদের জীবন-তরী
চির্‌বে লহর সিন্ধু মরি,
আন্‌তে সাপের মাথার মণির টিপ।"*

সেই আপনি না-হয় চেষ্টা ক'রে দেখুন না একবার গঙ্গাফড়িং Five years Plan বা বীচামের পিল্‌ নিয়ে একটি কবিতা লিখতে যা প'ড়ে বুকের রক্ত এমনি তালেই দুলে ওঠে। যদি পারেন আমি সাষ্টাঙ্গে আপনাকে প্রণিপাত ক'রে বলব—

আমার চোখে আজকে তুমি
'পিল্'কে কবিতায় কুসুমি'
কেমন ক'রে তুল্‌লে যাদুকর!
ম্যালেরিয়ায় ক্লিষ্ট হিয়া
উঠল পিল্‌-এ উচ্ছ্বাসিয়া!!
'পিল্'-ও হ'ল বাণীর স্বয়ম্বর!!!

এ ঠাট্টা? বটে? আর্ট-ফর আর্ট-সেকিস্টরা বড় গলা ক'রেই বলছেন না কি যে, "One subject is as good as another?" এ-বুলিটি যদি তাঁদের কথার-কথাই না হয়—অর্থাৎ যদি জীবনেও এ-নীতি সত্য হয় তবে আপনাকে মানতেই হবে যে, সব কিছুরই মধ্যেই যখন শিল্পী সৌন্দর্য দেখতে পান তখন বীচামের পিলের মধ্যেও তাকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেখাতে পারবেনই পারবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: পারেন কি? (টেক্‌নিক্যাল কীর্তিতে পারেন হয়ত, কিন্তু রস-সৃষ্টিতে? টেক্‌নিকাল কীর্তি ও রসসৃষ্টি তো এক বস্তু নয়।)

এসব তর্কের কিন্তু একটা মুস্কিল এই যে, একদিক দিয়ে এ বন্ধ্যা। কারণ এ-সব ততক্ষণ "কথা-কথা-কথা"ই থেকে যায় যতক্ষণ না হাতে-কলমে থিওরিকে ফলিয়ে দেখানো যায়। ওয়ার্ডসবর্থ বলতেন বড় গলা ক'রেই যে, বিজ্ঞানের "তুচ্ছাতিতুচ্ছ আবিষ্কারও" কাব্যের বিষয়ীভূত হ'তে পারে। থিওরি অনবদ্য। কিন্তু কার্যতঃ যতক্ষণ কেউ বৈজ্ঞানিক কবিতা লিখে আমাদের হিল্লোলিত ক'রে না তুলছেন ততক্ষণ এ-বিষয়ে আমরা

* "ইন্দ্রধনু"......শ্রীসুরেশচন্দ্র

থাকবই যে-তিমিরে সে-তিমিরে। কি জানেন? বাকচাতুর্যের উত্তেজনা, বাস্তব হ'লেও ভুরি ভোজন নিছক কাল্পনিক, অর্থাৎ, কথা শুধু চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করতেই পারে ক্ষুধাকে শান্ত করতে পারে না। তাই বিষয়বস্তুর সাম্যবাদ নিয়ে যতই হাঁকডাক করি না কেন, গোলাপফুল চাঁদ প্রণয় নীলাকাশ নিয়ে মানুষ আবহমানকাল কবিতা লিখে এসেছে এবং চিরদিনই লিখবে নানা ছাঁদে, কিন্তু ব্যাঙাচির লেজ, মাছের কাঁটা, লাউ-চচ্চড়ি নিয়ে লিখবে বড় জোর হাস্যরসের ছড়া।

আপনি কিন্তু গা-জোয়ারি ঢঙেই বলছেন যে, অলডাস হাক্সলির একথা মিথ্যা যে, "No body can seriously be as interested in napkins, apples and bottles (শ্রীঅরবিন্দের ব্যঙ্গ স্মরণীয় "bug and bedsheet") as in his lover's face, or the resurrection or the destiny of man." আমার অবাক লাগে সত্যিই যে, এ-ঐতিহাসিক স্বতঃসিদ্ধ সত্যের কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেতে পারে, বলতে পারে গম্ভীর ভাবে যে, আঁশচুপড়ির গন্ধ বা নাসপাতির স্বাদের ধ্যানে শিল্পী তেমন তন্ময় হ'য়ে কবিতা লিখতে পারেন যেমন পারেন তাঁর বল্লভের মুখ বা করুণার আনন্দের ধ্যানে। কিন্তু আপনি শুধু অম্লান বদনে নয়, স-দাপটেই বলছেন: "শিল্পীর কাছে Lover's face ও apple সমানই রসবস্তু হ'য়ে উঠতে পারে।" কিন্তু পারে কি সত্যই? রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আমাদের মতাবলম্বী। তাঁর "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

"যে-মন বরণীয়কে বরণ ক'রে নেয় তার শুচিবায়ুর পরিচয় দিই? সজনে ফুলে সৌন্দর্যের অভাব নেই। তবু ঋতুরাজের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রপাঠে কবিরা সজনে ফুলের নাম করেন না। ও যে আমাদের খাদ্য, এই খর্বতায় কবির কাছেও সজনে আপন ফুলের যাথার্থ্য হারাল।" তাই ফের বলি—এ হয় না, হ'তে পারে না। বিষয়বস্তুর মূল্য থাকবেই! শিল্পী হাজার বড় হোন না কেন, ছারপোকার ছবিকে শ্রীরাধার ছবির রস-পাংক্তেয় করতে পারেন না। তিনি খানিক দূর অবধি যেতে পারেন বটে—যা দৃশ্যতঃ সাধারণ তার মধ্যে অসাধারণত্ব খানিকটা ফলিয়ে তুলে—কিন্তু তাই ব'লে প্রতিভারও সীমা আছেই। আর এ-সীমা খানিকটা

অন্ততঃ নির্দিষ্ট হবেই ঐ বিষয়বস্তু দিয়ে। যা মূলতঃ কুৎসিত, জঘন্য তার চিত্রণে বড় জোর এক ধরণের জুগুপ্সা-রসের আমদানি করা যেতে পারে (এবং রসের জগতে এরও কিছু মূল্য থাকতে পারে) কিন্তু তাই ব'লে সে-ছবি কখনই পরম সুন্দরের আঁকা ছবির রসমূল্যের সমান হ'তে পারবে না। এই জন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "ছারপোকার মধ্যে সে-রস নেই যা আছে দেবতার মধ্যে।" পরমহংসদেব বলতেন: "সবই ভগবানের প্রকাশ হ'লেও সবার মধ্যে ভগবানের শক্তি সমভাবে প্রকাশ পায় না। সূর্য মাটিতেও প্রকাশ গাছেও প্রকাশ কিন্তু আর্শিতে বেশি প্রকাশ।" তাই যে-বিষয়বস্তু আর্শির মতন সৌন্দর্যকে বেশি প্রকাশ করতে পারে তার সুন্দর চিত্রণে বেশি রস ফুটবেই ফুটবে।

আমার সঙ্গীতের কথা তুলে কিন্তু আপনি ভারি বিপদে পড়ে গেছেন। কারণ এখানে আপনাকে অতি সহজেই চেপে ধরবার হাতল আমাকে আপনিই জুগিয়ে দিয়েছেন। একদিন ছিল যখন আমিও বলতাম: সঙ্গীত সঙ্গীতেরই জন্য—তার মানে যা-ই হোক। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সঙ্গীত একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রণালীমাত্র—যার মাধ্যমে নানা শ্রেণীর প্রেরণা ঝল্‌কে ওঠে মনের নানা অবস্থায় বা মুডে—অর্থাৎ সঙ্গীত আমার কাছে আজ বিশেষ ক'রেই উপায় মাত্র—উপেয় নয়, means to an end মাত্র, end নয়। আজ আমি দেখি—"বাঁকে ভিতবন নয়না রসিলে" শ্রেণীর বিলোল ঠুংরির সঙ্গে তানসেনের "বংশীধর পিনাকধর" শ্রেণীর ধ্যান সঙ্গীতের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। আজ আমি দেখি—"কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আসলে প্রাতে পুষ্পচোর"—শ্রেণীর গজলের সঙ্গে "নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপ রাশি"—শ্রেণীর শ্যামা সঙ্গীতের তুলনা করাও বিড়ম্বনা। আজ "যেমন আছ তেমনি থাক আবার কেন নয়না হানো" শ্রেণীর ঠুন্‌কো গানে আর সে-রস পাই না যে-রস পাই—দ্বিজেন্দ্রলালের "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায় পথে পথে ওই নদীয়ায়" গানে। এক কথায়, সঙ্গীতে আমার গানের ধারণা ও ঢং-এর মধ্যে যে-বিপ্লব ঘটে গেছে ও যে-দিকে উত্তরোত্তর বিকাশ হচ্ছে সেটা "সঙ্গীত সঙ্গীতেরই জন্য" নীতির ঠিক উল্টো মুখেই চলছে হু হু ক'রে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না কিন্তু। আমি বলি না যে, "আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়" বা "ভালোবেসে ভালো কাঁদালে"—শ্রেণীর গানের উচ্ছেদই আমি মনে-প্রাণে কামনা করি। জৈবলীলায় ছোট-বড় ভেদ থাকবেই চিরদিন। কারণ ছোট না থাকলে বড় তার মহত্ত্বের মর্যাদাই পেত না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "নগণ্যেরাই গণ্যের গণ্যতা রক্ষা করিয়া থাকেন।" তাই আমি এ-সব গান গাওয়ার বিরোধী নই, বা আমি নিজে এসব গানে আনন্দ পাই না ব'লেই বলতে চাই না যে, কারুরই চুট্‌কি গানে আনন্দ পাওয়া উচিত নয়। এ-ও আমি জানি যে, নানা মুডে নানা চুট্‌কি জিনিসেও রসের চকিত চমক মেলে। কিন্তু তবু একটি চিরন্তন সত্য এই যে, জীবনের সঙ্গে আর্টের মিল আছে এইখানে যে, জীবনের ম'ত শিল্পেও উপরভাসা ও গভীর, চক্‌চকে ও সুন্দর, মেকি ও সাঁচ্চা হ'ল আমড়া ও অমৃত কাজেই এদের একদর হতেই পারে না—যদিও এস্থীটরা বলছেন—পারে—প্রকাশভঙ্গির দৌলতে। কিন্তু কেমন ক'রে পারবে বলুন?—যখন তাকেই বলি আমড়া যার পুঁজি সামান্য, আনন্দদানের ক্ষমতা ক্ষণিক, তৃপ্তি অগভীর, আর অমৃত বলি তাকে যার সম্বল অসামান্য, আনন্দ স্থায়ী, তৃপ্তি গভীর। এ-কথা যদি জীবনের ক্ষেত্রে খাটে তবে, শিল্পের ক্ষেত্রে তো আরো বেশি খাটবে। কারণ জীবন ঢের বেশি পাঁচমিশালি ব'লে জীবনে ছোটও আমাদের অনেক সময় বাঁধে। কিন্তু শিল্পের প্রেরণা আসে ঊর্ধ্বলোক থেকে। তাই শিল্পের সার্থকতা ততই গভীর হয় যত সে হয় ঊর্ধ্বমুখী। জানি এখানে ইদানীন্তন আর্টের ব্যাখ্যা দিতে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, সামান্যকে নিয়েও তো এ-যুগের আর্ট বড় হয়েছে—যার নাম রিয়ালিস্‌ম্। রিয়ালিস্‌মের রহস্য ও স্বরূপ নিয়ে অন্যত্র আমি দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি যে, রিয়ালিস্‌ম্‌ও বড় হয়েছে চিত্রীর অসামান্য প্রেমেরই দরুণ, চিত্রিত বস্তুর নগণ্যতার দরুণ নয়। সত্য শিল্পে খানিকটা ক্ষুধা মেটে শিল্প শিল্পের জন্যে ব'লেই নয়, মেটে এইজন্যে যে, সত্য শিল্প প্রতিপদে আমাদের আভাষ দেয় এক মহৎ প্রেমের—যে-প্রেম "can hear the rustling of a wing"; মূর্ত ক'রে তোলে এক অধরা সত্যকে যে, "Imagination is eternity"—যার জন্যে শ্রেষ্ঠ মন যুগে যুগে চিরতৃষিত। যে-শিল্প এ-প্রচ্ছন্নসত্তার

স্পর্শ যত নিবিড়ভাবে পেয়েছে, যত স্পন্দিত আবেগে ঝঙ্কারে মন্ত্রে মূর্ছনায় চিনিয়েছে সে-শিল্প তত বড়, তত মহিমময়। আর্ট ফর-আর্টস্ সেকিস্টরা শিল্পের ঊর্ধ্বাভিসারকে ভঙ্গিসর্বস্ব ক'রে মধ্য পথে খণ্ডিত করতে চান ব'লেই আমার এত আপত্তি।

আর্ট-ফর-আর্টস্-সেকিস্টদের দেউলে মনোভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাবেন খ্যাতনামা এস্থীট T. S. Eliot-এর আর্ট সম্বন্ধে মতামত পড়লে। তিনি তাঁর Sacred Wood নামক পুস্তকে অম্লান বদনে কাব্য সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়েছেন; Poetry is a superior amusement······un amusement pour distraire les honnetês gens." যদি কাব্যের শেষ কথা হ'ত এলিয়েটের-উপাস্য কতিপয়। সজ্জনের ক্ষণিক চিত্ত-বিনোদন তাহলে কি সত্যি শিল্পীর কীর্তিকে মহনীয় বরণীয় উপাধি দেওয়া সম্ভব হত, না বলা চলত তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল? না, বন্ধুবর? আর্ট-ফর-আর্টস্- সেকিস্টদের স্বাভাবিক তথা অনিবার্য পরিণতি এই ক্ষণবিলাসের তুচ্ছতা—কেন না জীবনের ঊর্ধ্বতর ধ্রুব লোকের অস্তিত্বকে পাশ কাটিয়ে চলা যে-শিল্পিয়ানার লক্ষ্য তার মুখে কখনই ফুটবে না রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অনুভূতি তথা অধরা স্বপ্ন:

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে,
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।

উপনিষদের একটি গভীর বাণী এই যে পরম পুরুষের দুটি রূপ মূর্ত ও অমূর্ত এবং অমূর্তই মূর্তের পরিপূরক। শিল্পিয়ানা এই অমূর্ততে পাশ কাটিয়ে স্বয়ংসিদ্ধ হ'তে চায় ব'লেই জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজনরা তার মধ্যে মাত্র একটু আংশিক সুখ ছাড়া আর কোনো মহাপ্রসাদ শুধু যে পায় নি তাই নয়, তার প্রত্যাশাও করেন নি কোনোদিন। ইতি।

পুনশ্চ: এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, আজ অবধি শিল্প শিল্পসর্বস্ব হ'য়ে যত বড়ই হোক্ না কেন, ঊর্ধ্বলোকের মহনীয় আলোর নিম্নাবতরণে সে হবে ঢের বেশি গভীর বিচিত্র ও উজ্জ্বল। আর্ট-ফর-আর্টস্

সেকিস্টরা বলেন শিল্পকে মধ্য পথে থম্‌কে যেতে। কিন্তু যোগী কবির বাণী হচ্ছে ঃ

We must rise or we must fall ;
Love can know middle• way.
If the great life do not call,
There is sadness and decay.*
পাতিব আসন ব্যোমে অথবা ধূলায়
থামে না প্রেমেব বথ কভু মধ্যপথে।
মহিয়ান্ জীবন না ডাকে যদি হায,
ক্ষয় অবসাদ শুধু লভিব মরতে।

কিন্তু তাই ব'লে শিল্পিয়ানাকেও (aestheticism) পুরোপুরি বাতিল করা যায় না কেন না তার মধ্যেও কিছুটা সত্য আছে। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry গ্রন্থে বিশদ ক'রেই দেখিয়েছেন বিগত যুগের শিল্পসর্বস্ব কবিরাও কী ভাবে ও কতখানি আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন আমাদের ঊর্ধ্ব-প্রগতির সহায় হ'য়ে। লিখছেন তিনি যে, যদিও বিগত যুগের শিল্পসর্বস্ব কবিরা আমাদের complete poetic synthesis-এর অবদান দিতে পারেন নি, তবু তাঁরা জীবনকে একটা নতুন চোখে দেখার দীক্ষা দিয়েছেন বৈ কি, মানুষের জীবন ও অন্তরাত্মা এবং অসীম ও চিরন্তনের মধ্যে একটি স্বর্ণসেতু গড়েছেন বৈ কি। They have not, indeed, done all the has to be done, or given the complete poetic synthesis and fusion. Their work has been to create a new manner of seeing life, to build bridges of visioned light and rhythm between the finite and the eternal and the mind and soul and life of man.) কিন্তু বলছেন ঋষি কবি—অনাগত যুগের কবিদের যেতে হবে আরো অনেক এগিয়ে, হ'তে হবে আরো গভীরের ডুবারি, মাঝপথে থেমে গেলে চলবে না, কারণ তা'হলে মানুষের বৃহত্তর স্বরূপ ও বিশ্বজনীন পরমাত্মার শক্তির অবতরণ হবে না—যার প্রার্থনা বেজে উঠেছে উপনিষদে "আবিরাবীর্ম এধি"

*A. Er·········Warning কবিতা।

—অর্থাৎ যে মহনীয় অমর্ত্য চেতনা স্বপ্রকাশ তাঁকে আবাহন করতে হবে আমাদের মর্ত্য চেতনাকে পূর্ণ সার্থক করতে। শ্রীঅরবিন্দের স্পন্দমান মন্ত্র বাণীর তর্জমা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, তাই তাঁর মূল উক্তিটি উদ্ধৃত করি এখানে: "The future poetry is not to stay in their achievement; it has yet to step from these first fields into new and yet greater ranges, to fathom all the depths yet unplumbed, to complete what has been left half-done or not yet done, to bring all it can of the power of man's greater self and the universal spirit into a broadened and even the broadest possible of all life"

শিল্পীরা সচরাচর "রূপ"-কে BEAUTY নাম দিয়ে ভগবানের বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেন হৃদয়ের রূপতৃষ্ণার আরাধ্যরূপে বরণ ক'রে। এ-আবাহন যদি তাঁরা করতেন মন মুখ এক ক'রে তাহ'লে হয়ত বেশি ক্ষতি হ'ত না, কিন্তু দুঃখ এই যে, সর্বত্র না হ'লেও অনেক ক্ষেত্রেই 'বিউটি" হ'য়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে একটা কথার কথা—একটা ধোঁয়াটে ধুম ধড়াক্কা—তাঁরা বলেন বড় গলা ক'রেই যে, এই ধূমাবতীর দিকে মুখ ক'রে মানুষ শিল্পে অফুরন্ত রঙের ফুলঝুরি কাটতে কাটতেই কৈবল্য লাভ করবে। এ-লক্ষ্যমুখী হ'য়ে তাঁরা যে ষোলো আনাই ব্যর্থ হয়েছেন এমন কথা কেউই বলে না অবশ্য। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ করা চলে যে, যখন শিল্পিয়ানা শিল্পসাধকের একমাত্র উপাস্য হ'য়ে ওঠে তখন সে-শিল্প হ'য়ে ওঠে সৌখীন বাবুয়ানা, রক্তহীন অবক্ষয়ের উদ্গাতা—যার নাম decadent art. এ অধোগতির মূল কারণ এই যে, শিল্পে ভগবানের দৈব চিরন্তনতার কোনো স্থান না থাকলে সে কিছুতেই পুরোপুরি কৃতকৃত্য হ'তে পারে না—ঊর্ধ্ব-লোকের প্রেরণার রসদের অভাবে ক্রমশঃ মিইয়ে পড়ে। তাই তো শিল্পে পরমা তৃপ্তি মেলে না, মিলতে পারে না—শেলি কি সাধে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

এ-অতৃপ্তির উদ্ভব ভাগবত অরূপেরই সনাতন অভীপ্সা থেকে, অচিনের চিরন্তন আহ্বান থেকে। শুধু রূপে যদি পূর্ণ সার্থকতা থাকত তাহ'লে এ-বিষাদ-পূজা, অতৃপ্তি-বিলাস শ্রেষ্ঠ আর্টে ঠাঁই পেত না। ইতি।

তর্পণ

নীলকণ্ঠ

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি পেয়ে মনে হ'ল শ্রীকুমার বাবুর সম্বন্ধে কিছু লিখি স্মৃতিচারণী ঢঙে, কেন না এ-ঢঙ তুমি ভালোবাসো। তা ছাড়া স্মৃতিচারণী লিপিকায় ব্যক্তিগত অনেক কিছু লেখা যায় যা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। তাই অবহিত হও।

তুমি লিখেছ—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষপ্রয়াণের জন্যে আমি মনে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছি। ভুল লেখো নি, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে আমার শিক্ষক, উপদেষ্টা, বন্ধু, দরদী গুণগ্রাহী। আমার নানামুখী বৃত্তির গুণমূল্য দিতে তিনি এত আনন্দ পেতেন যে, আমাকে সময়ে সময়ে সত্যিই কুণ্ঠিত হতে হত।

আজ কিছু লিখব তাঁর পুণ্য স্মৃতিতর্পণে,—তাঁর কাছ থেকে আমি কী পেয়েছি, কী শিখেছি।

তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন এতে আমি দুঃখ পেয়েছি বৈকি—বিশেষ এই জন্যে যে, অতঃপর, আর তাঁর স্নিগ্ধ আশীর্বাদী আবির্ভাব হবে না আমার নানা গানের আসরে, দেখব না আর আমার ভজন শুনে তাঁর চোখে প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধ দীপ্তি। তিনি তো শুধু প্রবুদ্ধ সমজদার ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত। তাই আমি ব্যথিত হয়েছি একথা কবুল করতে একটুও কুণ্ঠিত নই গীতার ধমক মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যে, গতাসু বা জীবিত কারুর জন্যেই তত্ত্বদর্শীরা শোক করেন না যেহেতু দেহ নশ্বর হলেও আত্মা অমর।

এ-জগতে আমরা বাস করি নানা স্নেহসঙ্গে আনন্দ পেতে ও স্নেহাস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজনদের সাধ্যমত আনন্দ দিতে। শ্রীকুমার বাবু ১৯১৩ থেকে আজ পর্যন্ত—প্রায় ষাট বৎসর—আমাকে বহু আনন্দ দিয়েছেন, আমিও তাঁকে আমার গান লেখা ও ভক্তিশ্রদ্ধার মাধ্যমে কিছুটা আনন্দ দিয়েছি—যে-কথা তিনি তাঁর ভাবগম্ভীর স্নেহসজল ভাষায় বরাবরই স্বীকার করেছেন।

আমাদের তিনি ছিলেন প্রিয় শিক্ষক—প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর ছোঁয়াচে আমার মনে যেন আরো বেশি করে জেগে উঠেছিল বহুপাঠী হবার উচ্চাশা। সমর্সেট মম বলেছেন—এ-দুঃখময় জগতে একটি অন্ততঃ অপ্রতিবাদ্য সুখের আকর আছে যা অফুরন্ত—তার নাম পাঠানুরাগ (love of books)। শ্রীকুমারবাবু ছিলেন বহুপাঠী (এটি মহাভারতের বিশেষণ, কেমন সুন্দর বলো তো ?) বই পড়তে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল—রাশি রাশি বই পড়তেন তিনি কী যে আনন্দে! বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন—স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। আমরা প্রায়ই সসম্ভ্রমে বলতাম : "Gold medalist রে! সাবধান।"

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য ছাত্র বলে যাঁরা মান পান, উত্তরজীবনে তাঁরা প্রায়ই নগণ্য হয়ে দাঁড়ান। এর একটা কারণ—তাঁরা জীবনে ছোটখাট সুখ বিলাস ধনমানের কাঙাল হয়ে বহুপাঠী হবার সাধনাকে পাশ কাটিয়ে সস্তায় নাম কিনতে চান বা বাহ্য ভোগকেই মহনীয় সাহিত্যশিল্প-দর্শনচর্চার চেয়ে বেশি বরণীয় মনে ক'রে থাকেন।

শ্রীকুমার বাবু এদের দলে ভরতি হননি কোনোদিনই। ছাত্রাবস্থায়ও যেমন বহুপাঠী ছিলেন বৃদ্ধ বয়সেও ঠিক তেমনই গ্রন্থানুরাগী ছিলেন—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে bibliophil।

আমাদের দেশে গ্রন্থানুরাগীর আদর চিরদিনই ছিল এবং (আশা করি) এখনও লুপ্ত হয় নি। শ্রীকুমার বাবু তাই তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাবেন মনে হয় তাঁর বহুপাঠী সাধনার জন্যে।

ছাত্রদের সঙ্গে তিনি আদান প্রদান করতেন শুধু স্নিগ্ধ সৌজন্যের আলোয় নয়, সহজ স্নেহের হেমপ্রভায়। তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করেছেন সস্নেহে। এ কম কথা নয়—ছাত্রদের ভালোবাসতে পারা। এ যে পারে সে আপনি পারে—যার হৃদয়ে স্নেহের ধারা উপর থেকে নামে নি সে নীচেকেও তার সুধাসারে উর্বর করতে পারে পারে না। কবি নিশিকান্তের একটি সুন্দর গানে আছে :

কেমন ক'রে বলব তোমায় কেন বাজাই অনুরাগের বীণা ?
জানি শুধুই ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি না জানি না।

বস্তুতঃ সব প্রতিভা তথা প্রেরণার সম্বন্ধেই একথা খাটে। যার প্রতিভা আছে সে সৃষ্টি করে—কেন করে জানো না কোনদিনই—করার তাগিদেই করে, প্রেরণা পেলে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারে না ব'লে। আকাশের বৃষ্টিধারার মতনই নেমে আসে স্নেহের অমৃতধারা—তাই কথায় বলে—স্নেহ নিম্নগামী। শ্রীকুমার বাবুর কাছে গেলে এই কথাই মনে হ'ত, শুধু আমার নয়—সকলেরই। তিনি সম্ভ্রান্ত শিক্ষক একথা ভুলে যেতাম তাঁর দরদী বন্ধুরূপের কমনীয়তায়।

আর শুধু ছাত্রদের প্রতিই নয়—সকলের প্রতিই তিনি সমান প্রীতিমান্ ছিলেন সহজিয়া ঢঙে। সদাপ্রসন্ন ছিলেন তিনি স্বভাবে। তাই কতশত সভাসমিতিতে যে তিনি যেতেন বলবামাত্রই—কত কনফারেন্সের সভাপতি হ'তেন—(শুধু বাংলাদেশে নয়—বাংলার বাইরেও)—তার অবধি নেই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। "না বলতে তিনি পারতেন না—শুধু ছাত্রদের নয়—কাউকেই না।" কয়েক বৎসর আগে দক্ষিণে কোথায় এইভাবে সভাপতি হ'তে গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে ক্লান্তদেহে এসেছিলেন পুনায় আমাদের মন্দিরে—"ইন্দিরা নিলয়ে"। তাঁকে অতিথি পেয়ে আমাদের সে কী আনন্দ! তাঁরও সে কী আনন্দ মন্দিরে আমার ভজন কীর্তন ভাষণ শুনে!

আমার গানের এমন অকৃত্রিম অনুরাগী বাংলাদেশে হয়ত আরো আছেন, কিন্তু প্রবুদ্ধভাবে আমার সুরকৃতির বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করবার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন উচ্চাধিকারী। বোধহয় একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মোহিতলালের পরে এমন গভীরদর্শী ও আত্মপ্রত্যয়ী সমালোচক বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। তাই তিনি তাঁর স্বভাবের তাগিদেই আমার নানা বৃত্তিকে মান দিতেন তাঁর নিশ্চিতবোধের সহজ উচ্ছ্বাসে। কোনো দিনই ভুলতে পারি না সংস্কৃত কলেজে একদা আমার গান ও ভাষণের পরে তাঁর আমাকে অভিনন্দিত করা "সর্বতোমুখী প্রতিভা" বলে।

আমার শুধু গানেরই নয়, সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন তিনি প্রথম থেকেই। তাঁর প্রখ্যাত বিপুলকায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে তিনি আমার যৌবনে লেখা উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করেছিলেন সাত পৃষ্ঠা

ধ'রে! আমার নানা ত্রুটিও দেখিয়েছিলেন অবশ্য, কিন্তু মূলতঃ তিনি ছিলেন গুণদর্শী সমালোচক, ব্রণান্বেষী ক্রিটিক নয়। তবু আজও ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে যে, তিনি সে যুগেও আমার গুণবিচারে এমন সোচ্চার হ'তে পেরেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া ঢঙে। তাই তো তিনি আর সব সমালোচক কী বলবে, সায় দেবে কি না দেবে, এ দুর্ভাবনা রেখে অকুতোভয়েই লিখতে পেরেছিলেন ১৩৫৪ সালে [৩৭৬ পৃষ্ঠা]:

"দিলীপকুমারের মন একদিকে যেমন সমাজ ও হৃদয়সমস্যার আলোচনায়, যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণ নিপুণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি কাব্য ও ললিতকলার রসোপলব্ধির দিক দিয়াও নিজেকে সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই চিন্তাশীলতা ও নিবিড় রসোপলব্ধির যুগল মিলন তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। নিছক কালচারের দিক দিয়া উপন্যাস সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আছেন কিনা সন্দেহ এবং এই কালচার তাঁহার উপন্যাসের কেবল বহিরাবরণ বা বাহ্যসৌষ্ঠব নয়—কেন্দ্রীভূত সারাংশ, আবেদনের মূল সুর।"

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রবুদ্ধ সমালোচনায়, আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। তাঁকে লিখে জানিয়েছিলাম যে, আমি অর্জুনের মতনই "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।" আজ আমার উপন্যাসের চাহিদা প্রবর্ধমান, কিন্তু সেযুগে আমাকে বরণ করতেন একটি বিশিষ্ট সীমিত পাঠকগোষ্ঠী যাঁরা উপন্যাসে শুধু হাল্কারস পেয়েই তৃপ্ত হতেন না—বা কথাসাহিত্যে শুধু গল্প ছাড়া অন্য কোনো গভীর রসকে বর্জনীয় মনে করতেন না।

তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে আরো অনেক কিছু লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত হাতে আরো অনেক কাজ পড়ে গেছে। তাই আর দু-একটি কথা ব'লেই আমার এ তর্পণের সমাপ্তি টানব।

জীবনে আমরা চলি প্রায়ই দিনগতপাপক্ষয় করে। অর্থাৎ চলি চলতে হয় বলেই। বৈদেশিক বুদ্ধিবাদীরা আরো সঘনে বলেন: এ-জীবনটাকে যতটা পারো ভোগ করে চলো—এর পরে কী আছে সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে। ইন্দ্রিয় ও মনোজগতের বাইরে যা আছে সবই ঝাপসা। যে-বেসাতিতে নগদ বিদায় মেলে তারই তল্পি বয়ে চলো। এক কথায়

ঐহিকতাকেই মনে প্রাণে বরণ করো বাস্তব বলে, বাকি সব অবাস্তব, কবিকল্পনা ভাববিলাস, আকাশকুসুম।”

শ্রীকুমার বাবু এ-শ্রেণীর স্থূল বস্তুবাদী বা ভোগবাদী ছিলেন না কোনোদিনই। স্বভাবে তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী ধার্মিক, তাই দৃশ্য জগৎকেই শেষ সত্য ব'লে আঁকড়ে ধরতে পারেন নি—এ-জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কী, কোন্ পথে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছতে পারে, কোন্ মন্ত্রে নৈশ্চিত্যের প্রসাদ পেয়ে অভী হ'তে পারে, কোন্ দীক্ষায় অপরাবিদ্যার বহির্বাটীকে পাশ কাটিয়ে পরা প্রজ্ঞার অন্দরমহলের ছাড়পত্র পেতে পারে—এ সবই জানতে চাইতেন। এককথায়, তিনি ছিলেন স্বভাবে আর্ত কিন্তু অর্থার্থী নয়, ছিলেন জিজ্ঞাসু, ধর্মার্থী। তাই তিনি গুরুবাদকে অকুণ্ঠে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন নিজেকে পরম ভাগবত সীতারাম ওঙ্কারনাথের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে।

এ-কৃতিত্ব তথা সৎসাহস এ-যুগে সহজসাধ্য নয়—বিশেষ করে বিদ্বৎসমাজে—বুদ্ধিপ্রবণ ভাবুকেব পক্ষে। কারণ এ-যুগে বিজ্ঞানের জয়জয়কার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে (বিশেষ ক'রে) বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে নাস্তিক্য বা অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ-স্রোতের পালটা স্রোত আসবেই আসবে—কারণ মানুষ ইহলোকসর্বস্ব হয়ে কখনই তৃপ্ত হ'তে পারে না—নাল্পে সুখমস্তি—অসীম অশেষের সঙ্গে রাখীবন্ধন না হলে তার নিস্তার নেই, এই-ই হল সত্যের সত্য। ধন-জন-যশ-মান গৃহসুখ দেহবিলাস—এসবে মানবাত্মার মুক্তি নেই, নেই নেই। মুক্তি মিলতে পাবে কেবল অধ্যাত্ম জ্ঞানে ওরফে পরা ভক্তিতে। শ্রীকুমার বাবু ভারতের এ-শাশ্বতবাণীকে বিশ্বাস করতেন, তাই মানতেন উপনিষদেব মহাকাব্য: “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ”—শুধু ভগবৎ-মিলনেই মানুষ জীবন্মুক্তের পদবী লাভ করতে পারে লক্ষ মোহবন্ধনের মায়া কাটিয়ে।

এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তিনি আমার শুধু বুদ্ধিবাদী গবেষণাকে নয়—অধ্যাত্ম সাধনাকেও সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করেছিলেন, হয়েছিলেন আমার ভক্তিসঙ্গীতের অনুরাগী, ধর্মীয় কাব্য কথিকার গুণগ্রাহী। তাই আমার মধুমুরলীতে আমার ধর্মীয় কবিতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে তাঁর বাধেনি, আমার অঘটনী

গল্পমালা রমন্যাসের গভীর দর্শনে সায় দিয়ে আমাকে তিনি বার বারই উৎসাহিত করেছেন। এ-কথার উল্লেখ করলাম আত্মগুণগান করতে নয়—বিশ্বাস কোরো। উল্লেখ করলাম, সত্যিই অধ্যাত্মলোকে তাঁর সহজ প্রবেশ ছিল এই কথাটি ঘোষণা করতে—সেই সঙ্গে যদি বলি তাঁর সঙ্গে এখানে আমার আন্তর যোগের জন্যে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম তাহলে অশোভন হবে না, যেহেতু এ-সূত্রে আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করতে চাইছি—আরও এই জন্যে যে, আমার অধিকাংশ প্রাক-যৌগিক বন্ধুব সঙ্গে এক্ষেত্রে আমার আজ কোন গভীর আত্মিক মিলই নেই। শ্রীকুমার বাবুর সঙ্গে ছিল এ-অঙ্গীকারে তাইতো আমার আনন্দ আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। এ-হেন পরম শুভানুধ্যায়ী আত্মার-আত্মীয়ের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ থেকে আজ আমি বঞ্চিত হয়েছি ভাবতে ব্যথা বাজে, যদিও সে-ব্যথার উলটোপিঠে এই সান্ত্বনা আছে যে, তাঁর আশীর্বাদ আমার তীর্থযাত্রার পথে আমাকে যে-বল দিয়েছিল সে-পাথেয় অফুরান।

এ-আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে আরও বেশি হয়ে উঠেছে আজ বিশেষ করে এই-জন্যে যে, যেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছে সেখানেই তিনি আমার যুক্তিখণ্ডন করতে কুণ্ঠিত হননি। সত্যের ভিৎ-রই এই আমাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আসীন ছিল, তাই সে-সম্বন্ধে মতভেদের ফাটল হৃদাসীন আনন্দ-সম্বন্ধে কোনো হানি করতে পারেনি। এই মতভেদের একটিমাত্র উদাহরণ দিয়েই আমার এ-দীর্ঘপত্রের সমাপ্তি টানব।

আমার সুভাষ-তর্পণ (Netaji, the Man) বইটি পড়ে তিনি একটি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও লিখেছিলেন যে, সুভাষ যে-পথে গিয়েছিল সে পথের পথিক হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। আমি আমার তর্পণে লিখেছিলাম—সুভাষ রাজনীতির বিপথে পা না দিলে আজ সে আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবনে এক ভাস্বর পথিকৃত হয়ে আমাদের দিব্য প্রেরণা দিত—যেহেতু সে স্বভাবে ছিল ভাবুক তথা যোগী, রাজনৈতিক নয়। শ্রীকুমার বাবু আমার এ-উক্তির প্রতিবাদ করায় আমি তাঁকে লিখেছিলাম :

"আজ দেশের কী দুরবস্থা বলুন তো? পিতৃদেব মেবারপতনে

গেয়েছিলেন: "আবার তোরা মানুষ হ।" সুভাষ ছিল মানুষের মত মানুষ—স্বভাবে নেতা। তাই আমি এখনো অনমুতপ্ত, বলবই বলব যে সুভাষ যদি ধর্মের জগতে থাকত তাহলে আছ সে আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয়ে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ 'নেশনবিলডার' রূপে আমাদের আশ্বস্ত করতে পারত তার আত্মিক জ্যোতির অভীমন্ত্রে।" (আমি শুধু আমার পত্রের চুম্বকটি দিলাম এখানে)

উত্তরে শ্রীকুমার বাবু আমাকে লিখেছিলেন:

শ্রীশ্রীদুর্গা ৩১, সাদার্ণ এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

স্নেহাস্পদেষু

প্রিয় দিলীপ

তোমার পত্র পেলাম।······

আমার লেখাটা তোমার ভালো লেগেছে জেনে সুখী হলাম। তোমার অনুতাপ জন্মানো তো দূরের কথা, তোমার মত পরিবর্তনেরও দুরাশা প্রবন্ধটি লিখবার সময় আমার মনে স্থান পায় নি। তবে বিষয়টাকে যে আর একদিক থেকেও দেখা যায় এই কথাটাই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। পাপীকে পরিবর্তন করা যায়, ধার্মিককে কে কবে পরিবর্তন করতে পেরেছে? জগাই মাধাইকে সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য সংশোধনাতীত।

তবে আমার মনে হয় তোমরা অধ্যাত্ম সাধনায় জীবনকে নিয়োগ করার ফলে প্রাকৃত মানুষের প্রয়োজনটা সব সময়ে উপলব্ধি করো না। শ্রীঅরবিন্দ যদি বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানরাজ্যের অধীশ্বর না হতেন তাহলেও হয়ত তিনি নিজে পরমরহস্যভেদী যোগেশ্বর হতে পারতেন, কিন্তু সাধনতত্ত্ব কি এমন চমৎকার ক'রে বোঝাতে পারতেন? তোমার নিজের কথাটাই ভেবে দেখ না কেন। তোমার যদি সুকুমার শিল্পসাহিত্যে অসাধারণ অধিকার না থাকত তবে "অঘটন" হয়ত ঘটতই, কিন্তু সেই অঘটনের কাহিনী কি এমন চিত্তাকর্ষক ঢঙে এমন মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে বিবৃত করতে পারতে? বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, কিন্তু যে-বেচারী শেষ নাগ তার অযুতফণায় বিশ্বের ভারসাম্য রক্ষা করছে, অধ্যাত্মসাধনা

ব্যাপারে তার কি কোনো সহযোগিতাই নেই? পুরাণে পাই—মুনিঋষিরা তাঁদের তপস্যাকে নানা দানবিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্যে রাজশক্তির আনুকূল্য চাইতেন। তাঁরা তাঁদের অধ্যাত্মসাধনলব্ধ ব্রহ্মতেজে যজ্ঞবিঘ্নকারী দৈত্যদানাদের সহজেই ভস্মীভূত করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু করেন নি কেন? শুধু এই জন্যেই নয় কি যে, তাঁদের যোগশক্তির এরূপ অপচয় তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্যের অনুকূল মনে করেন নি? সুভাষ ধর্মপথে গেলে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হতে পারত এটা ঠিক; কিন্তু যে শ্রীঅরবিন্দ বা বিবেকানন্দ একক মাহাত্ম্যে আমাদের মধ্যে জন্মেছেন, আমরা কি তাঁদেরই সাধনা আত্মসাৎ করতে পেরেছি? ঐশীশক্তিসম্পন্ন লোক যত কম জন্মায় ততই ভালো; কেন না পূর্ব্বঋষিদের সাধনা আয়ত্ত করার আমরা তত বেশি সুযোগ পাব। কে জানে, সুভাষ সিদ্ধিলাভ করলে কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সংঘাতের মত আবার নূতন একটা মতবাদ গজিয়ে উঠে আমাদের বিভ্রান্ত করত কি না? এই জন্যেই আমি লিখেছিলাম তোমার Netaji, the Man বইটিতে তোমার মতের প্রতিবাদে যে, "গ্রন্থকাব তদানীন্তন অতলস্পর্শী বিফলতার কথা হয়ত সম্যক্ ভেবে দেখেন নি যার ফলে আমরা প'ড়ে গিয়েছিলাম নৈরাশ্যের পাতালে। তাই সুভাষের আই-এন-এ সৈন্যব্যূহ গড়ে তোলাকে বলা চলে সময়োপযোগী—যার প্রসাদে আমরা হতাশা কাটিয়ে দুরাশার দীপ্ত আলোকলোকে জেগে উঠেছিলাম।" তাই তোমার বইটির ভূয়সী প্রশংসা করা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই যে সুভাষ তার বিধিনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছে। সে যে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয় নি তা হয়ত ভগবৎ-ইচ্ছারই নিগূঢ় অনুবর্তনে।

যাক্, এবার পত্র শেষ করি। আমি একরকম আছি ও আমার দ্বারা ভগবান যে কাজ সম্পন্ন করাতে চান তা যথাশক্তি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করছি।

তুমি ও ইন্দিরা আমার আশীর্বাদ জানবে।

ইতি।

তোমাদের শুভাকাঙ্খী

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ চিঠিটি আছন্ত উদ্ধৃত করলাম আরো তাঁর স্বাধীন চিন্তার তেজস্বিতা তথা বলিষ্ঠ স্বকীয়তাকে ফুটিয়ে তুলতে।

গত কয়েক বৎসর ধ'রে তাঁকে দেহদুঃখ সইতে হয়েছিল অনেক। কিন্তু মন তাঁর তেমনি তাজা ছিল। কলকাতায় শেষবার যখন তিনি আমার গানের আসরে আসেন যখন ভগ্নস্বাস্থ্য সত্বেও আমার ভজন শুনে সমানে অশ্রুপাত করেছিলেন আগের মতই। শুধু তাই নয়, দেহের দৌর্বল্য সত্বেও আমার 'মধুমুরলী' কাব্যগ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাতে আমার কবিতার দু-একটি ত্রুটির কথা লেখার পরে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন। লিখেছিলেন:

'দিলীপকুমারের কবিপ্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ হয়েছে তাঁর দার্শনিক কবিতাবলীর মধ্যে। এখানে তাঁর বুদ্ধি-সমীক্ষা ও কাব্যসুষমার অপূর্ব সমন্বয় আশ্চর্যভাবে উদাহৃত। মননশৃঙ্খলার দৃঢ় কাণ্ড অবলম্বন ক'রে সুকুমার লতিকার ম'ত কবির সৃষ্টি ভাবের ও শিল্পলাবণ্যের ঊর্ধ্বজগতে অনায়াসে বিহার করেছে।"

ভক্তিসঙ্গীত ও ভক্তিকাব্য তাঁর মনকে কী গভীরভাবে নাড়া দিত ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। তবে এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব—দেহের বার্ধক্য সত্বেও এই অনুভবের তারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখার সহজ পটুতা। তাই তো বৃদ্ধবয়সেও বহু কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন শেষ পর্যন্ত, অথচ সাধারণ ঐহিক মানুষ যেভাবে কর্মভোগে জড়িয়ে পড়ে সেভাবে নয়—তাঁর পত্রের শেষে যে ছত্রটি লিখেছিলেন আমাকে স্মরণীয়: "আমাকে দিয়ে ভগবান্ যে-কাজ সম্পন্ন করাতে চান তা যথাশক্তি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করছি।"

এই-ই হ'ল কর্মযোগের কথা: কর্ম যখন ভগবানের চরণে সমর্পিত হয় তখনই কেবল সে যোগের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়, নৈলে সে-কর্ম থাকে ঐহিক কর্ম মাত্র—যার ফলাফল ঐহিক পাপপুণ্যের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। শ্রীকুমার বাবুর কর্ম ছিল ভগবৎ-মুখী, যার অন্ত্য লক্ষ্য—নিষ্কাম কর্মী হ'তে পারা। বিষ্ণু পুরাণে পাই: "তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—অর্থাৎ সেই কর্মই কর্মযোগীর আদর্শ কর্ম যা কর্মবন্ধনে বাঁধে না, সেই বিদ্যাই সার্থক বিদ্যা যা মুক্তিমুখী। এ-আদর্শে পৌঁছতে পারা

চাট্টিখানি কথা নয়। অবশ্য প্রতি কর্মীই জীবনে তার মনের প্রাণের ভগবৎমুখী স্ফুরণে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—উদ্বুদ্ধ হয়ে চলতে চান। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকতেই। তাই আমি বলছি না যে, শ্রীকুমার বাবু তাঁর আদর্শকে প্রতিপদেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, প্রতি কর্মের ঢেউকে ভাগবত সিন্ধুমুখী ক'রে অনায়াসে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে আমি নানাসূত্রে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে একটা জিনিষ আমার চোখে পড়ত বারবারই: যে, তাঁর মধ্যে একটি নিস্পৃহ উদাসী ধার্মিক ছিল যার প্রার্থনা নিরন্তরই ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠত উপনিষদের প্রার্থনার সুরে: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—ঠাকুর আমাদের বুদ্ধিকে পরম মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।" বিশেষ ক'রে বহুপাঠী বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় সবজান্তা মোড়লের ভাব। এ-ভাবের লেশও কোনোদিন শ্রীকুমার বাবুর অশ্রান্ত কর্মসাধনাকে ম্লান করে নি।

তিনি আমাদের সমাজকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু—তাঁর চারিত্র-বলে, 'ভাবুকতায়—সর্বোপরি, আত্মিক শক্তিতে শ্রদ্ধা ও অধ্যাত্মসাধনে নিষ্ঠার ফলে গ'ড়ে-ওঠা সুসমঞ্জস আনন্দদানের সহজ প্রতিভায়। তাঁর ভগবৎ-কৃপাধন্য জীবনের যে-সুন্দর নিটোল পরিণতি তাঁর জীবনদর্শনের ও কর্মাঞ্জলির মধ্যে দিয়ে উত্তরোত্তর ফুটে উঠত তার উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই তাঁর স্নেহধন্য অগুন্তি অনুরাগীর মুখপাত্র-রূপে।

ইতি—

তোমার নিত্য শুভার্থী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দের পত্র

অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দিলীপ,

আর্টেরই জন্যে আর্ট? কিন্তু মন্ত্রটির মোটের উপর বক্তব্য কি? এর পিছনে রয়েছে ঠিক কোন্ সমস্যাটি? এর অর্থ কি এই যে রূপবন্ধ, কারুকার্যই সর্বেসর্বা? আমার মনে হয় মন্ত্রটি যখন প্রথম ব্যবহারে আসে তখন তার অর্থ ঐ ছিল। তা যদি হয় তবে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই, যা'ই তুমি লিখ না, আঁক না, খোদাই কর না, যে কোন রকমে কি যে কোন বিষয়ে সঙ্গীত রচনা কর না তা'তে কিছুই এসে যায় না, যদি লেখা হয় সুন্দর, ছবি হয় সুষ্ঠু, মূর্তি হয় সুশ্রী, সঙ্গীত হয় সুচারু। কথাটি স্পষ্টই এক হিসাবে সত্য—এই হিসাবে যে, একটি বিশেষ শিল্পেব বিধি ব্যবস্থা অনুসারে যা কিছু নির্দোষ ভাবে প্রকটিত, প্রতিফলিত, অভিব্যক্ত হয়েছে, ঠিক তাতেই একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সে-জিনিস শিল্পীর কাজে যোগ্য উপকরণ। এই অবাধ অধিকার যাবতীয় স্থূল বস্তুকে দিতে হবে, তা যত সাধারণ বা হেয় ব'লে বিবেচিত হোক্ না—যথা, আপেলটা, হাঁড়িটা, গর্দভটি বা একবাটি ব্যঞ্জন তবে কেবল এদেরই মধ্যে আবার সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলেও চলবে না। এসকল ছাড়া নৈতিক প্রশ্ন বা প্রস্তাব, দার্শনিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক কোন প্রচেষ্টা, এমন কি পঞ্চবার্ষিক ব্যবস্থাটি বা জেলাবোর্ডের কার্যবিবরণী অথবা জলসারণি কি বৈদ্যুতিক কারখানা বা কোন অতিকায় হোটেলের পরিকল্পনার সাফল্য—এই সব জিনিষই আধুনিক, কি আরও জবরদস্ত বোল্‌শেভিক রেয়াজ অনুসারে শিল্পীর রাজ্যে পাংক্তেয় হ'য়ে উঠতে পাবে। কারণ রূপবন্ধই যখন হ'ল সব, তখন একমাত্র প্রশ্ন দাঁড়াবে এই—কবি ঔপন্যাসিক নাট্যকার চিত্রকর বা ভাস্কব হিসাবে শিল্পী তাঁর বিষয়ের অন্তর্গত বাধা সব জয় করেছেন কি না, তার ভিতরের সম্ভাবনাগুলি জীবন্তভাবে প্রকাশ ক'রে মুক্তি দিতে পেরেছেন কি না। আপেলটিকে গ্রহণ

করব অথচ "আপেলের গাড়ী" খানি ("শ"এর) বাতিল করব—এ কোন যুক্তির কথা নয়। তবুও বলতে পার শিল্পীর লক্ষ্য অন্ততঃ হওয়া উচিত কেবল শিল্প। নৈতিক, সামাজিক, রাজনীতিক সমস্যা অবশ্য শিল্পীর বিষয় হ'তে পারে, কিন্তু তা' ব'লে শিল্পসৃষ্টির উদ্দীপনাকে ভয় ক'রে ঐরকম কোন ধর্মনীতিক, সামাজিক বা রাজনীতিক মতলবকে ফলিয়ে ধরা শিল্পী তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে নেবেন না। তবে একাজটি করতে গিয়ে যদি তিনি তাঁর শিল্পের বিধান পালন ক'রে অনবদ্য রূপবন্ধ দেখাতে পারেন, তার মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন সৌন্দর্য, সামর্থ্য, পরিপূর্ণতা—তবে সে-কাজ তিনি করতে পারবেন না কেন? নীতিকার প্রচারক, দার্শনিক কি সামাজিক বা রাজনীতিক উৎসাহী অনেক সময় একই সাথে হ'য়ে থাকেন আবার শিল্পী—এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সামনেই—প্লেতো এবং শেলী—বেশিদূর যেতে হবে না। তবে এই মতবাদটির জোরে শিল্পীর কাছে তুমি শুধু এই দাবী করতে পার যে, শিল্পরচনা হিসাবে তাঁর সৃষ্টির বিচার হবে কারিগরির সাফল্য দিয়ে, বিষয়বস্তু দিয়ে নয়—তাঁর নৈতিক জল্পনা, তাঁর উৎসাহ—আস্পৃহা, তাঁর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার মূল্য অনুসারে তাঁর সৃষ্টি কিছু মহত্তর হ'য়ে উঠবে না।

তা'হলেও সমস্ত সিদ্ধান্তটি সত্য কেবল কিছুদূর পর্যন্ত। রূপবন্ধ প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। শুধু সুন্দর কথা ব্যবহারের জন্যই কেউ লেখে না, রং ও রেখার বাহারের জন্যই কেউ ছবি আঁকে না—একটা কিছু জিনিষ আছে যাকে এই সব উপায়ের আশ্রয়ে প্রকাশ করা বা আবিষ্কার করাই হ'ল শিল্পীর প্রচেষ্টা। সেই জিনিষটি কি? প্রথম উত্তর হবে সৌন্দর্যের আবিষ্কার, সৌন্দের্যর সৃষ্টি। শিল্প কেবল ঐ বস্তুটিরই জন্য—সৌন্দর্যের আবিষ্কার, সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি দিয়েই শুধু তার বিচার। যা কিছুকে সুন্দরের বিগ্রহ ক'রে প্রকাশ করা যায় তাই শিল্পীর উপকরণ। তবে জগতে যে কেবল দৈহিক সৌন্দর্যই আছে তা নয়, আছে নৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য। তবুও বলা যেতে পারে, শিল্পেরই জন্য শিল্প একথার অর্থ এই—যা কেবল রসের দিক নিয়ে সুন্দর তারই রূপ

দিতে হবে। আর এই রসপ্রতিষ্ঠা সৌন্দর্যবোধের বিরোধী যা কিছু সে সব দূরে রেখে চলতে হবে। জীবন হিসাবে জীবনের সাথে, সাক্ষাৎ জিনিস সকলের সাথে, অথবা মঙ্গল সত্য ভগবান এদের জন্যেই এদের সাথে আর্টের কোন সম্বন্ধ নাই; আর্টের সাথে এ সকলের সম্বন্ধ ততটুকু, যতটুকু এরা একটা রসমুখী সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ঠিক এই হেতুর জোরে পঞ্চবার্ষিক ব্যবস্থাটি বা কোন নীতি উপদেশ বা দার্শনিক আলোচনাকে আর্টের রাজ্য থেকে বহিষ্করণের যোগ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও জিজ্ঞাস্য, সৌন্দর্য মোটের উপর বলি কাকে? জিনিষটির মধ্যে সৌন্দর্য কতখানি রয়েছে, কতখানি বা রয়েছে সৌন্দর্যগ্রাহী চেতনার মধ্যে? শিল্পীর দৃষ্টি কি প্রতিনিয়তই অতি সাধারণের মধ্যে, কুৎসিতের মধ্যে, হেয়ের বীভৎসের মধ্যে একটা কিছু রস-বস্তু আহরণ করছে না? তাঁর উপকরণের আশ্রয়ে—বাক্যের, রঙ-রেখার, খোদিত আকারের আশ্রয়ে—সেই বস্তুটিকে বিজয়-আনন্দে ব্যক্ত ক'রে ধরছে না?

যোগলব্ধ এক চেতনা আছে যেখানে দ্রষ্টার চোখে সব জিনিষই সুন্দর হ'য়ে দেখা দেয়—শুধু এইজন্যই যে, সব জিনিস সেখানে রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক সত্তায়; কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা যে-আনন্দ, যে-প্রচ্ছন্ন ভগবান তাঁকেই প্রত্যেক জিনিস বিশেষ সত্তার, বিশেষ চেতনার রেখায়, রূপে, গুণে, সামর্থ্যে ধ'রে প্রতিফলিত করে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কাছে জিনিষটি যেমন তেমন ভাবে সাধারণ রসবোধের দৃষ্টি তাকে সুন্দর না দেখতে পারে, প্রায়ই সুন্দর দেখে না, কিন্তু যোগী তার মধ্যে দেখে থাকেন সেই অধিকন্তু কিছু স্থূল চক্ষু যা দেখে না; তিনি দেখছেন পিছনে রয়েছে যে-অন্তঃপুরুষ, স্বরূপ, যে-অধ্যাত্ম সত্তা। তিনি আরও দেখেন এমন সব রেখা, বর্ণ. সুসঙ্গতি, সার্থক অঙ্গবিন্যাস—যা স্থূল দৃষ্টিতে প্রথমেই দেখা যায় না বা ধরা পড়ে না। বলা যেতে পারে তাঁর নিজের ভিতরে যা রয়েছে যোগী তারই কিছু বিষয়টির মধ্যে এনে ভ'রে দিয়েছেন, আপন সত্তা থেকে আহরিত কিছু তার সাথে জুড়ে দিয়ে তার রূপান্তর ঘটিয়েছেন—শিল্পীও যেমন তা ক'রে থাকেন, যদিচ ভিন্ন প্রকারে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক ঠিক তা নয়। যোগী যা দেখেন, শিল্পী

যা দেখেন তা জিনিষের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর দৃষ্টি রূপান্তর সাধন করে, কারণ তা অন্তরতমকে ব্যক্ত করতে সক্ষম। বস্তুর আপাত-প্রতীয়মান রূপের পিছনে আছে যে একটা অতিরিক্ত কিছু তাই তিনি আবিষ্কার ক'রে ধরেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে,—যে-দিক দিয়ে দেখা যায় একটা নিত্যসিদ্ধ পরম সুসামঞ্জস্য—সব জিনিষই শিল্পীর বিষয় বস্তু হয় বা হতে পারে; কারণ যে-সৌন্দর্য সর্বত্রই রয়েছে তাকে তিনি সকলেরই মধ্যে আবিষ্কার করতে পারেন, প্রকট করতে পারেন। এই ভাবে দেখি—এ-পথেও আমরা গিয়ে পড়েছি এক প্রলয়ঙ্কর উদারতার মধ্যে; কারণ এখানেও কেউ কোথাও একটা সীমা নির্দেশ ক'রে দাঁড়ি টেনে দিত পারে না। অবশ্য কথাটা একটু দুরূহ শোনায় যে, শূকর কি শূকর-মারা ডাণ্ডা হতে কি কারও ঔষধের বড়ির বিজ্ঞাপন থেকে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার ও প্রকট করা যায়; কিন্তু এই ধরণেরই কিছু কি আধুনিক আর্ট ও সাহিত্য জোরের সাথে একনিষ্ঠ যত্নসহকারে চেষ্টা করছে না? ঐ সূত্রটিই যদি একটু ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা যায় তবে নৈতিকতা সমাজ-সংস্কার কি রাজনীতিক ঘোঁটের ভিতর থেকেও সমানভাবে সৌন্দর্যসার নিষ্কাসন করা যেতে পারে; অন্ততঃ শিল্পীর যদি ইচ্ছা হয় তবে এইসব বিষয়-বস্তুর উপর তিনি ন্যায্য অধিকার দাবী করতে পারেন—এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। এখানেও এমন বলা চলে না যে, শিল্পী তা করতে পারেন একমাত্র এইসর্তে যে, তাঁর মন থাকবে কেবল সৌন্দর্যের উপর, নীতি উপদেশ বা সমাজ-সংস্কার কি রাজনীতিক কোন প্রস্তাবকে তিনি প্রধান লক্ষ্য ক'রে তুলবেন না। কারণ এসকল বিষয় তাঁর মনের মধ্যে প্রধান হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও, যদি তিনি উচ্চস্তরের শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, ঐ লক্ষ্যেরই দিকে চলতে চলতে সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে থাকেন, তাঁর রসবিরোধী বৃত্তি সত্ত্বেও নিজেকে পরম স্রষ্টা বলে দেখাতে পারেন, তবে ঠিক তাইত আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করি—আরম্ভ তাঁর যেমনতরই হোক না তিনি হ'য়ে উঠবেন সৌন্দর্যের স্রষ্টা। শিল্প হ'ল সৌন্দর্যের আবিষ্কার ও সাক্ষাৎ-প্রকাশ—এই সূত্রকে কোন নিষেধ বা ব্যতিক্রম দিয়ে খাটো করবার উপায় নেই।

কিন্তু আরও একটি কথা আছে, তাতেই এসে পড়ে বিপুল পার্থক্য।

যোগী যে-দৃষ্টিতে দেখেন বিশ্বসৌন্দর্য তাতে সবই সুন্দর হয়ে উঠে বটে, কিন্তু সবই সমান স্তরে এসে দাঁড়ায় না। এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে আছে একটা ক্রমবিন্যাস, উচ্চনীচ-পর্যায়—আর তা নির্ভর করে ঊর্ধ্বগামী যে চেতনা, যে আনন্দ বস্তুর মধ্যে আপনাকে প্রকট ক'রে চলেছে তার মাত্রার উপর। সব বস্তুই ভগবান, কিন্তু ন্যূনাধিক পরিমাণে। শিল্পীর দৃষ্টিতে মর্যাদার স্তর বিভাগ ক্রমন্যাস আছে বা থাকতে পারে। ডগ্‌বেরি এবং মাল্‌ভোলিওর ভিতরেও শেক্সপীয়র নাট্যজ সুতরাং রসগত মর্যাদা আবিষ্কার করতে পারেন—এদিকেও তিনি সেই একই নিখুঁত শিল্পীর, পরম স্রষ্টার হাত দিয়ে তৈরী করেছেন যে হাতে গড়ে উঠেছে লিয়র, ম্যাক্‌বেথ। কিন্তু তবুও শেক্সপীয়রের প্রতিভার সাক্ষী হিসাবে যদি ডগ্‌বেরী ও মাল্‌ভোলিওই শুধু থাকত, থাকত না লিয়র, ম্যাক্‌বেথ তা'হলে কি তিনি এখনকার মত বড় নাট্যশিল্পী বা স্রষ্টা হতে পারতেন? কোন্ জিনিষের মধ্যে কতখানি কি সম্ভাবনা নিহিত তাতেই এসে যায় বৃহৎ প্রভেদ। আপেল্লে'র গড়া আঙুর পাখীতে ভুল ক'রে ঠোকরাতে এসেছিল, কিন্তু তার চেয়ে ফিদিয়ার জিয়ুসে পরিমাণে রয়েছে বেশী রস-পদার্থ—সৌন্দর্যগত যে আদি ধারাটি তাকে ভ'রে দেবার, প্রকাশ করবার জন্য এখানে রয়েছে একটা অধিকতর চেতনা সম্পদ, সুতরাং অধিকতর আনন্দ সম্পদ; যদিও দু'ই শিল্পীই, দুটি বিষয়েরই মধ্যে সৌন্দর্যের মূল স্বরূপ হয়ত বা সমান নির্দোষে রসায়িত ক'রে দেখাতে পারেন।

এর কারণ এই, শিল্পে রূপবন্ধই যেমন সব নয় তেমনি সৌন্দর্যও সব নয়। শিল্প যে কেবল রূপবন্ধ বা সৌন্দর্যের মূর্তি, শুধু সৌন্দর্যেরই আবিষ্কার ও অভিব্যক্তি তা নয়। রসাত্মক দৃষ্টির এবং নির্দোষ সৃষ্টির যে বিধি তার আশ্রয়ে চেতনার আত্মপ্রকাশ—এই হ'ল আর্ট। অথবা অন্যভাবে বলতে পারা যায় যে, আর্টের উপাদানে কেবল রসগত ওজন নাই, আছে আবার জীবনের, মনের, অন্তরাত্মার ওজন। শিল্পী কেবল তাঁর নিজেরই চেতনার ঐশ্বর্যকে নয়, পরন্তু যে পরাচেতনা জগৎসকল, জগতের অন্তর্গত বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছে তারও ঐশ্বর্য রূপায়িত ক'রে তোলেন। আর এই চেতনা বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যদি সর্বত্রই মূলতঃ সমান, তবুও প্রকাশে সকল জিনিষের মধ্যে তার শক্তি সমানে ব্যক্ত নয়।

সাধারণ মানুষের—প্রাকৃতো জনঃ—চেয়ে বিভূতির মধ্যে ভগবানের প্রকাশ বেশী। কোন কোন জীবন-আধারে অধ্যাত্মের আত্মাভিব্যক্তির সম্ভাবনা অন্যান্য আধার হতে অপেক্ষাকৃত কম। তাছাড়া চেতনারও আছে আবার নানা স্তর—তার ফলে শিল্পরচনার আকারগত সৌন্দর্যের মূল্যে বা মহত্ত্বে কোন ইতরবিশেষ না ঘটলেও তাতে বস্তুগত মূল্যে এনে দেয় একটা পার্থক্য। হোমর সৌন্দর্য গড়েছেন মানুষের বাহ্য জীবন কর্মকে ধ'রে—এর বেশী তিনি যান নাই। শেক্সপীয়র আর এক পা অগ্রসর হয়েছেন; তিনি ব্যক্ত করেছেন প্রাণময় আত্মাকে, প্রাণময় শক্তি-রাজিকে, প্রাণগত মর্যাদাকে—এই সকলের মধ্যে হোমর প্রবেশ করতে পারেন নাই। বাল্মীকি ও ব্যাসের মধ্যে সদা-সর্বদা পাই জীবনকে, জীবনের সকল বৃত্তিকে ধারণ ক'রে রয়েছে যেসব মহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ—এসব জিনিষ শেক্সপীয় কি হোমরের দৃষ্টি-পরিধির বাহিরে। আর আদর্শকে ভাবশক্তিকে অতিক্রম ক'রে উপরে রয়েছে অন্যরকমের সত্য, আরও অন্তরের অন্তরতম বস্তু সব, জিনিষের জীবের পিছনে যে এক অন্তর পুরুষ, অধ্যাত্ম সত্তা আর তার শক্তি সমুদয়—এই সবই শিল্পের বিষয় হ'তে পারে! শিল্প তা'তে হ'য়ে উঠে আরও অনেক বেশী শুদ্ধতর, গভীরতর, রসপ্রচুর। এই সকলকে যে কবি আবিষ্কার করেছেন, অতীতের কবিদের সমান শক্তি দিয়ে এদের বাণী-মূর্তি গড়েছেন তিনি কেবল সৌন্দর্য-সৃষ্টির গুজনে হয়ত মহত্তর শিল্পী না'ও হতে পারেন কিন্তু তাঁর শিল্পের পদার্থ, চেতনা-সম্পদ পূর্বতর সৃষ্টি অপেক্ষা হ'তে পারে গভীরতর, উচ্চতর, পূর্ণতর। এখানে এমন একটা জিনিষ পাই যা "শিল্পেরই জন্য শিল্প" বা "সৌন্দর্যের জন্য শিল্প"—এসব মন্ত্রের সত্যকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ এসকলে জোর দিতেছে সৌন্দর্য-সৃষ্টির যে একান্ত আবশ্যক গোড়াকার উপকরণ তার উপর, সে জোর অনেক সময় কাজে আসে, কিন্তু তাতে সৃষ্টি জিনিষটি সঙ্কীর্ণ হ'য়ে পড়তে পারে, যদি তার অর্থ হয়, সেই অধিকন্তু কিছুকে বাদ দিয়ে রাখা যা শিল্পকে নিত্য পরিবর্তনে প্ররোচিত করেছে—যার কারণে, শিল্পের নিরন্তর প্রয়াস গুপ্ত বা ব্যক্ত যে ভগবান, ব্যষ্টিগত বিশ্বরূপী বা বিশ্বাতীত যে অধ্যাত্ম সত্তা তাকে ক্রমে অধিক হতে অধিকতর প্রকাশ ক'রে চলা।

তিনটি জিনিষ নিয়ে তবে হ'ল শিল্পের সমগ্রতা। প্রথম, প্রকাশক্ষম রূপের অনবদ্যতা, সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার; দ্বিতীয়, বস্তুর যে মূল সত্তা বা অন্তরাত্মা তার অভিব্যক্তি; তৃতীয়, এই দুটি অঙ্গ যার বাহন সেই সৃষ্টি-পটু চৈতন্যের ও আনন্দের শক্তিরাজি। এই তিনটি যদি আমরা এক সাথে গ্রহণ করি তবে বর্ত্তমান বিতর্কের উভয় পক্ষকে মিলিয়ে ধরতে পারে, তাদের পার্থক্যকে মিটাতে পারে এমন মীমাংসায় হয়ত আমরা পৌছাতে পারি। শিল্পেরই জন্য শিল্প—নিশ্চয়; কারণ শিল্প হ'ল এক হিসাবে অনবদ্য রূপ, সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু শিল্প আবার অন্তঃপুরুষের জন্য, আত্মার জন্য—সৌন্দর্যকে আশ্রয় ক'রে, তার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরুষ, আত্মা যা গড়তে চায় সে সকলের প্রকাশের জন্য। এই আত্মপ্রকাশের ধারায় রয়েছে স্তরবিভাগ, ক্রমবিন্যাস—সম্প্রসারণ-পরম্পরা সোপানাবলী যারা সমুচ্চের দিকে উঠে চলেছে। শিল্পকে পরম বিস্তৃত বিস্তৃতির অভিমুখে প্রকাশিত ক'রে চলার সাথেই তাকে ধ'রে আবার উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধতর শিখরে উঠে উর্দ্ধতমের দিকে চলতে হবে—এই হ'ল আমাদের শিল্প-সাধনার, আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনার—উভয়েরই প্রয়াস।

পরিশিষ্ট

ART FOR ART'S SAKE

Art for Art's sake? But what after all is meant by this slogan and what is the real issue behind it? Is it meant, as I think it was when the slogan first came into use, that the technique, the artistry is all in all? The contention would then be that it does not matter what you write or paint or sculpt or what music you make or about what you make it so long as it is beautiful writing, competent painting, good sculpture, fine music. It is very evidently true in a certain sense,—in this sense that whatever is perfectly expressed or represented or interpreted under the conditions of a given art proves itself by that very fact to be legitmate material for the artist's labour. But that free admission cannot be confined only to all objects, however common or deemed to be vulgar—an apple, a kitchen pail, a donkey, a dish of carrots,—it can give a right of citizenship in the domain of art to a moral theme or thesis, a philosophic conclusion, a social experiment; even the Five Years' Plan or the proceedings of a District Board or the success of a drainage scheme, an electric factory or a big hotel can be brought after the most modern or the still more robustious Bolshevik mode into the artist's province. For, technique being all, the sole question would be whether he as poet, novelist, dramatist, painter or sculptor has been able to triumph over the difficulties and bring out creatively the possibilities of his subject. There is no logical basis here for accepting an apple and rejecting the (Shavian) Apple-cart. But still you may say that at least the object of the artist must be art only,—even if he treats ethical, social or political questions, he must not make it his main object to wing with the enthusiasm of æsthetic creation a moral, social or political aim. But if in doing it he satisfies the conditions of his art, shows a perfect technique and in it beauty, power, perfection, why not? The moralist, preacher, philosopher, social or political enthusiast is often doubled with an artist—as shining proofs and examples there are Plato and Shelley, to go no farther. Only, you can say of him on the basis of this theory that as a

work of art his creation should be judged by its success of craftsmanship and not by its contents ; it is not made greater by the value of his ethical ideas, his enthusiasms or his metaphysical seekings.

But then the theory itself is true only up to a certain point. The technique is only a means of expression ; one does not write merely to use beautiful words or paint for the sole sake of line and colour ; there is something that one is trying through these means to express or to discover. What is that something ? The first answer would be—it is the creation, it is the dicovery of Beauty, Art is for that alone and can be judged only by its revelation or discovery of Beauty. Whatever is capable of being manifested as Beauty is the material of the artist. But there is not only physical beauty in the world--there is moral, intellectual, spiritual beauty also. Still one might say that Art for Art's sake means that only what is æsthetically beautiful must be expressed and all that contradicts the æsthetic sense of beauty must be avoided. Art has nothing to do with Life in itself, things in themselves, Good, Truth or the Divine for their own sake, but only in so far as they appeal to some æsthetic sense of beauty. And that would seem to be a sound basis for excluding the Five Years' Plan, a moral sermon or a philosophical treatise. But here again, what after all is Beauty ? How much is it in the thing itself and how much in consciousness that perceives it ? Is not the eye of the artist constantly catching some element of æsthetic value in the plain, the ugly, the sordid, the repellent and triumphantly conveying it through his material,—through the word, through line and colour, through the sculptured shape ?

There is a certain state of Yogic consciousness in which all things become beautiful to the eye of the seer simply because they spiritually are—because they are a rendering in line and form and quality and force of existence, of consciousness, of the Ananda that rules the worlds,—of the hidden Divine. What a thing is to the exterior sense may not be, often is not beautiful for the ordinary æsthetic vision, but the Yogin sees in it the something More which the external eye does not see, he sees the soul behind, the self and spirit, he sees too lines, hues, harmonies and expressive dispositions which are not to the first surface

sight visible or seizable, It may be said that he brings into the object something that is in himself, transmutes it by adding out of his own being to it—as the artist too does something of the same kind but in another way. It is not quite that however,—what the Yogin sees, what the artist sees, is there—his is a transmuting vision because it is a revealing vision—he discovers behind what the object appears to be, the something More that it is. And so from this point of view of a realised supreme harmony all is or can be subject-matter for the artist because in all he can discover and reveal the Beauty that is everywhere. Again we land ourselves in a devastating catholicity ; for here too one cannot pull up short at any given line. It may be a hard saying that one must or may discover and reveal beauty in a pig or its poke or in a parish pump or an advertisement of somebody's pills, and yet something like that seems to be what modern Art and literature are trying with vigour and a conscientious labour to do. By extension one ought to be able to extract beauty equally well out of morality or social reform or a political caucus or allow at least that all these things can, if he wills, become legitimate subjects for the artist. Here too one cannot say that it is on condition he thinks of beauty only and does not make moralising or social reform or a political idea his main object. For if with that idea foremost in his mind he still produces a great work of art, discovering Beauty as he moves to his aim, proving himself in spite of his unæsthetic preoccupations a great artist, it is all we can justly ask from him—whatever his starting-point, to be a creator of Beauty. Art is discovery and revelation of Beauty and we can say nothing more by way of prohibitive or limiting rule.

But there is one thing more that can he said and that makes a big difference. In the Yogin's vision of universal beauty, all becomes beautiful, but all is not reduced to a single level. There are gradations, there is a hierarchy in this All Beauty and we see that it depends on the ascending power (vibhuti) of consciousness and Ananda that expresses itself in the object. All is the Divine, but some things are more divine than others. In the artist's vision too there are or can be gradations, a hierarchy of values. Shakespeare can get dramatic and therefore æsthetic values out of Dogberry and Malvolio and he is as thorough a

creative artist in his treatment of them as in his handling of Macbeth or Lear. But if we had only Dogberry or Malvolio to testify to Shakespeare's genius, no Macbeth, no Lear, would he be so great a dramatic artist and creator as he now is? It is in the varying possibilities of one subject or another that there lies an immense difference. Apelles' grapes deceived the birds that came to peck at them, but there was more æsthetic content in the Zeus of Phidias, a greater content of consciousness and therefore of Ananda to express and full in the essential principle of Beauty, even though the essence of beauty may be realised perhaps with equal æsthetic perfection by either artist and in either theme.

And that is because just as technique is not all, so even Beauty is not all in Art. Art is not only technique or form of Beauty, not only the discovery or the expression of Beauty—it is a self-expression of Consciousness under the conditions of æsthetic vision and a perfect execution. Or to put it otherwise there are not only æsthetic values, but life values, mind values, soul values that enter into Art. The artist puts out into form not only the powers of his own consciousness, but the powers of the Consciousness that has made the worlds and their objects. And if that Consciousness according to the Vedantic view is fundamentally equal everywhere, it is still in manifestation not an equal power in all things. There is more of the Divine expression in the Vibhuti than in the common man, *prakrito janah*; in some forms of life there are less potentialities for the self-expression of the Spirit than in others. And there are also gradations of consciousness which make a differenee if not in the æsthetic value or greatness of a work of art, yet in its contents-value. Homer makes beauty out of man's outward life and action and stops there. Shakespeare rises one step and reveals to us a life-soul and life-forces and life-values to which Homer had no access. In Valmiki and Vyas there is the constant presence of great Idea-Forces and Ideals supporting life and its movement which were beyond the scope of Homer and Shakespeare. And beyond the Ideals and Ideal-Forces even there are other presences, more inner or inmost realities, a soul behind things and beings, the spirit and its powers, which could be the subject-matter of an art still more rich and deep and

abundant in its interest than any of these could be. A poet finding these and giving them a voice with a genius equal to that of the poets of the past might not be greater than they in a purely æsthetical valuation, but his art's contents-value, its consciousness values could be deeper and higher and much fuller than in any achievement before him. There is something here that goes beyond any consideration of Art for Art's sake or Art for Beauty's sake—for while these stress usefully sometimes the indispensable first elements of artistic creation, they would limit too much the creation itself if they stood for the exclusion of the something More that compels Art to change always in its constant seeking for more and more that most be expressed of the concealed or the revealed Divine, of the individual and the universal or the transcendent Spirit.

If we take these three elements as making the whole of Art, perfection of expressive form, discovery of beauty, revelation of the soul and essence of things and the powers of creative consciousness and Ananda of which they are the vehicles, then we shall get perhaps a solution which includes the two sides of the controversy and reconciles their difference. Art for Art's sake certainly—Art as a perfect form and discovery of Beauty ; but also Art for the soul's sake, the spirit's sake and the expression of all that the soul, the spirit wants to seize through the medium of beauty. In that self-expression there are grades and hierarchies—widenings and steps that lead to the summits. And not only to enlarge Art towards the widest wideness but to ascend with it to the heights climbing towards the Highest is and must be part both of our æsthetic and our spiritual endeavour.

Sri Aurobindo